মাইকেল-সমীক্ষা

শ্রীদেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য
অধ্যাপক, যোগমায়া দেবী কলেজ, কলিকাতা

একমাত্র পরিবেশক
অপূর্বা
১৬।১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

১৭, রায় মথুরানাথ চৌধুরী স্ট্রীট, কলিকাতা-৩৬ হইতে
শ্রীমতী গীতা দেবী কর্তৃক প্রকাশিত

প্রথম প্রকাশ :
জানুয়ারী, ১৯৫৭

২৭।৩ বি, হরি ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬, শঙ্কর প্রিণ্টার্স-এর পক্ষে
শ্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত

মুখবন্ধ

সন্তঃ পরীক্ষ্যান্যতরদ্ ভজন্তে
মূঢ়ঃ পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধিঃ। (কালিদাস)

প্রশস্তি-চন্দনে লিপ্ত বিগ্রহের স্বরূপ খুঁজে পাওয়া বড্ডো শক্ত। খুঁজতে যাবে কে? ভয়ে হাত কাঁপে, এখনই সব পাণ্ডারা হাঁ-হাঁ করে উঠবে। যুক্তিবাদীরা তাদের চোখে কালাপাহাড়। কেউ তাদের আমল দিতে রাজী নয়। বড়ো বড়ো মহারথীর আরতি-দীপে যাঁর পাদ-পীঠে ভিড় জমে গেছে, সেখানে তাই সকলেরই চেষ্টা, আরও একটি দীপ জ্বেলে দিয়ে পাণ্ডাদের প্রসন্ন হাতে কপালে তুলে নেওয়া দপ্‌দপে সিঁদুর টিপ—নির্বিশেষের ভিড়ে বিশেষ হয়ে বেড়ানো। কিন্তু ঐ দীপালোকেরও নেশা থাকে, থাকে চোখ-ধাঁধানো মায়া, যাতে খাঁটি স্বরূপটি চোখে পড়তে চায় না। চাঁদোয়ার তলে এলেই শুধু একটা কাজ, দুই বাহু তুলে নেচে নেচে গাও খালি বন্দনাগান রকমারি সুরে! সমালোচনা? এযুগে তো বন্দনাই সমালোচনা। কি জানি, হয়তো—"প্রকৃত সমালোচনা পূজা"—এই রাবীন্দ্রিক বচনের কোনো প্রভাব থাকতে পারে এর উপর। তাই সমালোচনা, আগে যাই থাকুক, বর্তমানে হয়েছে শুধুই প্রশস্তি, শুধুই বন্দনা।

আগে বিদ্যাসাগরের সমালোচনায় বঙ্কিমকে বলতে শোনা গেছে, বিদ্যাসাগর পাঠ্যপুস্তক রচয়িতামাত্র, তাঁর রচনা মৌলিক নয়, সবই হয় ইংরেজি নয় সংস্কৃতের অনুবাদ, সুতরাং বাংলাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গদ্য-লেখকের সম্মান তাঁর প্রাপ্য নয়। (সুকুমার সেন, বাংলাসাহিত্যে গদ্য, ১ম খণ্ড, ২য় সং., পৃ. ৯২) এই অভিযোগের প্রতিবাদ থাকতে পারে, কিন্তু একে নিছক ঈর্ষাপ্রসূত বলে মনে না করে স্বচ্ছন্দে সমালোচন-রীতিসম্মত বলে ধরা যেতে পারে। আবার এখনকার দিনের মাইকেল-ভক্তগণ বিদ্যাসাগরকেই বা কি ক'রে ক্ষমা করবেন, জানি না, যদি মনে করিয়ে দেওয়া যায়, কোনো সময়ে মাইকেলকে তিনি মনে করতেন 'একটা গর্ভস্রাব, যা কিছু করছে সবই অপদার্থ, সুরা-মত্ততা ও মূঢ়তা-প্রসূত। (...an abortion, the worthless issue of drunkenness and stupidity.—'জীবন-চরিত' ৪র্থ সং., পৃ. ২৯৫') ।

যে রাজনারায়ণ বসু ছিলেন কবির অন্তরঙ্গ বন্ধু ও তাঁর কাব্যকৃতিতে মুগ্ধ, তিনিও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীতে কাব্যের ও কবির কতই না দোষ দেখিয়ে 'সমালোচনা' সার্থক করেছেন। যে বঙ্কিম বাংলাদেশের কবি বলতে জয়দেব গোস্বামীর পরই একেবারে মাইকেলকে চিহ্নিত করেছেন, এমনকি উচ্ছ্বাসভরে বলেছেন, "জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও * * * তাহাতে নাম লেখ, শ্রীমধুসূদন,"—তিনিও জানাতে ভোলেন নি, মধুসূদনের "কবিত্ব তাদৃশ প্রগাঢ় নহে।"[১] আবার কোথাও স্পষ্টাক্ষরে বলে গেছেন,—plagiarism-এর অভিযোগ থেকে মাইকেলের কাব্যের অব্যাহতি নেই[২]।

কিন্তু এসব দৃষ্টান্ত সেকালের। একালে কেবলই পূজা। পঞ্চোপচারে হয়ে গিয়ে থাকলে, দশোপচার, ষোড়শোপচার! আহুতি বাড়াও—অষ্টাবিংশতি, অষ্টোত্তর শত, অষ্টোত্তর সহস্র! কেউ ভোগের দিকে লক্ষ্য রাখ; কেউ বাড়াও আলোকসজ্জা, কেউ বা বাড়াও বাদ্যোদ্যমের ঘটা! একজন ভাষা নিয়ে ভঙ্গী নিয়ে অঙ্গন্যাস-করন্যাসের কায়দা দেখিয়েছে? তুমি জীবনদর্শন-জাতীয়জাগৃতি-যুগন্ধরত্ব-দেশপ্রেম-বিশ্বপথিকত্বের পঞ্চপ্রদীপ জ্বালিয়ে জমকালো আরতি চালাও! তুমিই বা দাঁড়িয়ে কেন? অলঙ্কারের বাদ্য-ঘটায় মেতে যাও। কিন্তু হুঁশিয়ার, দেবতার মহিমা যেন থাকে ক্রমবর্ধমান। এই তো, এখনকার সমালোচনা। অথচ সকলেই জানেন, সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমের বঙ্গসাহিত্যসেবার রূপটি রচনা ও সমালোচনা এই দুয়ের সুষম উপাদানে অপরূপ ছিল বলেই আমাদের সাহিত্য এত দ্রুত উন্নত ও সমৃদ্ধ হতে পেরেছিল। বলা বাহুল্য 'সমালোচনা' তখন ঠিক 'পূজা'-মাত্র ছিল না।

তার পরেও আমরা সমালোচনা দেখেছি। দেখেছি রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে, দেখেছি শরৎচন্দ্রকে নিয়ে। প্রতিবাদের অবসর থাকলেও, সমালোচনা যে ধাতুতে সুস্থ স্বাধীন সত্তা পেতে পারে, সেই ধাতু নিখাদ থেকেছে। কিন্তু এখন এসেছে ভেজালের দিন। এখন শুধু নামেই সমালোচনা; আসলে কোনো নামকরা শিল্পীকে কেবলই নব নব নামাবলীতে সাজানোর প্রয়াস—তা যে দৃষ্টিভঙ্গীতেই হোক—। উদ্ভাবন, অনুমান বা আরোপ সূত্রে প্রশংসিতের গলায় রকমারি প্রশংসার মালা পরিয়ে দেওয়া। প্রশংসার মাত্রা কোথায় কতদূর গিয়ে ঠেকছে, মিথ্যার জঞ্জালে সত্য আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে কি

(১) বিবিধ প্রবন্ধ—'বিদ্যাপতি ও জয়দেব'। (২) Calcutta Review No. 104, 1871.

না,—এসব কিছুই বিচার করা হয় না। এর ফলে সাহিত্যে এক জাতীয় উপকরণের ভিড় জমে উঠছে, যার পরিচয় হলো নিছক পণ্ডিতী কসরতে গড়ে তোলা সাহিত্যিক বাহাদুরি। মূল রচনা ও তার উপরে 'সমালোচনা' (?), এই দুটিকে পাশাপাশি ধরলে অনেকক্ষেত্রে মনে হয় যেন গহনার চটক দেখিয়ে মেয়েকে অনিন্দ্যসুন্দর করে চালাবার চেষ্টা, অথবা ঢাকীর বাজনা যাই হোক, রকমারি মেডেলের জোরে তাকে দিগ্বিজয়ী করে তোলা!

মাইকেল মধুসূদন যতোই আক্ষেপ করে যান, তাঁর মতো ভাগ্যবান কবি কমই দেখা যায়। খাঁটি কবিতার বিরল নমুনা সত্ত্বেও (কতিপয় সনেট ও 'বীরাঙ্গনা' ছাড়া, — যে 'বীরাঙ্গনা'র কবিকৃতির বিশেষত্ব সাধারণত উপেক্ষিত বা 'মেঘনাদবধে'র ছায়ায় আচ্ছন্ন) তিনি হয়েছেন 'মহাকবি'; আর সেই মহাকবি-বিগ্রহ ক্রমাগত প্রশস্তি-চন্দন-লেপনে এখন এমনি মহিমাধার, যে তাঁর কাব্যের অজস্র ত্রুটি-বিচ্যুতি, অশেষ অসঙ্গতি—সবই বুঝি বিরাট বিগ্রহ-মহিমার অঙ্গে স্বচ্ছন্দে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হতে চায় চন্দ্র-দেহে শশ-চিহ্নের মতো। কিন্তু চন্দ্রমার গৌরবে স্বতঃই জগৎ প্লাবিত, তাই শশ-লাঞ্ছিত হওয়ায় সে গৌরব আরো বেড়ে গেছে। মেঘনাদবধের কবি মধুসূদনের কবিত্বের গৌরব কোথায় যে তাঁর ত্রুটি সেই গৌরবকে আরো বাড়িয়ে দেবে? থাকতে পারে শিল্পের গৌরব, অভিনবত্বের যোগানে ভাষা ও সাহিত্য-সেবার গৌরব, কিন্তু কবিত্ব? সেটির সন্ধানে একটু হতাশ হতে হয় না কি? অথচ মাইকেল মহাকবি। এ যদি ভাগ্য না হয় তো ভাগ্য আর কাকে বলে? মহাকবি তিনি হোন, আপত্তি নেই। তিনি নূতন যুগের 'মহাকাব্য'-রচনায় প্রথম প্রয়াসী, অমিত্রচ্ছন্দ-প্রবর্তনে বাংলা কাব্যধারায় এনেছেন নূতন প্রবাহ, সঙ্গে যুগিয়েছেন ভাষায় নূতন শব্দ-ধ্বনি, নূতন ঝঙ্কার, সনেটের নমুনা দেখিয়ে পত্তন করেছেন একটা নূতন কাব্যরীতি। সুতরাং কাব্যজগতে তিনি উচ্চ সম্মান দাবী করতে পারেন বৈ কি। মাইকেল 'মহাকবি', এতে আপত্তি উঠতে পারে না,—আপত্তি ঐ মহাকবির ব্যঞ্জনার বহরে। তিনি নব নব উদ্ভাবন-প্রবর্তনের মহাকবি হোন, কিন্তু কবিত্বের মহাকবি হলেন কিসে?

তর্ক উঠতে পারে, বাল্মীকি বা হোমার কি খুব উঁচুদরের কবিত্ব দেখিয়েছেন? তার জবাবে আগে বলি, বাল্মীকি শুধু আদি-কবি নন, নিঃসন্দেহে বড়ো কবি। রামায়ণ-কাব্যের সরলতা নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে এবং এপিক-স্বভাবের ব্যাখ্যায় যে গণ-বোধের ধর্ম জড়িয়ে থাকে, সেটাকেও ঐ সঙ্গে দেখাতে গিয়ে

প্রায়ই রামায়ণের কাব্যমূল্য উপেক্ষিত হয়ে থাকে। নচেৎ বাল্মীকি সত্যই উঁচুদরের কবি। তা ছাড়া, মাইকেল, আর যাই হোন্, ব্যাস-বাল্মীকি-হোমার-শ্রেণীর মহাকবি নন। তাঁর আকাশচুম্বী স্বপ্নরচনায় তিনি নিজেও কোনোদিন তা মনে করেন নি। তিনি হতে চেয়েছেন কালিদাস-ভবভূতি-ভর্তৃহরি বা মিলটন ;—যদিও এঁদের কেউই মাইকেলের মতো খালি অপর কবির ফুল কুড়িয়ে মালা গেঁথে বা ফুলের মধুতে মৌচাক গড়েই মহাকবি হতে চান নি। সম্ভবত 'মণৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ'-এর অনুকরণ করতে গিয়েই কবির ঐ দশা! সে যাই হোক, 'কবিতারসের সরে' যে 'রাজহংসকুলে' মিলিত হয়ে তিনি বিহার করতে চেয়েছেন, সেই 'রাজহংস'দের কী বৈশিষ্ট্য তা বলাই বাহুল্য। তা ছাড়া, তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা মেঘনাদবধ-এর রসজ্ঞ পাঠকমাত্রেই জানেন, এখানে Authentic Epic বা Epic of Growth-এর প্রয়াস নয়, এ হলো Literary Epic এর আয়োজন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে মানানসই কবিকুলে রাজহংস হওয়ার সাধই তিনি মেটাতে চেয়েছেন। সুতরাং কবিত্বের জোরেই মহাকবি হওয়ার দাবী, —বিষয়বস্তুর বা তার উপস্থাপনের যুগোপযোগী বৈশিষ্ট্য সেই দাবীর সহায়ক হতে পারে, কিন্তু কবিত্ব বাদ দিয়ে মহাকবি হতে কবি নিজেও চেয়েছিলেন বলে মনে হয় না।

এখানে আর এক দফা ভাগ্যের প্রসঙ্গ আসে। মেঘনাদবধকে কবি নিজে তাঁর 'a few epiclings' এর অন্তর্ভুক্ত মনে করতেন ;—epic নয়, epic-ling ; এবং এই থেকেই তাঁর রচনার চরিত্র-সংকেত তিনি নিজেই দিয়েছেন পরিষ্কার। কিন্তু আমরা মুগ্ধস্তাবকতায় সে দিকে নজর না দিয়ে তাঁকে epic অর্থাৎ literary epic-এর মহাকবি করে তুলেছি। একি কম ভাগ্য? এতে দেশবাসীর উদার-গুণগ্রাহিতা ফুটতে পারে, কিন্তু literary epic-এর মান-সূচীতেই কাব্যের ও কবির বিচার নিষ্পন্ন হওয়া উচিত নয় কি? বিচারে যাই হোক, মাইকেল পেয়েছেন দুর্লভ ভক্তসমাজ, সুতরাং তিনি এ যুগের মহাকবি, তাঁর মেঘনাদবধ এ যুগের শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য!

কিন্তু মহাকবির সৃষ্টির মধ্যে কি শুধুই পরিকল্পনার অভিনবত্ব থাকলেই হবে, সেখানে সামঞ্জস্য, সম্ভাব্যতা, সৌষম্য বা পারিপাট্য খুঁজবো না? অভিনবত্বের নামে একটা যথেচ্ছাচার কি সমাদৃত হবে? কোনো প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধরসের মহাকাব্যের উপর স্থূল হস্তাবলেপ ও তজ্জনিত ব্যাপক বিকার-বিকৃতি কি কেবল অভিনব বলেই হবে বরণীয়? ভাবের গভীরতা যেখানে নেই, সেখানে ভাষার-

ভাষণে পরিতৃপ্তি খোঁজা হয়ে থাকে। মাইকেলের মেঘনাদবধের ভাষা অভিনব, কিন্তু সে কি সত্যই সর্বদা হৃদয়গ্রাহী? তাঁর অলংকারের চটক পাতায় পাতায় নয়, ছত্রে ছত্রে; কিন্তু তার মধ্যে কতোগুলি, বিশেষ করে অনুপ্রাস, রসজ্ঞের বিচারে আদরণীয়? অথচ আজ মহাকবি মাইকেলের জয়গান সর্বতোমুখী। জয়জয়কার তাঁর পরিকল্পনার, তাঁর চরিত্রসৃষ্টির, তাঁর সংলাপ-রচনার, তাঁর ভাষা-ভাষণের, তাঁর অলংকরণের। শুধু তাই নয়, অলংকার—বিশেষ করে অনুপ্রাস—যে পঙ্গপালের মতো তাঁর কাব্যের ফসল-ক্ষেতে উপদ্রব চালিয়েছে, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে যেই কেউ মধুসূদনের কাব্যালংকারের মধ্যে কবি-মানসের অমূল্য রহস্য উদ্ধার করেছেন বলে ঘোষণা করলেন, অমনি চারিদিকে রব উঠলো 'সাধু, সাধু'! আবার মাঝে মাঝে, মধুসূদনের শব্দসংগ্রহ ও প্রযুক্তিবিজ্ঞানের উপরেও ঢক্কা-নিনাদ শোনা যায়। অর্থাৎ যে যেদিক থেকে পারো, খালি গাও স্তুতিগান। তাই বলি, মাইকেল কবি-সমাজে বড়ো ভাগ্যবান।

তিনি মানুষটি ছিলেন খুবই সোজা, সরল। সোজা করেই ব্যক্ত করলেন তাঁর ত্রুটি—'মাৎসর্যবিষদশন কামড়ে রে অনুক্ষণ,'—কিন্তু ভক্তসমাজ তার ভাষ্য করে নিলেন অভিনব, নচেৎ মহিমা থাকে না বিগ্রহের। তিনি বললেন, 'রচিব মধুচক্র', এবং মধুচক্রই তিনি রচনা করেছেন; আমরা সে চক্রের কোষে কোষেই শুধু মধু খুঁজলাম না, চক্রটাকেই মধুময় খাদ্য বলে চালিয়ে দিলাম। ফলে, যেখানে কবির পরিকল্পনা ছিলো তাঁর কল্পনার মাধুকরী বৃত্তির জোরে একটা ভাণ্ডার গড়ে তোলা, সেখানে প্রশস্তিসর্বস্ব কাব্যসমালোচনায় ঐ মাধুকরী বৃত্তি হলো উপেক্ষিত, আরোপিত হলো কাব্যের উপর 'অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষমা প্রজ্ঞা'র অক্ষুণ্ন মহিমা। একি কম ভাগ্য? তিনি বললেন, I am acquiring a pucca fist'; ভক্তেরা 'আহা-হা' করে বলতে লাগলেন, এর চেয়ে পাকা হাত আর কোথায় কে দেখেছে! (সুকুমার সেনের সমঝদারী সুর কেউ কানেই নিতে চায় না)। এমন কি 'যাদঃপতিরোধঃ যথা চলোর্মি আঘাতে'—কবিতায় এমন একটি অচল চরণে কোথায় কবে কোন্ প্রতিভাধর তরুণ কিশোরের সুরতন্ময় অলৌকিক মুহূর্তে আবিষ্কৃত হয়েছে চলোর্মির ছন্দ,—আর সেই থেকে সবাই কান পেতে শুনে বলে চলেছেন—'একেবারে অবিকল!'

প্রশস্তির আসর যে কীর্তনের আসরের মতো। নূতন নূতন 'আখর'

তোলাই কাজ। পূর্ববর্তীর কোনো সুরের উপর ঘুরিয়ে আবার সুর চড়ানো। তা ছাড়া, এখানে যে মনন-ভাষ্যের প্রতিযোগিতা চলে, তারও বিচিত্র লীলা দেখা যায়। কেউ একজন যদি নূতন 'ফরমুলা' দিলেন, তো রচিত হতে থাকলো তার রকমারি 'করোলারি'। কবি মধুসূদনকে নিয়ে এই 'করোলারি'-রচনায় যে বৈচিত্র্য জমে উঠছে, তার জুড়ি বাংলাসাহিত্যে আর কোথাও নেই।

ব্যক্তিগত ভাব-ভাবনার বিশ্বস্ত বাহক পত্রাবলীতে যাঁর লেখনীমুখে Our Bengali ছাড়া Our Bengal কখনও দেখা যায় নি, অর্থাৎ জাতি, জাতীয়তা বা দেশ, কি সমাজ নিয়ে কোনো গভীর চিন্তা যাঁর ছিলো না, তাঁর কাব্যকে কেউ বললেন 'বাঙালীর জীবনবেদ'(১); কেউ বললেন 'উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী মানসের জীবনবেদ'(২); কবিকে কেউ বললেন 'যুগন্ধর মধুসূদন'(৩); কেউ বা 'বাঙালীর জাতীয় জাগরণের উদ্‌গাতা' (হাতে বুঝি অব্যর্থ (?) দলিল বঙ্কিমের "জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও, তাহাতে নাম লেখ শ্রীমধুসূদন"!!)(৪); কেউ বললেন 'জাতীয় মহাপুরুষ'(৫); আবার কেউ বা "জাতীয় পিতৃপুরুষ"!—সুনির্বাচিত দুই জাতীয় পিতৃপুরুষের একজন,—চৈতন্যদেব ও মাইকেল হলেন একই বেদীতে প্রতিষ্ঠিত!!(৬)। আলোকপাত করা হলো আর এক দৃষ্টিকোণ থেকে, মাইকেল হলেন 'বিশ্বপথিক' ঠিক যেমন রবীন্দ্রনাথ,—সেই 'বিশ্বনাগরিকত্বে'র অধিকারী!—মাইকেল ও রবীন্দ্রনাথ হলেন সমভাবনার কবি, "দুজনেই ভেবেছেন দেশ, জাতি ও বিশ্ব নিয়ে। দুজনেরই কাব্যের শেষ কথা মানুষ"(৭)। কেউ বললেন, না, তফাৎ আছে বৈ কি, প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সংযোগ-সাধনে মাইকেলের ও রবীন্দ্রনাথের অবদান বিভিন্ন,—"রবীন্দ্রনাথ করিলেন পাশ্চাত্যের সঙ্গে বন্ধুত্ব,—চিন্তার সংযোগ নয়", "অনায়াসেই বলিতে পারা যায় সাহিত্যের মধ্য দিয়া প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের যে যোগসূত্র চিন্তার, তাহা মধুর দ্বারাই সম্পন্ন হইয়াছিল"(৮)। ইনি মাইকেলের 'দেশপ্রেমিক' রূপেরও আরতি করেছেন—

জন্মভূমির প্রতি তাঁর জীবন্ত অনুরাগ প্রত্যক্ষ ক'রে—"নীলদর্পণের অনুবাদ-কার্যের মধ্যেও তাঁর স্বাদেশিক বিদ্রোহ"! [যদিও ইনিই আবার লিখেছেন, "নীলকর-দুহিতার (প্রথমা ও পরিত্যক্তা স্ত্রী রেবেকা) প্রতি রোষেই মধু যে 'নীলদর্পণে'র অনুবাদে প্রবৃত্ত হন নাই, তাহা বলা শক্ত।" লিখেছেন—"মধু কবি, সেহেতু তিনি বালস্বভাবসম্পন্ন।" লিখেছেন—"চার্বাকদর্শনের জলধি-বক্ষে তাঁর ভরাডুবি!" লিখেছেন,—নারীর আকর্ষণেই মাইকেলের ধর্মত্যাগ,—আর, দেবকীকে (রেঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা) না পাওয়ায় 'আত্মবিলাপে' এতো বিষাদের সুর। তথাপি মাইকেল 'মহাপুরুষ'? উত্তর—"মহাপুরুষের ব্যক্তিগত জীবন সর্বদা মহৎ হয় না।"]

ওদিকে 'মেঘনাদবধে'র যে অষ্টম সর্গের নিকৃষ্টতা বিষয়ে স্বয়ং কবিই সচেতন, মোহিতলালের মতো মাইকেল-ভক্তও যার বিরূপ সমালোচনা করেছেন, তার মধ্যে আবিষ্কৃত হয়েছে মাইকেলের মহাপ্রাজ্ঞতার ও বড়ো-কবিত্বের জোরালো প্রমাণ(১)। 'ব্রজাঙ্গনা'য় যে কবি-মানস প্রতিফলিত, তা যে একেবারে খাঁটি বৈষ্ণব-ভক্তসুলভ, তাও ঘোষিত হয়েছে বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে একাধিক ভক্তের সমবেত কণ্ঠে(২)। সর্বোপরি রামায়ণের রাবণ ও রাক্ষস-সমাজ যে ছিলো নিতান্তই অসভ্য, বর্বর ও কেবলমাত্র বীভৎস রসের কারবারী এবং মাইকেলের হাতেই পাওয়া যায় উন্নত মার্জিত সুসভ্য রক্ষোনরনারীর এক অভিনব মৌলিক আলেখ্য—এই নিদারুণ মিথ্যার এক প্রচণ্ড 'কোরাসে' বড়ো বড়ো মহারথী অদ্যাবধি যোগদান করে চলেছেন সেই ১৩০০ বঙ্গাব্দ থেকে—বুঝি রেনেসাঁসের মূর্ত প্রতীক মহাকবির জয়গানের ঝঙ্কারকে দুর্জয় করে তোলার জন্যে!

এইভাবে মাইকেল-প্রশস্তির যে তরঙ্গ চলেছে, তার উত্তালতা কিঞ্চিৎ ভয়াবহ। এর ফলে কবি ও কাব্যের স্বরূপ সম্পর্কে যে ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তি নিয়তই ঘোরালো হয়ে উঠছে, কেবল সেটাই নয়, এর ফলে আদি-কবি বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসের প্রতি যে উপেক্ষা এবং আর্য-রামায়ণ-ধৃত ধ্যান-ধারণার যে নিদারুণ বিকৃতি প্রশ্রয় পাচ্ছে, সেটাও সারস্বত সমাজ ও চিন্তাশীল সমাজের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়।

সমালোচনা যে ছিদ্রানুসন্ধান নয়, এও যেমন সত্য, অপ্রাপ্য প্রশস্তি

সমালোচনা নয়, এও তেমনি সত্য। সমালোচনা হলো সত্য-স্বরূপের প্রতিষ্ঠা। তার জন্য বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোকপাত করা যেতে পারে ঠিকই, আর তাইতেই সমৃদ্ধ হয় সমালোচনা সাহিত্য। কিন্তু এমন আলোক-সম্পাত কাম্য নয়, যার বিজলী-বিলাসে চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ায় স্বরূপের অঙ্গীভূত ত্রুটিগুলি থেকে যায় প্রচ্ছন্ন। এ তো আর রঙ্গমঞ্চে মেক্-আপ-দেওয়া পাত্র-পাত্রীর উপর আলোক-সম্পাত নয়। এখানে সাহিত্যিক সত্যের মর্যাদা-রক্ষাই সর্ব প্রধান ধর্ম। অসত্যের কোন স্থান থাকা উচিত নয়। ছিদ্রানুসন্ধী বা অসহিষ্ণু সমালোচনা যেমন অসত্য, ভিত্তিহীন স্তুতিবাদও তেমনি অসত্য। 'ছুঁছুঁন্দরীবধ' প্রথম শ্রেণীর অসত্য বলেই টেঁকে নি, কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর যারা, তাদেরও তো টনক নড়া উচিত।

এই 'মুখবন্ধে' সমীক্ষার যতোগুলি ইঙ্গিত স্থান পেয়েছে তার সবই যে গ্রন্থ মধ্যে আলোচিত হয়েছে তা নয়। এর উদ্দেশ্য সত্যানুসন্ধী পাঠকের মনে মাইকেল-প্রশস্তিমূলক নিবন্ধাদির খাঁটি মূল্য সম্পর্কে একটা যাচাই-এর স্বাধীন মনোভাব জাগিয়ে দেওয়া। বর্তমান গ্রন্থে নির্বাচিত কয়েকটি মাত্র বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ভুল-ভ্রান্তি অবশ্যই ঘটেছে এবং স্বাধীন মনের অনর্গল অভিব্যক্তি দিতে যাওয়ায় হয়তো ঘটেছে বাচনভঙ্গির অপরাধ। যা পণ্ডিতের মানায়, তা অপণ্ডিতের মানায় না,—এটা হয়তো সর্বদা মনে থাকে নি। আশা করি, প্রবীণ বয়সের লেখক এজন্য নিরপেক্ষ সত্যসন্ধী পাঠক-সমাজের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হবে না।

বিষয়-সূচী

বিষয় পৃষ্ঠা

॥ পঞ্চম অধ্যায় ॥

॥ ষষ্ঠ অধ্যায় ॥

প্রথম অধ্যায়

মেঘনাদবধ-কাব্যে আদিরস ও কবি-মানস

[১] প্রস্তাবনা

প্রস্তাবটি কিছু অদ্ভুত মনে হতে পারে। কারণ, কবির 'গাহিব মা বীররসে ভাসি মহাগীত', এই সংকল্পের পরিপ্রেক্ষিতে এযাবৎ মেঘনাদবধ কাব্যকে শুধু বীররসের কাব্য হিসাবেই যাচাই করবার চেষ্টা হয়েছে, আর, সেই প্রসঙ্গে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে যে অজস্র করুণ রসের উৎস, তারই আলোচনায় সীমাবদ্ধ থেকেছে কাব্যখানির সমগ্র রস-বিচার। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে বা বিচারে যে কোনো ত্রুটি লক্ষণীয়, তা বক্তব্য নয়। অথবা ঐ রসের আনুপাতিক গুরুত্ব সম্পর্কে কোনো নূতন অভিমত দেওয়াও এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। কবির বীররসের কাব্যসৃষ্টির সংকল্প সত্যই করুণ রসের প্লাবনে ভেসে গেছে কি না, তাও বিচার করবার আয়োজন এখানে নয়। শুধু রস-প্রসঙ্গ যোগে সম্প্রতি নানাভাবে আলোচিত যে কবি-মানস, তারই একটা বিশেষ ভঙ্গি বা প্রবণতার স্বরূপ এখানে উদ্‌ঘাটিত করার চেষ্টা হয়েছে তার উপরকার ভারী পর্দাখানি সন্তর্পণে তুলে ধ'রে। পর্দাখানি যে বেশ ভারী তাতে সন্দেহ নেই। ক্লাসিক মহিমার এক জড়োয়ার শাল যার সর্বাঙ্গে জড়ানো, বহু গুণিজনের প্রশস্তিতে যার উপর অজস্র চুমকির কাজ করা, তার কোনো অন্তঃপুরের কথা ব্যক্ত করতে যাওয়া বিপজ্জনক বৈ কি! মেঘনাদের বীরত্ব, রাবণের ট্রাজেডি, সীতার চরিত্র-মহিমা, প্রমীলার বীরাঙ্গনা মহিমা, সর্বোপরি এক জাতীয়তাবাদের বা দেশাত্ম-বোধের (?) গাম্ভীর্যে যে মহাকাব্যের আবেদনের কাঠামো সুরচিত বলে পেয়ে এসেছে বিশাল সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি, তার মধ্যে কবি মানসের কোনো আপত্তিকর দুর্বলতার কথা হয়তো চিন্তা করাও অন্যায়। কিন্তু ঠিক ন্যায়ান্যায়ের প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন সত্য-উদ্‌ঘাটনের। সত্য প্রায়ই থাকে প্রচ্ছন্ন। মধুসূদনের কবি-মানস-সংক্রান্ত সত্যটিও আজও রয়েছে প্রচ্ছন্ন। অথবা বুঝি এই কথাই ঠিক, ইদানীং ঐ কবি-মানস বস্তুটির উপর আলোকপাতের অত্যুৎসাহে তার স্বরূপ ক্রমাগত অধিকতর প্রচ্ছন্নই হতে চলেছে। এর কারণ আর কিছু নয়, গবেষণা-

আলোচনার নামে যদি কেবলই নব নব প্রশস্তির পালা রচনা করা হয়, তবে সেই প্রশস্তিপুঞ্জ যে ঘন আবরণ চাপাতে থাকে একটার পর একটা, তাতে বস্তুর প্রকৃত স্বরূপটি চাপা প'ড়বারই কথা। ঠিক এইভাবেই মাইকেলের কবি-মানসের উপর একটা ভারী পর্দা টেনে দেওয়ার মহড়া চলছে দীর্ঘকাল ধ'রে। যাঁরা সে পর্দার বুনোট-রচনায় ব্রতী হয়েছেন, তাঁদের কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত। কিন্তু শ্রদ্ধা এক জিনিষ, কবি-সত্য বা কাব্য সত্য আর এক জিনিষ। এই সত্যকে যাচাই করার চিরন্তন ও একমাত্র নির্ভরযোগ্য উপাদান হলো কবির রচনা। কাব্যকে বাদ দিয়ে যাঁরা কেবল নানা জনের নানা স্তুতিবাদকেই আশ্রয় করেন, অথবা নব নব স্তুতি রচনাকেই মনে করেন অমূল্য সাহিত্যসৃষ্টি, নিরপেক্ষ সমালোচনায় তাঁদের ঠিক সমর্থন করা চলে না।

বাঙালী পাঠক স্বভাবতই আদর্শপ্রবণ, শ্রদ্ধাপ্রবণ, স্তুতিপ্রবণ। কেউ যদি কোথাও একবার কোনো একটা আদর্শের সন্ধান দিয়েছে, দিয়েছে স্তুতিযোগ্য উপাদানের ইঙ্গিত, তবে তারই সূত্র ধরে চলতে থাকে কেবলই সেই আদর্শ বা স্তুতিবাদের মূলাধারটির উপর নব নব ভঙ্গিতে আলোকপাতের বিচিত্র প্রয়াস। ঠিক এই কারণেই বোধহয় অনেকেরই চোখে পড়েনি মেঘনাদবধ কাব্যে আদি-রসাত্মক চিত্র ও প্রসঙ্গ-যোজনার প্রতি কবির প্রচণ্ড প্রবণতা। অনেকেই বোধ হয় শুনে চমকে উঠবেন যে, মাত্র ন'টি সর্গে রচিত মেঘনাদবধের মতো একটা বীরগর্ভ করুণরসের ট্রাজিক কাহিনীতে কামোদ্দীপক চিত্র বা প্রসঙ্গের সংখ্যা কুড়িটিরও বেশি। পঁচানব্বই পৃষ্ঠার গ্রন্থের অন্তত পনেরোটি পৃষ্ঠা ঐ জাতীয় চিত্র বা ইঙ্গিত-সংকেতের কুশ্রীতায় কলঙ্কিত। অসহিষ্ণু মাইকেল-ভক্ত হয়তো এইখানেই প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠতে চাইবেন। বলবেন, মহাকাব্যিক বৈচিত্র্যের দাবীতে রস-বৈচিত্র্যের অঙ্গ হিসাবে যদি আদিরসের স্থান দেওয়া হয়ে থাকে, তাতে আপত্তি-উত্থাপনের স্পর্ধা আসে কেন? না, আদিরসের প্রসঙ্গমাত্রে আপত্তি নয়, আপত্তি ওরই অত্যন্ত অসঙ্গত বে-পরোয়া অনুপ্রবেশ বা যথেচ্ছ পরিবেশনের মত্ততায়। আর আপত্তি, কবি মানসের বিচারে এই মত্ততার প্রতি উপেক্ষায়।

'মেঘনাদবধ' কাব্য হিসাবে যতই সুপরিচিত হোক, যতই তার মহিমার কথা লোকসমাজে প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত হোক, সন্ধানী দৃষ্টিতে সমগ্র কাব্যের আনুপূর্বিক নিবিড় ধারাবাহিক পাঠে অভ্যস্ত পাঠকের সংখ্যা অল্প বলেই মনে হয়। সেকালের কথা স্বতন্ত্র; একালে পাঠ্যপুস্তক হিসাবেই এ কাব্যের

অংশবিশেষ পঠিত ও আলোচিত হয়ে থাকে। অতি সংকীর্ণ পরিধিতে এর সমগ্র পাঠের ব্যবস্থা থাকলেও, অপরাপর পাঠ্যগ্রন্থের ভিড়ের চাপে এর প্রতি পর্যাপ্ত মনোযোগ কদাচিৎ প্রদত্ত হয়। তা ছাড়া, স্বাধীন দৃষ্টিতে স্বাধীন রসবিচারের পরিবর্তে অপরের প্রদর্শিত পথে বাঁধা খাতে চলাই কাব্যপাঠ ও কাব্যালোচনার রীতি হতে দেখা যায়। ইংরেজিতে যাকে বলে biased reading ও biased criticism, মেঘনাদবধের ক্ষেত্রে পাওয়া যায় তারই ব্যাপক পরিচয়। নচেৎ আমরা কথনই মাইকেলের হাতে রাক্ষস চরিত্রের অভিনবত্বে মুগ্ধ হয়ে এ বিষয়ে তাঁর নিরঙ্কুশ মৌলিকতার জয়গানে বিভোর হয়ে থাকতাম না। সেই যে যোগীন্দ্রনাথ বসু বলে গেলেন, "মেঘনাদ সম্বন্ধে নূতন কথা এই যে, ইহার রাক্ষসগণ, রামায়ণের বীভৎস রসের আধার, নরশোণিতপ্রিয় জীব নহেন, * * * আর্য নর নারীগণের ন্যায় তাঁহারাও যজ্ঞ ও দেবপূজা করেন," অথবা "তিনি রাবণ, মেঘনাদ প্রভৃতি লঙ্কার রাক্ষসগণকে লোমশ ও নরখাদক বীভৎস জীব সৃষ্টি করেন নাই," —আর সেই থেকে এযাবৎ মধুসূদনের ভক্ত-সমাজে ছোট-বড় নির্বিশেষে চলে আসছে কবির রাক্ষস-চরিত্র-পরিকল্পনায় অখণ্ড মৌলিকতার জয়গান ও সেই সূত্রে তাঁর কবি-মানসের মহামূল্য সংকেতের মহামূল্য ভাষ্য-রচনা। কিন্তু নিরপেক্ষ মোহমুক্ত (unbiased) দৃষ্টিতে অন্বেষণ করলে অবশ্যই ধরা পড়তো অন্তত কৃত্তিবাসী রামায়ণে বর্ণিত রক্ষোবংশীয় নর-নারীর বহু উচ্চাঙ্গের আর্য-সুলভ কৃষ্টি ও চারিত্রিক সমুন্নতির বৃত্তান্ত। বস্তুত মূল রামায়ণের কথা ছেড়ে দিলেও কালিদাসের রাবণ-চিত্র ও কৃত্তিবাস-বিবৃত বিস্তারিত রক্ষোবংশ-বৃত্তান্তের সঙ্গে যাঁরই নিবিড় পরিচয় ঘটেছে, তিনিই বুঝবেন, মাইকেলের মৌলিকতা-প্রতিপাদনের অত্যুৎসাহে যোগীন্দ্রনাথ বসুর ঐ ধরণের মন্তব্য কতো অমূলক ও বিভ্রান্তিকর। প্রশস্তির ঢেউ একবার উঠলে আর থামতে চায় না, কেউ যাচাই করতে চায় না তার ভিত্তি, বরং রচনাই করতে চায় যে-কোনো সূত্র ধরে আরো আরো ঢেউ। তাই, বঙ্কিম যে ঠিক কী সূত্রে জাতীয় পতাকায় 'শ্রীমধুসূদন' নাম লিখে দেওয়ার উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন, তা না বুঝেই দেশশুদ্ধ লোক মধুসূদনকে জাতীয়তাবাদের উদ্‌গাতা মহাকবির শ্রেষ্ঠ বরণ দিতেই পাগল হয়ে উঠলো, আর তাঁর শ্রেষ্ঠকাব্য মেঘনাদবধ হলো ঐ উজ্জীবনের মন্ত্রাধাররূপে বাঙালী-জাতির জীবনবেদ! কিমাশ্চর্যমতঃপরম্!

আসল কথা, এই অতি-প্রশংসিত কাব্যখানির উপর নানাভাবে আরোপিত

এক বিচিত্র মহিমার পরিমণ্ডল রচিত হওয়ায় এই কাব্যের যে অজস্র ত্রুটি দুষ্ট-ক্ষতের মতো কাব্যদেহকে অধিকার করে আছে, তা ঐ মহিমার ক্রমাগত গাঢ়তর প্রলেপে প্রচ্ছন্নই থেকে যাচ্ছে। সৃষ্টি বা স্রষ্টাবিশেষের ঠিক সেই মহিমাই থাকা বাঞ্ছনীয়, যা তাদের ন্যায্য প্রাপ্য। মেঘনাদবধ কাব্যকে বা তার কবিকে যদি আজ প্রশস্তির মোহে এমনই উচ্চ স্থানে ঠেলে তোলা যায়, যেখান থেকে কালের বিচারে তারা নেমে আসতে বাধ্য হয়, তবে সেই স্তুতি-প্রয়াস শুধু অবাঞ্ছিত নয়, বিভ্রান্তিকর।

এখানকার কবিমানসের মধ্যে অনেকেই মহাপুরুষোচিত লক্ষণ, বিশেষ করে ভারতীয় জীবনাদর্শের সনাতন নীতি-প্রাণতা আবিষ্কার করতে চেয়েছেন। 'মুখবন্ধে' এঁদের কয়েকজনের মাত্র নাম করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে এ যুগের প্রখ্যাত সুপণ্ডিত ডাঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত (১) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনার অপেক্ষা রাখে। বর্তমান প্রবন্ধে কেবল ঐ আবিষ্কার-প্রয়াসের পরিপ্রেক্ষিতে মেঘনাদবধে আদিরসাত্মক চিত্র প্রসঙ্গের প্রাদুর্ভাব সমালোচনার বিষয়ীভূত হয়েছে। চরিত্র ও চিত্রকল্প (imagery)-রচনায় অথবা পরিবেশ অঙ্কনের মধ্যে নীতি-শৈথিল্যে লাঞ্ছিত এই সব রচনাংশের এমন বে-পরোয়া অনুপ্রবেশ কবি-মানসের কোনো বার্তা বহন করে কিনা, নিরপেক্ষ বিচারপ্রবণ সমালোচন-দরবারে সেইটাই উপস্থাপিত করার প্রয়াস এখানে।

ন'টির মধ্যে মাত্র তিনটি সর্গ—প্রথম, ষষ্ঠ ও সপ্তম—সম্পূর্ণ রেহাই পেয়েছে ঐ লাঞ্ছনার হাত থেকে। বাকী ছ'টি সর্গের বিভিন্ন অংশে এবং সমগ্র কাব্যের মোট অন্তত একুশটি প্রত্যঙ্গে বেশ স্থূলভাবে ছড়িয়ে আছে কবি-কল্পনার ঐ কামোদ্দীপনপ্রবণতার যথেচ্ছ লীলা। অথচ বিষয়বস্তুর যা প্রকৃতিবৈশিষ্ট্য, তাতে কোথায় যে ঐ রসের অমন নগ্ন চিত্রের অবসর থাকতে পারে, তা ভেবে পাওয়া যায় না; এবং ঠিক এই কারণেই সম্ভবত সাধারণ পাঠক ঐ অংশগুলি যুক্তিসম্মত প্রত্যাশার বহির্ভূত বলে উপেক্ষা করাই সংগত মনে করেন। তবে এ তো হলো পাঠকের ঔদার্যের কথা, যার মূলে আছে কবির প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও দরদ। কিন্তু তাতে তো কবি-মানস-সংক্রান্ত সত্যের স্বরূপ নিরূপিত হতে পারে না। বস্তুত বিষয়বস্তু যেখানে 'অস্ত্রলাভ'-বৃত্তান্ত (২য় সর্গ),

প্রমীলার বীরাঙ্গনা-মহিমার প্রতিষ্ঠা (৩য় সর্গ), সীতা-সরমা-সংবাদ (৪র্থ সর্গ), লক্ষ্মণের বীরচরিত্র-মহিমার ভিত্তিতে নিধনের 'উদ্যোগ'-বৃত্তান্ত (৫ম সর্গ), 'প্রেতপুরী'তে দশরথের কাছ থেকে লক্ষ্মণকে বাঁচাবার উপায় সংগ্রহ (৮ম সর্গ) এবং 'সংক্রিয়া' বা প্রমীলার চিতারোহণ (৯ম সর্গ), সেখানে যদি কামোদ্দীপক চিত্র-রচনা বা স্থূল আদিরসের অবতারণায় কবির বল্গাহীন উচ্ছ্বাস লক্ষিত হয়, তবে কি তাঁর মানসগঠন সম্পর্কে আমাদের স্বতন্ত্র চিন্তাধারার বশবর্তী হতে হয় না?

[২] ২য় সর্গে আদিরস

সচরাচর দেখা যায়, এই কাব্যের সমালোচনায় অনেকেরই মন্তব্য হয়েছে যে, এখানে দেব-চরিত্র ও নর-চরিত্র (রাম-লক্ষ্মণ) হীনতা প্রাপ্ত হয়েছে, আর, একটিমাত্র অংশের প্রতি অঙ্গুলি সংকেত করে মধুসূদনের বিরুদ্ধে ঐ অবনমনের অভিযোগ জোরালো করা হয়ে থাকে,—সেটি হলো মহাদেব সম্বন্ধে—

'প্রেমামোদে মাতিলা ত্রিশূলী'।

কিন্তু, প্রথমত, মাইকেলের হাতে রাম-লক্ষ্মণ-চরিত্র সর্বত্রই অবজ্ঞায় অবনমিত হয়েছে, এ অভিযোগ গ্রাহ্য নয়। তাছাড়া, আলোচনায় প্রতিপন্ন হবে মহাদেবের এই কামোন্মত্ত চিত্ররচনা মাইকেলের কোনো আকস্মিক ত্রুটি নয়, অথবা তিনি যে স্বধর্মত্যাগী বলে হিন্দুর দেব-দেবীর প্রতি অশ্রদ্ধাবশত মহাদেবকে নির্দ্বিধায় কামাতুর করেছেন, তাও নয়। আসলে তিনি ছিলেন কামোদ্দীপক চিত্র বা প্রসঙ্গ-যোজনায় স্বভাবতই নির্বিচার, অথবা বলা যায় বেশ কিছুটা আসক্ত। তাই কেবল ঐ মহাদেব-চিত্রই নয়, আরও বহুস্থানে ছাড়া পেয়েছে তাঁর ঐ আসক্তির উদ্দামতা। যে দ্বিতীয় সর্গ থেকে নেওয় ঐ মহাদেব-বৃত্তান্ত, তাতেই আরো তিনটি অংশে পাওয়া যাবে কবির ঐ রুচি ও মনোভঙ্গির পরিচয়। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, মহাদেব কবির হাতে যে হীনতা প্রাপ্ত হয়েছেন, তার চেয়েও অনেক বেশি হীনতা-স্পর্শ ঘটেছে পার্বতীর চরিত্রে এটি জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসুরও দৃষ্টি এড়ায় নি, কিন্তু তাঁর অভিযো ভিন্নতন্ত্রীয়। তিনি বলেছেন, ভিন্ন ধর্মগ্রহণ ও পাশ্চাত্য মডেল অনুসরণের ফলে মাইকেলের কাব্যে এই দোষ ঘটেছে। আমাদের কথা হলো, মডেলের প্রভা হয়তো অনস্বীকার্য, তবে তা ছাড়াও, এই রুচি-বিকারের বীজ কবির ব্যক্তি চরিত্রে ও মানস-প্রবণতায় ছিল নিহিত। তাই তার প্রকাশ এত প্রচু

এত বিচিত্র, এত বে-পরোয়া। কাব্যসৃষ্টির মধ্যে কবি উপভোগ করেন তাঁরই মানস-লীলা। মাইকেলের কবি-মানস যেমন বিচিত্র খেয়ালে ভরা, তেমনি ভরা খেয়ালীপনায়। প্রথমটিতে সৃষ্টি হয়েছে রকমারি শিল্পের নমুনা, আর দ্বিতীয়টিতে এসেছে বিচিত্র শৈথিল্যের রকমারি দৌরাত্ম্য। কোনো সামঞ্জস্য বা সঙ্গতিরক্ষার দায়িত্ব ঐ মানসগঠনে খুঁজে পাওয়া যায় না। কি ঘটনা-বিস্তার, কি চরিত্র-বিস্তার, কি প্রসঙ্গ-যোজনা, সব কিছুর মধ্যেই সেই খেয়াল ও খেয়ালীপনার অসংযত মিশ্রণে রচিত কবি-মানসই লীলায়িত হতে চেয়েছে, কেবল প্রাচ্য-প্রতীচ্য আদর্শের অনুসরণে নয়, কেবল নূতন ছন্দ-ধ্বনি নিজের কানে শোনার আনন্দে নয়, স্বীয় রুচির খুসিমত রসের অবতারণায়। অনাবশ্যক বা আপত্তিকর চিত্র বা প্রসঙ্গসৃষ্টিতে তাই কবির কতো রঙ্গভঙ্গ, কতো উল্লাস, কতো উৎসাহ। এই রঙ্গের প্রাধান্য এতো যে, তার প্রভাবে সংশ্লিষ্ট চরিত্রের বা উদ্দিষ্ট ভাবমূর্তির অবস্থা যে কী গিয়ে দাঁড়াচ্ছে, সেদিকে কবির খেয়াল নেই। খেয়াল নেই চরিত্রের প্রতি, খেয়াল নেই পরিবেশের প্রতি। কেবল যে দেব-দেবীর বেলাতেই কবির এই খেয়ালের অভাব, তাই নয়, তাঁর অন্যতম প্রিয় চরিত্র, তাঁরই মানসীকন্যা-পদবাচ্যা প্রমীলাও এর ব্যতিক্রম নয়।

দ্বিতীয় সর্গে তপোভঙ্গের আয়োজনে ভবানীকে কবি যে ভূমিকায় নামিয়েছেন তার অন্তরালে কাজ করছে কবিরই নিজস্ব নীতিশিথিল কল্পনারঙ্গ। তাই—

কেমনে
কোন্ রঙ্গে, ভঙ্গ করি তাঁহার সমাধি—

সুরু হলো অভিসারিকার মন-ভোলানো সাজ-সজ্জা। এরও আগে, যেখানে ভবেশ-ভাবিনী ভাবছেন, 'কিভাবে আজি ভেটিব ভবেশে,' সেইখানে সুরু হয় প্রথম মহড়া যার climax রচিত হলো 'প্রেমামোদে মাতিল ত্রিশূলী'তে। ব্যাপ্তি বা আয়তনের দিক দিয়ে ২৬৬ লাইনে যার সুরু, ৪২৪ এ তার শেষ। মধ্যে ভবানীকে নিয়ে, রতিকে নিয়ে, মদনকে নিয়ে এবং শিবকে নিয়ে কবি-মানসের কতো রঙ্গভঙ্গ, কতোই না আদিরসাত্মক তারল্য।

'ভেটিব ভবেশে' এই যেখানে চিন্তাধারা, সেখানে তো কন্দর্প-লীলায় গা-ভাসিয়ে দেওয়াই স্বাভাবিক। তাই, ভাষায় এখানে-ওখানে একটু 'দেবি' সম্বোধন, কি 'আজ্ঞা কর এ দাসেরে', অথবা 'চল, বাছা' —এমন একটু সম্ভ্রমের

বাতাবরণ থাকলে কি হবে, ভবানীর চরিত্র-পরিকল্পনায় কবি নিজে বিশেষ কোন সম্ভ্রমের গরজই বোধ করেন নি। তাই রতি তাঁকে অভিসার-সাজে কেবল সাজিয়েই দিলো না, বলেই দিলো—

সাজাই ও বর বপুঃ আনি
নানা আভরণ ; হেরি যে সবে, পিনাকী
ভুলিবেন,……

এই যে তুচ্ছ আভরণের ঘটায় মন-ভোলানোর নিম্নশ্রেণীর মনোভাব, এর জন্য রতি বা রতিপতিকে দায়ী করার কোনো কারণ নেই, মধুসূদনের ভবানীই এটা চেয়েছেন। গোড়াতেই তাই লক্ষ্য করা যায় তাঁর বেশ একটু ইঙ্গিতময় হাসি, যদিও তার আগে আশীর্বাদের সামাজিকতার ত্রুটি নেই।

আশীষি রতিরে, হাসি, কহিলা অম্বিকা,—
* * কেমনে কোন্ রঙ্গে * * ইত্যাদি।

হাসি থেকেই রতি বুঝে নিয়েছে দেবীর কী রঙ্গের অভীপ্সা! আবার,

হাসিয়া কহিলা,
চাহি স্মর-হর-প্রিয়া স্মর-প্রিয়া পানে,—
"ডাক তব প্রাণনাথে"।

কী উদ্দেশ্য, বলাই বাহুল্য। হাসির মধ্যে ইঙ্গিত কেবল সুস্পষ্ট নয়, কেমন যেন একটু উদ্দিষ্ট লীলারসের সংকেতও বহন করে। মদন তার পূর্বেকার নিদারুণ অভিজ্ঞতায় ভয়ত্রস্ত হয়ে পড়লে, আবার সেই অর্থপূর্ণ হাসির আমদানী করা হয়েছে,—

আশ্বাসি মদনে, হাসি, কহিলা শঙ্করী,
"চল রঙ্গে মোর সঙ্গে…………"

কবির মন যে রঙে চড়ে আছে, তাই ভবানীর মুখেই অনঙ্গ-রঙ্গের ইঙ্গিত দিতে তাঁর আটকায় না। বড়ো বড়ো শব্দের ঘটা ও অমিত্রচ্ছন্দের গাম্ভীর্যের আবরণে তিনি যেন খুবই সুযোগ পেয়েছেন পরিকল্পিত অনঙ্গ-লীলার আঙ্গিক-রচনায় যথেচ্ছ স্বাধীনতাভোগের। 'দ্বিরদ-রদ-নির্মিত গৃহদ্বার দিয়া বাহিরিলা' এই শব্দ-ঝঙ্কার দিয়ে সুরু করেই কবি-কল্পলোক যে ভবানী-চিত্রের ধ্যানে প্রবৃত্ত হলো, সেখানে মন্মথ এবং তাঁর কামবাণেরই আধিপত্য :—

সাথে মনমথ, হাতে ফুলধনুঃ,
পৃষ্ঠে তূণ, খরতর ফুলশরে ভরা………।

পৌরাণিক মদন-ভস্ম-কাহিনীতে অবশ্যই ফুলশরের আধিপত্য, কিন্তু সেখানে শিবের উপর মদন-প্রভাব-সংঘটনে পার্বতীর নিজস্ব এমন কোন সচেতন নির্লজ্জ সক্রিয় ভূমিকা নেই। নিজেই সেজেগুজে কাম-শক্তিতে সতেজ হয়ে চলেছেন 'ভেটিতে ভবেশে', এ মধুসূদনেরই প্রিয় কল্পনা। হতে পারে এটা ইলিয়াডের অনুকরণে (exquisite grace (?) of the Greek mythology), কিন্তু চিত্রবস্তু ও রসটির প্রতি কবির আসক্তি কী জাতীয়, তা তাঁরই নিজের মন্তব্যে সুস্পষ্ট,—'I am not ashamed to say that I have intentionally imitated it—Juno's visit to Jupitor on Mount Ida'. লজ্জিত হওয়ার কারণ থাকতেও কবির এই নির্লজ্জ বেপরোয়া অনুকরণ। তা ছাড়া, মেঘনাদবধের মতো বিষাদ-গম্ভীর কাহিনীতে হর-ধ্যানভঙ্গের পৌরাণিক বিকৃতিযুক্ত এই উপাখ্যানের এত দীর্ঘ সংযোজন কি এতই অপরিহার্য ছিল? আর যদি বৈচিত্র্য-সমাবেশের খাতিরে এর স্থান স্বীকার করতে হয়, তবে এর মধ্যে এত বেশি নগ্নতা ও রুচিশৈথিল্য কেন? এর উত্তরে ধরা পড়বে কবি-মানসেরই শৈথিল্য যার মূলে আছে মাইকেলের নিজস্ব নীতিশিথিল জীবনের অলঙ্ঘ্য প্রভাব। আদিরসের প্রতি কবির মারাত্মক দুর্বলতাই এই কাব্যের অনেক ত্রুটি, অনেক অসঙ্গতির কারণ।

কপর্দী তপস্বী,
বিভূতি-ভূষিত দেহ, মুদিত নয়ন,
তপের সাগরে মগ্ন, বাহ্য-জ্ঞান-হত ;—

এই বর্ণনায় শিবের অতি উচ্চাঙ্গের আলেখ্য রচিত হলে কি হবে, সেই তপোমগ্নকেই কবি আমাদের চোখের সামনে অচিরেই তপের সাগর থেকে কামের সাগরে নিমজ্জিত করে না দেখিয়ে বিষয়ান্তরে যেতে পারেন না। এবং এ চিত্রের খুঁটিনাটি সবই যেন তাঁর বর্ণনা করা চাই, তা সমগ্র কাব্যের মূল সুরের সঙ্গে সেটা যতই বেসুর বাজুক না কেন। শিবকে বাহ্যজ্ঞানহত দেখে ভবানী মন্মথকে যা বললেন ও যেভাবে বললেন তা বেশ লজ্জাকর :—

কহিলা মদনে হাসি সুচারুহাসিনী,—
"কি কাজ বিলম্বে আর, হে সম্বর-অরি?
হান তব ফুলশর।"

আবার সেই নিম্নশ্রেণীর হাসি, যার প্রতিচ্ছবি কোনো বেহায়া বাইজি বা ঐ জাতীয় কোনো পুরুষ-ভোলানো পেশাধারিণীর মুখেই প্রত্যাশিত। বস্তুত

এই উপাখ্যানটিতে মাইকেল কথায় কথায় ভবানীর মুখে যে হাসিগুলি বসিয়েছেন তার প্রত্যেকটা আপত্তিজনক। তা ছাড়া, মদনের ভূমিকাটিকে কবি যে কোন্ মানস-প্রবণতায় এমন জঘন্যভাবে বিস্তারিত প্রসারিত করে চলেছেন তা ভেবে দেখবার মতো।

১ম সম্মোহন-শরে শূর বিঁধিলা উমেশে।
শিহরিলা শূলপাণি।

* *

২য় ভয়াকুল ফুল-ধনুঃ পশিলা অমনি
ভবানীর বক্ষঃ-স্থলে ;··· (ঐ-৩৯৩-৯৪)

* *

উমার উরসে

৩য় (কি আর আছে রে বাসা সাজে মনসিজে
ইহা হতে !) কুসুমেষু, বসি, কুতূহলে,
হানিলা, কুসুম-ধনুঃ টঙ্কারি কৌতুকে
শর-জাল ;—প্রেমামোদে মাতিলা ত্রিশূলী ! (ঐ-৪১৮-২২)

* *

৪র্থ চলি গেলা মীনধ্বজ, নীড় ছাড়ি উড়ে
বিহঙ্গম-রাজ যথা, মুহুর্মুহুঃ চাহি
সে সুখ-সদন পানে ! (ঐ-৪৩৯-৪১)

প্রথম লীলায় মহেশকে উত্তেজিতকরণের প্রথম প্রয়াসের প্রতিক্রিয়া, 'শিহরিলা শূলপাণি', এ যে রতিরঙ্গে মত্ততা-জাগানো কামের শিহরণ, তা তো আর অমিত্রচ্ছন্দের গাম্ভীর্যের আবরণে শিবপূজার উপকরণে রূপান্তরিত হওয়ার নয় ? দ্বিতীয় লীলায় 'ভবানীর বক্ষঃস্থলে' প্রবেশের কল্পনাটি রীতিমত অদ্ভুত। শুধু প্রবেশ নয়, গাঢ় প্রবেশ, এবং সেখানেই তার অবস্থান, সেখানে থেকেই নিয়ত কুতূহলে শরজাল-নিক্ষেপ (৩য় লীলা) ; চিত্রখানি যে সরাসরি অনঙ্গলীলার নগ্নচিত্র তা বলাই বাহুল্য। এই লীলাক্ষণটি যেন ঐ মদনের মতোই দুর্বার আকর্ষণে কবি-কল্পলোক আঁকড়ে থাকতে চায়। তাই চাঁদ কেমন করে লজ্জিত হলো, বিভাবসু কেমন করে সেই কাম-লীলা প্রত্যক্ষ করতে না পেরে তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে ভস্মের মধ্যে লুকিয়ে আত্মসম্মান বজায় করলো, এই সব তুচ্ছতা-লাঞ্ছিত পরিবেশ অঙ্কনে কবির আগ্রহের অন্ত নেই। এ সবের ফলে

পার্বতী-পরমেশ্বরের মতো দুটি শ্রেষ্ঠ দেব-চরিত্রের অবনমন যে কোন্ পর্যায়ে গিয়ে ঠেকছে, সে তো স্বতন্ত্র কথা। যে মদন অভয়ার আজ্ঞাবহ ভৃত্যমাত্র, সেই মদনকে বুকের মধ্যে নিয়ে চললো মহাদেবীর মহাদেবসহ কাম-কেলি মদনের চোখের উপর।

এখানে তর্ক উঠতে পারে, মদনকে বাদ দিয়ে তো কোথাও কাম-লীলা সম্ভব নয়। এ লীলা মদনেরই লীলা। তা ছাড়া মদন যখন অনঙ্গ, তখন তাকে ভবানীর বক্ষাশ্রিত কল্পনা করায় কী দোষ থাকতে পারে? অনঙ্গ তো সকলেরই বক্ষোবিহারী। কিন্তু এ তর্ক এখানে প্রযোজ্য নয়। কারণ এখানে অনঙ্গ বা অমূর্ত মদন নয়, পৃথক মূর্তির অধিকারী মদন নামক পৃথক একটি দেব-চরিত্রই পরিকল্পিত। এ সেই মদনভস্মের দেহধারী মদন, দেহ না থাকলে ভস্মীভূত হওয়ার কথাই উঠতো না। সেই পৃথক দেহধারী মদনকে ভৃত্য বা সেবকরূপে নিয়ত সঙ্গে রাখা হয়েছে। সে হলো তাঁদের সম্ভোগলীলার প্রত্যক্ষদর্শী। শুনলো সে তাঁদের নিভৃত শলা-পরামর্শ। তারপর, হুকুম হয়েছে তার চলে যাওয়ার, তবু সে যেন অপ্রসন্ন সেই 'সুখ-সদন' ছেড়ে যেতে হচ্ছে বলে (৪র্থ লীলা)। আসল কথা, কবি-কল্পলোক এখানে মদনাসক্তির মোহ ছাড়তে চাইছে না, তাই কাব্যগত প্রয়োজন ত্বরান্বিত করার পরিবর্তে, এবং সংশ্লিষ্ট চরিত্র ও পরিবেশের বাঞ্ছিত মর্যাদার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করেই কবি মদনের ভূমিকাটি যদৃচ্ছ প্রসারিত করে চলেছেন। মদনের আসল কাজ কখন মিটে গেছে। সে গিয়ে ইন্দ্রকে খবরটা দিলেই ইন্দ্র মায়া-সদনাভিমুখে যাত্রা করতে পারেন। কিন্তু ওদিকে যে রতিকে কবি বসিয়ে রেখেছেন কৈলাসে। সেই রতি ও রতিপতির মিলনোল্লাস কিছু না দেখিয়ে কবির পক্ষে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। তাই এলো কুড়ি লাইনেরও বেশি একটি সংযোজন, যার মধ্যে আছে,—

> অমনি পসারি বাহু, উল্লাসে মন্মথ
> আলিঙ্গন-পাশে বাঁধি, তুষিলা ললনে
> প্রেমালাপে। * * *
> পাই প্রাণ-ধনে ধনী, মুখে মুখ দিয়া,
> (সরস বসন্তকালে শারী-শুক যথা)
> কহিলেন প্রিয়-ভাষে ··।

চিত্রখানি রচনার মধ্যে কবির কোন্ মানসপ্রবণতা সুস্পষ্ট হতে চায় তা যথেষ্ট প্রবলভাবে সংকেতিত।

[৩] ৩য় সর্গে আদিরস

আদিরসের আসক্তিতে কবি যে সবই ভাসিয়ে দিতে পারেন তার সবচেয়ে চমক-লাগানো দৃষ্টান্ত তাঁর প্রমীলা-চিত্র। এখানে তিনি কথায় কথায় গঙ্গাজলে বেনো-জল ঢুকিয়েছেন ঐ রসের প্রতি তাঁর মারাত্মক দুর্বলতায়। তৃতীয় সর্গটি সমগ্রভাবে প্রমীলার বীরাঙ্গনা-চিত্র-রচনায় ব্যাপৃত, ঠিকই। কিন্তু কবি-মানসের অন্তঃপুরের একটি বিশেষ খবর চাপা থাকে না, যখন সর্গটির আনুপূর্বিক পাঠে ধরা পড়ে এই সর্গ-দেহে অন্তত ছ'টি দুষ্টক্ষত, যাদের সৃষ্টি হয়েছে কবিরই নিজস্ব আদিরসের প্রতি শৈথিল্যের সুড়ঙ্গ পথে। তেজস্বিনী রণরঙ্গিনী যে বীরাঙ্গনা, তার পরিচয়ে—উরুদেশ রম্ভার ন্যায় বর্তুল, এ উল্লেখও যেমন বে-মানান, তার নিতম্বিনীত্বের প্রসঙ্গও তেমনি বে-খাপ। তার পর,

অধরে ধরি লো মধু, গরল লোচনে
আমরা;

এ উক্তি কি কোনো বীরাঙ্গনার মুখে মানায়?

প্রমীলার পুরীপ্রবেশের কারণের মধ্যে একটি হলো,—

দেখিব যে রূপ দেখি স্থূর্পণখা পিসী
মাতিল মদন-মদে পঞ্চবটী বনে; (ঐ-১৫১-৫২)

কেন যে আদৌ প্রমীলার মত চরিত্র-প্রসঙ্গে এবং কাব্যের পরিবেশগত গাম্ভীর্য বজায় করার দাবী সত্ত্বেও এই সব আদিরস-চিহ্নিত শৈথিল্য দেখা দিয়েছে তা অনুসন্ধানের বিষয়। কিন্তু অনুসন্ধানের বড় একটা অবসরই রাখেন নি কবি। অচিরেই দেখা যায়, সরাসরিভাবে চরিত্রে ও চিত্রে তিনি ঘটিয়েছেন উৎকট আদিরসের প্লাবন, প্রথমে প্রমীলার সখী, দূতী ও সেনানায়িকা নৃমুণ্ডমালিনীতে, পরে স্বয়ং প্রমীলার মধ্যে। কোথাও কোনো সংযমের বালাই নেই, খেয়াল নেই সংগতি বা সামঞ্জস্যরক্ষার। নৃমুণ্ডমালিনীকে কবি দেখাতে চান 'নৃ-মুণ্ডমালিনী'-রূপে, করলেনও তাকে 'উগ্রচণ্ডা', হলো সে 'ভৈরবীরূপিণী', 'ভীমা', কিন্তু কোথা থেকে কি হয়ে গেল,—সে যখন চলেছে রামের শিবিরাভিমুখে তখন দেখা গেল,—

চলে নিতম্বিনী
জরজরি সর্বজনে কটাক্ষের শরে
তীক্ষ্ণতর।

* * *

দুলিছে পৃষ্ঠে মণিময় বেণী
কামের পতাকা যথা উড়ে মধু-কালে।

অর্থাৎ নৃ-মুণ্ডমালিনীকে নিয়ে কবি-কল্পনা মেতে উঠলো যথেচ্ছাচারে। তাকে 'উগ্রচণ্ডা' বলা হলো, বলা হলো 'আকৃতিতে ভীমা নৃমুণ্ডমালিনী'—যার ভয়ে সকলে জড়সড়, আবার তারই মধ্যে তাকে অবলম্বন করে শৃঙ্গাররসের ছিঁটেগুলি নিক্ষেপ করার চেষ্টাও চলতে থাকলো। ফলে এখানকার উদ্দিষ্ট বীররসটুকুতে যে ভেজাল মিশে গেল, সেদিকে কবির লক্ষ্য নেই।

প্রমীলারও এই একই অবস্থা, অথবা অধিকতর দুরবস্থা। পর্যাপ্ত রণসাজে তাকে সাজানো হয়েছে। কোষবদ্ধ অসি খরসান, বিলম্বিত স্বর্ণ-সারসনে, দীর্ঘ শূল করে, বীরাঙ্গনা মাঝে প্রমীলা চলেছে শূলপাণি, পরাক্রমে ভীমা বামা। কিন্তু এতে বুঝি কবি-কল্পনার তৃপ্তি নেই। তাই—

অন্তরীক্ষে সঙ্গে রঙ্গে চলে রতিপতি
ধরিয়া কুসুম-ধনুঃ, মুহুর্মুহুঃ হানি
অব্যর্থ কুসুম-শরে!

এবং প্রমীলার বীরাঙ্গনা সখিদলকেও করা হলো—

বীর-মদে, কাম-মদে উন্মাদ ভৈরবী।

সঙ্গতিবোধের কী শোচনীয় অভাব! বীররসে-শৃঙ্গাররসে, গাম্ভীর্যে-তরলতায় কী আপত্তিকর রসাভাসদুষ্ট সংমিশ্রণ! কোনো শক্তিশালী কবির হাতে কল্পনার এই যথেচ্ছাচার বড়োই পীড়াদায়ক। কবি-মানসের অভ্যন্তরে দৃষ্টি সঞ্চালন করলেই দেখা যাবে, নৈতিক চরিত্রের শুচিতা ও দৃঢ়তার অভাব, অথবা তৎসম্পর্কে একটা বে-পরোয়া মনোভাবের ফলেই এমন সব অসঙ্গতি ঘটতে পেরেছে। প্রমীলা-চরিত্রের serenity ও sublimity যে এতে বিনষ্ট হতে বাধ্য, তা কে অস্বীকার করবে? একটু পরেই যে-প্রমীলাকে দুর্গা, শচী ও লক্ষ্মীর সঙ্গে উপমিত করা হয়েছে, তার সঙ্গে এই কামোদ্দীপকতার সঙ্গতি কোথায়?

কবির ব্যক্তিজীবনের আদিম নীতিশৈথিল্য তাঁর কাব্যের বাঞ্ছিত রস ও বাঞ্ছিত চরিত্র-মহিমার লাঞ্ছনা ঘটিয়েছে। তাঁর সৃষ্টির মূল্য যাচাই করতে যাওয়ার এইখানেই বিড়ম্বনা। প্রমীলা লঙ্কাপুরীতে এসে প্রবেশ করলে

দিগ্‌বিজয়িনীর মতো, কিন্তু মেঘনাদের মুখোমুখি তাকে দাঁড় করাতে গিয়ে কবি ভাসিয়ে দিলেন তার ঐ বিজয়িনীর মহিমা তার একটি মুখের কথায়,—

* * কিন্তু মনমথে না পারি জিনিতে। (৩।৫২৯)

সেই আবার আদিরসের বেনো জল এসে ঢুকলো প্রেমের মন্দাকিনীতে।

[৪] ৪র্থ সর্গে আদিরস

মধুসূদনের মানসগঠনের এ যে কী সর্বনাশা শৈথিল্য তা নিরপেক্ষ সমালোচক মাত্রই বুঝবেন। চতুর্থ অঙ্কের প্রধান উপজীব্য সীতা-চরিত্র ও সীতার কারুণ্যাপ্লুত পবিত্র জীবন-কাহিনী। এর ভূমিকা স্বরূপ কবি প্রথম কয়েকটি ছত্রে গেয়েছেন বাল্মীকি-বন্দনা। অতঃপর সুরু হবে

একাকিনী শোকাকুলা, অশোক কাননে,
কাঁদেন রাঘব-বাঞ্ছা, আঁধার কুটীরে
নীরবে!

এই করুণ সুরে পরমদুঃখিনী সীতাদেবীর করুণ কাহিনী। মধ্যে, 'ভাসিছে কনক-লঙ্কা আনন্দের নীরে' ইত্যাদি ভঙ্গিতে কবি যখন একটু আনন্দের পরিবেশ অঙ্কনের অবসর করে নেন, তখন আমরা ভাবতেও পারি না যে, এর মধ্যে উৎকট কাম-কেলির চিত্র কোথাও স্থান পেতে পারে। কিন্তু কবি অনায়াসে লিখলেন,

* * নায়কে লয়ে কেলিছে নায়কী,
খল খল খল হাসি মধুর অধরে!
কেহ বা সুরতে রত, কেহ শীধু-পানে। (৪।২৫-২৭)

কবিগুরু-বন্দনার পবিত্র সুগম্ভীর সুরের ঠিক পাশেই এবং সীতার পবিত্র জীবন-কাহিনীর কারুণ্য-পরিপূত রাগিণীর ঠিক বন্দনামুখেই কনক-লঙ্কার আনন্দময় পরিবেশ রচনার অজুহাতে এই যে নীতি-শৈথিল্যাশ্রয়ী সম্ভোগমত্ততার সুর বেজে উঠলো, এটা রুচিবোধে এমনই আঘাত করে যে, কোন্ মানস-প্রবণতায় কবি এমন চিত্র আঁকতে পারেন তার সন্ধান না করে পারা যায় না। মাত্র বারো লাইনে যেখানে লঙ্কার আনন্দময় জীবনের একটি সংক্ষিপ্ত নক্‌শা দেওয়ার আয়োজন, তারই মধ্যে এই ঘৃণ্য উলঙ্গ কাম-কেলি-চিত্র-যোজনায় যিনি উৎসাহিত বোধ করেন, তাঁর কবি-মানসের রুচিবিকার ও নীতিহীনতা অনস্বীকার্য। বিশেষ তো যেখানে একপাশে কবিগুরু আর একপাশে সীতা-

দেবীর প্রসঙ্গ পরিবেশগত পবিত্রতা ও গাম্ভীর্যের ভিত্তিতে কোনো হীন প্রসঙ্গের অনুপ্রবেশে জানায় পরম নিষেধ, সেখানে আদিরসাত্মক চিত্রের উলঙ্গতার প্রতি কবির বে-পরোয়া আসক্তি ব্যতীত কখনও এমন হতে পারে না।

[৫] ৫ম সর্গে আদিরস

পঞ্চম সর্গ থেকে পাঁচটি দৃষ্টান্ত দেখানো যেতে পারে কবি-মানসের এই আসক্তির। নারীদেহের নগ্নতার প্রতি ইঙ্গিত ও তারই বর্ণনাসূত্রে কামোচ্ছ্বাস সৃষ্টির প্রবণতা এখানে পাঠক-চিত্তে কবি-মনোভঙ্গি সম্পর্কে পদে পদে প্রশ্ন জাগায়। আরও লক্ষ্য করবার বিষয়, কবি কিভাবে ঐ পঙ্কিলরসের কুহকবিস্তারের উপযোগী অবসর-রচনায় কৃতিত্ব দেখাতে চান। স্বর্গ-মর্ত-নরকে চলেছে তারই সন্ধান। কবির কল্পলোকে এই উদ্দেশ্যে দৃশ্য ও পরিস্থিতি উদ্ভাবনের মহড়া চলেছে প্রবল উৎসাহে। তাই যেমন মর্তের প্রমীলাও নিস্তার পায় নি কবির ঐ আদিরসের লীলাভূমি-রচনার দায়িত্ব থেকে, তেমনি নিস্তার পান নি কৈলাসের ভবানী এবং স্বর্গের ইন্দ্রাণীও। ভবানীর লাঞ্ছনার কথা দ্বিতীয় সর্গ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। ইন্দ্রাণীর জন্য কবি রচনা করলেন অতি তুচ্ছ একটি অবসর, কাব্যগত প্রয়োজনের হিসাবে যার কোনো স্থান নেই,—যা প্রায় একটা দুঃসহ বাহুল্য বা উপদ্রবের মতো।

এই সর্গের আসল কাজ সুরু হয়েছে লক্ষ্মণকে চণ্ডীর দেউলে পাঠাবার জন্য স্বপ্নের আয়োজনে, যার ব্যবস্থাপনা সবই মায়াদেবীর। কিন্তু তৎপূর্ববর্তী শতাধিক লাইনের এক সংযোজনে রচিত হয়েছে ইন্দ্রপুরীর একটি নৈশ আলেখ্য। মায়াদেবী সেখানে একটিবার বেড়াতে আসেন। কোনো কাজের কথাই তাঁদের সংলাপে পাওয়া যায় না। রাত্রি প্রায় শেষ হতে চলেছে, রাত্রি যাপনোপযোগী কুসুমশয্যার প্রতি ইন্দ্রের অনাসক্তি লক্ষ্য করে ইন্দ্রাণী অভিমানিনী। তার পর এলো উর্বশী-মেনকাদি অপ্সরাবেষ্টিত হয়ে ত্রিদিব দেবী ও দেবেন্দ্রের সেজেগুজে বসার পালা। যাত্রাদলের রাজা-রাণীর মতো এই বসা শুধু মায়াদেবীর অকারণ আবির্ভাবের একটা পরিবেশ-রচনার জন্য অতঃপর দেবীর তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে এলো ঘটা করে শয়নের পালা এদিকে কিন্তু উষাকাল আসন্ন,—"চাহি দেখ ওই পোহাইছে নিশি,"—কিন্তু তাহলে কি হয়, পরিকল্পিত শয়ন-ঘটা কবিকে আঁকতেই হবে। তাই ইন্দ্রাণীকে

প্রস্তুত করা হচ্ছে স্বামি-সহবাসের জন্য। কবির যেন এই ধরণের মুহূর্তগুলি দুর্বার আকর্ষণের বিষয়। প্রমীলার মেঘনাদ-সহবাসে নিশি-যাপনের বেলাতেও লক্ষিত হয় কবির এই একই আসক্তি। ইন্দ্রাণীকে কেবল নিরাভরণ নয়, নিরাবরণ না করতে পারলে যেন কবির সৌন্দর্যসৃষ্টি সার্থক হয় না। তাই,

খুলিলা নূপুর, কাঞ্চী, কঙ্কণ, কিঙ্কিণী
আর যত আভরণ ;

এই যথেষ্ট নয় ;

খুলিলা কাঁচলি ;
শুইলা ফুল শয়নে সৌর-কর-রাশি-
রূপিণী সুর-সুন্দরী.........

এইভাবে নারীদেহের নগ্নসৌন্দর্য বিকশিত করা হলো। আবার তাকে যেন কিছুক্ষণ উপভোগ করাও দরকার, তাই, পরিমলময় বায়ু কিভাবে "কভু অলকে, কভু উচ্চ কুচে, কভু ইন্দু-নিভাননে করি কেলি" "সুস্বনে বহিল," এটাও কবির অবশ্য বর্ণিতব্য বিষয়। ইন্দ্রাণীর নিরাবরণ বক্ষোদৃশ্য এইভাবে উদ্ঘাটনের মধ্যে মাইকেলের কবি-মানসে আদিরসের স্থান সম্পর্কে কী ইঙ্গিত পাওয়া যায় তা সহজেই অনুমেয়।

এই নারীদেহের নগ্নতা ও কামোদ্দীপক প্রসঙ্গের আকর্ষণেই পঞ্চম সর্গে লক্ষ্মণের পরীক্ষা-বৃত্তান্তটি এত প্রশস্ত ও জমকালো হয়েছে। পরীক্ষার উপকরণ সংখ্যায় চারটি। এক, উদ্যানদুয়ারে প্রহরী ত্রিশূলধারী ভূতনাথ; দুই, আক্রমণোদ্যত সিংহ; তিন, বজ্রপাতসহ ঝড় ও দাবানল; চার, অপ্সরাদের প্রেমনিবেদনের ছলনা। এর মধ্যে প্রথম তিনটি মামুলী ধরণের। যা কিছু কবির মৌলিকতা ও সযত্ন রচনার প্রয়াস সে এই চতুর্থ দফায়। প্রায় পঁয়তাল্লিশ লাইনব্যাপী এক আলেখ্যরচনার কৃতিত্বে কবি রীতিমত গর্ব অনুভব করেছেন বলে মনে হয়। কিন্তু এর উপাদানের মধ্যে আছে,—

বামাদল, তারাদল ভূপতিত যেন!
কেহ অবগাহে দেহ, স্বচ্ছ সরোবরে,
কৌমুদী নিশীথে যথা! দুকূল, কাঁচলি
শোভে কূলে, অবয়ব বিমল সলিলে,
মানস-সরসে, মরি, স্বর্ণপদ্ম যথা!

'মরি' প্রয়োগটি লক্ষ্য করবার মতো। মাইকেলের কবি-মানস নিয়ে বাইরের লোকে যতই বড় বড় আদর্শবাদ আবিষ্কারের চেষ্টা করে মরুক, কবি তাঁর স্বাধীন রুচি বা প্রবণতার উপর কোনরকম আবরণ দেওয়ার গরজ বোধ করেন নি। এখানে যে নগ্ন নারীদেহের সৌন্দর্য-সম্ভোগে তাঁরই নিজস্ব তন্ময়তা প্রকাশ পাচ্ছে, কবি সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করেন নি। এই তাঁর প্রকৃতি, এই তাঁর মানসভঙ্গি। তাই লক্ষ্মণের পরীক্ষার নামে কাহিনীবহির্ভূত সম্পূর্ণ একটি নূতন সংযোজনে এই নগ্ন-সৌন্দর্যের লালসা-জাগানো চিত্রটিতে কামোচ্ছ্বাস উদ্রিক্ত করার উপযোগী যেখানে যা কিছু থাকতে পারে সবই একে একে বর্ণিত না করে কবি প্রসঙ্গান্তরে যেতে পারেন না। পরে অবশ্য লক্ষ্মণের মাতৃ-সম্বোধনে কাব্যের হাওয়াবদল ঘটে, কিন্তু চারিত্রিক সংযম দেখানোর জন্য কি সত্যই হাওয়াটাকে এতখানি কলুষিত করার দরকার ছিল? আসল কথা, কোনো কলুষস্পর্শের চিন্তার দায়িত্ব কবি মাইকেলের ছিল না। এর ফলে ভারতচন্দ্রের মতোই তাঁর কাব্যে 'বিদ্যাও আছে, সুন্দরও আছে, কিন্তু বিদ্যা-সুন্দরের মিলন ঘটে নি।'* আর্ট যদি ফুটে থাকে তো সুন্দর হয়েছে বিনষ্ট। কারণ শৃঙ্গার-রসের গন্ধমাত্রেই কবি-মানসটি এমন মাতাল হয়ে ওঠে যে, তখন তার সুন্দর-বোধের ত্রিসীমানায় শিবত্বকে খুঁজে পাওয়া যায় না। তখন সে চায় কেবলই মদের পরিবেশন। তাই,

অলঙ্কারে কেহ
অলক, কাম-নিগড়!
* * *
কেহ বা নাচিছে
সুখময়ী; কুচযুগ পীবর মাঝারে
দুলিছে রতন-মালা, চরণে বাজিছে
নূপুর, নিতম্ব-বিম্বে কণিছে রশনা!
মরে নর কাল-ফণী-নশ্বর-দংশনে;—
কিন্তু এ সবার পৃষ্ঠে দুলিছে যে ফণী
মণিময়, হেরি তারে কাম-বিষে জ্বলে
পরাণ! * *
হায়রে, এ ফণী হেরি কে না চাহে এরে
বাঁধিতে গলায়, শিরে, * *

* প্রমথ চৌধুরী—বীরবলের হালখাতা।

সেই কামোচ্ছ্বাস, সেই 'হায় রে',—কবির ব্যক্তিগত লালসার উত্তালতা, যা প্রকাশভঙ্গিতে সংক্রমণ-শক্তির দাবী জানায়। আবার,

অনন্ত বসন্ত জাগে যৌবন-উদ্যানে;
উরজ-কমল-যুগ প্রফুল্ল সতত;
না শুকায় সুধারস অধর সরসে;
* * *
কঠোর তপস্যা নর করে যুগে যুগে
লভিতে যে সুখভোগ, দিব তা তোমারে

এইভাবে এ আর শেষ হতেই চায় না। লক্ষ্মণের কঠিন সংযম-সূচক কথা কখন শোনা যাবে তার ঠিক নেই, কবি ততক্ষণ সাধ মিটিয়ে আদিরসের পরিবেশন চালিয়েছেন সকল মাত্রা বা পরিমিতিবোধ অগ্রাহ্য করে।

বস্তুত নারীদেহের নগ্নতার প্রতি কবির আকর্ষণ দুর্বার। তাই কোনো দৃশ্যবর্ণনায় অন্য অনেক কথা লিখবার থাকলেও ঐ নগ্নতার প্রতি ইঙ্গিত করবার অবসর তিনি কখনও নষ্ট করেন না। প্রমীলার নিদ্রাভঙ্গে ঠিক এই মনোভঙ্গির বশবর্তী বলেই কবি মাত্র দুটি লক্ষণ এঁকেছেন,—'চমকি রামা উঠিল সত্বরে,' আর, 'আবরিলা অবয়ব সুচারুহাসিনী শরমে।' শেষেরটির ইঙ্গিত লক্ষণীয়।

[৬] ৮ম সর্গে আদিরস

কিন্তু এমন ছিটে-ফোঁটায় যেন কবির কিছুতেই সাধ মিটছিল না। ফাঁক পেলেই একবার ঢালোয়া পরিবেশনের কায়দা দেখাবার ইচ্ছা। এই ফাঁক তিনি রচনা করলেন অষ্টম সর্গে। উদ্ভাবনীশক্তি মাইকেলের অপরিসীম। বাঞ্ছিত ঢঙে বা ছাঁচে শিল্পকলা ফলাবার অবসর-রচনায় মাইকেলের ওস্তাদি তারিফ করবার মতো। বীরাঙ্গনা-কাব্যের গোটাটাই এই ওস্তাদিতে ভরা। মেঘনাদবধের অষ্টম সর্গও এ বিষয়ে কবির যথেষ্ট ক্ষমতার পরিচয় দেয়। কিন্তু এখানে আমরা রস-প্রেরণার বিচারে যে বস্তুটির আধিপত্য দেখতে পাই, সেটি মনে হয়, মাইকেল-প্রশস্তির অত্যুৎসাহে অথবা কাব্যের নিবিড় পাঠের অভাবে অনেকেরই দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে।

বিশল্যকরণীর সন্ধান এখানে গৌণ, মুখ্য হলো নরক-বর্ণন। মোট ৮১২ লাইনে রচিত এই দীর্ঘতম সর্গটির মাত্র ২৫০ লাইনের মতো খাঁটি নরকের

বর্ণন। বাকী অংশের কিছুটা গৌরচন্দ্রিকা-রচনায়, কিছুটা মায়াদেবী ও রামচন্দ্রের কথোপকথনে, আর, বেশ কিছুটা শুম্ভ-নিশুম্ভ-বৃত্র-সুন্দ-উপসুন্দ-বালি-জটায়ু-দিলীপ-ইক্ষ্বাকু মান্ধাতা-নহুষ, অবশেষে দশরথ-বৃত্তান্তে ভরানো হয়েছে। এই শেষোক্ত অংশে নরকের কিছুই নেই ; পাঠককে নরকে দাঁড় করিয়ে পৌরাণিক ইতিবৃত্ত শোনানোর একটা কবি-কৌশল মাত্র। যাইহোক, পূর্বোক্ত ২৫০ লাইনের মধ্যে প্রায় ১০০ লাইন জুড়ে আছে বিচিত্র আদিরসাত্মক প্রসঙ্গ ও জঘন্য কামোদ্দীপক চিত্রের নগ্নতা। মনে হয়, ঘটনাস্থলটি নরক বলেই বুঝি, কবি অবাধ স্বাধীনতা নিয়েছেন কামকলায় নারকীয় নগ্নতা দেখাতে।

পুরীদ্বারে প্রবেশের পরই আমাদের প্রথম যে গ্যালারী দেখানো হলো, তাতে একে একে সাজানো হয়েছে কয়েকটি রোগ-সত্ত্ব, যথা,—(১) জ্বর-রোগ, (২) উদরপরতা, (৩) প্রমত্তত্ব, (৫) যক্ষ্মা, (৬) হাঁপানি, (৭) বিসূচিকা, (৮) অঙ্গগ্রহ ও (৯) উন্মত্ততা। কিন্তু এরই মধ্যে চতুর্থ স্থানে কবি 'রোগ'-টীকা কপালে লাগিয়ে বসিয়ে দিয়েছেন 'কাম'-কে :—

তার পাশে দুষ্ট কাম, বিগলিত-দেহ
শব যথা, তবু পাপী রত গো সুরতে— (৮।২৩৪-৩৫)

প্রথমত, 'কাম' ঠিক ঐ পর্যায়ভুক্ত 'রোগ' নয়। কাম বাদে আর সব কটি যে দৃষ্টিতে রোগ বলে গণ্য, সে দৃষ্টিতে কাম রোগ-শ্রেণীভুক্ত হতে পারে না। কিন্তু কামের প্রসঙ্গে কবি বুঝি শ্রেণী জ্ঞান বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। দ্বিতীয় কথা, একেবারে সুরত-ক্রিয়ার চিত্রটি চোখের সামনে তুলে ধরা কেন? এর মূলে এবং এই শ্রেণীতে বে-মানান হলেও এইখানেই কাম চিত্র-রচনার মূলে কবি-মানসের সেই একই প্রবণতা, একই দুর্বলতা লক্ষিত হয়। চতুর্থ সর্গের 'কেহ বা সুরতে রত' স্মরণীয়। আবার ৯ নং রোগ 'উন্মত্ততা'র পরিচয়ে কবি দুটি অবসর করে নেন তাঁর এই হীন রুচির মশলায় দুটি কদর্য চিত্র রচনার,—

(১) কভু বা
উলঙ্গ, সমর-রঙ্গে হরপ্রিয়া যথা
কালী!

বলা বাহুল্য, এ উলঙ্গ মূর্তি পুরুষের নয়, নারীর। পূর্ববর্তী ছত্রে 'কভু হীনবলা' লক্ষণীয়।

(২) কভু ধিক, হাবভাব-আদি
বিভ্রম-বিলাসে বামা আহ্বানে কামীরে
কামাতুরা !

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

কিন্তু অষ্টম সর্গের ৩৯৮ লাইন থেকে ৪৯০ লাইন পর্যন্ত কবি যে কাম-চর্চার কসরৎ দেখিয়েছেন, তাতে একমাত্র যাঁরা এই কসরতের অনুরাগী তাঁরা ছাড়া আর সকলেরই কবি-মানসের গঠন সম্পর্কে অখণ্ড শ্রদ্ধা বজায় রাখা কঠিন সমস্যা। অংশবিশেষ উদাহরণের কাজে লাগানো যেতে পারে।

(ক) * * সূক্ষ্ম স্বর্ণ-সূতার কাঁচলি
আচ্ছাদন-ছলে ঢাকে কেবল দেখাতে
কুচ-রুচি, কাম-ক্ষুধা বাড়ায়ে হৃদয়ে
কামীর ! সুক্ষীণ কটি ; নীল পট্টবাসে,
(সূক্ষ্ম অতি) গুরু উরু যেন ঘৃণা করি
আবরণ, রম্ভা-কান্তি দেখায় কৌতুকে ;
উলঙ্গ বরাঙ্গ যথা মানসের জলে
অপ্সরীর, জল-কেলি করে তারা যবে।

(খ) হেরি সে পুরুষ-দলে কামমদে মাতি
কপটে কটাক্ষ-শর হানিলা রমণী,—
কঙ্কণ বাজিল হাতে শিঞ্জিনীর বোলে।
তপ্তশ্বাসে উড়ি রজঃ কুসুমের দামে
ধূলারূপে জ্ঞান-রবি আশু আবরিল।
হারিল পুরুষ রণে ; হেন রণে কোথা
জিনিতে পুরুষ-দলে আছে হে শকতি ?
বিহঙ্গ-বিহঙ্গী যথা প্রেমরঙ্গে মজি
করে কেলি যথা তথা—রসিক নাগরে
ধরি পশে বন-মাঝে রসিকা নাগরী—
কি মানসে, নয়ন তা কহিল নয়নে ! (ঐ, ৪৫৪-৬৪)

লক্ষ্য করবার বিষয়, চিত্রগুলির আঙ্গিক-রচনায় কবির কী নিবিড় অভিনিবেশ, কী বিপুল উৎসাহ, কী ঐকান্তিক নিষ্ঠা ! এদের ত্রিসীমানায় নরক নেই, থাকতেও পারে না। এগুলোকে কবি বাইরের জগত থেকে মনের মত

করে সাজিয়ে নিয়ে নরকবর্ণনার মধ্যে খুশীমত এঁটে দিয়েছেন। এমন বিশ্লিষ্ট খণ্ডের খেয়ালী বেথাপ সংযোজনের দৃষ্টান্ত এ কাব্যে সুপ্রচুর। মাইকেলের কল্পলোক কোনো সংশ্লেষ-সঙ্গতির ধার ধারে না। খণ্ডচিত্র খণ্ড-কল্পনা নিয়েই তাঁর কারবার। সম্প্রতি উদ্ধৃত চিত্রগুলিতে দেখা যাবে কবি-কল্পলোক অবাধ কামকেলির দৃশ্যরচনায় নেশায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য। নরকের মধ্যে যে প্রমোদোদ্যানের কেলিকুঞ্জ ফুটে উঠছে সেদিকে কবির খেয়াল নেই। সুতরাং ঐ কল্পলোকের গঠনে মৌলিক উপাদান হিসাবে কাম-কলা-লিপ্সা বা আদিরসপ্রবণতা কত প্রভাবশালী, তা লক্ষ্য ক'রবার বিষয়। এরই জন্য এখানে পদে পদে দেখা যায়, এই সুরের ও এই রসের কথায় সংযমের কোনো স্থান নেই। কে 'উন্মদা যৌবনমদে' 'ধর্ম-কর্ম ভুলি' চিকণ কেশাবলী যত্ন করে নিয়ত বাঁধতো শুধু 'বাঁধিতে কামীর মনঃ'; কোন্ 'দুষ্টা' 'সাজিত সতত' 'কামী-মনঃ মজাতে বিভ্রমে কামাতুরা!' কোন্ 'বামাদলে'র 'কুরঙ্গ-নয়নে' 'কামাগ্নির তেজোরাশি'; কিভাবে 'জীবনে কামের দাস পুরুষ, কামের দাসী রমণী-মণ্ডলী, কাম ক্ষুধা পূরাইল দোহে অবিরামে বিসর্জি ধর্মেরে, হায়, অধর্মের জলে, বর্জি লজ্জা।'— ইত্যাদি বিচিত্র ভাষায় ও ভঙ্গিতে কামলীলার প্রসঙ্গটিকে বিস্তারিত করা হয়েছে। দণ্ডের স্বরূপটি জানাতে গিয়েই কবি আরও উলঙ্গতায় মত্ত হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন—

> * * স্বর্ণকান্তি মাকাল যেমতি
> মোহে ক্ষুধাতুর প্রাণে, সেই দশা ঘটে
> এ সঙ্গমে;

ভাগ্যবান মাইকেলের অতি-ভক্ত অনুরাগীমহল অবশ্য এই অংশের উপসংহার থেকে একটিমাত্র ছত্র তুলে নিয়ে—"ভুলো দোষ, গুণ ধর"—কবির এই প্রার্থনা অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ করেছেন:

> "যৌবনে অধিক ব্যয়ে বয়সে কাঙ্গালী"—

এইটাকেই মহাবচনের মহিমায় মুড়ে মাথায় তুলে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু মাইকেল মহাবচনের কবিও ন'ন, নীতিবাক্যের কবিও ন'ন। এ বিষয়ে রাজনারায়ণ বসু গোড়াতেই এ কাব্যের দোষের আলোচনায় বলে গেছেন, "নীতিগর্ভ মহাকাব্যের অভাব"। তিনি আরো বলেছেন, "এ বিষয়ে ভারতচন্দ্র আমাদের মহাকবি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর।" বস্তুত মহাবাক্য বা

নীতিবাক্য শোনানোর কোনো আয়োজন বা মানসপ্রস্তুতি মাইকেলের ছিল না। তা ছাড়া, আলোচ্যাংশে যে বচনটি তাঁর লেখনীমুখে পাওয়া গেছে, বিচ্ছিন্নভাবে তার একটা নীতিমূল্য থাকতে পারে, কিন্তু এর জন্য যে আলেখ্য ও পটভূমিকা অঙ্কিত হয়েছে, তার অতিবিস্তারের মধ্যে এমনই একটা সম্মোহনী শক্তি আছে যে, নীতিবচনের কোনো মূল্যই আর স্বীকৃতি পায় না। ঐ অতিবিস্তারের মধ্যে কবি-মানসের মোহ-শিথিলতা এতই অবারিত যে, নীতি-বচনের বাঁধনে আর সেটাকে গম্ভীর স্বরে বেঁধে নেওয়া অসম্ভব। ধারাবাহিক পাঠে প্রবৃত্ত পাঠকমনেও আলোচ্য ছত্রটি নীতিবচনের মহিমায় এই কারণেই স্থায়ী রেখাপাত করতে পারে না যে, অব্যবহিত পূর্ববর্তী সবিস্তার অঙ্কিত কুৎসিত কামকেলি-নক্সার প্রভাবে সেখানে নীতিগ্রহণের কোনো প্রস্তুতি জাগে না,—জাগে না আরো, ঐ নীতিবচনের যিনি বক্তা তাঁর বাগ্‌ভঙ্গির প্রতি শ্রদ্ধার অভাবে। এমন কি, পরবর্তী ছত্রদ্বয়ে কবি যখন দণ্ডের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেন,

অনির্বেয় কামানল পোড়ায় হৃদয়ে ;
অনির্বেয় বিধিরোষ কামানল-রূপে
দহে দেহ,—

তখনও কবি-মনোভঙ্গির পরিচ্ছন্নতায় আমাদের আস্থা জাগে না। এটাকে মনে হয় একটা জোড়া-তাড়ার মত। মনে হয়, সম্ভোগচিত্রটি মনের মতো ভোগ ক'রে নিয়ে কবি শেষ করবার আগে কিছু নীতিবুলি আওড়িয়ে দিলেন। বিশেষ যখন এই জাতীয় 'বিধি'-প্রসঙ্গ তিনি এই কাব্যে কথায় কথায় তুলেছেন, আবার এই 'বিধি-রোষ'-এর প্রসঙ্গও তুলেছেন আর এক 'অনল'-এর ক্ষেত্রে [রৌরব-এর প্রসঙ্গে—"অগ্নিরূপে বিধি-রোষ যেথা জ্বলে নিত্য!"], তখন এটার মধ্যে তাঁর মানস-গঠনে কোনো পাপ-জুগুপ্সা বা শুদ্ধি-প্রবণতার পরিবর্তে কেবল একটা বাগ্‌ভঙ্গি-প্রবণতাই লক্ষণীয়। 'অনির্বেয় কামানলে'র প্রভাবে অথবা 'যৌবনে অন্যায় ব্যয়ে'র ফলে কবির নিজস্ব জীবনে যে বিড়ম্বনা ঘটেছিলো এখানে যেন তজ্জনিত একটা ক্ষীণ আর্তনাদ বেরিয়ে আসতে চেয়েছে বিধির দোহাই দিয়ে। কামানলের দুর্জয়তা তিনি নিজেই যে হাড়ে হাড়ে বুঝেছিলেন, বুঝেছিলেন, কিন্তু সংযমের অভাবে কিছুই করতে পারেন নি, সেইটাই এখানে বিধি-রোষের রূপ নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। আসলে অষ্টম

সর্গের এই কামাসক্তিজনিত লাঞ্ছনার চিত্রটির মধ্যে কবিরই নীতিশিথিল মনোগঠনের অনেকখানি অভিব্যক্ত হয়েছে। তাই এত উৎসাহ, এত খুঁটিনাটির প্রতি লক্ষ্য, এত প্রশস্ত বিস্তার, এত নগ্নতার প্রতি ঔদাসীন্য।

[৭] ৯ম সর্গে আদিরস

কবি মাইকেলের আদিরসের প্রতি আকর্ষণ এতই দুর্নিবার যে, কেবল বীররসের মধ্যেই নয়, করুণরসের মধ্যেও তিনি এই হীন আবেদনের ভেজাল চালিয়েছেন। তাঁর সযত্ন-অঙ্কিত শোকচিত্রেও খুঁজলে পাওয়া যাবে শৃঙ্গার-রসের জঞ্জাল। শোক-দুর্বল কারুণ্য-বিহ্বল বাঙালী পাঠক, তাই, চোখ বুঁজিয়ে থাকে কবি যখন নবম সর্গে মেঘনাদের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার পরিবেশ রচনার মধ্যে তাঁরই মানসী-প্রতিমা এবং শোক-প্রতিমা প্রমীলার বর্ণনায় স্ফীতবক্ষে আমদানী করেন 'কামের সমর' ও সেই সময়ে 'সর্বভেদী কটাক্ষশর'-এর পরিকল্পনা।

কোথা সে কটাক্ষশর, কামের সমরে
সর্বভেদী ?

কবি যেন শুধু ভঙ্গির মধ্যে সব মানিয়ে নিতে চান। 'হায় রে' বলে একটা আক্ষেপের ভঙ্গি দিয়ে আমাদের ভুলিয়ে তাঁর অসংযত কল্পলোকের উচ্ছৃঙ্খল কাম-কলা-বিলাসে গা ভাসিয়ে চলতে চান। তাই তো আবার দেখা যায়, প্রমীলার দেহ-বিচ্ছিন্ন বীরসাজগুলির বর্ণনায় কবির সেই নীতি-বল্গাহীন দৃষ্টি খুঁজে বেড়াচ্ছে প্রমীলারই দেহ-সৌষ্ঠবের নগ্নতা। তাই কল্পনাও হয়ে উঠলো উর্বরা; কটি-বন্ধ ও কবচ, এরা হলো প্রাণবন্ত; এদের ওপর আরোপ করা হলো স্মৃতিজনিত মলিনতা,—

সারসন স্মরি,
হায় রে, সে সরু কটি! কবচ ভাবিয়া
সে সু-উচ্চ কুচযুগে—গিরিশৃঙ্গসম!

এইভাবে শোকাবহ চিত্রের মধ্যেও ঐ কটিদেশ ও উচ্চ কুচযুগের স্মরণে গদগদ হয়ে উঠেছে যে কবি-মানস, তার আদিরস-দুর্বলতা কখনই উপেক্ষণীয় হতে পারে না,—হতে পারে এ শৈথিল্য কবির শিল্প-চরিত্রেরই দুর্বলতাপ্রসূত, যেখানে খুঁজে পাওয়া যায় সংশ্লেষ-সংগতির শোচনীয় অভাব।

[৮] উত্তর-ভাবণ

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় এটা প্রমাণ করা উদ্দেশ্য নয় যে, আদিরস-প্রবণতাই মাইকেলের কবি-মানসের প্রধান লক্ষণ। মহাকাব্যজাতীয় রচনায় অপরাপর রসের মতো আদিরসেরও কিছু অবসর আছে বৈ কি। সাহিত্যে রসের সন্ধান বলতেই বোঝায় বিচিত্ররসের। মহাকাব্যে এই রসবৈচিত্র্যই প্রত্যাশিত। সে দিক থেকে মেঘনাদবধে আদিরসের অবতারণামাত্রেই মাইকেলের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ উঠতে পারে না। অভিযোগ এইখানে যে, এই রসের অত্যন্ত খেয়ালী ও বে-পরোয়া অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে মাইকেল তাঁর কাব্যের বহু চিত্র, চরিত্র ও পরিবেশের মধ্যে যে যথেচ্ছাচার চালিয়েছেন, কবি-মানসের বিচারে তা উপেক্ষিত হয়ে থাকে। বস্তুত কবির এই মারাত্মক দুর্বলতার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর কাব্য সম্বন্ধে যাই হোক, কবি মানস সম্বন্ধে কোনো মহৎ ধারণা পোষণ করা যায় না। ইদানীং কালের গবেষণায় বা মাইকেল-প্রশস্তিতে কবি-মানসের আরো কতিপয় বৈশিষ্ট্যের মতো এটিও উপেক্ষিত হতে দেখা যায়, অথবা এটির সম্বন্ধে হয়তো কোনো কুয়াসাচ্ছন্ন ধারণা থাকতে পারে। আশা করি, এই আলোচনায় ঐ উপেক্ষা ও কুয়াসা উভয়ই বিদূরিত হবে।

আদিরসের প্রসঙ্গটি একদিকে যেমন আলোকপাত করে মাইকেলের ব্যক্তিমানসগঠনের নৈতিক দুর্বলতা-শৈথিল্যের উপর, তেমনি সংকেত বহন করে তাঁর শিল্পী-মানসের বিচিত্র শৈথিল্যের,—যার ফলে মেঘনাদবধ কাব্যখানি ভরে গেছে অজস্র অসঙ্গতিতে, খামখেয়ালী পরিকল্পনায়, খেয়ালী শব্দপ্রয়োগে, উপমার যথেচ্ছাচারে, অকারণ বাগাড়ম্বরে, পুনরুক্তির আতিশয্যে ও আরো বিচিত্র ত্রুটি-বিচ্যুতির অনুপ্রবেশে। সব কিছুর মূলে খুঁজে পাওয়া যায় কবির এক সর্বনাশা খেয়ালীপনা ও দুর্দান্ত শৈথিল্য বা অসংযম। এ শুধু নৈতিক অসংযম নয়, শিল্পীয় অসংযমও বটে।

———

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভাষা : পদরচনা ও শব্দযোজনা

[১] রবীন্দ্রনাথ ও মোহিতলাল

না, প্রশস্তি নয়। প্রশস্তি অনেক হয়েছে, অনেক হওয়ার আশাও আছে। শক্তিধর কবি মাইকেলের এই পদরচনা ও শব্দযোজনা সম্পর্কে প্রশস্তি প্রাপ্যও যথেষ্ট। নব নব দৃষ্টিতে নব নব উপচারে ঐ প্রশস্তির ডালা সাজানো হোক, সে তো আনন্দের কথা। কিন্তু কেবল গবেষণার বাহাদুরির জন্যই যদি সত্য থেকে যায় আচ্ছন্ন, অতিভক্তির ঝোঁকে চলতে থাকে কেবল অন্ধ স্তুতিবাদ, তবে প্রকৃত সমালোচনা-সাহিত্য তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তার ভাণ্ডার ভরে উঠবে মেকির অবাঞ্ছিত স্তূপে।

আলোচ্য বিষয়ে মোহিতলাল মজুমদারই সর্বপ্রথম কিছু বিস্তারিত আলোচনা করেন তাঁর **'কবি শ্রীমধুসূদন'** গ্রন্থে। তৎপূর্বে মাইকেলের ভাষা সম্পর্কে স্তুতি-নিন্দা যাই হয়ে থাকুক, সে সবই ভাসা-ভাসা, মোটামুটি অভিমত প্রকাশ ; সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ-ভিত্তিক সমালোচনা তেমন কিছুই হয়নি। রবীন্দ্রনাথের মুখে প্রথমে যে অভিমত ব্যক্ত হয়, তাতে প্রশংসার পরিবর্তে ছিল বেশ বিরূপ মন্তব্য। তিনি বলেন, 'মেঘনাদবধে'র ভাষা অতিশয় কৃত্রিম—দুরূহ ও অপ্রচলিত আভিধানিক শব্দের দ্বারা কণ্টকিত, অতএব এ খাঁটি বাংলা ভাষা নয়। পরে সম্ভবত তাঁর এই অভিমতের কিছু পরিবর্তন হয়ে থাকবে, যদিও কেবল একটিমাত্র দুরূহ শব্দযুক্ত পঙ্‌ক্তির অভিনব রস-ব্যাখ্যা ছাড়া ঐ বিষয়ে আর কোনো দলিলী প্রমাণ পাওয়া যায় না। অনুরাগী পাঠকমহলে সেই 'যাদঃপতিরোধঃ যথা চলোর্মি আঘাতে'-র রবীন্দ্রকৃত ব্যাখ্যাটি সুবিদিত।

এখানে মেঘনাদবধ-এর ভাষা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের আরো কিছু অভিমতের ইঙ্গিত সংগ্রহ করা যেতে পারে। স্বীয় রচনার বিপুল বহরে বহু উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ এনেছেন মেঘনাদবধের প্রসঙ্গ। তাদের পূর্ণাঙ্গ সংকলন এখানে সম্ভব নয়,—আলোচনার সুবিধার জন্য কয়েকটির দিকে নজর দেওয়া যেতে পারে। সর্বপ্রথম ১২৮৪ সালে ভারতী পত্রিকার পাঁচটি সংখ্যায় ৩৬ পৃষ্ঠায়

প্রবন্ধে প্রকাশিত হয় এই কাব্যের কঠোর সমালোচনা। যেমন ভাষা, তেমনি কাব্যের বিষয়, উভয়েরই মূল্যায়নে ষোড়শবর্ষীয় সমালোচক তীব্র বিরূপতা প্রকাশ করেন। আলোচ্য 'যাদঃপতিরোধঃ'-এর সপ্রশংস ব্যাখ্যা কিন্তু এই প্রবন্ধেরই অন্তর্ভুক্ত। বড়োই মজার বিষয়, এই একটি অনুকূল মন্তব্যে রবীন্দ্রনাথ এমন সাড়া জাগিয়ে ফেলেন, যাতে তাঁর বিরূপতার বহর হতে থাকে উপেক্ষিত, বা বালকের কাঁচাবুদ্ধিসঞ্জাত বলে প্রবীণের ঔদার্যে ক্ষমা-প্রাপ্ত।

এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী কালের এক মন্তব্য হয় প্রবীণের উৎসাহ-বৃদ্ধির কারণ। জীবনস্মৃতিতে কবি লিখলেন, "অল্পবয়সের স্পর্ধার বেগে মেঘনাদবধের একটি তীব্র সমালোচনা লিখিয়াছিলাম। কাঁচা আমের রসটা অম্লরস—কাঁচা সমালোচনাও গালিগালাজ। অন্য ক্ষমতা যখন কম থাকে তখন খোঁচা দিবার ক্ষমতাটা খুব তীক্ষ্ণ হইয়া উঠে। আমিও এই অমর কাব্যের উপর নখরাঘাত করিয়া নিজেকে অমর করিয়া তুলিবার সর্বাপেক্ষা সুলভ উপায় অন্বেষণ করিতেছিলাম।"[১]

যথেষ্ট উৎসাহিত হলেন রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। লিখলেন, "চিরদিনই দেখা যায়, সাহিত্যক্ষেত্রে নবীন লেখকগণ তাঁহাদের আবির্ভাবকে প্রবীণের সমালোচনা ও সনাতনীদের নিন্দার দ্বারা বিঘোষিত করেন; প্রতিভার ঔদ্ধত্যে বিচারবুদ্ধি তখন আবিষ্ট থাকে।"[২] ডাঃ সুকুমার সেন রবীন্দ্র ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করে আনন্দ প্রকাশ করেছেন এই বলে যে, "মেঘনাদবধের নির্মমতম সমালোচক বালক রবীন্দ্রনাথও ছত্রটির দোষ ধরিতে পারেন নাই"[৩]—সমর্থনে নিজস্ব মন্তব্যে বলেছেন, "শব্দচ্ছটা ভাবকে গাঢ়বন্ধ মূর্ত এবং ওজস্বী করিয়াছে"[৪]; কিন্তু "অকারণ শব্দাড়ম্বর কাব্যের সর্বত্র মাধুর্য বৃদ্ধি করে নাই"[৫]—এর দৃষ্টান্তরূপে যে উদ্ধৃতি দেখিয়েছেন—

'দম্ভোলী নিক্ষেপী
সহস্রাক্ষে যে হর্যক্ষ বিমুখে সংগ্রামে',

তার অনুরূপ দৃষ্টান্তের প্রাচুর্যে মাইকেলের কাব্যখানি যখন কণ্টকিত, তখন মাইকেলের ভাষা ও শব্দপ্রয়োগ সম্পর্কে সমগ্রভাবে তিনি যে সপ্রশংস অভিমত পোষণ করেন, এমন ধারণা বোধহয় করা চলে না।

'জীবনস্মৃতি'র ঐ মন্তব্যের কাল মোটামুটি ১৩১৯ সাল ('জীবনস্মৃতি'র প্রকাশ-কাল)। বছর পাঁচেক আগে 'সাহিত্য' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে 'সাহিত্যসৃষ্টি' প্রবন্ধের মধ্যে 'মেঘনাদবধ' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সমালোচনা। বলা বাহুল্য, এটি বিশুদ্ধ কাব্য-সমালোচনা, এবং বড়ো কবির বড়ো বহরের রসগ্রাহিতার দাক্ষিণ্য-পুষ্ট। কবি মাইকেল এবং তাঁর 'মেঘনাদবধ'-এর যা শ্রেষ্ঠ প্রাপ্য, পরিণত সাহিত্যিক সমালোচনাসূত্রে রবীন্দ্রনাথের হাতে তা এইখানেই বেরিয়ে এসেছে। প্রবীণ কবি-সমালোচকের কবির প্রতি এই সময়কার যে শ্রদ্ধা, তারই দ্বারা নিয়ন্ত্রিত পূর্বোক্ত বিনয়-দৈন্য-চিহ্নিত মন্তব্যটি। নচেৎ ঠিক মাইকেলের ভাষা সম্বন্ধে বা আনুষঙ্গিকভাবে কাব্য সম্বন্ধে এই সমালোচকের আরো তিন চার বার যে মন্তব্য পাওয়া যায় তার মধ্যে কোথাও তীক্ষ্ণ সমালোচনা, কোথাও ব্যঙ্গের খোঁচা, কোথাও বা বিজ্ঞবিশ্লেষণ যোগে অসারতা প্রদর্শন ও একই ভাবপ্রকাশের সহায়ক বিকল্প ভাষার নমুনা-রচনা লক্ষণীয়।

১২৮৪-এর পরেই ১২৮৯-এর ভারতীতে পুনরায় যে মেঘনাদবধের সমালোচনা বেরোয়, তাতেও ছিল যথেষ্ট তীব্রতা। 'রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্র-সাহিত্য-প্রবেশক' গ্রন্থের প্রণেতা রসজ্ঞ ভাষ্যকার প্রভাতকুমারের প্রতিক্রিয়া উল্লেখযোগ্য। প্রথমবারের মতো এবারেও তিনি মাইকেলের মান বাঁচালেন এই বলে, "যে আঘাত সহ্য করিয়া আহত হয় না, আঘাত তাহারই ভূষণ; সুতরাং সাহিত্যের মানসূচী প্রতিষ্ঠাকল্পে মধুসূদনের রচনাকে আক্রমণস্থলরূপে নির্বাচন করিয়া রবীন্দ্রনাথ ভালোই করিয়াছিলেন; কারণ ক্ষীণপ্রাণ সাহিত্যিকদের উপর রবীন্দ্রনাথের তীব্র সমালোচনাসায়কগুলি নিক্ষিপ্ত হইলে তাহাদের পক্ষে মারাত্মকই হইত। কিন্তু মধুসূদনের কঠিন প্রাণ রবিকরপীড়নে ম্লান হইবে না।"[১] তবে সেই প্রথম সমালোচনা সম্বন্ধে যেমন লিখেছিলেন,— "কিন্তু প্রবন্ধটির অনেক কথা এখনও বিচার্য;...একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে ইতঃপূর্বে এমন নির্ভীক বিস্তারিত সমালোচনা বাংলা সাহিত্যে কোনো গ্রন্থ সম্বন্ধেই হয় নাই—", এই দ্বিতীয় সম্বন্ধেও লিখলেন, "...মোটকথা এবারকার সমালোচনা গতবারের রচনার ন্যায় তীব্র না হইলেও যুক্তির দিক হইতে বিশেষ-ভাবে বিচারণীয়; সে যুগের সমালোচনা-মানসূচীর দৃষ্টিতে এই রচনা সাহিত্যে অপাংক্তেয় হইতে পারে না।"[২] যুক্তিগুলির যে সংক্ষিপ্ত সংকেত এখানে

(১) রবীন্দ্রজীবনী, ১ম, পৃঃ ১২৪। (২) ঐ

(পৃঃ ১২৪) বা পূর্ববর্তী ক্ষেত্রে (পৃঃ ৬০) তুলে ধরা হয়েছে, মাইকেল-সমীক্ষা-ব্রতীমাত্রেরই তা প্রণিধানযোগ্য। দ্বিতীয়বারে সেই তরুণ সমালোচক ভারতীর পাতায় যে লিখেছিলেন "নিরস্ত্র ইন্দ্রজিতকে হীন ক্ষুদ্র তস্করের ন্যায় রামলক্ষ্মণ বধ করিলেন, ইহা মহাকাব্যের বিষয়বস্তু হইতে পারে না"—আজও তার জবাবে মাইকেলকে সমর্থন করবার জন্য কেউ এগিয়ে এসেছেন কি না, জানি না।

সে যাই হোক, ঐ একই 'জীবনস্মৃতি'তে মেঘনাদবধ কাব্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আর একটি কৌতুকরস-জারিত মন্তব্য এবং তদানুষঙ্গিক এক টুকরা বৃত্তান্ত এখানে পাঠককে উপহার দেওয়া যেতে পারে।

"যে জিনিসটা পাতে পড়িলে উপাদেয় সেইটাই মাথায় পড়িলে গুরুতর হইয়া উঠিতে পারে। ভাষা শিখাইবার জন্য ভালো কাব্য পড়াইলে তরবারি দিয়া ক্ষৌরি করাইবার মতো হয়—তরবারির তো অমর্যাদা হয়ই, গণ্ডদেশেরও বড়ো দুর্গতি ঘটে। কাব্য জিনিসটাকে রসের দিক হইতে পুরাপুরি কাব্য হিসাবেই পড়ানো উচিত, তাহার দ্বারা ফাঁকি দিয়া অভিধান-ব্যাকরণের কাজ চালাইয়া লওয়া কখনোই সরস্বতীর তুষ্টিকর নহে।" ('জীবনস্মৃতি', পৃঃ ২৯৭)

আনুষঙ্গিক বৃত্তান্তটি হলো,—নর্মাল স্কুলের পালা শেষ হয়েছে। মেঘনাদবধের প্রভাবে শিক্ষার্থীদের ভাষা সম্পর্কে সচেতনতা হয়েছে তীক্ষ্ণ। রবীন্দ্রনাথের সহপাঠী আর দু'জনের মধ্যে ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কাছে এক লিখিত আবেদনযোগে একখানি পুস্তক সংগ্রহ করতে প্রয়াসী। "সে মনে করিয়াছিল, সর্বসাধারণের সঙ্গে সচরাচর যে প্রাকৃত বাংলায় কথা কহিয়া থাকি সেটা তাঁহার কাছে চলিবে না। সেইজন্য সাধু গৌড়ীয় ভাষায় এমন অনিন্দনীয় রীতিতে সে বাক্যবিন্যাস করিয়াছিল যে, পিতা বুঝিলেন, আমাদের বাংলা ভাষা অগ্রসর হইতে হইতে শেষকালে নিজের বাংলাত্বকেই প্রায় ছাড়াইয়া যাইবার জো করিয়াছে।" পরদিনই মহর্ষির নির্দেশে মেঘনাদবধ-বিশারদ নীলকমল পণ্ডিতের কাছে বাংলা-পড়া বন্ধ হয়ে গেল ('জীবনস্মৃতি', পৃঃ ঐ)।

আশা করি, সহৃদয় পাঠক এই উদ্ধৃতির উদ্দেশ্য ঠিকই বুঝে নেবেন। মেঘনাদবধকে অপাঠ্য বলার মূর্খতা যে মহর্ষিকে বা বর্তমান লেখককে অধিকার করে নি, তা, অবশ্যই বুঝিয়ে বলা নিষ্প্রয়োজন। গ্রন্থখানি তরুণ শিক্ষার্থীদের পক্ষে নিতান্ত দুরূহ এবং তার মূলে আছে এর ভাষাগত দুরূহতা এইটাই বক্তব্য।

আর একটি বিশেষ ইঙ্গিত ঐ প্রয়োগটিতে—মেঘনাদবধের বাংলায় আমাদের "নিজের বাংলাকেই প্রায় ছাড়াইয়া যাইবার" উপক্রম। এই বস্তুটি, অর্থাৎ মেঘনাদবধের ভাষার প্রকৃতি যে খাঁটি বাংলা ভাষার প্রকৃতিবিরুদ্ধ, এই প্রস্তাবটির সমর্থনে রবীন্দ্রনাথ আরো পরিণত বয়সে যে লেখালেখি করেছেন, ১৩৪১ সালের উদয়ন পত্রিকায় প্রকাশিত তারই একটি নমুনা এই নিবন্ধের অন্তর্ভুক্ত করা হলো। তবে আলোচ্য বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের তীব্র প্রতিবাদে যে মোহিতলাল বাংলা সমালোচনার আসর উত্তপ্ত করে তোলেন, তাঁর প্রসঙ্গ দিয়েই অগ্রসর হওয়া অধিকতর কাম্য মনে হয়।

মোহিতলাল তাঁর বৈদগ্ধ্যপূর্ণ সমালোচনায় কিছু কিছু দোষত্রুটির উল্লেখ করলেও মেঘনাদবধের ভাষা-রচনা ও তার উপাদান-সমাবেশে কবির বিশেষ কোনো দুর্বলতা স্বীকার করেন নি। তিনটি প্রশস্ত অধ্যায়ে বিন্যস্ত প্রায় পঞ্চাশ পৃষ্ঠাব্যাপী তাঁর এই ভাষাগত মহামূল্য আলোচনায়, মনে হয়, লেখক তাঁর নিজস্ব মাইকেল-মুগ্ধতাকে বলিষ্ঠ হস্তে অপরের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেওয়ার সাফল্যজনিত আত্মপ্রসাদে ভরে উঠেছেন। তাঁর ঐ মুগ্ধতার মাত্রা যে কতো, তার পরিচয় রয়েছে সেইখানে যেখানে তিনি মাইকেলের খেয়ালী শব্দপ্রয়োগের যেগুলিকে আর কোন মতেই সমর্থন করতে পারেন নি, সেগুলিকে বলেছেন "খাঁটি আর্ষ প্রয়োগ ভিন্ন আর কিছুই নহে" (পৃঃ ১৬১)। এ ছাড়া, মোহিতলাল মেঘনাদবধ কাব্যে 'অনুপ্রাস-বাহুল্য', শব্দনির্মাণের 'স্বেচ্ছাচার', 'ক্রিয়াপদ নির্মাণের হঠকারিতা', 'ব্যাকরণ-লঙ্ঘন', 'অবাচকতা-দোষ' ইত্যাদি বেশ কয়েকটি দোষের প্রসঙ্গ আনলেও, প্রতিক্ষেত্রেই কোন না কোন অছিলায় সেই দোষগুলিকে গুণে রূপান্তরিত করে ছেড়েছেন। কোথাও বলেছেন, 'একটা দুঃসাহসিক পরীক্ষা' (পৃঃ ১৬০-৬১), কোথাও, 'এ ব্যাপারে কবির কাজ আগে, ব্যাকরণ পরে' (১৬২), কোথাও বা টিপ্পনী যোগে বলেছেন, 'এইরূপ দুঃসাহসিকতা ভাষার যে উপকার করিয়াছে—অতিশয় সংযমী, সুবোধ ও সাবধানী লেখকের দ্বারা তেমন উপকার কখনও হইতে দেখা যায় নাই' (১৬৩)। এ ছাড়া, কখনও 'মধুসূদনের নিজস্ব প্রয়োগ' (১৬৩) বলে, কখনও ইংরেজী প্রভাবের ফল, এবং তা সর্বত্র দোষাবহ নয় (১৬৫), এই যুক্তি দিয়ে, আর সবশেষে "সাহস ও স্বেচ্ছাবৃত্তি উৎকৃষ্ট কবিনীতি" (১৬৭), এই দোহাই দিয়ে সমালোচক তাঁর কবি-প্রশস্তিতে মাইকেলের রচনাকে কেবল নিখুঁত নিটোল নয়, অলৌকিক কবি-প্রতিভার এক আদর্শ রূপায়ণ বলেই তুলে

ধরেছেন। লক্ষ্য করবার বিষয়, উল্লিখিত বিভিন্ন ধারায় যে সব দোষের প্রসঙ্গ আনা হয়েছে, এবং তা খণ্ডন করা হয়েছে প্রতিবাদাতীত দৃঢ়তায়, সেগুলির চেয়ে আরও অনেক স্থূল ও ব্যাপক ত্রুটিবিচ্যুতি উপেক্ষিত হয়েছে। তা ছাড়া আর্ষ প্রয়োগ', 'নিজস্ব প্রয়োগ' বা 'স্বেচ্ছাবৃত্তি' ইত্যাদি যে নিরপেক্ষ সমালোচনার কোনো ধারাই বলে গণ্য নয়, কিম্বা উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কোনো সাহিত্যিকের রচনাগত ত্রুটি-দুর্বলতার উপর মুনি-ঋষি-মাহাত্ম্যের আবরণ টেনে দেওয়া যে নিতান্ত মুগ্ধতারই পরিচায়ক, তা সমালোচক একবারও ভাবেন নি।

বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ছিদ্রানুসন্ধীর ভূমিকায় কিছু নিন্দা-মন্দ করা নয়, কোনো যুগান্তকারী সাহিত্যসৃষ্টির স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সঠিক ধারণা গঠনের পথে প্রশস্তি-মোহান্ধতা যাতে অন্তরায় হয়ে না দাঁড়ায়, এখানে সেই বিষয়েই কিছু আলোচনার প্রয়াস। দোষ-গুণের খতিয়ান যেমনই হোক, মেঘনাদবধ কাব্য যে বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সঞ্চয় এবং মধুসূদন এক যুগপ্রবর্তক কবি, এ সত্য চিরকালের জন্য প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু সেই মহাকবির হাতে যা আমরা পেয়েছি তার মূল্যায়ন কষ্টিপাথরেই হওয়া আবশ্যক। সোনাটি কী দরের, তাতে খাদ কতখানি, খাঁটি ক'রে না জানা হ'লে, ফাঁপাই মূল্য ধরে রেখে কোন লাভ নেই, বরং লোকসান আছে। সাহিত্য-সমালোচনার স্থান বা উপযোগিতা সম্বন্ধে যাঁরা সচেতন, তাঁরাই বুঝবেন, এই লোকসান কী।

একদিকে উদ্দাম প্রশস্তিবাদ, আর একদিকে 'থিসিস্'-মার্কা গ্রন্থসৃষ্টির লোলুপতা, এই দুইয়ের চাপে পড়ে বর্তমান বাংলা সাহিত্যে এমন অনেক মতবাদ বা অভিমতের আমদানী হচ্ছে, যাদের প্রতিবাদ সাহিত্যিক সত্যের খাতিরে অত্যাবশ্যক। মোহিতলাল যতোই যুক্তিতর্ক-ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ যোগে প্রতিষ্ঠিত করতে চান,—"মেঘনাদবধ-কাব্যের ভাষাই আধুনিক বাংলা কাব্যের প্রথম কবিভাষা (পৃঃ ১৩৮), * * * ইহা এ যুগের অর্থাৎ রবীন্দ্রোত্তর কাব্যযুগের ভাষা নয়, তথাপি এ ভাষায় এখনও বাংলা কবিতার একটি অভিনব রূপ অম্লান হইয়া আছে ;" (পৃঃ ১৪৫), এবং "এ কাব্য আর কোনো ভাষাতেই হতে পারতো না" (পৃঃ ১৫৩),—তাঁর মধ্যে উদ্দাম মাইকেল-প্রশস্তি বা ভক্তিমুগ্ধতার সুর প্রবলরূপেই ধরা পড়ে। আবার তাঁরই গাওয়া প্রশস্তিবাদের ধুয়া ধরে ইদানীং সুরু হয়েছে সেই প্রশস্তির যৎপরোনাস্তি চড়া সুরের রেওয়াজ। অথচ রবীন্দ্রনাথ যে মেঘনাদবধ-এর ভাষাকে বললেন খাঁটি বাংলা ভাষা নয়,

এ কাব্য খাঁটি বাংলা ভাষায় ও খাঁটি বাংলা ছন্দে রচিত হলে সমান উপাদেয় হতো, সেটা কি কেবল মোহিতলালের তর্কের প্যাঁচে ও কতিপয় রবীন্দ্র-বিদ্বেষী টিপ্পনীর উষ্মায় নস্যাৎ হয়ে যাবে? রবীন্দ্রনাথ কিভাবে বুঝিয়েছেন যে, খাঁটি অর্থাৎ প্রাকৃত বাংলায় এই কাব্য সমান উপাদেয় হতো, একবার দেখা যাক। তিনি লিখেছেন,

"মাইকেল তাঁর অমিত্রাক্ষর ছন্দে যুক্তবর্ণের ধ্বনি পদে পদে ঝঙ্কৃত কোরে পয়ারের একটানা চালের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করেছিলেন। সাধারণ পয়ারের এই শক্তির সম্ভাবনা কতদূর পর্যন্ত পৌঁছয় সে তিনিই প্রথম দেখিয়েছেন। তৎসত্ত্বেও তাঁর অনবধানতা মেঘনাদবধ কাব্যের আরম্ভেই প্রকাশ পেয়েছে—

সম্মুখ সমরে পড়ি, বীর-চূড়ামণি
বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে, কহ, হে দেবি অমৃতভাষিণি,
কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতি-পদে,
পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃকুল-নিধি
রাঘবারি।

এতগুলি পংক্তির আরম্ভে ও শেষে দুটি মাত্র যুক্তবর্ণের ধাক্কা। এর সঙ্গে 'প্যারাডাইস্ লস্‌টে'র সূচনা মিলিয়ে দেখলে প্রভেদ স্পষ্ট হবে।"

*   *   *   *

"অথচ এই প্রাকৃত বাংলাতেই 'মেঘনাদবধ' কাব্য লিখলে যে বাঙালীকে লজ্জা দেওয়া হোতো সে কথা স্বীকার করব না। কাব্যটা এমনভাবে আরম্ভ করা যেত—

যুদ্ধ তখন সাঙ্গ হোলো বীরবাহু বীর যবে
বিপুল বীর্য দেখিয়ে শেষে গেলেন মৃত্যুপুরে
যৌবনকাল পার না হতেই। কও মা সরস্বতী,
অমৃতময় বাক্য তোমার, সেনাধ্যক্ষ পদে
কোন্ বীরকে বরণ করে পাঠিয়ে দিলেন রণে
রঘুকুলের শত্রু যিনি, রক্ষকুলের নিধি।

এতে গাম্ভীর্যের ত্রুটি ঘটেছে একথা মানব না। এই যে বাংলা বাঙালীর দিন-রাত্রির ভাষা এর একটি মস্ত গুণ—এ ভাষা প্রাণবান। এই জন্যে সংস্কৃত

বলো, ফার্সি বলো, ইংরেজি বলো, সব শব্দকেই প্রাণের প্রয়োজনে আত্মসাৎ করতে পারে।" —উদয়ন, বৈশাখ, ১৩৪১।

সম্ভবত এরই উত্তরে মোহিতলাল অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে টিপ্পনী কেটেছেন "যদি কেহ বলেন, মেঘনাদবধ কাব্য কাব্যই হয় নাই, সে কথার বরং একটা অর্থ হইতে পারে, কিন্তু মেঘনাদবধ-কাব্য অন্যবিধ ভাষায় রচিত হইলেও, তাহা যেমন কাব্য তেমন কাব্যই থাকিত—এমন কথা সাহিত্য-ধর্মেরই বিরোধী" (পৃঃ ১৫৩)। স্থানবিশেষের উদ্ধৃতি দেখিয়ে বলেছেন, "এ ভাষা যে খাঁটি বাংলা ভাষা—বাঙালীর পৈতৃক কবি-ভাষা, তাহা স্বীকার করিতে যাঁহার বাধে, আজিকার সেই আধুনিক বাংলা-সহিত্যিক নিজেই জাতিভ্রষ্ট হইয়াছেন। * * * অতএব 'মেঘনাদবধে'র ভাষা বাংলা ভাষা নয়—এমন কথা একটা স্বতঃ-সিদ্ধকে অস্বীকার করার মত। মিলটনের Paradise Lost-এর ভাষা ইংরেজী নয় বলিয়া তাহা যে বরখাস্ত হইয়াছে, এ সংবাদ আমরা এখনও পাই নাই। সে ভাষা যদি ইংরেজী হয়, তবে 'মেঘনাদবধে'র ভাষা তাহার দশগুণ বাংলা। * * * আজকাল যে ভাষা প্রচলিত হইয়াছে, তাহা বাংলা ভাষার একটা অতি কুৎসিত ফিরিঙ্গী সংস্করণ। রবীন্দ্রনাথের "খাঁটি বাংলা" এই ভাষাকেই জাতে তুলিবার বড় সুবিধা করিয়া দিয়াছে।"

মোহিতলালের এই টিপ্পনী-ধমকানি কে কেমনভাবে নেবেন, বলা যায় না; তবে আসল সত্য যে তাঁর মাইকেল-প্রশস্তির উন্মাদনায় আরও আচ্ছন্ন হয়ে যেতে পারে, এমন আশংকা অমূলক নয়। একটা বৃহৎ কাব্যদেহ থেকে সুবিধামতো অংশ বা শব্দাবলী বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে তাদের সাহায্যে সমগ্র কাব্যেরই প্রশস্তি রচনায় বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা হয়। তাঁর নির্বাচিত অংশের সবগুলিই যে সুন্দর বা বিতর্কের অতীত, তাও নয়। মোট কথা, মাইকেলের ভাষা বা তার উপাদান-সমাবেশ সম্বন্ধে যে প্রশস্তির প্লাবন বহানো হয়েছে বা আরও হতে চলেছে, তাতে সাধারণ সাহিত্যানুরাগী পাঠকের ক্রমাগত বিভ্রান্ত হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা।

'মেঘনাদবধ'-এর ক্ষেত্রে এই বিভ্রান্তির হেতু-মূলে আরও একটি জোরালো বিষয় হলো কবির নিজস্ব ঘোষিত কতিপয় মন্তব্য নিজেরই কবিকৃতি-সম্পর্কে। চিঠিপত্রাদিতে প্রকাশিত মাইকেলের অনেক মনের কথা যেমন তাঁর সাহিত্যিক ভাবধারা বা কবি-মানসগঠন বুঝে নেওয়ার পক্ষে খুবই সহায়ক

তেমনি অনেক কথাই সেখানে পাওয়া যায়, কাজের মধ্যে যাদের কোথাও ফুটেছে আংশিক সার্থকতা, কোথাও বা পুরো ব্যতিক্রম।

পদরচনা-শব্দযোজনা ইত্যাদি সম্পর্কে মাইকেলের নিজের কথা যা তাঁর চিঠিপত্রে পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় এই ব্যাপারে নিজের নৈপুণ্য ও নিখুঁত সাফল্যজনিত আত্মপ্রসাদে কবির বক্ষ স্ফীত হয়ে উঠছে।

"...The thoughts and images bring out words with themselves—words that I never thought I knew. Here is a mystery for you."

এ হলো এক রকম। আবার—

"You must weigh every thought, every image, every expression, every line."

এ আর এক রকম। প্রথমটায় বোঝায় কবির নিপুণ শব্দপ্রয়োগাদির মূলে ছিল যেন কোনো অলৌকিক শক্তির প্রেরণা, যার জন্য তিনি তাকে 'mystery' বলেছেন। দ্বিতীয়টায় দেখা যায়, অনির্দেশ্য শক্তির রহস্য নয়, স্বীয় সচেতন কবিপ্রয়াসের দ্বারাই যে কবি প্রতিটি ভাব, চিত্র, বা প্রকাশভঙ্গী, এবং প্রতিটি ছত্রের কাঠামো রচনা, সর্বত্রই নিখুঁত হতে পেরেছেন, এই তাঁর ধারণা। আর এই সবের ভিত্তিতেই চলে আসছে শব্দ-নির্মাণ ও প্রয়োগকুশলতায় কবির বিস্ময়কর সাফল্যের জয়গান, অকুণ্ঠ প্রশংসার স্তুতিরচনা। প্রজ্ঞাধর্মী সমালোচনায় সিদ্ধহস্ত মোহিতলাল তাঁর নির্বাচিত বহু পদ, পদাংশ, ছত্রগুচ্ছ বা বাক্যাংশের বিবিধ বিশ্লেষণের সাহায্যে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, মধুসূদন ছিলেন ভাষা সম্বন্ধে সর্বদা সতর্ক, 'শব্দচয়ন ও শব্দযোজনা, বাক্যসৃষ্টি ও বাক্যের গঠন, সর্ববিষয়ে পূর্ণ সজাগ'। সম্ভবত তাঁরই বৈদগ্ধ্যপূর্ণ আলোচনা থেকে ইঙ্গিতে সংগ্রহ করে ইদানীংকালের উৎসাহী গবেষককে দেখা যায় কবির ঠিক এই কৃতিত্বের একটা চোখ-ধাঁধানো আলেখ্য রচনায় ও তারই কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত। অর্থাৎ 'নূতন কিছু করো, একটা নূতন কিছু করো'-র হিড়িক চলেছে, আর সাধারণের অনতিপ্রিয় কঠিন-বোধ্য 'মেঘনাদবধ' হয়েছে ঐ নূতনের কায়দা দেখানোর সহজ উপায়।

কিন্তু মধুসূদনের রচনার শব্দবিজ্ঞান নিয়ে বৈয়াকরণ গবেষণা বা ভাষা-তাত্ত্বিক গবেষণা (ডাঃ সুকুমার সেনের গ্রন্থে যার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে) যেমন ইচ্ছা হোক ; ভাব-ব্যঞ্জনায়, বাঞ্ছিত সুরসৃষ্টিতে বা রূপসৃষ্টিতে মধুসূদনের

শব্দ-চয়ন-বয়ন-প্রয়োগশিল্প যে যথেষ্ট শৈথিল্যে লাঞ্ছিত, এর অকাট্য প্রমাণ কাব্যদেহে প্রচুর পরিমাণে ছড়িয়ে আছে। সঙ্গতি, সামঞ্জস্য ও যথাযথতার অভাবে তাই 'মেঘনাদবধে'র বহু রচনাংশ মাইকেলকে 'শব্দকবি'-সংজ্ঞার হাত থেকে বাঁচানোর পথে প্রবল অন্তরায় হয়ে আছে।

নায়ক মেঘনাদ ও প্রতিনায়ক লক্ষ্মণ সম্বন্ধে কবিপ্রযুক্ত দুটি বিখ্যাত বিশেষণ-পদের প্রসঙ্গ দিয়ে আলোচনা সুরু করা যেতে পারে।

'দেবদৈত্যনরত্রাস', মেঘনাদের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত এই স্বরচিত পদটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় আমাদের সমালোচকসমাজ মুখরিত। কিন্তু সমগ্র মেঘনাদবধ কাব্যে এই একই পদ ব্যবহৃত হয়েছে অন্তত আটবার (১ম সর্গে দুই ; ৪র্থ সর্গে এক ; ৫ম সর্গে এক ; ৬ষ্ঠ সর্গে দুই ও ৭ম সর্গে দুই) ; এই আটবারের মধ্যে মাত্র দু'বার পদটি ব্যবহৃত হয়েছে মেঘনাদের উদ্দেশে, একবার কুম্ভকর্ণ প্রসঙ্গে আর বাকী পাঁচবার অর্থাৎ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শব্দটির চয়ন-বয়ন-প্রয়োগ ঘটেছে লঙ্কার অখ্যাতনামা সাধারণ রাক্ষসের পরিচয়ে। আরও লক্ষণীয়, কবির এই সুগঠিত স্বরচিত অতিপ্রশংসিত ধ্বনিগাম্ভীর্যময় অনন্যসাধারণ পদটির এই কাব্যে প্রথম আবির্ভাব মেঘনাদ-চরিত্রের অনন্যতা-জ্ঞাপনের জন্য নয়, একেবারেই সাধারণ রাক্ষস-সৈন্যদলের পরিচয়-প্রসঙ্গে ;—

> সাজিল কর্বুরবৃন্দ বীরমদে মাতি,
> দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস।

দ্বিতীয় উল্লেখ লঙ্কার বীরশূন্যতা-জ্ঞাপনের জন্য ঐ একইভাবে সাধারণ বীর সৈন্যের উদ্দেশে ;—

> মহারথিকুল-ইন্দ্র আছিল যাহারা,
> দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস, ক্ষয় এ দুর্জয়
> রণে !

তৃতীয় উল্লেখ,—'পড়েছে সংগ্রামে দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস কুম্ভকর্ণ বলী'

চতুর্থ উল্লেখ,—

> বিখ্যাত রাক্ষস-কুল, দেব-দৈত্য-নর-
> ত্রাস ত্রিভুবনে, দেবি !

পঞ্চম ও সপ্তম উল্লেখে অর্থাৎ একবার মাত্র ষষ্ঠ সর্গে ও একবার মাত্র সপ্তম সর্গে, উভয় স্থলেই রামচন্দ্রের মুখে এই পদটি মেঘনাদ্-পরিচয়ে ব্যবহৃত হয়েছে। নচেৎ ষষ্ঠ উল্লেখেও পদটিকে সাধারণ রক্ষোবীরের উদ্দেশে বরং আরও জমকালো করে ব্যবহার করা হয়েছে 'ত্রাস'-এর সঙ্গে 'চির' শব্দটি সংযুক্ত করে,—

আর আর মহাবলী, দেববৈত্যনর-
চিরত্রাস! (৬ষ্ঠ, ৬৩০-৩১)

অষ্টম স্থলেও সেই একই কথা, যুদ্ধে রক্ষোবাহিনীকে উত্তেজিত করার জন্য রাবণ বলছেন,—

দেববৈত্যনরত্রাস তোমরা সমরে
বিশ্বজয়ী; (৭ম, ৩৮২-৮৩)

এ অবস্থায় 'দেববৈত্যনরত্রাস'-এর মতো নামকরা পদটির রচনায় ও যোজনায় মাইকেলের ঐ 'thoughts and images bring out words with themselves'-এর দাবী যে কতো অচল তা বলাই বাহুল্য। যে 'thought' বা 'image' তাঁর মনে মেঘনাদকে অবলম্বন করে জেগে উঠতো, অবশ্যই সেগুলো জাগতো না অতি সামান্য সাধারণ রাক্ষস সৈন্যের ক্ষেত্রে। সুতরাং মোহিতলাল যে বলেছেন মধুসূদন ছিলেন ভাষা সম্বন্ধে সর্বদা সতর্ক, 'শব্দচয়ন ও শব্দযোজনা···সর্ববিষয়ে পূর্ণ সজাগ', সে প্রস্তাবের ভিত্তি যথেষ্ট দৃঢ় বলে গ্রাহ্য হতে পারে না, এবং ইদানীংকালের গবেষক যে মাইকেলের শব্দ-বিজ্ঞান ও প্রয়োগচাতুর্য নিয়ে বিশ্ববিমোহন একটা সিদ্ধান্ত চালাতে চান, তারও ভিত্তিগত দুর্বলতা অনস্বীকার্য। যাঁর কাছে লঙ্কার সর্বশ্রেষ্ঠ বীর ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদ 'দেববৈত্যনরত্রাস', আর বাহিনীর অন্তর্গত যে কোনো রাক্ষসসৈন্যও সেই একই, কোথাও বা আরও এক ধাপ উপরে—'দেব-দৈত্য-নর-চির-ত্রাস', তাঁর শব্দচয়নে, শব্দযোজনায় বা প্রয়োগচাতুর্যে ঠিক মুগ্ধ হওয়া যায় না।

মোহিতলাল অবশ্য মুগ্ধনেত্রে লক্ষ্য করেছেন "এই কাহিনীতে কবি মেঘনাদকে 'দেববৈত্যনরত্রাস' এক অতিমানুষ বীর-রূপে চিত্রিত করিয়াছেন" এবং "লক্ষ্মণ এ কাব্যে প্রায় সর্বত্র 'সৌমিত্রী কেশরী' ও 'দেবাকৃতি রথী' প্রভৃতি নিত্যবিশেষণে কবি-কর্তৃক ভূষিত হইয়াছে"; কিন্তু এই কাব্যে যে মেঘনাদ ছাড়া আরও 'দেববৈত্যনরত্রাস' আছে, এবং লক্ষ্মণ ছাড়াও 'কেশরী' বা 'দেবাকৃতি রথী' আরও আছে, তা বোধহয় লক্ষ্য করেননি;—করলে অমন 'অতিমানুষ

ীর'-এর পক্ষপাত দেখে বোধহয় আর কবির রচনার প্রতি তাঁর এতখানি শ্রদ্ধা থাকতো না, এবং যুগপৎ নায়ক ও প্রতিনায়ক উভয় চরিত্রের মহিমার উপর আলোকপাতের উদ্দেশ্যে এমন নিপুণভাবে তিনি বলতেন না যে, ইন্দ্রজিতের হত্যাকারী হইবার জন্যও লক্ষ্মণের মত 'দেবাকৃতি রথী'কে চাই।" বুঝতে হবে, 'দেবাকৃতি' ও 'দেবাকৃতি রথী' প্রয়োগটি যে বিশেষভাবে লক্ষ্মণেরই চরিত্রমাহাত্ম্যজ্ঞাপক রূপে কবিকর্তৃক নির্বাচিত ও ব্যবহৃত হয়েছে, এতেই সমালোচক মুগ্ধ। কিন্তু এই 'দেবাকৃতি' শব্দটিকে মেঘনাদবধ কাব্যে আমরা অন্তত ন'বার দেখতে পাই (৬ষ্ঠ সর্গে ৫বার, ৭ম-এ সর্গে ১ বার ও ৮ম-এ ১ বার) এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার ব্যবহার লক্ষ্মণের পরিচয়ে নয়। এতে প্রথমেই প্রমাণিত হয়, মোহিতলাল যে দরদী ভঙ্গিতে 'দেবাকৃতি' পদটিকে লক্ষ্মণের নিত্যবিশেষণ অর্থাৎ একান্তই লক্ষ্মণের জন্য নির্বাচিত এক বিশেষ শব্দ-সম্পদ বলে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন, তার কোন যুক্তিগত ভিত্তি গ্রাহ্য নয়। দ্বিতীয় কথা, কবির নিজস্ব দাবী যে, thoughts and images bring out words with themselves—ভাবমূর্তি অনুযায়ী শব্দের রূপায়ণ, এরও ভিত্তি শিথিল হ'তে বাধ্য। যেখানে লক্ষ্মণও "দেবাকৃতি, দেববীর্য" (৬।৩৯৯), আর রামপক্ষীয় নগণ্য বানরসৈন্যও "দেবাকৃতি, দেববীর্য,"—

> বিপক্ষের পক্ষে শূর ; আর যোধ যত,
> দেবাকৃতি, দেববীর্য ;—
>
> (রামচন্দ্রের উক্তি, ৬ষ্ঠ সর্গ, ১৫১-৫২)

সেখানে কবির ঐ দাবী মানতে হলে, এটাও মানতে হয় যে, লক্ষ্মণ-চরিত্রকে অবলম্বন করে কবির মনে যে image বা ভাবমূর্তি জাগে, যে-কোনো বানরসৈন্য সেই একই image জাগাতে সক্ষম। তা ছাড়া, এই কাব্যে আলোচ্য প্রয়োগটি প্রথমেই দেখা দেয় ঐ বানরসৈন্যের বিশেষণরূপে এইমাত্র উদ্ধৃত ষষ্ঠ সর্গের রামচন্দ্রের উক্তিতে ; সুতরাং কবিকে ভাষা সম্বন্ধে সর্বদা সতর্ক বা শব্দের চয়ন-বয়ন-প্রয়োগের ক্ষেত্রে ভাবের সহিত সঙ্গতি-সামঞ্জস্য রক্ষায় পূর্ণমাত্রায় সজাগ, এই যদি বলতে হয়, যদি মানতে হয়, তিনি তাঁর নিজের dictum—"You must weigh every thought, every image, every expression, every line" ঠিকই মেনে চলেছেন, তবে "দেবাকৃতি, দেববীর্য"

প্রয়োগটি যে অবশ্যই কবি-কল্পলোক-ধৃত বানরসৈন্যের চরিত্রমাহাত্ম্যকে অবলম্বন করেই লেখনীমুখে দেখা দিয়েছে, এইটাই মেনে নিতে হয়। এই প্রথম প্রয়োগটিকে যে আমরা রামচন্দ্রের উক্তি বলে, কবির একান্ত নিজস্ব নয়, রামের বানর-তোষণ-মূলক বলে পৃথক দৃষ্টিতে দেখবো, তারও উপায় নেই। অন্যত্র কবিরই নিজস্ব সশ্রদ্ধ পরিচিতিরূপে এই একই পদের ব্যবহার দেখা যায় বানরের ক্ষেত্রে ;—

আইলা
নল, নীল দেবাকৃতি ; (৭ম, ২২১)

এ ছাড়াও, অষ্টম সর্গে আমরা পাই,—

দেখিলা নৃমণি, জটায়ু গরুড়পুত্রে, দেবাকৃতি রথী
(৮ম, ৬৩৭)

দেখিলা সুমতি, বহু স্বর্ণ অট্টালিকা ; দেবাকৃতি বহু রথী,
(৮ম, ৬৬৫)

কহ, কেমনে আইলা সশরীরে প্রেতদেশে, দেবাকৃতি রথি ?
(৮ম, ৬৯৯)

অতএব, একই 'দৈবাকৃতি' যদি রাম, লক্ষ্মণ, প্রেতপুরী নিবাসী বহু প্রেতাত্মা, পক্ষিরাজ জটায়ু, বানর-সর্দার নল-নীল, এবং যে-কোনো বানর সেনারও বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়, তবে "এই সুদীর্ঘ কাব্য-দুকূলের বাণীবয়ন-চাতুর্যে" মুগ্ধ হওয়া যায় না, "ইহার যে কোন স্থান হইতে বুনানির নমুনা ধরিয়া" অকুণ্ঠ প্রশংসার দাবী জানানো দুঃসাহস মাত্র। প্রসঙ্গত মনে পড়ে রাম-পক্ষীয় বানর-সেনার প্রতি কবির প্রচণ্ড ঘৃণা-ব্যঞ্জক কতিপয় মন্তব্য ;—

(ক) Only the Monkeys spoil the joke—but I shall look to them.

(খ) He (রাবণ)...would have kicked the monkey-army into the sea. By the bye, if the father of our poetry had given Ram human companions I could have made a regular Iliad of the death of Meghnad.

(গ) I despise Ram and his rabble.

এই যাঁর বানর-সেনা সম্পর্কে আসল মনোভাব, তাঁরই হাতে ঐ বানর সম্পর্কেই —'দেবাকৃতি' বা 'দেবাকৃতি দেববীর্য'-জাতীয় শব্দাদি ব্যবহৃত হতে দেখে, বাধ্য হয়ে বলতে হয়—ঐ thoughts and images এবং words-এর মধ্যে কোনো রকম সঙ্গতি-রক্ষার দায়িত্বই কবির ছিল না, অথবা এই ব্যাপারে যে যথেষ্ট শৈথিল্য রয়ে গেল কবির সেদিকে খেয়াল ছিল না।

'সৌমিত্রি কেশরী' প্রয়োগটিও বেছে নেওয়া হয়ে থাকে বিশেষভাবে লক্ষ্মণ-চরিত্রের ভাবমণ্ডল-জ্ঞাপক হিসাবে; কিন্তু এই কাব্যে যে কেশরী-চরিত্রের অভাব নেই, এমন কি কেশরী নামক বানরও 'কেশরী' (৬ষ্ঠ, ১৫০), সেটি লক্ষ্য করার পরেও কি আর ঐ বিশেষণ স্বীকার্য?

এই একই পটভূমিকায়, অর্থাৎ বানরদলের প্রতি কবির আসল মনোভাব ও তাদের পরিচয়ে ব্যবহৃত শব্দাবলী বা প্রকাশভঙ্গি এই দুইয়ের অসঙ্গতির আলোচনায়, দেখানো যেতে পারে কবির আরও অনেক খেয়ালী-পনার বিচিত্র দৃষ্টান্ত। সুগ্রীব, অঙ্গদ, হনুমান, নল, নীল বা আর কোনো বিশেষ বানরবীরের পৃথক পরিচয় ছাড়াও সাধারণ বানরগণই এই কাব্যে—

রুদ্র-কুল সমতেজঃ, ভৈরব মূরতি (৩য়, ২৭৪)
ইন্দ্র-তুল্য বলী-বৃন্দ (৪র্থ, ৪৮৪)
দেবাকৃতি, দেববীর্য (৬ষ্ঠ, ১৫২)
ত্রিভুবনজয়ী (৭ম, ২৩০)
দেবকুলরথী— (৯ম, ৬৯)

ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত। 'images' ও 'words'-এর সঙ্গতি লক্ষণীয়! পৃথক পৃথক ব্যক্তিগত পরিচয়ে, বানরাধিপতি সুগ্রীবের চিত্র,—

(ক) উত্তর দুয়ারে রাজা সুগ্রীব আপনি
বীরসিংহ। (১ম, ২৩৩-৩৪)

(খ) সুগ্রীব সুমতি
জাগেন আপনি তথা বীর-দল সাথে,
বিন্ধ্য-শৃঙ্গ-বৃন্দ যথা,—অটল সংগ্রামে!
(৩য়, ৫৫৩-৫৫)

(গ) জাগিছে সুগ্রীব মিত্র বীতিহোত্র-রূপী—
বীর-বর-দলে তথা। (৫ম, ১৯২-৯৩)

(ঘ) সুগ্রীব বাহুবলেন্দ্র, (৬ষ্ঠ, ১৪৬)

(ঙ) আইলা কিষ্কিন্ধ্যানাথ গজপতিগতি, (৭ম, ২১৯)

(চ) ভীমরবে উত্তরিলা বলী
সুগ্রীব,—"অধর্মাচারী কে আছে জগতে
তোর সম রক্ষোরাজ ? পরদারলোভে
সবংশে মজিলি, দুষ্ট ! রক্ষঃকুলকালি
তুই, রক্ষঃ ! মৃত্যু তোর আজি মোর হাতে। (৭ম, ৬৮৫-৮৯)

এর মধ্যে তৃতীয় (গ) উদ্ধৃতির অন্তর্ভুক্ত 'বীতিহোত্র-রূপী' পদটি মধুসূদনের হাতে পাওয়া অগ্নি-বাচক পদগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলেই মনে হয়। 'বিভাবসু', 'বৈশ্বানর', 'সর্বভুক', 'ইরম্মদ','হুতাশন','সর্বশুচি' প্রভৃতি কতোই না অগ্নি-বাচক পদ কবির হাতে রচিত হয়েছে ; কিন্তু 'বীতিহোত্র'-এর তুলনা নেই। এখন thoughts and imags অনুযায়ী যদি words হয়, তবে বলতে হবে, অন্তত পঞ্চম সর্গের ঐ আলোচ্যক্ষেত্রে বানর-বীর সুগ্রীব যে শ্রদ্ধার পরিমণ্ডলে মধুসূদনের কল্পলোকে স্থান পেয়েছেন, তার আর তুলনা নেই। কিন্তু আমরা জানি, এই তুলনা-বিরল পদটির উৎপত্তিমূলে সক্রিয় অনুপ্রাস, শব্দধ্বনি বা ঝঙ্কারের তাগিদ ছাড়া আর কিছু নয়।

অঙ্গদের চিত্র,—

(ক) দক্ষিণ দুয়ারে
অঙ্গদ, করভসম নব বলে বলী ;
কিম্বা বিষধর, যবে বিচিত্র কঞ্চুক-
ভূষিত, হিমান্তে অহি ভ্রমে উর্ধ্বফণা—
ত্রিশূল সদৃশ জিহ্বা লুলি অবলেপে ! (১ম, ২২৮-৩২)

(খ) দক্ষিণ দুয়ারে ফিরে কুমার অঙ্গদ,
ক্ষুধাতুর হরি যথা আহার-সন্ধানে,
কিম্বা নন্দী শূল-পাণি কৈলাস-শিখরে। (৩য়, ৫৫৮-৬০)

(গ) বিশারদ রণে
অঙ্গদ, সুযুবরাজ ; (৬ষ্ঠ, ১৪৬-৪৭)

(ঘ) রুষিলা
যুবরাজ, রোষে যথা সিংহশিশু হেরি
মৃগদলে ! (৭ম, ৫৩৪-৩৬)

হনূমানের চিত্র,—

(ক) পবন-নন্দন হনূ ভীষণ দর্শন—
রোষে অগ্রসরি শূর গরজি কহিলা,— (৩য়, ১৭৬-৭৮)

(খ) প্রবল পবন-বলে বলীন্দ্র পাবনি
হনূ, অগ্রসরি শূর, দেখিলা সভয়ে
* * * ভাবে মনে মনে
* * * *
ধন্য বীর মেঘনাদ, যে মেঘের পাশে
প্রেম-পাশে বাঁধা সদা হেন সৌদামিনী !
এতেক ভাবিয়া মনে অঞ্জনা-নন্দন
(প্রভঞ্জন-স্বনে যথা) কহিলা গম্ভীরে ;
* * * তোমরা অবলা,
কহ, কি লাগিয়া হেথা আইলা অকালে ?
নির্ভয় হৃদয়ে কহ ; হনূমান আমি
রঘুদাস ; দয়া-সিন্ধু রঘু-কুল-নিধি ।
তব সাথে কি বিবাদ তাঁর, সুলোচনে ?
কি প্রসাদ মাগ তুমি, কহ ত্বরা করি ; (৩য়, ২০২-৩২)

হনূমান-চরিত্রের বীরত্ব, সংযম, বিনয় ও শিষ্টাচার সবই এখানে সুপরিস্ফুট ।

(গ) আইলা অঞ্জনাপুত্র,—প্রভঞ্জনসম
ভীমপরাক্রম হনূ, গর্জি ভীম নাদে।
যথা প্রভঞ্জন-বলে উড়ে তুলারাশি
চৌদিকে, রাক্ষসবৃন্দ পালাইলা রড়ে
হেরি যমাকৃতি বীরে। * *
অধীর হইলা হনূ, ভূধর যেমতি
ভূকম্পনে। পিতৃপদ স্মরিলা বিপদে
বীরেন্দ্র, * * (৭ম, ৬৬২-৭০)

চিত্রগুলি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে অবজ্ঞা-উপেক্ষার পরিবর্তে কবির রীতিমত শ্রদ্ধা ও মমতারই পরিচয় ফুটেছে এই সব বানর-সামন্তের আলেখ্য-রচনায় ।

রাম-শিবিরে ঠিক যার যথা স্থান, কবি তার পর্যাপ্ত মর্যাদা বজায় রেখেছেন। সুগ্রীব, এখানে 'রাজা সুগ্রীব','বীরসিংহ','বীতিহোত্ররূপী' মহামহিম বীর নায়ক, অধর্মের বিনাশে বদ্ধপরিকর। অঙ্গদ যদি সেই বানর মাত্রই হবে যাদের কবি মনে করেন 'the Monkeys who spoil the joke,' যাদের মতো বুনো জানোয়ারের সাহচর্য থাকায় রামও তাঁর ঘৃণার পাত্র,—'I hate Ram and his rabble,'—তবে কেন তার প্রসঙ্গমাত্রেই 'কুমার অঙ্গদ', 'সুযুবরাজ', প্রভৃতি দরদী ভঙ্গিতে ছাড়া তিনি অঙ্গদ-প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন না, কেনই বা নিত্যতারুণ্যভরা বীরত্বের প্রতীক 'করভ', 'নির্মোক-মুক্ত ঊর্ধ্ব-ফণা ফণী', অথবা 'সিংহশিশু' এমন কি, 'কৈলাস শিখরস্থ শূলপাণি নন্দী'র উপমায় অঙ্গদের আলেখ্যরচনায় কবির আবেগ এমন উদ্বেল হয়ে ওঠে? হনুমান সম্বন্ধেও এই একই কথা। বলা বাহুল্য, কবি-প্রদত্ত এই সুগ্রীব-অঙ্গদ-হনুমান-চিত্র সাধারণ বাঙালী পাঠকসমাজের খুবই প্রিয় বস্তু। আমাদের বক্তব্য হলো, কবি-কর্তৃক ঘোষিত তাঁর নিজস্ব রুচি বা ভাবাদর্শের সঙ্গে তাঁরই অঙ্কিত ভাষা-চিত্রের সংগতি রক্ষিত হয়নি; সুতরাং তিনি যে 'thoughts and images' অনুযায়ী 'words' রচনায় অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, অথবা শব্দ-রচনায় বা বাণীবয়নে ভাব-প্রতিমারই সার্থক রূপদানে সর্বদা সতর্ক ছিলেন, এ কথা স্বীকার্য নয়।

[২]

সমালোচিত—ডাঃ শিশিরকুমার দাস, প্রসঙ্গত, শ্রীজনার্দন চক্রবর্তী

এ অবস্থায় যাঁরা কেবল এই শব্দপ্রয়োগ বা অলংকার-প্রয়োগ থেকেই মাইকেলের কবি-মানসের নির্ভুল সংকেত উদ্ধার করতে চান (যেমন, ডাঃ শিশির-কুমার দাস,—গ্রন্থের নাম 'মধুসূদনের কবিমানস', বা ডাঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, গ্রন্থের নাম 'মধুসূদনের কাব্যালংকার ও কবিমানস') তাঁরা যে কতো ভ্রান্ত, তা সহজেই অনুমেয়। ডাঃ ভট্টাচার্যের সিদ্ধান্ত পৃথক আসরে সমালোচ্য। শিশির-বাবু তাঁর "শব্দ ও শ্রুতি" শিরোনামযুক্ত অধ্যায়ে এক যায়গায় (পৃঃ ১৯), মাইকেলের শব্দ-ব্যবহারে খেয়াল-'খুশি'-র হাত যাদের নজরে পড়বে, তাদের "মূঢ়তা"র ভয় দেখিয়েছেন। এদিকে নিজেই বলছেন, "একথা আদৌ বক্তব্য নয় যে মধুসূদনের প্রতিটি শব্দব্যবহারকেই সমর্থন করতে হবে" (পৃঃ ঐ)।

এখন সেই সমর্থনের অযোগ্য শব্দের সংখ্যার উপর নির্ভর করছে ঐ "খুশি"-মাফিক শব্দ-ব্যবহারের অভিযোগের ভিত্তি। সুতরাং নির্বাচনের ও বিচারের অবসর দৃষ্টিভঙ্গিভেদে কম-বেশি হওয়ারই কথা। গ্রন্থকার স্বীকার করছেন "শব্দের ধ্বনিগত ঐশ্বর্য তাঁকে (কবিকে) মুগ্ধ করেছিল বেশি—তাই সর্বত্র তিনি অর্থ প্রয়োগে সচেতন হতে পারেন নি" (পৃঃ ৮০)। মন্তব্য করছেন, বাংলা ও সংস্কৃত শব্দের মধ্যে যেখানেই কবি "সাম্য রাখতে পারেন নি সেখানেই কাব্যের ত্রুটি ঘটেছে" (পৃঃ ৮২)। আর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, "মধুসূদনের কাব্যবিচারেরও প্রধান নির্ভর শব্দ এবং শ্রুতি" (পৃঃ ৮৩)। গ্রন্থকারের এই সিদ্ধান্তে কবি মধুসূদন ও তাঁর কাব্যের স্থান ও মান কোথায় গিয়ে দাঁড়ালো তা বোধহয় লেখক নিজেও ভাল করে ভেবে দেখেননি। বর্তমান সমীক্ষায় মধুসূদনের যতোই ত্রুটি-শৈথিল্যের আলোচনা থাকুক, ঠিক ঐ সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত হয়ে কবি ও কাব্যকে ঐ পর্যায়ে নামিয়ে আনা কখনই ঈপ্সিত নয়। তবে "ধ্বনিগত ঐশ্বর্যে মুগ্ধ" হয়ে "অর্থপ্রয়োগে সচেতন হতে না পারার" ত্রুটি যে উপেক্ষিত হওয়া উচিত নয়, এটা অবশ্যই বক্তব্য। আর সেটা ঐ "রঞ্জিত রঞ্জন রাগে"-র মতো ত্রুটি নয়—যেখানে গ্রন্থকার সমালোচককে "অজ্ঞ" বলে জাহির করার সহজ সুযোগ খুঁজে পেয়েছেন (পৃঃ ৮০)। শব্দ-ব্যবহারে মধুসূদনের প্রধান ত্রুটি অসঙ্গতির, শব্দ ও উদ্দিষ্ট বস্তু ব্যক্তি বা চিত্রের মধ্যে ভাবগত সামঞ্জস্য বা সৌষ্ঠবের অভাব ; অর্থাৎ এই বিষয়ে কবির অসতর্কতা ও বেপরোয়া মনোভাব।

শিশিরবাবু তাঁর গ্রন্থের ঐ একই অধ্যায়ে মধুসূদনের শব্দসংগীত সৃষ্টির মূলে 'শ্রুতি'র প্রশংসনীয় লীলার দৃষ্টান্তস্বরূপ বিসর্গ-ব্যবহারের যে ছ'টি নমুনা তুলে ধরেছেন, তার মধ্যে ১ম ও ৩য় উদ্ধৃতি,—'কী (মাইকেলের রচনায় কি) সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে প্রচেতঃ' ও 'যাদঃপতিরোধঃ যথা', এ দুটি যথাক্রমে মোহিতলাল ও রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক পূর্বেই ঐ একই উদ্দেশ্যে নির্বাচিত ও ব্যাখ্যাত হয়েছিলো। দ্বিতীয়টি যে ডাঃ সুকুমার সেনেরও সমর্থিত, তা আগেই দেখানো হয়েছে। রবীন্দ্রকৃত ব্যাখ্যা প্রায় হুবহু ব্যবহার করেও (পৃঃ ৭২) রবীন্দ্রনাথের নাম অথবা কোনো উদ্ধৃতি-চিহ্ন দেখাতে লেখক হয়তো ভুলে গেছেন ; কিন্তু আমাদের ধারণা, রবীন্দ্র-দত্ত ব্যাখ্যা সত্ত্বেও ঐ ছত্রটি আবৃত্তি করে শব্দসংগীতের মাধুর্য প্রমাণ করা সহজসাধ্য নয়। তা ছাড়া, লেখকের ৫ম ও ৬ষ্ঠ দৃষ্টান্ত :—'শুন মনঃ দিয়া' ও 'নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ পরঃ

পরঃ সদা' যে কোন্ অপার্থিব পন্থায় আবৃত্তির ফলে শব্দসংগীতের মাধুর্যে পাঠক ও শ্রোতার মন ভরাতে পারে তা ভেবে পাওয়া যায় না। এই দুটি ক্ষেত্রেই আবৃত্তি নিদারুণ আড়ষ্ট হয়ে যায় বলেই মাইকেল গ্রন্থাবলীর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণের যুগ্মসম্পাদক সজনীকান্ত ও ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁদের টীকায় বলে গেছেন, 'মনঃ' স্থলে 'মন', ও 'পরঃ পরঃ' স্থলে 'পর পর' পড়তে হবে। শিশিরবাবু যে লিখেছেন, "শুন' এবং 'মন'র ওজন একই, কিন্তু বিসর্গের আঘাতে মনের পাত্র উপচে উঠছে" ; এবং ৬ষ্ঠ দৃষ্টান্তের বেলা "পর পর তিনটি আঘাতে উত্তেজিত বক্তার কণ্ঠস্বর যেন ধীরে ধীরে চড়া হচ্ছে বুঝতে পারি"—এতে তাঁর মাইকেল ভক্তির আতিশয্যেরই পরিচয় ফুটেছে। সম্ভবত তিনি যদি খবর পেতেন, আলোচ্য অংশটি মূল রামায়ণেরই 'যঃ পরঃ পর এব সঃ'—প্রভৃতি সম্বলিত অংশবিশেষের আক্ষরিক অনুবাদমাত্র, তা হ'লে তাঁর এই আতিশয্যে ভাঁটা পড়তো। এ বিষয়ে এ গ্রন্থের "কৃত্তিবাসী ঋণের বহর" নামক আলোচনাটির অষ্টম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

'নারী'-শিরোনামযুক্ত অধ্যায়ে লেখক একস্থানে (পৃঃ ৫৩-৫৭) মাইকেলের 'বীরাঙ্গনা' শব্দটির নির্বাচন ও ব্যবহার যে প্রশংসনীয় বলেছেন, অথবা আর একস্থানে (পৃঃ ৬০, ফুটনোট) বীরাঙ্গনা-ব্রজাঙ্গনার অন্তর্ভুক্ত 'অঙ্গনা' শব্দটির অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জনার্দন চক্রবর্তী-কৃত মৌলিক ব্যাখ্যা সংযোজিত করে তার বিশেষত্বের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, এবং মধুসূদনের ঐ শব্দ-ব্যবহারের প্রশংসাকে যে আরও প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন, এতে আপত্তির কিছুই নেই। কিন্তু ঐ 'অঙ্গনা' শব্দটির মধ্যেই যে রেনেসাঁসের কবি মধুসূদনের নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির কোনো বিশেষ সংকেত অনুসন্ধেয়, এমন ধারণা গঠনের সঙ্গত কারণ নেই। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চক্রবর্তীর প্রদর্শিত পন্থায় সম্ভবত কিছু বেশি উৎসাহিত হয়ে শিশিরবাবু তাঁর পুস্তিকার ৫৪ পৃষ্ঠায় 'অঙ্গনা'র পাশাপাশি স্ত্রী-বাচক অপর কয়েকটি শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ দেখিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন, 'নারী', 'কামিনী', 'ললনা' বা 'সতী' সবই 'অঙ্গনা'-র চেয়ে নিকৃষ্ট, তাই "মধুসূদনের মত শব্দ-সচেতন কবি নিশ্চয়ই কোন একটি অভিপ্রায়ে" ঐ 'অঙ্গনা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। অভিপ্রায় আর কিছু নয়, রেনেসাঁস-জাগ্রত কবি-মানস যেন চেয়েছিলো নারীর 'শোভনতা ও সৌন্দর্যের', আর বুঝি, 'স্বাতন্ত্র্যের'ও 'সুরুচি'-পূর্ণ ব্যঞ্জনাটি শব্দের মধ্যে তুলে ধরতে।

এখানে সর্বপ্রথম বক্তব্য, মধুসূদনের কবি-মানস দেখাবার অত্যুৎসাহে শিশিরবাবু যেভাবে অভিধান মিলিয়ে ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ধরে একে একে অন্যান্য স্ত্রী-বাচক শব্দকে কোণঠাসা করে 'অঙ্গনা'-র শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করেছেন, প্রকৃতপক্ষে কবি বা লেখকদের ব্যবহারে ঐ শব্দগুলো ঠিক অমনভাবে অর্থ-কুণ্ঠিত হয়ে দেখা দেয় না; যাকে নিয়ে গ্রন্থকারের এই গবেষণা, সেই মাইকেলের হাতেও না। তারা যে ঐ ঐ ব্যুৎপত্তিগত হীনতার দ্যোতনা সত্ত্বেও কবির শ্রদ্ধেয় নারীচরিত্রের উদ্দেশে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গেই ব্যবহৃত হয়েছে, এবং ঐ নারী-কামিনী-ললনা-সতী ছাড়াও বামা-রামা-বালা-অবলা-রমণী প্রভৃতি আরও কতোই না নারী-বাচক শব্দ যে পর্যাপ্ত সমাদরেই বেরিয়ে এসেছে মাইকেলের লেখনীমুখে, তাঁর যে-কোনো কাব্যগ্রন্থের পাতায় পাতায় ছড়ানো আছে তার নমুনা। পরিসংখ্যানে দেখা যাবে অন্যান্য স্ত্রী-বাচক শব্দের তুলনায় 'অঙ্গনা'-র ব্যবহার নগণ্যই। তা ছাড়া, শিশিরবাবু তাঁর নির্বাচিত শব্দ-চতুষ্টয়ের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ আলোচনায় পাঠকের কৌতূহল বাড়িয়ে প্রতিপাদ্য বিষয়টির ভিত্তি যেন খুবই পাকা করে নিতে চেয়েছেন, কিন্তু তাতে যে হাঙ্গামাও জড়াতে পারে, তা হয়তো ভাবেননি। তিনি প্রথমেই ধরেছেন 'নারী' শব্দ।

শ্রীযুক্ত জনার্দন চক্রবর্তীর ব্যাখ্যা—'নারী শব্দটি নরনির্ভর',—এই থেকেই ইঙ্গিত নিয়ে বোধহয় গ্রন্থকার 'নারী'র পুরোপুরি প্রকৃতিপ্রত্যয় অভিধান থেকে তুলে দিয়েছেন "নর+অ (ষ্ণ) + ধর্মার্থে ঈপ্‌। মানে মনুষ্য জাতির যে অংশ সন্তান প্রসব করে।" কিন্তু জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধানে 'নারী' শব্দের ঐ ব্যুৎপত্তি-ব্যাখ্যার পরিবর্তে উদ্ধৃত করা হয়েছে বিজয়চন্দ্র মজুমদারের মন্তব্য : "বেদের ভাষার মধ্যে যাহা প্রাচীনতম সেই ভাষায় স্ত্রীজাতির সাধারণ নাম ছিল 'নারী'; এই নারী শব্দ 'নর' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গের রূপ নহে। নর শব্দটি সুপ্রাচীন বেদ-সংহিতায় প্রচলিত নাই। যে যুগে নর শব্দ ছিল না, কিন্তু নৃ শব্দ ছিল, সেই যুগেই স্ত্রীজাতি বুঝাইবার জন্য নারী শব্দের যথেষ্ট প্রচলন ছিল এবং নারী শব্দের অর্থ ছিল নেত্রী * * * পারিবারিক বিষয়ের নেত্রী; তিনি ভোগবিলাসের রমণী বা কামিনী ছিলেন না।"—ভারতী, আশ্বিন, ১৩২০।

এ যদি সত্য হয়, তবে শব্দটির 'নর-নির্ভরতা' রইলো কৈ? আর, 'নর-নির্ভরতা' বা ঐ সন্তান-প্রসবের বৈশিষ্ট্য কি কোনো হীনতাসূচক? শিশিরবাবু উত্থাপিত "সুরুচি"র দাবীতেই বা 'নারী'-র পিছিয়ে থাকার যুক্তি কোথায়?

'নর-নির্ভরতা'র কথা তুলে যে 'অঙ্গনা'-র স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা, 'বীরাঙ্গনা'-'ব্রজাঙ্গনা'র নারীচরিত্রগুলির ক্ষেত্রেই তো সেটা আরও বেশি অপ্রযোজ্য। 'বীরাঙ্গনা'র অঙ্গনাদের কেউ বা প্রণয়িনীর ভূমিকায় প্রণয়ীকে, আর কেউ বা পত্নীর ভূমিকায় পতিকে পত্র দিচ্ছে। নর-নির্ভরতা বাদ দিয়ে প্রণয়িনী, বা পত্নীর অস্তিত্ব কোথায়? শিশিরবাবু যে লিখেছেন, মধুসূদন "এই কাব্যের উৎসর্গপত্র ও আখ্যাপত্রেও নারীর স্বাতন্ত্র্য-চেতনার কথা বলেছেন" (পৃঃ ৫৪), এটা তথ্যানুগ নয়। উৎসর্গপত্রে তো কোনো উল্লেখের চেষ্টাই নেই; প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রে সাহিত্যদর্পণ থেকে তোলা একটা কথা ছিল—"লেখ্যপ্রস্থাপনৈঃ নার্য্যা ভাবাভিব্যক্তিরিষ্যতে," এরই মধ্যে কি স্বাতন্ত্র্য-চেতনার কথা খুঁজে বার করতে হবে? তাও তৃতীয় সংস্করণ থেকে ঐ উদ্ধৃতি তুলে দেওয়া হয়। সূক্ষ্মবিশ্লেষণে 'অঙ্গনা'র মধ্যেও যে "প্রশংসার্থে ন", সে প্রশংসাও কি নরের অর্থাৎ পুরুষের নয়?

'ললনা' শব্দটির ব্যুৎপত্তিতে যে লল্ ধাতু আছে, তার মানে 'কটাক্ষাদি ভঙ্গী প্রদর্শন করা' দেখেই লেখক শব্দটিকে 'কুরুচি'র আওতায় ফেলে দিয়েছেন, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি,

"না জাগিলে যত ভারত-ললনা
এ ভারত বুঝি জাগে না, জাগে না"—

হেমচন্দ্রের 'ভারতসংগীতে'র এই বিখ্যাত ছত্রে 'ললনা' শব্দটির 'ব্যুৎপত্তিগত কুরুচি' কি সত্যই আমাদের রুচিবোধে কোথাও আঘাত করে? মনে হয়, 'ভারত-ললনা'র 'ললনা' স্থলে আর কোন প্রতিশব্দই এত সুন্দর শোভন হতো না।

স্বয়ং মধুসূদনই যে মেঘনাদবধ কাব্যে তাঁর বাছাই করা বীরাঙ্গনা প্রমীলার উদ্দেশে মমতাভরে ব্যবহার করেছেন 'ললনা' শব্দটি?

"হাসি, কহিলা ললনা;
ও পদ-প্রসাদে, নাথ, ভব-বিজয়িনী
দাসী;" (৩।১২৭)

করেছেন, প্রমীলার দলনেত্রীর উদ্দেশেও রামচন্দ্রের মুখে,—

"কহ তাঁরে, শতমুখে বাখানি, ললনে,
তাঁর পতিভক্তি আমি, (৩।৩৪১)

'কামিনী' শব্দটির অর্থ 'অতিশয় কামযুক্তা নারী' হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু মাইকেল মেঘনাদবধের তৃতীয় সর্গে রামচন্দ্রের নিকট দূতী নৃ-মুণ্ডমালিনীর প্রথম সাড়ম্বর নৈষ্ঠিক ভাষণে প্রমীলা-পরিচয়ে পরম তৃপ্তিভরে এই শব্দটির ব্যবহার করেছেন,

দৈত্যবালা প্রমীলা সুন্দরী,
বীরেন্দ্র-কেশরী ইন্দ্রজিতের কামিনী, (৩।৩১০)

'সতী'র "পুংলিঙ্গ সৎ শব্দের অর্থ পত্নীব্রত পুরুষ" নয় যখন, তখন এ শব্দটিও 'অঙ্গনা'র পাশে নিকৃষ্ট,—এমনতরো যুক্তি বড়োই অদ্ভুত! মধুসূদনের হাতে এই 'সতী' শব্দটি যে অসংখ্য স্থলে নারীর প্রতি শ্রদ্ধা ও সুরুচির আবহাওয়াতেই ব্যবহৃত হয়েছে,—এটা গ্রন্থকার লক্ষ্য করলে ভালো করতেন। যেখানেই কবিহৃদয়ের দরদ, সেখানেই তাঁর কলমে এসেছে 'সতী'। তিলোত্তমা স্বর্বেশ্যা হতে পারে, কিন্তু কল্যাণী সত্তায় তার আবির্ভাব; তাই গ্রন্থ থেকে বিদায় দেওয়ার আগে "হে কল্যাণি, * * এ সুখ্যাতি তব, সতি, ঘুষিবে জগতে চিরদিন"—এইভাবে সতী সম্বোধনে কবি তাঁর তিলোত্তমা-কাহিনী শেষ করে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বিরূপ মন্তব্যের ভাজন হয়েছেন। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয়, ব্যুৎপত্তিগত অর্থ (পতিব্রতা স্ত্রী) ধ'রে তিনি এখানে 'সতী' শব্দ ব্যবহার করেন নি, করেছেন কল্যাণী নারী অর্থে, আর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র যাই বলে থাকুন, এযুগের পাঠক ঐ 'সতী'র কবি-ঈপ্সিত বৃহত্তর ব্যঞ্জনা ঠিকই বুঝবেন।

অতএব, শিশিরবাবুর ব্যুৎপত্তিগত অর্থের ভিত্তিতে 'অঙ্গনা'-র অনুকূলে অভিমত গঠনের প্রয়াস সার্থক বলা যায় না।

তা ছাড়া, কেবল দুটি গ্রন্থের নামকরণ থেকেই কবির ঐ বিশিষ্ট নারীদৃষ্টি এবং ঐ দৃষ্টি ও তদনুযায়ী ব্যবহৃত শব্দের সামঞ্জস্যগত কৃতিত্ব প্রমাণিত হয় কি? নাম হিসাবে 'বীর-নারী', 'বীর-কামিনী', বা 'বীর-রমণী' ইত্যাদির চেয়ে অধিকতর ধ্বনি-সৌষ্ঠব ও শ্রুতি-মহিমাযুক্ত বলেই 'বীরাঙ্গনা-ব্রজাঙ্গনা' নির্বাচিত হয়েছে। নচেৎ যদি শব্দের মধ্যে কবিমানসস্থ নারীর শোভনতা-সৌন্দর্যবোধের সুরুচিপূর্ণ প্রকাশের উদ্দেশ্যেই 'অঙ্গনা'-শব্দের নির্বাচন হয়ে থাকবে, তবে কেন সীতা বা সরমা প্রসঙ্গে মেঘনাদবধ কাব্যের সুদীর্ঘ চতুর্থ সর্গে একটিবারও 'অঙ্গনা' শব্দটি প্রযুক্ত হতে দেখা গেল না? অথচ সতী, রমণী, সাধ্বী, অবলা, নারী, বামা, কামিনী, ললনা, এতগুলি নারী-বাচক শব্দ সেখানে ব্যবহৃত হয়েছে।

'তিলোত্তমা সম্ভব' কাব্যের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া যাক। সেখানকার শ্রেষ্ঠ নারী-চরিত্র ইন্দ্রাণী, ত্রিদিবের দেবী। কবিও পরম শ্রদ্ধাভরে অঙ্কন করেছেন এই চরিত্রটি, এবং নারী-বাচক শব্দও অনেক ব্যবহৃত হয়েছে এঁর উদ্দেশে, কিন্তু 'অঙ্গনা'-র প্রয়োজন একবারও অনুভূত হয়নি,—নারী, কামিনী ও ললনা শব্দেই কবির উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হয়েছে।

নারী—হেরি এ নারীন্দু-পদ অরবিন্দ যুগ, (১।৪৪৯)
কামিনী—চলিলা দেব-কামিনী মরাল-গামিনী (১।৫০৩)
ললনা—যেখানে স্বরাঙাপদ অর্পিলা ললনা (১।৫১০)
ঐ— এ পর্বত-দেশে
স্বাগত, ললনা, তুমি! (১।৫৮৬-৮৭)

অথচ এই কাব্যেই কবির হাতে "অঙ্গনা" শব্দের ব্যবহার হয়েছে, এবং হয়েছে পুরুষের মন ভোলাতে সক্ষম সাধারণ নারীর ক্ষেত্রে,—

'ধন্য রে অঙ্গনাকুল, বলিহারি তোরে!' (১।৪৫৭)

প্রমীলা-প্রসঙ্গে মেঘনাদবধের তৃতীয় সর্গে কবি স্ত্রী-বাচক কতো বিচিত্র শব্দই না ব্যবহার করেছেন; লক্ষ্য করবার বিষয়, সেখানে খোদ প্রমীলার উদ্দেশে, বামা, সতী, বালা, সীমন্তিনী, ইত্যাদি নানা শব্দের মধ্যে 'বামা' শব্দটিই সর্বাধিক সংখ্যায় ব্যবহৃত। 'বামা' নিশ্চয়ই 'অঙ্গনা'-র মতো 'বীর্য-স্বাতন্ত্র্য-সৌন্দর্য-শোভনতার ব্যঞ্জনায় মণ্ডিত নয়! আরও লক্ষ্য ক'রবার বিষয়,—এই তৃতীয় সর্গে 'বীরাঙ্গনা' বা 'অঙ্গনা'-র ব্যবহার প্রায়ই হয়েছে সেখানে, যেখানে 'রঙ্গে', রণরঙ্গে','সঙ্গে','তরঙ্গ' বা 'প্রতিজ্ঞা'-র যুক্তধ্বনিতে তাল মিলিয়ে অনুপ্রাস জমানোয় কবি সুবিধা পেয়েছেন। যেমন,—রণরঙ্গে, বীরাঙ্গনা (৩।৮৮); এ প্রতিজ্ঞা, বীরাঙ্গনা, মম (৩।১৪৬); কি রঙ্গে অঙ্গনা বেশ ধরিলি দুর্মতি (৩।১৮৪); বীরাঙ্গনা-মাঝে রঙ্গে প্রমীলা দানবী (৩.২০৪); চলিলা অঙ্গনা আগ্নেয় তরঙ্গ যথা (৩।৫১২); সঙ্গিনী-দল সঙ্গে বীরাঙ্গনা (৩,৫৭৬)। নচেৎ, যেমন 'বামা'ই সর্বাধিক সংখ্যায় ব্যবহৃত, তেমনি 'অঙ্গনা'-'বীরাঙ্গনা'ও যে, অবলা-বালা-ললনাও সে;—একই হনুমানের মুখে, 'কি রঙ্গে অঙ্গনা-বেশ' আবার 'তোমরা অবলা'; একই রামের মুখে 'বীরাঙ্গনা সখী তাঁর যত', আবার 'তোমরা সকলে কুলবালা' বা 'কহ তাঁরে শতমুখে বাখানি, ললনে, তাঁর পতিভক্তি আমি'। প্রমীলার আত্মপক্ষ পরিচয়ে শোনা যায়, 'অবলা, কুলের

বালা, আমরা সকলে' (৩।২৪২) ; তার দলনেত্রীর উদ্দেশে 'রামা' শব্দটিও লক্ষণীয়, 'কি যাচ্ঞা করি আমি রামের সমীপে বিবরিয়া কবে রামা' (৩।২৪৭)।

স্ত্রী-বাচক শব্দাবলীর এই ধরণের ব্যবহার সম্পর্কে আমাদের কোনো মন্তব্য নেই, মন্তব্য শুধু শব্দ ব্যবহারের বিশেষত্বের মধ্যে কবি-মানস-সন্ধানের প্রয়াসের বিরুদ্ধে।

শিশিরবাবু অপর একটি অধ্যায়ে 'লক্ষ্মণ' শব্দটির পরিবর্তে 'ঊর্মিলা বিলাসী'র ব্যবহার থেকে মাইকেলের কবি-মানসের আর একটি মূল্যবান সংকেত সংগ্রহ করতে চেয়েছেন। বার বার 'ঊর্মিলা বিলাসী' শব্দ ব্যবহার করে মধুসূদন যেন ঊর্মিলাকে উপেক্ষার আড়াল থেকে কাব্যের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, এবং এর মূলে আছে সেই কিশোরী-বধুর বিষাদকরুণ জীবনের প্রতি দরদী কবি-হৃদয়ের গভীর সহানুভূতি। এখানে বক্তব্য, বাল্মীকি-রামায়ণে উপেক্ষিতা ঊর্মিলার প্রসঙ্গ এনে মাইকেল অবশ্যই চিন্তার মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন—বিশেষ করে ৬ষ্ঠ ও ৮ম সর্গে রামচন্দ্রের লক্ষ্মণের প্রতি কাতরতা-বর্ণনাসূত্রে। কিন্তু ঐ যে 'বিলাসী'-শব্দযোগে ঊর্মিলা-স্মরণ, ওটি যত না কবিহৃদয়ের ঊর্মিলা-কাতরতার পরিচায়ক, তত কেবলই শব্দগঠনের নিজস্ব একটি টেক্‌নিক-অনুসরণ। টেক্‌নিকটা হলো পুরুষ বা নারী-চরিত্রের পরিচয়ে তাদের প্রিয়তমা বা প্রিয়তমের নামের সঙ্গে ঐ বিলাসী বা বিলাসিনী অথবা বল্লভ-রঞ্জন-মনোহর-কান্ত ইত্যাদি যুক্ত করে পরিচায়ক পদগুলি গঠন করা। তাই তিলোত্তমা-কাব্যেই পাওয়া যায় 'রাম' ও 'লক্ষ্মণ' শব্দের পরিবর্তে 'সীতাকান্ত' ও 'ঊর্মিলা-বল্লভ'—'মেঘনাদ যথা প্রহারয়ে সীতাকান্ত ঊর্মিলাবল্লভে' (৪।৪৬৩) ; পাওয়া যায় 'রঘু রঞ্জন-রঞ্জিনী' (৪।২৯৮) ; 'বামাব্রজরঞ্জন' ভুজন (৪।৪১০) ; মেঘনাদবধে পাওয়া যায় 'মন্দোদরী-মনোহর' (১।১৭৩), 'বৈদেহীরঞ্জনে' (২।২০০), 'বৈদেহী-মনোরঞ্জন' (২।৫৪০) ইত্যাদি।

প্রকৃতপক্ষে 'ঊর্মিলা-বিলাসী'-র ব্যবহারের মূলে আছে মাইকেলের 'বিলাসী'-শব্দ-বিলাসের মোহ। তাই মেঘনাদবধে তিনটি 'ঊর্মিলা-বিলাসী' ছাড়াও আছে 'বৈদেহী-বিলাসী' (জিজ্ঞাসিলা বিভীষণে বৈদেহী-বিলাসী, ৫।১৬৫) ; 'মৈথিলী-বিলাসী' (যথায় শিবিরে শূর মৈথিলী-বিলাসী, ৬।৭১৫) ; তিলোত্তমায় আছে 'রোহিণী-বিলাসী' (রোহিণী-বিলাসী সুধানিধি, ৩।৩৭৫) ; 'তিমির-বিলাসী' (যম) (২।৪৭৬, ৩।৬২০) ; 'বসন্ত-বিলাসী'

(কন্দর্প), (৩।২৫); 'ভানু-বিলাসিনী' (ছায়াসুন্দরী) (৪।২৮৯); কমল উরে যাহার (কর্ণিকা) 'বিলাসী' (তপন-তাপেতে তাপী) শিলীমুখ, সুখে লভে সুবিরাম (১।৫৩৭-৩৯); সুরাসুর যবে 'অমৃতবিলাসে' মথিলা সাগরজল (৩।৬৪২) ইত্যাদি নানা সূত্রে কবির 'বিলাসী'-বা-'বিলাস'যুক্ত শব্দগঠনের চর্চা। আমরা এটিকে শব্দ-বিলাসের মোহ বলি ঠিক সেই দৃষ্টিতে যে দৃষ্টিতে অনেকেই মধুসূদনের শব্দ-প্রয়োগে সংযম-সুরুচি-শোভনতার জয়গান গাইতে চান। মাইকেল-স্তুতিতে অন্ধ না হলে নিশ্চয়ই ধরা পড়বে সংযমের তুঙ্গমহিমায় সমুন্নত শুচি-শুভ্র লক্ষ্মণ-চরিত্রের পক্ষে 'উর্মিলা-বিলাসী'র মত বিশেষণ পদ এক কথায় রুচিবিরুদ্ধ ও ঘোরতর আপত্তিকর। 'বিলাসী' শব্দটির ব্যবহারগত ব্যঞ্জনায় সংযম-শুচিতা তো থাকতেই পারে না, ব্যুৎপত্তি ধরে টানাটানি করেও [বিলাস —বি (বিশিষ্টরূপে) + লস্ (ক্রীড়া করা ই:) + অ (ভা:)] কোনো লাভ নেই। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস যে 'বিলাসী' শব্দের দ্বিতীয় অর্থ দিয়েছেন 'বল্লভ', সে এই মেঘনাদবধের খাতিরে বাধ্য হয়ে। আসল কথা, শব্দপ্রয়োগে বেপরোয়া মাইকেল 'উর্মিলা'র যুক্তধ্বনি ও 'বিলাসী'র সঙ্গে মিল-করা কোনো অনুপ্রাসের ঝোঁকেই চালিয়ে গেছেন তাঁর শব্দ-লীলা। তাই মেঘনাদবধের মতো এতো বড়ো কাব্যের উদ্বোধনী ছত্রাষ্টকে গুরুগম্ভীর পরিবেশে প্রথম লক্ষ্মণ-প্রসঙ্গে 'উর্মিলা-বিলাসী' শব্দটিতে শব্দ-সজাগ সন্ধানী পাঠক চমকিয়ে উঠলেও কবি পূর্বোক্ত যুক্তধ্বনি ও অনুপ্রাস বজায় করার আনন্দেই বিভোর রইলেন,— 'উর্মিলা-বিলাসী নাশি, ইন্দ্রে নিঃশঙ্কিলা' (১।৮)। ঠিক এইভাবেই

> "যে আজ্ঞা", বলিয়া শূর বাহিরিলা লয়ে
> উর্মিলা-বিলাসী শূরে, সুরপতি-সহ (৩।৪৮৪)

অনুপ্রাসের টানে 'বিলাসী' আর 'শূরে'-র একাকারে অর্থবিপর্যয় উপেক্ষিত হয়েছে।

> মধুর সম্ভাষে তুষি কিষ্কিন্ধ্যা-পতিরে
> চলিলা উত্তর মুখে উর্মিলা-বিলাসী। (৫।২০২)

এখানেও লক্ষ্য করলে পাওয়া যাবে, কবি-মানসের উর্মিলা-কাতরতা নয়, অনুপ্রাস-কাতরতাই রচনামূলে সক্রিয়।

> জিজ্ঞাসিলা বিভীষণে বৈদেহী-বিলাসী (৫।১৬৫)

ঠিক পূর্ববর্তী ছত্রে যাঁকে 'রঘুমণি' বলা হয়েছে, সেই রামচন্দ্রকে 'বৈদেহী-বিলাসী' বলতেই পাঠকের মনে খটকা লাগে। অবশ্যই এটা কবির বৈদেহী-কাতরতার ফল নয়, অনুপ্রাস-জমানোই উদ্দেশ্য,—ঠিক যেমন 'যথায় শিবিরে শূর, মৈথিলী-বিলাসী' (৬৷৭১৫)।

বস্তুত শব্দের চয়ন-বয়ন-প্রয়োগে অথবা বাণী-প্রতিমা-রচনায় মাইকেলের শৈথিল্য, স্বেচ্ছাচার, অসঙ্গতি বা খেয়ালীপনার মাত্রা আদৌ উপেক্ষণীয় নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁর রচনার এই মারাত্মক দোষ দেখা দিয়েছে অনুপ্রাসের খাতিরে, আর কতক স্থলে, শুধুই একটা ধ্বনিঝঙ্কার সৃষ্টির উদ্দেশ্যে।

'শূলীশম্ভুনিভ' বা 'শূলীশম্ভুসম' পদটি মেঘনাদবধ কাব্যে কবি যে আমাদের শুনিয়েছেন অন্তত ছ'বার, সে কি সত্যই ঐ পদ-ধৃত দেবাদিদেব ত্রিশূলধারী মহাদেবের মহিমময় ব্যঞ্জনা-মণ্ডিত image খানি ভাষায় রূপায়িত করার উদ্দেশ্যে? কুম্ভকর্ণের মধ্যে অবশ্যই কবি এমন কোন মহিমা খুঁজে পান নি যার জন্য 'শূলীশম্ভু' বাদ দিয়ে কুম্ভকর্ণের প্রসঙ্গ উত্থাপনে তাঁর প্রসন্নতা দেখা দেয় না! আসলে মহিমা এখানে কোনো image-বা ভাবপ্রতিমাগত নয়, ধ্বনিগত; 'শম্ভু'-র সঙ্গে 'কুম্ভ'-র ধ্বনি-সাম্যই রচনামূলে যুগিয়েছে প্রবল উন্মাদনা, আর ঠিক সেই কারণে, কেবল কুম্ভকর্ণ নয়, 'শুম্ভ' নামক দানবের ভাগ্যেও জুটেছে 'শূলীশম্ভুনিভ' বিশেষণটির মহাদেবোপম মহিমা-গরিমা (৮ম, ৫৮৮)। বাকী পাঁচটি উল্লেখ,—

শূলীশম্ভু সম ভাই কুম্ভকর্ণ মম	(১ম, ৯৭)
শূলি-শম্ভু-সম ভাই কুম্ভকর্ণে মম	(৪র্থ, ৫৩৭)
শূলিশম্ভুনিভ কুম্ভকর্ণ ?	(৬ষ্ঠ, ৫২৪)
শূলিশম্ভুনিভ কুম্ভকর্ণ শূরে	(৭ম, ২৩৭)
শূলিশম্ভুসম ভাই কুম্ভকর্ণ মম	(৯ম, ৩৮)

যে কারণে রামপক্ষীয় বানর-বীরের দল হয়েছে—"ইন্দ্রতুল্য বলীবৃন্দ" (৪র্থ, ৪৮৪), বা সুগ্রীব হয়েছে "বীতিহোত্ররূপী", সেই কারণেই কুম্ভকর্ণ এবং শুম্ভ নামক অসুর হয়েছে "শূলিশম্ভুনিভ।"

[৩] শব্দকবি মাইকেল : শিথিল বাগ্‌বিস্তার : শব্দপ্রয়োগে যথেচ্ছাচার : অসঙ্গতিদুষ্ট প্রয়োগ : যান্ত্রিক অনুপ্রাস।

শব্দকবি মাইকেল কেবলমাত্র শব্দ-ঝঙ্কারের জন্য অনুপ্রাস-যমকের চটকে আবৃত্তিটুকু জমকিয়ে তোলার নেশায় এমন নির্বিচার বলেই বিভীষণ-প্রসঙ্গে বার বার বলেছেন,

"বিভীষণ—বিভীষণ রণে"

কোনো দিকেই তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই শব্দ-ধ্বনি ছাড়া। তাই আমরা যখন ভেবে পাই না, মেঘনাদবধ-এর বিভীষণ-ভূমিকায় (রামায়ণের কথা স্বতন্ত্র) যখন বীরত্বের বিন্দুমাত্র পরিচয় ফোটে নি, তখন তাকে কেন্দ্র করে কবি কল্পলোকে রণ-বিভীষণতার ভাব-মূর্তি (image) কী করে গড়ে ওঠে,—কবি তখন শুধুই বিভোর হতে চান, 'বিভীষণ—বিভীষণ রণে' এই আবৃত্তির শব্দাড়ম্বরে। বাল্মীকি-রামায়ণের "বিভীষণেনারিবিভীষণেন" (যুদ্ধ, ৮৯।৩৫) শব্দগুচ্ছটি হয়ত সুনিপুণ সংগ্রাহক মধুসূদনকে উৎসাহিত করে থাকবে, কিন্তু বাল্মীকি বা কৃত্তিবাসের বিভীষণের চিত্র-সমগ্রতায় ধার্মিকতার সঙ্গে যে বীরত্বের সমন্বয় আছে, মেঘনাদবধের কবি তার বাষ্পটুকুও দেখাতে অনিচ্ছুক। সুতরাং এই কাব্যে বিভীষণের পরিচয়ে কথায় কথায় "বিভীষণ রণে" নিতান্তই হাস্যকর, —কেবল ধ্বনিসর্বস্ব আবৃত্তিমাত্র। ষষ্ঠ সর্গের ২০০ ও ৫১৯ সংখ্যক ছত্রে এই আবৃত্তি পাঠক যদিও উপেক্ষা করতে পারে, ৮ম সর্গের ১৪ সংখ্যক ছত্রে লক্ষ্মণের শক্তিশেলজনিত শোক-করুণ পরিবেশের মধ্যে অত্যন্ত বেমানান, অনর্থক উপদ্রবের মতো যখন এরই পুনরাবৃত্তি এসে পড়ে তখন একে বিকারী রোগীর প্রলাপের মতোই শোনায় ;—

শূন্যমনাঃ খেদে
রঘুসৈন্য ;—বিভীষণ বিভীষণ রণে, (৮ম, ১৪)

মেঘনাদবধ-কাব্যে যার ভূমিকার কোথাও বিভীষণত্ব নেই, তার জন্য নিত্যবিশেষণের বিড়ম্বনা কেন ?

সবই অনুপ্রাস-যমকের লীলা! কাব্যের মনোহারিত্বের জন্য অনুপ্রাস-যমক অবাঞ্ছিত নয়, অবাঞ্ছিত তার যান্ত্রিকতা ও তজ্জনিত নিরর্থক শব্দাড়ম্বর, অর্থগত বিভ্রান্তি বা রচনার শৈথিল্য। এমন অনেক শব্দ, শব্দগুচ্ছ বা প্রকাশভঙ্গি আছে যেগুলিকে সরাসরি সহজ-সচল বলে মেনে নেওয়া যায় না, স্থায়ী

প্রত্যাশা বা স্বাভাবিক দাবীর অনেক বাদসাদ দিয়ে শুধু একটা অতিরিক্ত পক্ষপাতিত্বের জোরে চালাতে হয়। যেমন,

(ক) 'ক্রৌঞ্চবধূ সহ ক্রৌঞ্চে নিষাদ বিঁধিলা,'—এখানে ভাষাগত অর্থে দুটি পাখীরই নিধন বোঝায়; 'ক্রৌঞ্চবধূসহবাসী ক্রৌঞ্চ' এই অর্থের জন্য পাঠকের অনুকম্পার উপর কবিকে নির্ভর করতে হয়।

(খ) হইল সে তোমার প্রসাদে
মৃত্যুঞ্জয়, যথা মৃত্যুঞ্জয় উমাপতি!

এখানকার উপমাংশের সার্থকতা কেবল পরীক্ষার্থী ছাত্রের কাছেই গুরুত্বপূর্ণ, নচেৎ মৃত্যুঞ্জয়িতার কোন শ্রেণীভেদ বা পাত্রভেদে গুণভেদ বা তারতম্য থাকতে পারে না। আর মৃত্যুঞ্জয়িমহল থেকে উমাপতিকেই বা বেছে নেওয়া কেন? আসলে যুক্তাক্ষর ও যুক্তধ্বনির গরজেই কবি আরও বহু বহু স্থানের মতো এখানেও একই শব্দের পুনরুল্লেখ চালিয়ে কার্যসিদ্ধি করতে চেয়েছেন—হয়তো 'যমক'-এর জমক দেখিয়ে আলঙ্কারিকের বাহবা পাওয়ার আশায়। কিন্তু পরবর্তী ছত্রদ্বয়ে 'রত্নাকর' নিয়ে যে সুন্দর প্রয়োগ-মাধুর্য ফুটেছে, এখানে তার ছন্দাংশও ফোটে নি।

(গ) 'সুচন্দন-বৃক্ষশোভা বিষবৃক্ষ ধরে' (১।২২), অথবা 'সুসৌরভে পূরি দেশ!' (৮।৫৭৯), এই সব 'সু' কি নিরর্থক নয়? কিন্তু প্রধানত অনুপ্রাসের খাতিরে ও কেবল মাত্রা-পূরণের দায়ে এমন অনেক বাড়তি বিরক্তিকর 'সু'-এর ব্যবহার করেছেন কবি, কোথাও বা ঝাঁকে ঝাঁকে;—

সুরম্য হর্ম্য সুকানন মাঝে,
সুসরসী সুকমলে পরিপূর্ণ সদা,
বাসন্ত সমীর চির বহিছে সুবনে,
গাইছে সুপিকপুঞ্জ সদা পঞ্চস্বরে। (মেঘ, ৮ম)

'ত্যজি সুকনকাসন, উঠিলা গর্জিয়া' (মেঘ, ১।৪০৯), 'সুগন্ধমাদন গিরি' (৮।৭৭৬), অথবা, 'শুনি সে সু-আরাধনা' (৬।২২২) অথবা, 'অঙ্গদ, সুযুবরাজ' (৬।১৪৭), শুনতেও যেমন, প্রয়োগের আড়ষ্টতাও তেমনি। সুবঙ্গ ভবনে, সুবঙ্গমণ্ডলে (কৃত্তিবাস), সুপথ (ছায়াপথ), সুসুন্দরী (বটবৃক্ষ), সুরত্নে, সুতারা (কোজাগর লক্ষ্মীপূজা), সুবিশ্বে (সৃষ্টিকর্তা), সুকবরী (সায়ংকালের তারা), সুহাসমুখে (নিশা), সুরাজ্যে (প্রাণ), সুকবচ, সুচামর (মেঘ-৯ম), ইত্যাদি এমন অনেক 'সু' ছড়িয়ে আছে মাইকেলের কাব্যে, যেগুলি তাঁর মতো

প্রতিভাবান কবির রচনায় একান্তই বে-মানান এবং যাদের প্রয়োগ-সৌষ্ঠব স্বীকার্য নয়। এ ছাড়া, সুবীর, সুরথী, সুকেশিনী, সুহাসিনী, সুবচনী, সুবদনী-র তো ছড়াছড়ি। মেঘনাদবধ-এর নবম সর্গে সীতার মুখে কবি শোনাতে চান,—শুভক্ষণে দেবর লক্ষ্মণকে সুমিত্রা দেবী গর্ভে ধারণ করেছিলেন—এই কথাটি; এর কাব্যরূপটি 'স'-বা-'শ'-ধ্বনির অনুপ্রাসে মুড়ে দিতে গিয়ে কবি লিখেছেন—

শুভ ক্ষণে হেন পুত্রে সুমিত্রা শাশুড়ী
ধরিলা সুগর্ভে, সই!

'সুগর্ভে'-র 'সু'-এর মধ্যে একটা জবরদস্তি ধরা পড়ে না কি? এই কাব্যে আর তিনটি চোখে-পড়ার মতো 'সু'-এর ব্যবহার, 'সুলক্ষণ লক্ষ্মণ' প্রয়োগটিতে।

"কি উপায়ে সুলক্ষণ লক্ষ্মণ লভিবে জীবন।" (৮।১৪১)
"পাইবে লক্ষ্মণে, সুলক্ষণ! (৮।৭৭৩)

বাল্মীকির "লক্ষ্মণং শুভলক্ষণং" (যুদ্ধ—১১২।৯) প্রয়োগটির অনুকরণে মাইকেল এখানে যে কী কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, এর শ্রুতিমাধুর্য বা প্রয়োগ-সৌষ্ঠব কেমন, রসজ্ঞ পাঠককে আমরা তা ভেবে দেখতে বলি। কবি কিন্তু ঐ 'লক্ষণ-লক্ষ্মণ'-এর শব্দভ্রমকে দিশেহারা বলেই নবম সর্গে আরও একটি সুযোগ নিয়েছেন অনুরূপ শব্দধ্বনি জাগাবার। সঙ্গে 'সু' আছেই। তবে এবারে আর 'সুলক্ষণ'-কে বাগে আনতে পারেন নি, 'সুলক্ষণা' এবং তার সম্বোধনে 'সুলক্ষণে' (সরমার উদ্দেশে) দিয়ে কাজ সারতে হয়েছে। যথা—"বনবাসী, সুলক্ষণে, দেবর সুমতি লক্ষ্মণ!" (৯।১৯০-৯১)। শব্দ-রচনায় ও শব্দ-যোজনায় জবরদস্তি লক্ষণীয়।

তবে লক্ষ্মীদেবী-বোধক 'রমা'র স্থলে 'সুরমার যে 'সু', এর আর জুড়ি নেই,—"চলিলা পশ্চিমদ্বারে কেশববাসনা—সুরমা," (৬।২৪-৭৫)।

(ঘ) তুমিও আইস, দেবি, তুমি মধুকরী
কল্পনা! কবির চিত্ত-ফুলবন-মধু
লয়ে, রচ মধুচক্র; (১ম, ২৯-৩১)

এখানে 'কল্পনা'-কে দেবী বানিয়ে কবি একটা অভিনবত্বের পরিচয় দিয়েছেন বটে, কিন্তু কল্পনাকে মধুকরী করলে তার রচনার স্বাধীনতা থাকে কি? কবি আসলে তাঁর মেঘনাদবধ কাব্যে বহুলাংশে মাধুকরীর বশবর্তী হয়েছেন ঠিকই, কিন্তু সেই কাজে তাঁর যে শক্তির প্রয়োজন হয়েছে, তা, আর যাই হোক, 'কল্পনা' হতে পারে না; সংগ্রহের, সংকলনের বা চয়নের কাজে ঠিক 'কল্পনা'র ভূমিকা স্বীকার্য নয়। 'স্মৃতিশক্তি'র সঙ্গে সংগ্রাহক-

শক্তির মিশ্রণেই ঐ কবিচিত্ত-ফুলবনমধু সংগৃহীত হতে পারে। কেবল মধুচক্রটি 'রচনা'র বেলায় নিজস্ব 'কল্পনা'র প্রয়োজন বটে। সুতরাং দুটি কাজ এখানে,—একটি মধুসংগ্রহ, একটি চক্র-রচনা। শেষেরটিতে 'কল্পনা'র রূপক চলতে পারে, কিন্তু প্রথমটিতে একেবারেই অচল। কল্পনার কাজ যে আসলে কী, তা এই কবিই অন্যত্র বলেছেন সুন্দর ভঙ্গিতে,—

সেই কবি মোর মতে, কল্পনা সুন্দরী
যার মনঃকমলেতে পাতেন আসন,
অস্তগামি-ভানু-প্রভা-সদৃশ বিতরি
ভাবের সংসারে তার সুবর্ণ কিরণ
…………ইত্যাদি।

অর্থাৎ কল্পনার কাজ রচয়িতা-কবিরই নিজস্ব মনোভূমিতে, অন্য কবিচিত্ত-ভূমিতে নয়। অথচ আলোচ্যাংশে মধুচক্রের রূপক চালাবার জন্য 'কল্পনা' শব্দটির অপপ্রয়োগ উপেক্ষিত হয়েছে।

(ঙ) 'আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি'—কিন্তু 'মধুচক্র' থেকে 'মধু'-পানই তো ছিল স্বাভাবিক। 'মধু' শব্দের প্রয়োগে কি ছন্দ, কি অর্থ কিছুই ক্ষুণ্ণ হতো না। 'কাব্য-সুধা' ও 'কাব্য-মধু' দুইয়ের মধ্যে অবশ্যই প্রথমটি অধিকতর বাঞ্ছনীয়। কিন্তু যেখানে মধুচক্রের রূপক চালানো হয়েছে সেখানে অর্থ-সংগতির দিক থেকে 'মধু'-ই সঙ্গততর প্রয়োগ। নিজে রচনা করবো 'মধুচক্র', কৃত্তিবাসের 'সুধাভাণ্ড' নয়, অথচ পরিবেশনের বেলা ঐ 'সুধা'ই চালাবো, এই দু'দিক সামলাতে গিয়ে কবির এই অবস্থা হয়েছে। 'গৌড়জন' অবশ্য সত্যই 'সুভাজন', তাঁরা কাব্যানন্দে বিভোর হয়ে ঠিক করে নিয়েছেন, কাব্যের 'মধু'ও যা, 'সুধা'ও তাই। সুতরাং কবির কোনো ভাবনাই নেই।

(চ) ফুলদল দিয়া
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলীতরুবরে? (১ম, ৮৩-৮৪)

নিছক শব্দধ্বনির খাতিরে 'শাল্মলী', নচেৎ শিমূল গাছের 'তরুবর'-পরিচিতির কোনো দাবী থাকতে পারে না। 'ধ্রুবং স নীলোৎপলপত্রধারয়া শমীলতাং ছেত্তুমৃষির্ব্যবস্যতি'—কালিদাসের এই ভঙ্গির অনুকরণে মাইকেলের এই কবি-প্রয়াস। কিন্তু কোথায় 'শমী' আর কোথায় শিমূল? অথচ শব্দধ্বনিতে 'শমী' দিয়ে সুবিধা হয় না; তাই 'শাল্মলী', তা অর্থ যেমনই হোক।

(ছ) কিন্তু কভু নাহি শুনি ত্রিভুবনে
এ হেন ঘোর ঘর্ঘর কোদণ্ড-টঙ্কারে ! (১ম, ১৫৪)

'ঘর্ঘর' শব্দটির প্রয়োগ দূষিত নয় কি ? ধনুকের টঙ্কারের সঙ্গে ঘর্ঘর-ধ্বনির সাদৃশ্যের কথা ভাবলে কবি নিজেও লজ্জিত হতেন।

(জ) দূতমুখে বীরবাহুর যুদ্ধবর্ণনায় কবি লিখলেন, রামচন্দ্র যুদ্ধে প্রবেশ করেন—

'কনক-মুকুট শিরে, করে ভীম ধনুঃ' (১।১৬৭)

শুনতে ভালোই লাগলো, কিন্তু বনবাসী জটাধারী রামচন্দ্র কি যুদ্ধকালে স্বর্ণমুকুটে ভূষিত হতে পেরেছিলেন ? কবিও ভালোই জানেন তাঁর 'ভিখারী রাঘবে'র বর্তমান পরিস্থিতি। তবু খেয়ালের বশে চালিয়ে দিলেন অনুপ্রাস-জমকালো বিশেষণটি।

(ঝ) 'তথা জাগে রথ, রথী, গজ, অশ্ব, পদাতিক অগণ্য।' (১।২২৩)

রথী-পদাতিক এর সঙ্গে গজ-অশ্বাদি জাগে, না হয় জাগুক,—'পক্ষিরাজ ঘোড়া জাগে'—আমাদের রূপকথার গল্পে শোনা আছে, কিন্তু 'রথ'ও জাগে ! শব্দ-যোজনায় কবির যেন কোনো সতর্কতার প্রয়োজনই নেই।

(ঞ) কেশরিকামিনী,—
নয়ন-রমণী রূপে, পরাক্রমে ভীমা
ভীমাসমা ! (১।২৪১-৪৩)

'ভীমাসমা'র অর্থ কী ? কী বা প্রয়োগটির সার্থকতা ? 'ভীমা' শব্দে 'দুর্গা' বা 'চণ্ডী'কেও বোঝায়। হয়তো কবিও তাই চেয়েছেন। কিন্তু সিংহীর পরাক্রমের উপমানের জন্য যদি সিংহবাহনা স্বয়ং দুর্গাকেই আনা হয়, তবে আর শব্দ-প্রয়োগে যথেচ্ছাচারের কী বাকী থাকে ? আরো লক্ষণীয় কবির কাছে একটা বনের পশু সিংহীও 'পরাক্রমে ভীমাসমা', প্রমীলাও 'পরাক্রমে ভীমা বামা' (৩।৩৮৭), সুতরাং 'ভীমা' শব্দটির প্রয়োগে তিনি যে কতো নির্বিচার তা সুস্পষ্ট। অনুপ্রাসই প্রধান লক্ষ্য।

(ট) 'শিরঃ চুম্বি, ছদ্মবেশী অম্বুরাশি-সুতা উত্তরিলা'— (১।৬৬১)

ইন্দিরা অর্থাৎ লক্ষ্মীর প্রতিশব্দ হিসাবে 'অম্বুরাশি-সুতা' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে 'সমুদ্র-তনয়া' বোঝায়। কিন্তু 'অম্বুরাশি' কি সমুদ্র ? তবে অন্যত্র কবিকে সমুদ্র বোঝাতে 'অম্বুরাশিপতি' বলতে হয় কেন ? (৭।৮৫)

(ঠ) 'তুমি হে মঞ্জুনাশিনী শচি', (২।২০৫)। 'মঞ্জুনাশিনী' শব্দটির অর্থ কী? মাইকেলের যথেচ্ছ শব্দপ্রয়োগের অনেক অত্যাচারই আমাদের সইতে হয়; যেমন, 'রজত' অর্থে 'রজঃ', 'বরুণানী' অর্থে 'বারুণী', 'হ্রেষিল' স্থলে 'হেষিল' বা 'হ্রেষা' স্থলে 'হেষা','তপস্বী' অর্থে 'তপসী'(যদিও অভিধানে 'তপসী' খুঁজলে পাওয়া যাবে 'তপ্‌সে মাছ', এবং 'কপর্দী তপসী' (২।৩৮০)-তে অমন গুরুগম্ভীর সংস্কৃত শব্দের পাশাপাশি কোন্‌কালে শূন্যপুরাণে ব্যবহৃত প্রাচীন বাংলায় ঐ গ্রাম্য শব্দটির প্রয়োগ প্রায় হাস্যোদ্দীপক), 'গায়িকা' স্থলে 'গায়কী', 'নায়িকা' স্থলে 'নায়কী', 'উরোজ' স্থলে 'উরজ', 'অজগর' স্থলে 'অজাগর,' 'পুত্রহন্তা' স্থলে 'পুত্রহানী' ইত্যাদি; এবং এই ধরণের আরো অনেক শব্দের অপপ্রয়োগ এতো বেশি মাত্রায় কবির বিভিন্ন কাব্যে ছড়িয়ে আছে যে, মোহিতলাল মাইকেলী প্রয়োগ সম্বন্ধে 'আর্ষ-প্রয়োগে'র আইন জারি করতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু সব যথেচ্ছাচারই কি ঐ আইনের আওতায় আনা যায়? শচীকে উমা আদর করে বলেছেন 'মঞ্জুনাশিনী'; 'মঞ্জু' কখনও বিশেষ্য পদ হয় না; হলেও 'মঞ্জু' বা মধুরতা নাশকারিণী,—এইভাবে কী অর্থ গিয়ে দাঁড়ালো, খেয়ালী কবি তা একবারও ভাবলেন না।

(ড) 'দেখ তূণ, যাহে
পশুপতি-ত্রাস অস্ত্র পাশুপত-সম! (১।৭৭৩-৭৪)

'পশুপতি-ত্রাস' বলার কী সার্থকতা থাকতে পারে? 'পাশুপত' অস্ত্র বলতেই বোঝায় শিবের অমোঘাস্ত্র 'ত্রিশূল'; তা ছাড়া, রামায়ণে বর্ণিত বহুবিচিত্র বাণের মধ্যে একটির নাম 'পাশুপত বাণ'; তাকে বা ত্রিশূলকে পশুপতি ত্রাস বলার কী কারণ? শুধুই একটা শব্দঝঙ্কার সৃষ্টি ছাড়া, আর কিছুই নয়। অথচ এ এক সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টি। মাইকেল যেমন উচ্চমানের শব্দসৃষ্টিতে সক্ষম, তেমনি সৃষ্টির উদ্দামতায় 'শব্দকবি'র অভিযোগও এড়াতে অক্ষম।

(ঢ) দ্বিতীয় সর্গে ইন্দ্রের হাতে দেবাস্ত্রসমূহ তুলে দেওয়া হলে মায়াদেবী দেবরাজকে আশ্বাস দিয়ে বলছেন, আগামী প্রত্যুষেই মেঘনাদ নিহত হবে, সুতরাং ইন্দ্র অবশ্যই ইন্দ্রজিত-ত্রাস-হীন হতে পারবেন। মাইকেলের এই উপলক্ষে রচনা;—

'* * তব চিরত্রাস, বীরেন্দ্র কেশরী
ইন্দ্রজিত-ত্রাস-হীন করিবে তোমারে—' (২।৫২২-২৩)

এই 'চিরত্রাস' নিছক শব্দাড়ম্বর-জনিত দুষ্টপ্রয়োগ, উক্তিটির মধ্যে বিশেষণ বা বিশেষ্য কোনোরূপেই একে বাঞ্ছিত শব্দের সঙ্গে যুক্ত করার উপায় নেই। পর পর দুটি ছত্রে 'ত্রাস'-যুক্ত দুটি সংযুক্ত পদের আবৃত্তিতে একটা ধুম তোলা হলো, এতেই কবি পরিতৃপ্ত। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে, কবির পছন্দসই আরো কতিপয় জমকালো পদের মতো 'ত্রাস'-যুক্ত সংযুক্ত পদের মোহটি ছিল তাঁর দুর্বার; তাই 'দেবদৈত্যনরত্রাস' বা 'দেবদৈত্যনরচিরত্রাস', 'চামর অমর-ত্রাস' বা 'পশুপতিত্রাস'-এর মতো পদগুলি তিনি কেবল শব্দাড়ম্বরের জন্য নির্বিচারে চালিয়ে গেছেন, যাদের অধিকাংশই যে নিতান্ত খেয়ালী বা অসংগত প্রয়োগ, তা এই প্রবন্ধের অন্যত্র দেখানো হয়েছে।

(৭) শব্দনির্বাচনে মাইকেল অধিকাংশক্ষেত্রেই পরিচালিত হয়েছেন যতো না অলংকারসম্মত ধ্বনি-সৌষ্ঠব-চেতনায়, ততো নিছক শব্দধ্বনির মোহে। অর্থসংগতি উপেক্ষা করে শব্দসংগতির বহর দেখাতেই তিনি অধিকতর ব্যগ্র। যেখানে এ দুয়ের সমন্বয় ঘটেছে, সেখানে তাঁর রচনা হয়েছে মহিমান্বিত। অন্যথা প্রয়োগ হয়েছে কোথাও জড়তা, আতিশয্য বা অসঙ্গতি দোষে দুষ্ট, কোথাও বা নিতান্ত তরল, বা প্রমাদপূর্ণ। এ ছাড়া তাঁর অনুপ্রাস-মাদকতা ও বেপরোয়া-বা-খেয়ালীপনা তো আছেই। সুতরাং এ অবস্থায় পদরচনা ও শব্দ-যোজনায় কবির শৈল্পিক বিচক্ষণতার নিরঙ্কুশ জয়গান গাওয়া ও সেই শিল্পের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব-তথ্যগত ব্যাখ্যায় নিয়তই সপ্তম স্বরে নিখুঁত উৎকর্ষেরই প্রতিষ্ঠা দিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

'দম্ভোলি-নিক্ষেপী—
সহস্রাক্ষে যে হর্য্যক্ষ বিমুখে সংগ্রামে,'— (৩।৪১৯-২০)

'হর্য্যক্ষে'র অর্থ সিংহ, 'পুরুষসিংহ' তো নয়? কিন্তু কবি তা গ্রাহ্য করলেন না; 'সহস্রাক্ষ' ও 'হর্য্যক্ষ' এই দুয়ে মিলে আবৃত্তিতে যে শব্দের বাজি-ফোটানো হলো, এতেই তিনি খুশী।

'ত্রস্তে রক্ষোরথী,
দাশরথিপানে চাহি, কহিলা কেশরী;— (৩।২৯০-৯১)

পূর্বের মতোই আড়ষ্ট প্রয়োগ এই 'কেশরী'-ও। কেশরীসদৃশ বীর বা তেজস্বী যে রক্ষোরথী, এ আর ভাষায় প্রকাশ পেলো না। telegraphic wording-এর মতো কবি যেখানে সেখানে বসিয়ে গেলেন শব্দ। তাঁর যেন ব্যবহৃত শব্দগুলির মধ্যে সর্বদাই কোনো অন্বয়-রক্ষার দায়িত্ব নেই।

রামচন্দ্রের বক্তব্য,—সুগ্রীব, অঙ্গদ, হনুমান, ধূম্রাক্ষ, নল-নীল, কেশরী ও বিভীষণ, সকলে মিলে যে মেঘনাদকে বাধা দিতে অক্ষম, লক্ষ্মণ একাকী তার বিরুদ্ধে লড়বে কী করে? কবির ভাষায়,—

সুগ্রীব বাহুবলেন্দ্র; বিশারদ রণে
অঙ্গদ, সুযুবরাজ; বায়ুপুত্র হনূ,
ভীমপরাক্রম পিতা প্রভঞ্জন যথা;
ধূম্রাক্ষ, সমর-ক্ষেত্রে ধূমকেতু সম;
অগ্নিরাশি নল, নীল; কেশরী—কেশরী
বিপক্ষের পক্ষে শূর; আর যোধ যত,
দেবাকৃতি, দেববীর্য; তুমি মহারথী;— (৬।১৪৬-৫২)

প্রথমে লক্ষণীয়, এখানেও সেই 'কেশরী', প্রায় একই রকমের আড়ষ্ট, কেশরী নামক বানর-বীর যে বিক্রমকেশরী, বা পরাক্রমে কেশরীসম, এমন ভাব-প্রকাশের ভাষায় টান ধরেছে; অথচ আগের সুগ্রীব, অঙ্গদ, হনুমান ও ধূম্রাক্ষ, এই চার বীরের ক্ষেত্রে প্রকাশের কোনো জড়তা নেই। হনূমান ও ধূম্রাক্ষের বৈশিষ্ট্য-পরিচয় একেবারে নিখুঁত। সুগ্রীব ও অঙ্গদের পরিচয়ে যথাক্রমে 'বাহুবলেন্দ্র' ও 'সুযুবরাজ' পদদ্বয় অবশ্য সুরচিত নয়, প্রথমটি তো আপত্তিকরই বটে। নল ও নীল এই দুই বীরের জন্য যে একটি পরিচয় বরাদ্দ হয়েছে—'অগ্নিরাশি', এও অত্যন্ত আড়ষ্টপ্রয়োগ, সঙ্গে জড়ানো আছে কবির বেপরোয়া-পনা; 'অগ্নিরাশি' পদটি প্রয়োগের দিক থেকে পূর্বোক্ত telegraphic পর্যায়েই গিয়ে পড়ে। কিন্তু এখানে বড়োই কৌতুকাবহ 'দেবাকৃতি-দেববীর্য'—এই দুটি পদের প্রয়োগ। 'আর যোধ যত' তাদের ভাগ্যেই ঘটেছে এই পরিচিতিলাভ। বলা বাহুল্য, রামপক্ষীয় বানরসৈন্য এরা। বিশেষ উল্লেখযোগ্য সুগ্রীবাদি বড়ো বড়ো বীর বাছাই হয়ে যাওয়ার পর, যারা পড়ে রইলো, সেই নাম-না-জানা বানর মাত্রেরই উদ্দেশে (বলা বাহুল্য, 'জাম্ববান'ও আছেন এদের মধ্যে!) কবির পরিচায়িকায় পাওয়া গেল 'দেবাকৃতি, দেববীর্য'—সেই সুদুর্লভ সুষমা-মাহাত্ম্যমণ্ডিত বিশেষণ-যুগল, যা কেবল লক্ষ্মণের মতো চরিত্রকেই মানায়, এবং যাকে লক্ষ্মণেরই নিত্যবিশেষণ হতে দেখে মোহিতলাল কবির প্রয়োগ-নৈপুণ্যে উচ্ছ্বসিত হয়েছেন! পূর্বেই এই বিষয়টির সমন্তব্য আলোচনা হয়ে গেছে, অতএব এখানে আর নয়। এখানে শুধু বক্তব্য, উদ্ধৃত অংশটির বিশ্লেষণ থেকে অবশ্যই সুস্পষ্ট হবে, ক্ষেত্রবিশেষে যথেষ্ট নৈপুণ্য প্রকাশ পেলেও ক্ষেত্রান্তরে

কবির পদরচনায়, শব্দযোজনায় ও প্রযুক্তিধারায় সতর্কতা, সঙ্গতিবোধ বা মাত্রাবোধের শোচনীয় অভাব অনস্বীকার্য। ধ্বনি-শব্দ (ধ্বনি-যুক্ত শব্দ) ও শব্দ-ধ্বনি (নিছক আবৃত্তিগত), মাইকেলের শব্দযোজনায় এই দুইয়ের মধ্যে বিচক্ষণ নির্বাচনের অভাব; অথবা, ঐ দুইয়ের অশোভন একাকার বড়োই পীড়াদায়ক। প্রকাশের জড়তা সত্ত্বেও 'অগ্নিরাশি' একটি ধ্বনি-শব্দ, কিন্তু 'দেবাকৃতি-দেববীর্য' লক্ষ্মণের বেলা যাই হোক, এখানে নিছক শব্দ-ধ্বনি ছাড়া কিছু নয়। কিছু অনুপ্রাসযুক্ত গুরুগম্ভীর একটা আওয়াজ তুলেই কবি ক্ষান্ত।

(ত) কেবল আওয়াজ ও অনুপ্রাসের মোহেই কবি প্রমীলার সখী 'বাসন্তী'কে নিয়ে এমন বাড়াবাড়িতে মত্ত হয়ে ওঠেন,—

"বাসন্তী নামেতে সখী বসন্ত-সৌরভা" (৩।১৯)

"কহিলা বাসন্তী সখী, বসন্তে যেমতি
কুহরে বসন্ত সখা," ৩।২৮-২৯)

"বসন্ত সৌরভা সখী বাসন্তীরে সতী
কহিলা" (৭।২০)

বস্তুত 'বসন্ত-সৌরভা'-র মতো একটা বিশেষণ স্বয়ং প্রমীলার ভাগ্যেও জোটে নি!

(থ) তবে কবির শব্দ ধ্বনি বা শব্দাড়ম্বরের মোহ প্রমীলার অন্যতম সহচরী 'নৃমুণ্ডমালিনী'কে নিয়ে যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে তার জুড়ি এ কাব্যে আর কোথাও নেই। প্রথমত, শব্দমোহে দিশেহারা কবি তাঁর এই মনের মতো শব্দটিকে পাগলের মতো আবৃত্তি করেছেন, যথা—

(১) নৃমুণ্ডমালিনী নামে উগ্রচণ্ডা ধনী (১০২)

(২) নৃমুণ্ডমালিনী সখী (উগ্রচণ্ডা ধনী!) (১৮৮)

(৩) নৃমুণ্ডমালিনী দূতী, নৃমুণ্ডমালিনী
আকৃতি, (২৪৮)

(৪) প্রণমি আমি রাঘবের পদে,
আর যত জনে—নৃমুণ্ডমালিনী
নাম মম, (৩০৭-৯)

(৫) সর্ব্ব অগ্রে উগ্রচণ্ডা নৃমুণ্ডমালিনী,
কৃষ্ণহয়ারূঢ়া ধনী, (৩৭৮-৭৯)

(৬) মহাবীর্যবতী এই প্রমীলা সুন্দরী,
নৃমুণ্ডমালিনী, যথা নৃমুণ্ডমালিনী,
রণপ্রিয়া ! (৪৬৮-৭০)

(৭) উচ্চৈঃস্বরে কহে চণ্ডা নৃমুণ্ডমালিনী ; (৫০১)

আর একবার নামটি কোথাও বসাতে পারলেই এই তৃতীয় সর্গেই কবির ইষ্টমন্ত্রজপের মতো 'নৃমুণ্ডমালিনী' নামটা দশবার জপ করা হয়ে যেতো ! অবশ্য সে অভাব মিটে গেছে নবম সর্গে। তা ছাড়া, নামটির শব্দমোহের আরো একটি কারণ, এরই উচ্চারণগত ধ্বনি-গাম্ভীর্যের সঙ্গে মানানসই 'উগ্রচণ্ডা', 'চণ্ডা', 'কৃষ্ণহয়ারূঢ়া', 'মহাবীর্যবতী' 'ভয়ঙ্করী' 'ভীমা', 'দানবনন্দিনী' 'প্রচণ্ডা খর্পরখণ্ডা হাতে, মুণ্ডমালী', ইত্যাদি রুদ্রধ্বনিযুক্ত বহু শব্দের সমাবেশ ঘটিয়ে শব্দকবি মাইকেল সাধ মিটিয়ে শব্দের দামামা বাজাতে পেরেছেন। কিন্তু ঠিক সেই অনুপাতেই তিনি যে অন্যদিকে সামঞ্জস্য হারিয়েছেন, এটাও সত্য। আলোচ্য শব্দটি যদি কেবল একটা নাম হতো, তা হলেও রক্ষা ছিল, কিন্তু ঐ নামের রুদ্রতার সঙ্গে মিল রেখে কবি বার বার জানিয়েছেন তার আকৃতি ও প্রকৃতিগত ভয়াবহতা ; জানিয়েছেন সে 'উগ্রচণ্ডা', 'চণ্ডা', 'নৃমুণ্ডমালিনী আকৃতি' ; কেবল নামে নয়, "যথা নৃমুণ্ডমালিনী রণপ্রিয়া" সুতরাং রণরঙ্গিণীর করালতা তার সত্তায় অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত, এবং তার সেই ভয়ঙ্কর রূপ দর্শনে রামশিবিরস্থ বীরগণের অবস্থা হলো 'দড়ে রড়ে জড় সবে হয় স্থানে স্থানে'।— কিন্তু অচিরেই আমাদের শুনতে হয়, নৃমুণ্ডমালিনী নাকি চলেছে 'আলো করি দশদিশ, কৌমুদী যেমতি, কুমুদিনী-সখী, ঝলে বিমল সলিলে' ! শুধু তাই নয়, সে নাকি এমন পঞ্চশরের প্রভাব বিস্তার করে চলেছে যে দু'পাশে জমায়েত সমস্ত পুরুষের মন একেবারে ঐ প্রভাবে জরজর,—"জরজরি সর্বজনে কটাক্ষের শরে"। এও কি সম্ভব ? মাইকেলের হাতে সবই সম্ভব। শব্দধ্বনির খাতিরে তিনি যা বলবার বলেছেন। অতঃপর প্রসঙ্গের সম্প্রসারণে সেই সব শব্দের সঙ্গে অর্থের সংগতি-সামঞ্জস্য রক্ষার দায়িত্ব সর্বদা মেনে চলা তাঁর ধাতুতে নেই। তাই 'আকৃতিতে নৃমুণ্ডমালিনী' বলা হলেও দেখা যায়, মুক্তকেশী বা আলুলায়িতকুন্তলা বা তজ্জাতীয় কোন কেশভঙ্গী দেখানোর পরিবর্তে কবি তার স্বরচিত একটি বেণীর ব্যবস্থা করেছেন, শুধু বেণী নয়, 'মণিময় বেণী,' এবং সেটি যে তার পৃষ্ঠদেশে অকারণ দোদুল্যমান, তাও নয়, তারও আছে প্রবল কামোদ্দীপক প্রভাব—

তুলিছে পৃষ্ঠে মণিময় বেণী,
কামের পতাকা যথা উড়ে মধু-কালে। (৩।২৬৫-৬৬)

আনুষঙ্গিকভাবে এসেছে পায়ে নূপুর, কটি-দেশে কাঞ্চী, পীবর স্তনযুগল রত্নহারের শোভায় সুসজ্জিত। অর্থাৎ নৃমুণ্ডমালিনী বলে যে পরিচয়ই দেওয়া হোক, আসলে তার কাজ গিয়ে দাঁড়াল শৃঙ্গাররসের উদ্দীপন! শব্দে ও অর্থে, প্রয়োগে ও আবেদনে কী উৎকট অসঙ্গতি! অতো বড়ো কবির হাতে এমন একটা বিশ্রী ব্যাপার কি করে ঘটলো, এ রহস্যও অনুদঘাট্য নয়। কবি যতোই প্রচার করুন, 'The thoughts and images bring out words with themselves,—words that I never thought I knew,'—এই দূতীর পরিচিতি-ছাঁচটি বিশেষত তার আকৃতির রুদ্রতা-সূচক বর্ণনা তিনি নিয়েছেন কৃত্তিবাসের চামুণ্ডা-বর্ণনা থেকে ('কৃত্তিবাসী ঋণের বহর' ৫ম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। চামুণ্ডায় ও দূতীতে একাকার ঘটাতে গিয়েই এই অবস্থা। এতে কল্পনার কসরৎ ফুটেছে, কিন্তু নিদারুণ অসঙ্গতিতে সৃষ্টি হয়েছে হাস্যোদ্দীপক।

(দ) নিরর্থক বাগ্‌বিস্তার ও তজ্জনিত অসঙ্গতি দোষ মাইকেলের কাব্যে এই কারণেই সুপ্রচুর। অনুপ্রাস-জমাবার লোভে কবি কী যে আমদানী করেন, তা আর ফিরে দেখেন না।

চঞ্চল হইনু
এ প্রপঞ্চ দেখি, সখে, বঞ্চো না আমারে। (৩।৪০৭-৮)

এই আবৃত্তিতে পর পর তিনটি 'ঞ্চ' ধ্বনির তরঙ্গ তুলে অমিত্রাক্ষর ছন্দের মর্যাদা বাড়ানো হয়েছে,—ঠিক যেমন হয়েছে—

এ প্রপঞ্চে তবে
কেন বঞ্চাইছ দাসে, কহ তা দাসেরে
সর্বভুক? (৬।৪৫২-৫৪)

কিন্তু শেষোক্ত ক্ষেত্রে মেঘনাদের কাছে লক্ষ্মণের অতর্কিতে আবির্ভাব অগ্নিদেবের 'প্রপঞ্চ' মনে হতেই পারে, সুতরাং 'বঞ্চনা'র প্রস্তাব সার্থকই বটে; তাই বলে প্রথম ক্ষেত্রেও ঐ একই অনুপ্রাস-ঝঙ্কার বাজালে চলবে কেন? সেখানে তো 'প্রপঞ্চে'র প্রসঙ্গ উঠবার কোনো পার্থিব কারণ নেই? এর আগেই রামচন্দ্র স্বয়ং প্রমীলার দূতীর মুখে বৃত্তান্ত সব শুনেছেন, নিজেও তার সঙ্গে আলাপ করেছেন; তদুপরি বিভীষণ স্পষ্টই বলেছেন, "দেখ, প্রমীলার পরাক্রম, দেখ বাহিরিয়া, রঘুপতি!' এর পরেও 'প্রপঞ্চে'র প্রশ্ন কি উঠতে

পারে? কিন্তু কবি নির্বিকার। একবার 'চঞ্চল-প্রপঞ্চ-বঞ্চো না'-র ঝঙ্কার তুলে হলো না, 'ছল-ছলনা'-দিয়েও আর একবার ঢেউ তোলা হলো—

পাতিয়া এ ছল সতী পশিলা কি আসি
লঙ্কাপুরে? কহ বুধ, কার এ ছলনা? (৩।৪১১-১২)

অর্থাৎ অনুপ্রাস-বন্ধ শব্দের ঢেউ তোলাই কবির কাজ, আর পাঠকের কাজ অগ্রপশ্চাৎ কোনো কিছু না দেখে, শিথিল বাগবিন্যাস বা অসঙ্গতির প্রতি চক্ষু মুদ্রিত করে কেবলই ঐ ঢেউয়ের নাগরদোলায় দোল খেয়ে কবির পদরচনা-শব্দযোজনা ও প্রযুক্তি-নৈপুণ্যের উচ্ছ্বসিত বন্দনা গাওয়া!

খেয়ালী কবির খেয়ালী বাগ্‌বিন্যাসের অজস্র পরিচয়ের মধ্যে আরও কিছু নমুনা তৃতীয় সর্গের এই আলোচ্য অংশেরই সংলগ্ন। দূতীর সঙ্গে আলাপে রামচন্দ্রের যে দীনতা প্রকাশ পেয়েছে, তাতে রামচরিত্রের অহেতুক দুর্বলতার লক্ষণ আগেকার সমালোচনাতেই ধরা পড়েছে। কিন্তু এই 'দুর্বলতা' এক জিনিষ, শব্দযোজনায় শৈথিল্য আর এক জিনিষ।

"সুখে থাক, আশীর্বাদ করি!" (৩,৩৪৮)

কী সর্বনাশ! এই সুখে-থাকার আশীর্বাদ কোথায় গিয়ে পড়লো? এ আশীর্বাদ নিশ্চয়ই শুধু দাসী নয়, তার কর্ত্রী যে প্রমীলা, তার প্রতিও এটা প্রযোজ্য? কিন্তু মেঘনাদ যখন অবশ্যই বধ্য, তখন প্রমীলা বা তার সখিদলের সুখে-থাকাটা কেমন হবে তা তো সহজেই অনুমেয়! অতএব এ ক্ষেত্রে এ আলাপ প্রায় বাচালতার পর্যায়ে পড়ে না কি? নবীন সেন রৈবতকের এক জায়গায় 'সুবোধ' নামক এক আশ্রম-পালিত শার্দুলের প্রতি আশ্রম-বালকের গলা জড়িয়ে আলাপের মধ্যে লিখেছেন, "সুবোধ, বড় ভাল ছেলে তুমি।" আর এরই একটু আগে কৃষ্ণ-ধনঞ্জয়ের প্রতি এক আশ্রম শিশুর উক্তি শুনিয়েছেন। "মহালাজ, আছীব্বাদ কলি।" মহাকাব্যের মূল বস্তু ফেলে রেখে এই ধরণের বর্ণনায় মেতে ওঠার জন্য ডাঃ শশিভূষণ দাসগুপ্ত একে "বর্ণনার আদিখ্যেতা" বলে মন্তব্য করেছেন। মাইকেলের এই 'সুখে থাক, আশীর্বাদ করি'র উপর মন্তব্য চাইলে, তিনি কি বলতেন জানি না, তবে আমরা দেখছি, প্রবীণ ঋষিদের অনুকরণে আগন্তুকদের আশীর্বাদ জানানো শিশুদের পক্ষে অস্বাভাবিক কিছু নয়, হয়তো একেবারে নিরর্থকও নয়,—হতে পারে কবির ঐ ধরণের বর্ণনা স্থানবিশেষে খুবই বিরক্তিকর;—কিন্তু মাইকেলের রামের এই "আশীর্বাদ করি," এ তো শিশুমুখ-নিঃসৃত অভ্যস্ত বুলি নয়? এর প্রযোজ্যতা কি আদৌ

স্বীকার্য? তা ছাড়া, "বিনারণে পরিহার মাগি তার কাছে!"—এই 'পরিহার-মাগা'র কথা রামচন্দ্রের মুখে কবি সজ্ঞানে বসাতেই পারেন না, রামচরিত্রের এমন উদ্ভট অবনমন তাঁর নিজেরই পরিকল্পনা-বিরুদ্ধ। আসলে এগুলি শব্দ-প্রয়োগে অমার্জনীয় শৈথিল্যের ফল।

শিথিল বাগ্‌বিস্তার ও তজ্জনিত নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় অতি কাঁচা কথার অহেতুক অনুপ্রবেশ ঐ নবীনচন্দ্রের মতো মাইকেলের কাব্যেও আরো ঘটেছে। আপাতগম্ভীর শাব্দিক পরিমণ্ডলে সেগুলি প্রায়ই আচ্ছন্ন থেকে যায়। যেমন, ইন্দিরা-মুরলা-সংলাপে ইন্দিরার মুখে বারুণীর 'স্নেহৌষধগুণে'র উল্লেখের পরেই —"ভাল ত আছেন, কহ, প্রিয়সখী মম বারীন্দ্রাণী?" এর প্রথম অংশটি অবশ্যই অযত্নরচিত। দ্বিতীয় সর্গে এই ইন্দিরাই দেবরাজ ইন্দ্রকে কৈলাসে মহাদেবের শরণ নেওয়ার জন্য উদ্যোগী হতে দেখে দেবরাজের মারফত নিজস্ব একটি নিবেদন পাঠানোর ভূমিকায় যখন বলেন, "বড় ভাল বিরূপাক্ষ বাসেন লক্ষ্মীরে," —তখন তাঁর 'আহ্লাদীপনা'য় আমাদের লজ্জিত হতে হয়। দ্বিতীয় সর্গেরই আর এক স্থানে দেবরাজের মায়াদেবী-তোষণে যে ন্যাকামি-ছেলেমি ফুটেছে, তা কারও দৃষ্টি এড়াতে পারে না;—যেই মায়া দেবী বললেন,—'ওই দেখ ধনু, দেব।' অমনি 'কি ছার ইহার কাছে দাসের এ ধনুঃ রত্নময়!'—বলে 'শচীকান্ত বলী'র হাঁ-করে-পড়া বড়ই বিসদৃশ। তবে তূণের প্রশংসায় যখন ইন্দ্র বলেন, 'হেন তূণ আর, মাতঃ আছে কি জগতে?' তখন তাঁর আদেখ্‌লেপনায় বুঝি মায়াদেবীরও অসহ্য লাগে। তিনি প্রসঙ্গান্তরে চলে যান। তবে এবিষয়ে আমাদের নিজস্ব মন্তব্য হলো, সংলাপ-রচনায় এখানে-ওখানে এমন একটু শৈথিল্য সব শিল্পীর রচনাতেই খুঁজলে পাওয়া যায়। যে মূল প্রসঙ্গে এজাতীয় উদ্ধৃতির প্রয়োজন হয়েছে, তা হলো পদরচনায় ও শব্দ-যোজনায় কবির পূর্বাপর সংগতির প্রতি উপেক্ষা ও অসতর্কতা।

পরবর্তী দৃষ্টান্ত তৃতীয় সর্গের প্রমীলা-বাহিনী সংক্রান্ত:—

> "না জানি এ বামা-দলে কে আঁটে সমরে,
> ভীমারূপী, বীর্যবতী চামুণ্ডা যেমতি—
> রক্তবীজ-কুল-অরি?" (৩।৩১৬-১৮)

সেই জম-জমাট শব্দ-ধ্বনি ও উদ্ভট উপমা। কবির ভ্রূক্ষেপ নেই কার মুখে কথাগুলো বসানো হলো! বক্তা এখানে বিভীষণ—প্রমীলার খুড়শ্বশুর।

পুত্রবধূপমা প্রমীলা ও তার সখীদল অবশ্যই তাঁর কাছে তাঁরই পরিবারভুক্ত অতিপরিচিত স্নেহাস্পদ ললনাদলের মতো। তাদের সম্বন্ধে তাঁরই মুখে এই চামুণ্ডাভাবনাযুক্ত ভীতিবিস্ময়বিহ্বলতার প্রকাশ নিতান্তই আজগুবি কল্পনা, যার মোহ কবি এড়াতে পারেন নি ঐ শব্দাড়ম্বরের মোহে, আর সঙ্গতি-বোধের বালাই না থাকায়।

(ধ) 'সর্বহর কাল তাহে পারে না হরিতে', এবং 'সশঙ্ক লঙ্কেশ শূর স্মরিলা শঙ্করে', এই দুটি চরণের সাহায্যে মোহিতলাল প্রমাণ করতে চেয়েছেন, এই কবির হাতে যে যমক-অনুপ্রাসের এতো প্রাচুর্য, তার কারণ শুধু শব্দালংকার-প্রীতি নয়, অব্যর্থ শব্দধ্বনির দ্বারা ভাবের যথাযথ রূপসৃষ্টি। প্রথমটি সম্পর্কে সমালোচকের মন্তব্য,—'এখানে যেটুকু যমক বা অনুপ্রাসের টান আছে (যেন টানেই এসে গেছে, স্বেচ্ছাকৃত নয়), তাহা কেবল ভাষার অলংকারবৃদ্ধির জন্যই নহে, এই অনুপ্রাসে যে বিশিষ্ট ব্যঞ্জন-ধ্বনির সমাবেশ হইয়াছে, তাহাতে ভাষায় ভাবানুরূপ গাম্ভীর্যের সঞ্চার হইয়াছে' (পৃঃ ১৪৭)। এ বিশ্লেষণ ও মন্তব্য যে যুক্তিপূর্ণ ও সুবিজ্ঞ, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এই কবির ব্যবহৃত রাশি রাশি অনুপ্রাসের মধ্যে এমন দুটি একটিকে বেছে নিয়ে ঢালোয়া মন্তব্য দিলে তো চলবে না, ওদিকে যে নিতান্ত যান্ত্রিক শিথিল নিম্নশ্রেণীর অনুপ্রাসে মাইকেলের কাব্য ছেয়ে গেছে।

দ্বিতীয়টির বেলা মোহিতলালের উচ্ছ্বাস যেন উদ্বেলিত হতে চায়। তিনি লিখেছেন,—"এই চরণের নিরবচ্ছিন্ন অনুপ্রাসও, Tennyson-এর Immemorial elms and murmur of innumerable bees-এর মত নিকৃষ্ট শব্দালংকার মাত্র নয়; কারণ, তাহাও সেই 'মধুকর-নিকর-করম্বিত' জাতীয় অনুপ্রাসেরই ইংরেজি সংস্করণ।" অর্থাৎ Tennyson বা জয়দেব সব তুচ্ছ, নিকৃষ্ট শব্দালংকারের কবি; মাইকেলের হাতে কেবল শব্দধ্বনিতে অনুপ্রাসসৃষ্টির নিকৃষ্ট নমুনা কেউ দেখাতে পারবেন না! প্রশস্তিমোহ আর কাকে বলে?

'দৌর খরতর কর-জাল-সম্বলিত' (২।২৭৮)

অথবা 'দিনকর-খরতর-কর সহ্য করি' (তিলো—২।২০৭) কি 'মধুকর-নিকর-করম্বিত'-এর চেয়ে উৎকৃষ্ট অনুপ্রাসের নিদর্শন? তা ছাড়া,—

'বলে রিপু-কুল-কাল বলী';—'প্রবল পবন-বলে বলীন্দ্র পাবনি'; 'বিরলে করেন কেলি মধু মধুকালে'; 'সুবিধি বিধির বিধি বিদিত জগতে' ;ভুরিয়া

ভীষণ তনু সুবীর ভূষণে'; 'আশুগতি পুত্র হনূ আশুগতিগতি'; 'দেবকুলদাস দাস, দেবকুলপতি'; 'অশেষ হে মহাভাগ, সম্ভোগ এ ভাগে'; 'রমার আশার বাস হরির উরসে, হেন হরি হারা হয়ে বাঁচিল যে রমা'; 'রমে আঁখি মরে নর তাহার পরশে'; 'দড়ে রড়ে জড় সবে হয় স্থানে স্থানে'; 'জলকান্ত যথা শান্ত শান্তি-সমাগমে'; 'শুইলা ফুলশয়নে সৌরকররাশিরূপিনী সুরসুন্দরী'; 'দমনিয়া ভবদম দুরন্ত শমনে'; 'ফুরাইল জীবলীলা জীবলীলাস্থলে'; 'রঘুজ-অজ-অঙ্গজ'; 'রবিকুলরবি'; 'বিকট বিপক্ষ-পক্ষে'; 'জীবকুলকুলক্ষণ'; 'প্রফুল্লিল ফুলকুল'; 'নীলকণ্ঠ যথা (নিস্তারিণী-মনোহর) নিস্তারিলে ভবে, নিস্তার এ বলে', 'কৃপা করি কৃপাদৃষ্টি কর কৃপাময়ি', 'বারিসংঘটিত ঘটে', 'কহ, কৃপাময়ি, কৃপা করি, কহ শুনি, কোন কোন রথী'; 'ঘন রাশি রাশি, স্বর্ণবর্ণ, সুবাসিত বাস খাসি ঘন'; 'সশরীরে, হে সাহসি, পশিলা এ দেশে'; 'নরান্তক (রণে নরান্তক),'—এগুলির মধ্যে নিছক অনুপ্রাসের একটা যান্ত্রিকতা ধরা পড়বেই। "যাঁহারা প্রাণের দরজা বন্ধ করিয়া কেবল কানের কপাট খুলিয়া রাখেন, তাঁহারা সাহিত্য সমালোচনার অধিকারী নহেন"—মাইকেলের যমক-অনুপ্রাসের নিঃসর্ত সমর্থনে বদ্ধ-পরিকর মোহিতলালের এই ধমকানির ভয়ে যাঁরা পূর্বোক্ত দৃষ্টান্তগুলিতে কবির ঐ যমক-অনুপ্রাসে কোনো 'অসামান্য কবিশক্তি'র উজ্জ্বল পরিচয়ই লক্ষ্য করেন তাঁদের সঙ্গে একমত হওয়া অপরের পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁদের আনন্দবর্ধনের জন্য এবং স্বাধীন দৃষ্টিসম্পন্ন সাধারণ রসজ্ঞ পাঠকের নিরপেক্ষ বিচারের উদ্দেশ্যে এই বিষয়ে অনুরূপ কবিকৃতির আরো কিছু নমুনা দেখানো যেতে পারে :—

'যথায় কমলালয়ে, কমল-আসনে
বসেন কমলময়ী কেশব-বাসনা" —মেঘ-১।৪৮৭-৮৮

"কনক-পুত্তলী,
কমলবসনা, শিরে কমল-কিরীট,
কমল-ভূষণা, কমলায়ত-নয়না,
কমলময়ী যেমনি কমল-বাসিনী—
ইন্দিরা!" -তিলো—১।৫৫৫-৫৯

"কলকল করে জল মহাকোলাহলে"— ঐ ।২১

"চিত্রলেখা—জগৎজনের চিত্তে লেখা"- ঐ ।৫৭

"চিত্ররথ—কামিনীকুলের মনোরথ—
মহারথী ?" তিলো ।৬২
"নিকটে বিকট বজ্র, ব্যর্থ এবে রণে,"— ঐ ।১৬৪
"মন্মথের মন যবে মথেন কামিনী" ঐ ।৪১৩
"কেন না মন্মথ মন মথেন যে ধনী" ঐ ।৪৭৮
"কামের কামিনী সমা কোন বামা ধরে"— ঐ ।৫৭১
"দিনকর-খরতর-কর সহ্য করি"— ঐ ২।২০৭
"আইলাম আমা সবে ধাতার সমীপে
ধায়ে রড়ে,—বিধির বিধান বোধগম !"— ঐ ৩।২১৯-২
'হেথা তুরাসাহ-সহ ভীম প্রভঞ্জন'— ঐ ।১
"কিন্তু দৈববলে
বিফলবিভ্রমা বামা লজ্জায় ফিরিল
গিরিদেহে বাজি যথা রাজীব !"— ঐ ।৩০৯-১১
'ধাতাবরে, দেববর সাবাসি তোমারে' !— ঐ ।৬২৩
'তোমারি প্রতিমা, ধনি ; ওই মধুধ্বনি,
তব ধ্বনি প্রতিধ্বনি শিখি নিনাদিছে'— ঐ ৪।২৭৫-৭৬
'ববম্বম রবে—
ববম্বম রবে যবে রবে শিঙ্গাধ্বনি !' ঐ ৪।৫৫৯-৬০

(ন) উথলিল সভাতলে দুন্দুভির ধ্বনি,
শৃঙ্গনিনাদক যেন, প্রলয়ের কালে
বাজালো শৃঙ্গবরে গম্ভীর নিনাদে ! মেঘ—৭।১৫৮-৬০

শব্দ-প্রয়োগ ও উপমা উভয়েরই ত্রুটি-দুর্বলতা লক্ষণীয়। 'শৃঙ্গনিনাদক' বলেই কবি বোঝাতে চান প্রলয়ের দেবতা মহাকাল-ভৈরবকে ; কিন্তু এটা পদরচনার দুর্বলতাই প্রকাশ করে। এ দুর্বলতা কবির ক্ষমতার অভাব-জনিত নয়, এর মূলে আছে 'নিনাদ' ও 'নিনাদক' এই ধ্বনি-সাম্যের মোহ এবং দুটি 'শৃঙ্গ'-ধ্বনিতে শব্দ-তরঙ্গ-সৃষ্টির প্রলোভন। এরই ফলে উপমাটির অবস্থা হয়ে উঠেছে সঙ্গীন ; 'দুন্দুভি' স্বর্গ-দামামা, তার ধ্বনি আনন্দসূচক, মহাকালের প্রলয়-শিঙা-ধ্বনিতে তার সাদৃশ্য দেখানো সমীচীন নয়।

এই 'নিনাদে'র মোহেই অন্যত্র কবির রচনায় ছেলেমানুষী পুনরুক্তি, যান্ত্রিক অনুপ্রাস ও অনৌচিত্য-দুষ্ট উপমার ত্র্যহস্পর্শ ঘটেছে ;—

রক্ষঃ-অনীকিনী—
নিনাদিলা বীরমদে, নিনাদেন যথা
দানবদলনী দুর্গা দানবনিনাদে। (৭।২৫৭-৫৯)

(প) 'বসেন বিষাদে দেবী, বসেন যেমতি—' (১।৫০৩)

পাঠক লক্ষ্য করুন, 'ব', 'স' ও 'দ' ধ্বনির অনুপ্রাসে সহজেই আসর জমিয়ে কবি বলতে সুরু করেছেন ইন্দিরা-দেবীর বসার কায়দা; কিন্তু শেষ করবার আগে আরো যে একটি 'বসি' আমদানী করা হলো,—সম্ভবত ঐ 'ব' ও 'স' ধ্বনিগত অনুপ্রাসেরই ঝোঁকে,—তার বসায় অর্থাৎ অবস্থানের আড়ষ্টতা দেখে বেচারার প্রতি দুঃখ হয়। পাঁচ লাইনের এই রচনাটুকুর প্রথম লাইন উপরেই উদ্ধৃত, বাকী অংশ,—"বিজয়া-দশমী যবে বিরহের সাথে / প্রভাতয়ে গৌড়গৃহে —উমা চন্দ্রাননা / করতলে বিন্যাসিয়া কপোল, কমলা / তেজস্বিনী, বসি দেবী কমল-আসনে" ; এই শেষের 'বসি' শব্দটির বাকী অংশের সঙ্গে অন্বয় রচনার উপায় কবি রাখেন নি।

(ফ) শব্দ-প্রয়োগে আরো রকমারি যথেচ্ছাচারের দৃষ্টান্ত ঃ—

(৵০) অবহেলি শরানলে ; বিরহ-অনলে
(দুরূহ) ডরাই সদা ; (৩।৫৩০-৩১)

'দুরূহ' অর্থ কী ? বাক্যটির কোথাও কি এর অর্থসামঞ্জস্যপূর্ণ স্থান থাকতে পারে ? ব্রাকেটে উল্লেখ থাকলেও তার প্রযোজ্যতা থাকা চাই বৈ কি। অথচ এ ঝঞ্ঝাট কবি জড়িয়েছেন সেই যান্ত্রিক অনুপ্রাসের মোহে, 'বিরহ' আর 'দুরূহ' এই দুয়ে জোর করে জোট পাকাবার দুর্দান্তপনায়।

(৶০) মহারথিকুল-ইন্দ্র আছিল যাহারা,
দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস, ক্ষয় এ দুর্জয়
রণে ! (১।৫৭৭-৭৯)

'দুর্জয়'-এর সঙ্গে মিলিয়ে 'ক্ষয়' শব্দটি বসানো হয়েছে। কেমন হয়েছে প্রয়োগটি, পাঠক বিবেচনা করুন।

(৷০) উত্তরিলা হাসি
রামানুজ, "রক্ষোবংশ-ধ্বংস, বীরমণি !
রাঘবের দাসআমি।" (৫।১৯৭-৯৯)

সুগ্রীবের প্রতি লক্ষ্মণের এই উক্তিতে 'রক্ষোবংশ-ধ্বংস' এই সংযুক্ত পদটি অবশ্যই কবির মেহনত ক'রে গড়া, কিন্তু 'বংশে' আর ধ্বংসে' অনুপ্রাস, এবং সবশুদ্ধ একটা চওড়া গুরুগম্ভীর আওয়াজ ছাড়া এর মধ্যে আর কিছু আছে কি ? ব্যুৎপত্তিগত অর্থই বা কী হবে, আর কোথায়ই বা অন্বয় দেখাতে হবে ? একেই বলে শব্দের বাজি-ফোটানো !

(।০) পদরচনায় ও প্রয়োগে এমন শব্দ-বেপরোয়া বলেই কবি লিখতে পারেন,—"বারিদপ্রতিমস্বনে স্বনি উত্তরিলা, সুগ্রীব" (৭।২৪৬)। "স্বনি"টাকে বাদ দিলেই হয় সমগ্র প্রয়োগটি সুন্দর, নির্দোষ ; কিন্তু কবির চাই যমক-অনুপ্রাসের ঝমাঝম ; অর্থ বা প্রয়োগসুষমা নয়।

প্রভঞ্জন যেমতি, উপাড়ি
অভ্রভেদী মহীরুহ, হানে গিরিশিরে
ঝড়ে ! ভীমাঘাতে হস্তী নিরস্ত, পড়িলা
হাঁটু গাড়ি। (৭।৬৩৫-৩৮)

রাবণের গদার আঘাতে ইন্দ্রের ঐরাবতের দুর্দশার বর্ণনা। এখানে 'ঝড়ে' শব্দটির কোনো স্থান আছে কি ? কিন্তু তা হলে কি হবে, 'ঝড়াকারে' পদের আমদানীতে অভ্যস্ত কবির কলমে সবই সম্ভব। তা ছাড়া বোধহয়, 'উপাড়ি', 'ঝড়ে', 'পড়িলা', 'গাড়ি'—এগুলিতে যে 'ড়'-ধ্বনির বাজনা বেজেছে, তার প্রলোভন কবি এড়াতে চান নি। তাই তো 'হস্তী'র 'স্ত'-ধ্বনির সঙ্গে তাল ঠুকে 'নিরস্ত'-ও প্রয়োগের দিক দিয়ে ঠুঁটো হয়ে রইলো।

(।/০) খেদাইব সুগ্রীব, অঙ্গদে
সাগর অতল জলে ! (৫।৪৬৫-৬৬)

'সাগর' শব্দটির ব্যবহারগত পঙ্গুতা লক্ষণীয়।

(।৵০) 'দ্রুত ইরম্মদে দগ্ধিব কর্বুরে' (৫।৯০)

তিনটি 'দ'-এর অনুপ্রাস ও একটি যুক্তধ্বনির ধাক্কা, এ ছাড়া 'দ্রুত' শব্দটির কোনো প্রয়োগ-সার্থকতা নেই। অর্থাৎ কেবল শব্দ-ধ্বনি, অর্থ বা অর্থযুক্ত প্রয়োগ এখানে কেমন হলো, তা কবি দেখলেন না। 'দ্রুতগামী ইরম্মদ', এও যেমন কাঁচা কথা, 'দ্রুত দগ্ধ করিব', এও তেমনি বা ততোঽধিক কাঁচা।

(।৶০) ত্রিদিবসৈন্য শূন্য কেন হেরি
এ বিরহে ? (৭।৩১৬)

'সৈন্য-শূন্য', 'হেরি-বিরহে', সেই যান্ত্রিক শব্দানুপ্রাস ছাড়া কোনো অর্থবোধ সংগ্রহ করতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। 'শূন্য' ও 'বিরহে', ব্যবহারগুণে উভয়ই নিরর্থক মনে হয়। 'বিরহে' তো একটি ধাঁধাঁ-স্বরূপ। 'মেঘনাদবধের ভাষায় প্রায় আগাগোড়া যে অনুপ্রাসের ছড়াছড়ি'—এটা মোহিতলাল খুব ভালোই লক্ষ্য করেছেন, এবং এ কাব্যের প্রায় প্রত্যেক চরণেই যে অনুপ্রাসের স্থান করার প্রয়াস, তাও তিনি দেখেছেন, শুধু তফাৎ এইখানে যে তাঁর রসবিচারে ঐ অনুপ্রাস আমদানীর দ্বারা কবি প্রত্যেক চরণকে "অনুপ্রাস-শিঞ্জনে শিঞ্জিত করিয়াছেন" (পৃঃ ২২১)। এখানে উদাহৃত এইসব ক্ষেত্রে ঐ শিঞ্জন-মাধুর্যে মুগ্ধ হওয়া আদৌ সম্ভব কিনা রসজ্ঞ পাঠক বিচার করবেন।

(৸৹) যাইব চল যথায় শিবিরে
চিন্তাকুল চিন্তামণি দাসের বিহনে (৬।৭০০)

'চিন্তামণি' শব্দেই রামচন্দ্র বুঝতে হবে, এই কবির জুলুম; নচেৎ তাঁর যমক-অনুপ্রাস জমাবার অসুবিধা হয়। তাঁর পদরচনা-শব্দযোজনার প্রধানতম নির্ণায়ক যে এই যমক-অনুপ্রাস, তাই যেখানেই 'চিন্তা', সেখানেই 'চিন্তামণি,' তা সে রামই হোন, আর বিষ্ণুই হোন—যেমন "ক্ষণকাল চিন্তি চিন্তামণি (যোগীন্দ্র-মানস-হংস) কহিলা মহীরে—" (৭।৪৫৭-৫৮)

(৸৶৹) কুলগ্নে, সখি, মগ্ন লোভ-মদে,
মাগিনু কুরঙ্গে আমি! (৪,২৭৫-৭৬)

লোভ-মদে 'মগ্ন' নয়, 'মত্ত'ই সুস্থ প্রয়োগ। কিন্তু কবির চাই লগ্নের সঙ্গে ধ্বনিসাম্যযুক্ত একটা জোট-বাঁধা শব্দ, নাই বা থাকুক প্রয়োগ-সৌষ্ঠব।

(৸৵৹) জানেন তাত বিভীষণ, দেবি,
তব পুত্র-পরাক্রম; দম্ভোলি-নিক্ষেপী
সহস্রাক্ষ * *
পাতালে নাগেন্দ্র, মর্ত্যে নরেন্দ্র। (৫।৪৮৪-৮৭)

মেঘনাদের স্বর্গমর্তপাতাল ত্রিভুবনজয়ী শক্তির ইঙ্গিত দেওয়ার প্রয়াস এখানে। দেবেন্দ্র ও নাগেন্দ্র, এ দুয়ের উল্লেখে স্বর্গ ও পাতালে আধিপত্যের কথা ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু 'নরেন্দ্র' শব্দে কি মর্তে অনুরূপ আধিপত্যের ইঙ্গিত ফোটে? যে-কোনো রাজাই তো নরেন্দ্র-পরিচিতির অধিকারী। ভাবপ্রকাশে শব্দের এই ব্যর্থতার মূলে আছে কবির সেই অনুপ্রাসমাত্রে পরিতৃপ্তি।

(॥৶৹) প্রচণ্ড আঘাতে

দণ্ডি তাত বিভীষণে, বাঁধিবে অধমে। (৬।৩৯৩-৯৪)

লঙ্কার পুরবাসীদের মুখে বসানো হয়েছে এই কথা। 'তাত' ও 'অধম', একই নিশ্বাসে দুটি বিরোধী ভাব-ব্যঞ্জক শব্দের এই ধরণের ব্যবহার একমাত্র মাইকেলের মতো বেপরোয়া কবির পক্ষেই সম্ভব।

(৸) কোমল কণ্ঠে স্বর্ণকণ্ঠমালা

ব্যথিল কোমল কণ্ঠ! (৭।১৮-১৯)

দ্বিতীয় 'কোমল কণ্ঠ' দ্বিরুক্তি হিসেবে অশোভন তো বটেই, আপত্তিকরও। নিতান্তই শব্দ-কচ্‌কচি।

(৸৹) পড়েছিল যথা

হিড়িম্বার স্নেহনীড়ে পালিত গরুড়

ঘটোৎকচ, (১।২৬৫-৬৭)

'ড়'-এর হিড়িকে 'গরুড়' চালিয়ে দেওয়া হলো; প্রয়োগের প্রসন্নতা বা শব্দের অর্থ-ব্যঞ্জনা, এসবের কোন দিকে কবির ভ্রুক্ষেপ নেই। পরপর তিনটি 'ড়' যুক্ত শব্দের যোগাড় হয়ে যেতেই, আরো একটি সন্ধানের ঠেলায় কবির মনে হুড়মুড় ক'রে এলো 'গরুড়' আর তিনিও ছত্রটির হুড়মুড় ধ্বনিতেই হলেন পুলকিত। 'গরুড়'-এর মধ্যে বীরসুলভ কী বৈশিষ্ট্য এখানে কবির উদ্দিষ্ট তা পাঠকেরই অনুমানের বস্তু হয়ে রইলো। সাংকেতিক প্রয়োগ একে বলে না। সেই 'হর্যক্ষে'র মতোই শব্দ-ব্যবহার। সাংকেতিকতায় প্রকাশ কেন বিড়ম্বিত হবে? প্রকাশের সরলতায় 'গরুড়' কেমন সাংকেতিক হতে পারে রবীন্দ্রনাথে তার নমুনা—

তরুণ গরুড় সম কী মহৎ ক্ষুধার আবেশ

পীড়ন করিছে তারে, কী তাহার দুরন্ত প্রার্থনা,

অমর বিহঙ্গ-শিশু কোন্ বিশ্বে করিবে রচনা

আপন বিরাট নীড়! (ভাষা ও ছন্দ)

(ব) যে রবির ছবি পানে চাহি বাঁচি আমি

অহরহঃ, অস্তাচলে আচ্ছন্ন লো তিনি! (২।৫৭-৫৮)

'লঙ্কার পঙ্কজ রবি যাবে অস্তাচলে' বা 'গেলা অস্তাচলে', অন্তত বার চারেক কবি আমাদের শুনিয়েছেন এই কাব্যে; এবং রবির অস্তাচলে যাওয়া বলতে

নিশ্চয়ই আমাদের বুঝতে বলেছেন ঐ রবির উপমায় উপমেয় মেঘনাদের মৃত্যু। কবির সেই একই ভাষা এখানে 'অস্তাচলে', এবং 'রবি'ও এখানে সেই 'মেঘনাদ'; কিন্তু সত্যই কি এখানে মৃত মেঘনাদের উদ্দেশেই প্রমীলার এই উক্তি? 'অস্তাচলে' শব্দটির প্রয়োগে কবির এই অসতর্কতা অমার্জনীয়।

(ভ) 'লঙ্কার পঙ্কজ-রবি গেলা অস্তাচলে,' ষষ্ঠসর্গে নায়কের করুণ নিধন-দৃশ্যে কবি-হৃদয়ের অসীম মমতা-মাখা একটি বিখ্যাত উক্তি। বস্তুত মমতাময় গভীর কারুণ্যের সংযোগেই এই উক্তিটি মানান-সই। কিন্তু এই একবার ছাড়া আরও যে তিনবার উক্তিটিকে স্থান দেওয়া হয়েছে মেঘনাদবধ কাব্যে, তার কোনো ক্ষেত্রেই বক্তা বা বক্তৃীর পক্ষে ঐ মমতা-কারুণ্যের বশবর্তী হওয়া স্বাভাবিক নয়। এ কাব্যে অন্যায় যুদ্ধে নিধনের প্ল্যানটাই যাঁর উদ্ভাবিত, সেই মায়াদেবী ইন্দ্রের কাছে বাহাদুরি দেখালেন ঐ প্ল্যানের নক্সা বুঝিয়ে। বললেন, লক্ষ্মণ দেবরাজ ইন্দ্রকে অবশ্যই ইন্দ্রজিত-ত্রাস-হীন করবে;—সঙ্গে সঙ্গে তাঁরই মুখে সর্বপ্রথম কবি তাঁর এই প্রিয়তম উক্তিটি আমাদের শোনালেন, 'লঙ্কার পঙ্কজ-রবি যাবে অস্তাচলে'! (১।৫২৪)। যা কবির নিজের জবানীতেই হতো স্বাভাবিক, সেটাই মায়ার মুখে ঠিক এই ক্ষেত্রে রীতিমত অস্বাভাবিক ও অপ্রত্যাশিত। দ্বিতীয়বার এই উক্তি আমাদের শুনতে হয় মেঘনাদেরই নিহন্তা স্বয়ং লক্ষ্মণের মুখে (৩।৪৬০), যে লক্ষ্মণের মেঘনাদের প্রতি হুঙ্কারের বাণীরূপ "আনায়-মাঝারে বাঘে" ইত্যাদি! সুতরাং দ্বিতীয় আবৃত্তিতে বক্তা ও বক্তৃতায় কেমন সঙ্গতি রক্ষিত হয়েছে, অবশ্যই অনুমেয়! তৃতীয়বারের আবৃত্তি শোনা যায় পুনরায় মায়াদেবীর মুখে পঞ্চমসর্গে এক নিতান্ত অনাবশ্যক স্বর্গ-সফরকালীন ইন্দ্রের সঙ্গে অনাবশ্যক আলাপে (৫।৬৭)। দেবীর এক মুখে এই দরদী আবৃত্তি, আর এক মুখে 'মায়া-জালে বেড়িব রাক্ষসে', 'তাঁহার (চণ্ডীর) প্রসাদে বিনাশিবে অনায়াসে দুর্মদ রাক্ষসে'। সঙ্গতি সম্পর্কে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

সঙ্গতি-নিরপেক্ষ নিছক শব্দ-ঝংকারে প্রমত্ত বলেই কবি ইন্দ্রের মুখেও তাঁর চিরশত্রু মেঘনাদ সম্বন্ধে বক্তব্যের বাণীরূপে 'কর্বূর-কুলের গর্ব"—এর মতো মমতাভরা প্রশস্তির সুরবিশিষ্ট কথা বার করেছেন (৫।৮৬)।

(ম) 'চিবাইয়া রোষে মুখস' (১।৪২৪)—মোহিতলালের প্রশংসাধন্য এই মাইকেলী প্রয়োগটিকে অবশ্যই আমরাও প্রশংসা করতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। প্রশংসিতের প্রশংসা যেমন সমাজধর্ম, তেমনি হয়তো সাহিত্যধর্মও। তাই আধুনিক বাংলা অভিধানেও 'মুখস'-এর এই অর্থ এবং ব্যবহারটিও স্থান পেয়েছে

'মেঘনাদবধ'-এর দোহাই দিয়ে। নচেৎ মুখস বা মুখোস (শ) বলতে কখনও 'লাগামের অংশ' —যেমন এখানে—বোঝাতো না, বোঝাতো 'মুখাবরণ' বা 'কৃত্রিম মুখের ছাঁচ'। এ ছাড়া 'বাজিরাজী, বক্রগ্রীব, চিবাইয়া রোষে মুখস'-এর আবৃত্তিতে পাছে সাধারণ রস-রুচির পাঠক অসুবিধা বোধ করেন, পাছে মনে করেন ভাষায় এমন গুরুচণ্ডালী বা জগাখিচুড়ী না ঘটালেই ভালো হতো, এজন্য কবির অনুকূলে—'স্থান ও ঘটনাবিশেষের ভাবমণ্ডল বজায় রাখিবার প্রয়োজন,' 'ভাষার এই নূতন সজ্জা এক রণসজ্জা,' 'একেবারে মুখের বোল' ব্যবহারের ক্ষমতা ইত্যাদি এমন সব যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে যাতে মাইকেলের শব্দপ্রয়োগের এই জাতীয় অসঙ্গতির দিকে অঙ্গুলি-সংকেতের সাহস কারও না দেখা দেয়। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, 'মন্দুরা ত্যজিয়া' থেকে সুরু করে, 'বাজিরাজী বক্রগ্রীব'—সূত্রে গম্ভীর শব্দের সঙ্গে গম্ভীর সুর ভেঁজে নিয়ে হঠাৎ যেই 'মুখস্' বলে শেষ করতে হয়, তখন যদি ঐ সব যুক্তির কথা মনে না থাকে তবে একটা হাস্যোদ্গার সংবরণ করা কঠিন হয়ে পড়ে বৈ কি। তা ছাড়া 'রোষ' আর 'মুখোস'-এর অনুপ্রাসও যে কবিকে প্রলুব্ধ করেছিলো এও অনস্বীকার্য।

অনুপ্রাস, তা সে যেখানেই হোক, যে ভাবেই হোক, মাইকেলের এক দুর্বার আকর্ষণ। রামায়ণের সীতাহরণ ঘটনাটি নিশ্চয়ই কোন হাসির ব্যাপার নয়। স্বয়ং সীতাদেবীকেই যদি সেই আতঙ্কময় নিদারুণ অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিতে হয় তবে ভাষার যে 'ভাবমণ্ডল' সৃষ্টির প্রয়োজন, তাতেও নিশ্চয়ই হাসির কোন স্থান থাকতে পারে না। কিন্তু মাইকেলের সীতা যেই বলেন,—

'অমনি ধরিল হাসিয়া ভাসুর তব আমায় তখনি',—(৪।৩৪৮)

তৎক্ষণাৎ ভেসে যায় যতকিছু প্রত্যাশিত ভাবমণ্ডল। যমদূতরূপী রাবণ সম্পর্কে আতঙ্কগ্রস্তা সীতাদেবীর মুখে 'হাসিয়া ভাসুর তব' এই আবৃত্তিতে মাইকেলের ভাষার শৈথিল্যে ও প্রয়োগের যথেচ্ছাচারে লজ্জা বোধ করতে হয়। যে পাপিষ্ঠ দুর্বৃত্ত তাঁর জীবনে সর্বনাশ ঘটিয়েছে, তারই সেই নারকীয় দৌরাত্ম্যের মুহূর্তটি বর্ণনকালে, সই-এর সঙ্গে তার ভাসুর-সম্পর্কটাই কি সীতার কাছে বড়ো হলো? অশোকবনে বন্দিনী দশায় 'একাকিনী শোকাকুলা' হয়ে দিনযাপনের মধ্যে সীতাদেবীর মনে কি রাবণের ঐ 'সই-এর ভাসুর'-মূর্তিটাই থেকে থেকে জেগে উঠতো? যে শার্দূল-হরিণীর গল্প বলে এর ঠিক পরেই আসর জমানো হয়েছে, সেই শার্দূল বা 'ইরম্মদাকৃতি বাঘ' (নিকৃষ্ট প্রয়োগ)-এর সঙ্গে 'হাসিয়া ভাসুর তব'

এই প্রকাশভঙ্গিতে দ্যোতিত রাবণ-মূর্তির কোনো সঙ্গতি কল্পনা করা চলে কি? যাঁরা মাইকেলের শব্দ-প্রয়োগে স্থানকাল-পাত্রোপযোগী ভাবমণ্ডল-দ্যোতনার নিত্য সাফল্য ঘোষণা করতে বদ্ধপরিকর, তাঁরা দেখুন, সীতার জীবনের করালতম দুর্যোগ-বর্ণনায় সীতারই মুখে ঐ শৈথিল্য-লাঞ্ছিত সুরের কথায় বক্তৃী-মানসের উপযুক্ত ভাবমণ্ডল কেমন দ্যোতিত হয়েছে! সরমাই যেখানে 'নিষ্ঠুর, দুষ্ট লঙ্কাপতি' বা 'সবংশে মরিবে দুষ্টমতি' এইভাবে রাবণের উল্লেখ করছে, সেখানে লুন্ঠিতা-লাঞ্ছিতা স্বয়ং সীতাদেবীর 'হাসিয়া ভাস্বর তব' এই ভঙ্গিতে কথা বলায় যে জঘন্য ন্যাকাপানির সুর বাজে, তার সঙ্গে বর্ণনীয় বিষয়টির চরম অসঙ্গতি নিতান্ত পীড়াদায়ক। এরও মূলে আছে সেই অনুপ্রাসের নেশা, (হাসিয়া-ভাস্বর, তব-তখনি) যা এখানে চরম শৈথিল্যের প্রতি কবিকে করেছে উদাসীন।

"ইরম্মদাকৃতি বাঘ"ও (৪।৩৫৩) গুরুচণ্ডালী-দুষ্ট শিথিল প্রয়োগ; "ফাঁফর হইয়া" (৪.৩৭৯), 'বারুইর' যথা' (১।৩৬৩) অথবা "ডাকিল ফিঙা,* আর পাখী যত" (২।১২২)—এ প্রয়োগগুলিও অপ্রসন্ন; কিন্তু পূর্বোক্ত "হাসিয়া ভাস্বর তব"—রচনাংশে শব্দ-যোজনার শৈথিল্য সকল মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। এই উক্তিতে যে সীতা-চরিত্রের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়েছে তা কবি খেয়াল করেন নি। (এই প্রসঙ্গে "কৃত্তিবাসী ঋণের বহর" প্রবন্ধটির ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।)

(য) নিছক মাত্রারক্ষার খাতিরে মাইকেল যে পদ-প্রয়োগে কতো বিকৃতি চালিয়ে গেছেন, এখানে (নিম্নে মোটা অক্ষরে মুদ্রিত) তার কিছু নমুনা দেওয়া হলো :—

'এতেক কহিয়া রমা **মুরলার** সহ' (১।৫৫০), 'সরস **মধুর** মাসে' (৪।২২৭), 'সৌমিত্রি **ভ্রাতার** সহ' (৭।৩৩৫), 'মরিবে পৌলস্ত্য যথোচিত শাস্তি **পাই**' (৪।৫৯২), 'আইল **ধাই** রক্তবর্ণ আঁখি হর্যক্ষ' (৫।২৩২), 'সুকৌষিক বস্ত্র **পরাই**' (৯।৩৪২), 'আজ্ঞা কর দাসে **শাস্তি** নরাধমে' (৬।৫৬১), 'ভিক্ষা দেহ রঘুবধূ ক্ষুধার্ত **অতিথে**' (৪.৩৩০), 'বহিছে **কলে** প্রবাহিণী ঝরি' (৮।৬৮০), 'এ ভবমণ্ডলে স্বেচ্ছায় কে **গ্রহে** জন্ম' (৮।৩৩৫), 'দক্ষিণে **রক্ষঃ** বিভীষণ-বলী মিত্র, আর **নেতৃ** যত' (৯।৬৭-৬৮), 'যথায় বাসব-ত্রাস **বসে** বীরমণি' (১।৬২১)।

* 'ফিঙে'-পাখী যে খুব ভোরেই ডাকে, সেটা ঠিক, কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে বর্ণনীয় পরিমণ্ডল সৃষ্টিতে ভাষার যে কাজ, তা বিঘ্নিত হয়েছে নামটির ধ্বনিগত তুচ্ছতায়।

(র) মাইকেলের হাতে অসতর্ক প্রয়োগের নমুনা চতুর্দশপদী পদাবলীতেও প্রচুর দৃষ্ট হয়।

(৵০) বিরহ-লেখন পরে লিখিল লেখনী
যার, বীর জায়া-পক্ষে বীর পতি-গ্রামে ; (উপক্রম)

সমগ্র বীরাঙ্গনা-কাব্য সম্পর্কে 'বিরহ-লেখন' বা বিরহ-পত্র, ঠিক এই পরিচিতি নিখুঁত নয় ; যেহেতু এখানে বিরহমূলক ভাব ছাড়া অন্য ভাবও স্থান পেয়েছে ; তবে নায়কের অনুপস্থিতিতে নায়িকারা পত্র লিখেছেন, এইজন্য হয়তো 'বিরহ' কথাটাকে খুব ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু এই পত্র-কাব্যখানির সাধারণ পরিচয়ে 'বীর জায়া-পক্ষে বীর পতিগ্রামে'—এ কথা কবি লিখলেন কী হিসাবে? প্রথমত, এখানকার নায়িকা-নায়ক সকলেই জায়া-পতি সম্পর্কযুক্ত নয় ; যেমন, সোম ও তারা, লক্ষ্মণ ও সূর্পণখা, বা পুরুরবা ও উর্বশী (পত্র-লিখন কালে)। দ্বিতীয়ত, পতিপক্ষে বা নায়কপক্ষে 'বীর' শব্দ প্রয়োগে একমাত্র 'সোম' ছাড়া আর কোথাও আপত্তি নেই বটে, কি নায়িকা-পক্ষে ঐ একই 'বীর' শব্দের প্রয়োগ অধিকাংশ স্থলেই আপত্তিকর।

(৶০) মজিনু বিফল তপে অবরণ্যে বরি ;—
কেলিনু শৈবালে, ভুলি কমল-কানন! (বঙ্গভাষা)

মাতৃভাষা বাংলাকে অবহেলা করার জন্য কবি যে আক্ষেপ প্রকাশ করতে চান, তার আন্তরিকতা উপভোগ্য ঠিকই ; কিন্তু তার জন্য তিনি ইংরাজী ভাষাকে 'অবরণ্য' (শুদ্ধরূপ হওয়া উচিত ছিল 'অবরেণ্য') বলতে পারেন কি? জগতের সুধীসমাজ যে ভাষা ও সাহিত্যকে শ্রেষ্ঠত্বের বরণ দিয়েছে, প্রকৃতপক্ষে যে ভাষায় তিনি নিজে মানুষ হয়েছেন, পাশ্চাত্য সাহিত্যের ধনরত্ন সংগ্রহ করে ধন্য হয়েছেন, যে ভাষার মিলটনের নামে তিনি হতেন আত্মহারা—Milton is divine'-, স্বাধীন ভাবে দুটো কথা বলতে হলেই তাঁকে যে ভাষার দ্বারস্থ হতে হতো (চিঠিপত্রে), শেষদিনেও যে ভাষার আবৃত্তি মুখে নিয়ে তাঁকে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করতে হয়েছে, সেই ইংরাজীর প্রতি তাঁর এই প্রয়োগটিতে যে অশ্রদ্ধা, অবজ্ঞা বা তুচ্ছতা প্রকাশ পেলো, তা কবি খেয়াল করলেন না। অধিকন্তু উপমায় মেতে গিয়ে বাংলা-ভাষা ও ইংরাজী-ভাষার তুলনামূলক প্রস্তাবে, সেই বিদেশী সাহিত্যের প্রতি অহেতুক অবজ্ঞা-প্রকাশের অন্যায় উপেক্ষা করে, বাংলাকে পদ্মের

সঙ্গে ও ইংরাজীকে শৈবালের সঙ্গে উপমিত করে কবি একদিকে যেমন ঔচিত্য-বিধি লঙ্ঘন করেছেন, অন্যদিকে তেমনি বিরাট অসংগতি-অপরাধের আসামী হয়েছেন।

(৵০) জনক জননী তব দিলা শুভ ক্ষণে
কৃত্তিবাস নাম তোমা !—কীর্তির বসতি
সতত তোমার নামে সুবঙ্গ-ভবনে, (কৃত্তিবাস)

চৌদ্দ লাইনের কবিতাটির আট লাইন ব্যাপী যে প্রথম ভাগ, তাতে যে একটিমাত্র কথা কবি খুব জমকিয়ে বলতে চেয়েছেন, সেটি হলো, 'কৃত্তিবাস' নামটি বুঝি শুভক্ষণেই দেওয়া হয় কবিকে ; এমন সার্থক নাম আর হয় না। কারণ দেখিয়েছেন, কীর্তির এমন চির-অধিষ্ঠান যে এই নামে ঘটবে, এ বুঝেই যেন 'কৃত্তিবাস' নাম দেওয়া হয়েছিলো। কিন্তু কিসের ভিত্তিতে মাইকেলের এই নামটি নিয়ে এতো আড়ম্বর ? রামায়ণ-অনুবাদক মহাকবির নাম হলো 'কৃত্তিবাস', 'কীর্তিবাস' তো নয় ? দুটি পদের মধ্যে কি অর্থগত কি উচ্চারণগত কোনো মিলই থাকবার কথা নয়। কিন্তু বেপরোয়া কবি মাইকেল 'কৃত্তিবাস' ও 'কীর্তিবাস'-এর মধ্যে কোনো প্রভেদ না করেই থালি একটা কথার জাল বুনে ছেড়ে দিয়েছেন। এই একই বেপরোয়া-পানার বশবর্তী হয়ে, এতো বড়ো একটা শাব্দিক প্রমাদ উপেক্ষা করে মেঘনাদবধ-এর চতুর্থ সর্গের প্রথম কয়েকটি ছত্রে কবিগুরু-বন্দনা-প্রসঙ্গে মাইকেল লিখেছেন, "কীর্তিবাস—কীর্তিবাস কবি"। লক্ষ্য তাঁর যমকের চমক লাগানো,—তা শব্দের রূপ বা গঠনের যে বিকৃতিই ঘটুক না কেন। মেঘনাদবধের আলোচ্য অংশে 'কীর্তিবাস' এই বানানেই যে মাইকেল রামায়ণের কবির নাম লিখেছেন, এর প্রমাণ ঐ গ্রন্থের যাবতীয় সংস্করণে ঐ একই পাঠ দেখা যায়, এবং হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের টীকা-সমন্বিত প্রাচীন সংস্করণে ঐ পাঠই বজায় করে টীকাকারকে 'কীর্তিবাস'-এর পাশে ব্রাকেটে 'কৃত্তিবাস' লিখতে হয়েছে।

(।০) সত্য কি হে এ কাহিনী, কহ মহামতি ?
মিথ্যা কে বা বলে বলি ! (কালিদাস)

মহাকবি কালিদাসের জন্য 'বলী' বিশেষণটি নির্বাচিত হওয়ার ভিত্তি খুঁজে হয়রান হওয়ারই কথা ; কিন্তু মাইকেল অনুপ্রাস জমাবার ঝোঁকে (বলে বলি), আর প্রযোজ্যতা নিয়ে মাথা ঘামান নি। তাছাড়া 'বলী' শব্দের সম্বোধনে 'বলিন', 'বলি' যে ব্যাকরণদুষ্ট, সে তো আছেই।

(।/০) নীরবিলা ধীরে সাধ্বী, ধীরে যথা রহে
বাহ্য-জ্ঞান-শূন্য মূর্তি, নির্মিত পাষাণে! (সীতা-বনবাসে)

দ্বিতীয় 'ধীরে' নিরর্থক শব্দ-প্রয়োগ। পাষাণ-মূর্তি যেমন অচল হয়ে থাকে, এই ছিল কবির বক্তব্য, কিন্তু অনুপ্রাসের মোহে কবি 'অচল' অর্থে ধীরে, এই অচল চালিয়ে গেলেন।

(।৵০) নব রস-সুধা কোথা বয়েসের হাসে?
কালে সুবর্ণের বর্ণ ম্লান, লো যুবতী! (ভাষা)

বাংলা ভাষার প্রতি গভীর দরদের বশেই কবির এই সনেট রচনা। কিন্তু দরদ প্রকাশের বেলা নিজের ভাষা ও প্রয়োগভঙ্গিতে কবি এমন অসতর্কতা বা চপলতার পরিচয় দিয়েছেন যে, তার ফলে ঐ দরদের আন্তরিকতা ও গাম্ভীর্য অন্তত আংশিকভাবে চাপা পড়ে গেছে। বাংলা যুবতী বলেই অধিকতর আকর্ষণীয়া, আর সংস্কৃত প্রবীণা বলেই রসহীনা, এই ধরণের প্রস্তাবের সমাবেশে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির মধ্যে একটা তরলতার হাওয়া বইয়ে দেওয়া খুবই অসমীচীন হয়েছে। বয়সে প্রবীণা বলে সংস্কৃত ভাষা তার কাব্যরস হারিয়েছে, এও যেমন অচল যুক্তি, যে দৃষ্টান্তের সাহায্যে কবি তাঁর প্রস্তাবটিকে প্রতিষ্ঠিত করতে গেছেন, তারও কোনও যুক্তি-ভিত্তি নেই। কালে সুবর্ণের বর্ণ ম্লান হয় না। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, দুটি ছত্রের মধ্যেই বেশ একটা শব্দানুপ্রাসের টান আছে, যে টানেই কবি বসিয়ে গেছেন তাঁর খেয়ালে-ভেসে-আসা শব্দাবলী।

(।৶০) 'মিত্রাক্ষর' নামক সনেটটি মাইকেলের অসতর্ক রচনার এক প্রকাণ্ড নিদর্শন। ভাষায় ও ভাষণে চূড়ান্ত অসংযম ও মাত্রাজ্ঞানের শোচনীয় অভাবে কবির মূল বক্তব্য, অথবা বাংলাভাষার প্রতি ও অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রতি তাঁর আসল হৃদয়ভাবটি সুস্পষ্ট হওয়ার পরিবর্তে অত্যন্ত অবাঞ্ছিত এক অশিষ্ট সুরের জঞ্জালে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। প্রথম পাঁচ লাইনে কবি এমন একটি ভণিতা করে নিলেন যাতে তিনি মিত্রাক্ষর ছন্দের কবিদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতে পারেন। হলেনও তাই,—'স্মরিলে হৃদয় মোর জ্বলি উঠে রাগে!' অতঃপর সুরু হলো :—

ছিল না কি ভাব-ধন, লো ললনে,
মনের ভাণ্ডারে তার, যে মিথ্যা সোহাগে
ভুলাতে তোমারে দিল এ তুচ্ছ ভূষণে?—

অন্তরে ভাব-ধন না থাকার জন্যই যে দুর্বল অক্ষম কবিরা মিত্রাক্ষর ব্যবহার করে গেছেন, এ প্রস্তাব যে কতো ভ্রান্ত, কতো অচল, কতো অসার ও কতোই অপরাধজনক, তা চিন্তাশীল পাঠকমাত্রেই বুঝবেন। মাইকেলের এই ভ্রান্তি ও অপরাধের মাত্রা আরও বেড়েছে ঐ 'মিথ্যা সোহাগ' ও 'কুচ্ছ ভূষণে'র অভিযোগে। তিনি একবারও ভেবে দেখেন নি, তাঁর এই অভিযোগের আওতায় এসে পড়েন, চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি-জ্ঞানদাস-গোবিন্দদাস-কৃত্তিবাস-কাশীরাম-মুকুন্দরাম-রামপ্রসাদ-ভারতচন্দ্র প্রমুখ কতোই না প্রতিভাধর অমর কাব্যের কবি! তিনি এই মিত্রাক্ষরের কবিদের নিবুদ্ধিতা বুঝাবার জন্য "কি কাজ রঞ্জনে রাঙি"-ইত্যাদি ভঙ্গিতে কবিতাটির শেষার্ধে যে অপ্রস্তুত প্রশংসা অলংকারের ঢেউয়ের পর ঢেউ তুলেছেন, তাতে ঐ ঢেউ থামলেই যে তাঁরই মূঢ়তা আরো প্রকট হতে থাকলো, তা একবারও ভাবেন নি। বেপরোয়া মন্তব্য চালনায় কবি এমনই মত্ত যে, তাঁর নিজেরই হাতে যে 'ব্রজাঙ্গনা'র মতো কাব্য এবং বহু খণ্ড-কবিতা ঐ মিত্রাক্ষরেই রচিত হয়েছে, এ কথা একবারও মনে হলো না।

(॥০) 'নিশা' নামক সনেটে সুরুতেই কবি এঁকেছেন এক জ্যোৎস্না-লোকিত রজনীর পরিবেশ-চিত্র।

> সুহাস-মুখে সরসীর জলে,
> চন্দ্রিমা করিছে কেলি প্রেমানন্দ-মনে।

তারপরে কবির চেষ্টা হয়েছে ঐ নিসর্গ-চিত্রের সাহায্যে তাঁর নিজেরই প্রিয়া-সম্ভাষণের আনন্দ উপভোগ করার। সরোবরে যেমন জ্যোৎস্নার তেমনি কবির হৃদয়-সরোবরে প্রতিফলিত হয়েছে প্রিয়ার মূর্তি। "চন্দ্রিমার রূপে এতে তোমার মূরতি!" সুন্দর প্রস্তাব। কিন্তু হঠাৎ যে কী হলো? কবির খেয়ালী কলমে বেরুলো—

> কাল বলি অবহেলা, প্রেয়সি, যে করে
> নিশায়, আমার মতে সে বড় দুর্মতি।
> হেন সুবাসিত শ্বাস, হাস স্নিগ্ধ করে
> যার, সে কি কভু মন্দ, ওলো রসবতি?

নিশাকে 'কালো' বলায় কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার রজনী বুঝতে হয়, এবং 'অবহেলা'ও সেইজন্য, কবির 'দুর্মতি' নিন্দাবাদও সেইজন্য। কিন্তু গোড়াতেই

যে 'নিশা' বলতে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত নৈশ প্রকৃতির চিত্র আঁকা হয়েছে, সেদিকেও কবির ভ্রূক্ষেপ নেই, আবার এখানেও "হাস স্নিগ্ধ করে যার", অর্থাৎ জ্যোৎস্নাই যার হাস্যস্বরূপ, এই বলে সেই চন্দ্রালোকিত নিশার রূপটাই যে ধরে রাখা হয়েছে, তাও কবি খেয়াল করলেন না। কবি কেবল নূতন নূতন বাচনভঙ্গি দেখাতেই ব্যস্ত। সঙ্গতিরক্ষার কোনো বালাই তাঁর নেই।

(॥৵০) মাইকেলের শব্দ-প্রয়োগে যথেচ্ছাচার ও প্রসঙ্গ-যোজনার অনৌচিত্যের অপর একটি দৃষ্টান্তস্থল ৫৯ নং চতুর্দশপদী কবিতাটি।

নহি আমি, চারু-নেত্রা, সৌমিত্রি কেশরী,
তবে কেন পরাভূত না হব সমরে ?
চন্দ্র-চূড় রথী তুমি, বড় ভয়ঙ্করী,
মেঘনাদ-সম শিক্ষা মদনের বরে।
গিরির আড়ালে থেকে, বাঁধ, লো সুন্দরি,
নাগ-পাশে অরি তুমি ; দশ গোটা শরে
কাট গণ্ডদেশ তার, দণ্ড লো অধরে ;
মুহুর্মুহুঃ ভূকম্পনে অধীর লো করি !—
এ বড় অদ্ভুত রণ ! তব শঙ্খ ধ্বনি
শুনিলে টুটে লো বল ! শ্বাস-বায়ু-বাণে
ধৈরয-কবচ তুমি উড়ায়ে, রমণি,
কটাক্ষের তীক্ষ্ণ অস্ত্রে বিঁধ লো পরাণে :—
এতে দিগম্বরী-রূপ যদি, সুবদনি,
ত্রস্ত হয়ে ব্যস্তে কে লো পরাস্ত না মানে ?*

কেন যে এমন একটি বিষয়বস্তুর মধ্যে, কামোন্মত্তা নারীর পুরুষের উপর প্রভাব-বর্ণন ও মদন-ক্রিয়ার এমন নগ্নচিত্রের মধ্যে 'সৌমিত্রি কেশরী', 'চন্দ্র-চূড়-রথী' বা 'মেঘনাদ'-এর প্রসঙ্গ আদৌ আমদানী করা হয়েছে, তা বোঝা দুঃসাধ্য। এই নামগুলির শুভ্র সৌন্দর্য ও এদের সঙ্গে বিজড়িত ধ্বনি-গাম্ভীর্যের দ্বারা কবি কি এখানকার বর্ণিত কাম-কেলিকে একটি শব্দ-গাম্ভীর্যের মোড়কে মুড়তে চেয়েছেন ? বিশেষত মেঘনাদের প্রসঙ্গটিকে

* কবিতাটির পূর্ণাঙ্গ সমালোচনার জন্য মৎসম্পাদিত চতুর্দশপদী কবিতাবলী (মডার্ণ বুক এজেন্সী) দ্রষ্টব্য।

এখানে যেভাবে কাজে লাগানো হয়েছে, তাতে কাব্যের ঔচিত্যধর্মের প্রতি কবির তাচ্ছিল্য উৎকটভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কবি-কল্পনার সঙ্গে সঙ্গে শব্দ-প্রয়োগেরও কী যথেচ্ছাচারই না ঘটেছে এখানে? 'চন্দ্র-চূড়-রথী' এই জমকালো পদটি যার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে সে হলো কামকেলি-পরায়ণা নারী; অথচ তাকেই 'চন্দ্র-চূড়-রথী' বলার যুক্তি কোথায়? সমাসবদ্ধ পদটির সাধারণ অর্থে মহাদেবকেই বুঝতে হয়। যিনিই চন্দ্রচূড় তিনিই রথী অর্থাৎ মহাবীর। কিন্তু কবির প্রয়োগভঙ্গিতে বুঝতে হয়, সম্ভবত উদ্দিষ্ট ভাবটি এই, চন্দ্রচূড় মহাদেবও নারীর মোহিনী শক্তির নিকট পরাভূত। কিন্তু 'রথী' শব্দে একেবারে 'জয়ী' বোঝানোর চেষ্টা শব্দপ্রয়োগে যথেচ্ছাচার ছাড়া কিছু নয়, তার উপর বাঞ্ছিত স্ত্রীলিঙ্গরূপের উপেক্ষা আরও আপত্তিজনক। যে-কোনো উপায়ে শব্দাড়ম্বরই কবির অন্যতম লক্ষ্য হওয়ায় এমন একটি অচল প্রয়োগও চালানো হয়েছে। "গিরির আড়ালে" প্রয়োগটি এসেছে মেঘনাদ-সমরের "মেঘের আড়াল"-এর ছাঁচে। কিন্তু কামের সময়ে নারীর তরফে "গিরির আড়াল"-টা যে কিসের, তা বোঝা যায় না। প্রাচীন বাংলায় 'গিরি'-কে কচিৎ-কখনো 'গৃহ' বা 'ঘর' অর্থে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়, কিন্তু 'ঘরের আড়ালে থেকে', এও বা কী আজগুবি প্রয়োগ হলো? তবে কি ছত্রটির শেষ শব্দ 'সুন্দরি' ও 'গিরি'-কে নিয়ে শুধুই একটা অনুপ্রাসের জোট বাঁধা? কী বিচিত্র মাইকেলের এই শব্দ-প্রয়োগের খেয়ালীপনা!

বস্তুত মহাকবি মাইকেল মধুসূদনের বে-পরোয়া পদ-রচনা বা অসঙ্গত প্রয়োগের তালিকা নির্মাণ করতে যাওয়া বৃথা। বহু পদ-রচনা যেমন তাঁর সৃষ্টির প্রশংসা জাগায়, তেমনি দূষিত বা অসঙ্গত রচনা ও প্রয়োগের দৃষ্টান্ত এতো অধিকসংখ্যক যে কবির রচনাগত এই দুর্বলতা কিছুতেই উপেক্ষিত হতে পারে না। মাইকেল-প্রশস্তিতে অভ্যস্ত বাঙালী পাঠক অতিরিক্ত সহৃদয়তার বশে কেবল দুরূহ আভিধানিক শব্দ-যোজনার অভিযোগের কথাটাই বড়ো ক'রে দেখেছে, যেটা হয়তো মাইকেল-ভক্ত-মহলে বৈদগ্ধ্যের চিহ্নমাত্র বলেই অভিনন্দিত হয়ে থাকে। বিশেষ তো, যখন 'যাদঃপতিরোধঃ যথা চলোর্মি-আঘাতে'-এর মতো একটা নিদারুণ আপত্তিকর ছত্রও পেয়ে গেল রবীন্দ্রনাথের সমর্থন, তখন আর ভয় কি? কিন্তু ভয়-ভরসার কথা নয়। 'মেঘনাদবধ' কাব্যের কবি শ্রীমধুসূদনের অসামান্য প্রতিভার

পরিচয়কে উপেক্ষা করার ধৃষ্টতা কারও থাকতে পারে না, তবে এই কাব্যের রচনাক্ষেত্রে অজস্র ত্রুটি-বিচ্যুতি যে আগাছার জঞ্জাল হয়েই আছে, সেগুলোকেও ফসলের পর্যায়ে মিশিয়ে সমগ্র সৃষ্টির উপর রচনাগত উৎকর্ষের উচ্চমানের লেবেল এঁটে দেওয়া কখনই কাম্য হতে পারে না। আর যেখানে কারিগরির মধ্যে শৈথিল্য-অসঙ্গতি-অসামঞ্জস্যের এতো প্রচুর রন্ধ্র রয়ে গেছে, সেখানে সমগ্রভাবে এখানকার শব্দ-শিল্প বা প্রযুক্তি-বিদ্যা সম্পর্কে শিল্পীর কোনো বৈজ্ঞানিক নীতি-নিষ্ঠা দেখাতে যাওয়া কেবল সত্যকে চাপা দিয়ে গবেষণার অন্যায় বাহাদুরি ফলানো ছাড়া আর কিছু নয়। রবীন্দ্রনাথের মতো বিচ্ছিন্ন-ভাবে অমন দুটি একটি প্রয়োগের সার্থকতা উদ্ধার করা এক জিনিষ,—তাতে সমজদারের বিশেষত্বই ফোটে, স্রষ্টার নয়,—আর সমগ্র কাব্যের রচনা সম্পর্কে ঢালোয়া অভিমত দেওয়া আর এক জিনিষ। কেউ যখন বলেন,

রাবণ, ফিরায়ে আঁখি, দেখিলেন দূরে
সাগর—মকরালয় ;

এখানে 'মকরালয়' শব্দটির মধ্যে 'করাল' অর্থাৎ সাগরের করালতা প্রচ্ছন্ন অথচ সুনিশ্চিতভাবে ফুটেছে, এবং এইখানেই কবির পদ-নির্বাচনের বিশেষত্ব, তখন তাঁর এই আবিষ্কারের অবশ্যই তারিফ করতে হয়, কিন্তু মাইকেল যে ঠিক ঐ সূক্ষ্মমানের নির্বাচন বা প্রয়োগ-নৈপুণ্যের নিত্য অধিকারী-রূপে অভিনন্দনের যোগ্য, এ ধারণা ভ্রান্ত। তা যদি হতেন, তবে পূর্বোক্ত ত্রুটিযুক্ত প্রয়োগের তালিকা ছাড়াও আরও বহু অপপ্রয়োগ তাঁর রচনায় এমন ছড়িয়ে থাকতো না।

ভীষণ মহিষাসুরকে 'তুরঙ্গমদমী' ব'লে (৮ম, ৫৯৯), বিড়ালাক্ষ রাক্ষসকে 'বিরূপাক্ষ' সদৃশ ব'লে (৭ম, ৫৩৮) চামরকে 'অমরত্রাস' ব'লে (৭ম, ৫২৭), অথবা রমা, কিনা লক্ষ্মীদেবীর পরিচয়ে কেবল 'বিম্বাধরা' বলে (৪র্থ, ৫৫) কবি যে কী নির্বাচন বা প্রয়োগ চাতুর্যের পরিচয় দিয়েছেন তা ভাবতে গেলেই ধরা পড়বে রচয়িতার বিপুল অসতর্কতা ও শৈথিল্য। "উদ্‌ভ্রান্তচেতনাম্ সীতাং... ত্রিজটা সমজীবয়ৎ" (রঘু, ১২।৭৪) কালিদাসের এই ত্রিজটা-পরিচিতি সত্ত্বেও এবং বাল্মীকি-কৃত্তিবাসের ত্রিজটা-কে সীতা-দরদী ও মমতাময়ী জেনেও কেন যে মাইকেল বার বার 'ত্রিজটা'র জন্য 'বিকটা' বিশেষণটি বরাদ্দ করেছেন (৫ম, ৪৬২ ; ৯ম, ১৪১) ; কেনই বা যে-সরমা অন্যত্র 'রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী রক্ষোবধূবেশে', যাকে পেয়ে সীতা বলেন, 'পাইনু সরমা সই, পরম পিরীতি',

তারই এক সম্বোধনে কবি 'সরমা রাক্ষসি!' (৯ম, ১৮৫) সীতামুখ-নিঃসৃত এমন কঠোর শব্দ ব্যবহার করেন; সখী বাসন্তীর প্রসঙ্গ এলেই তাকে 'বসন্ত-সৌরভা'-র মতো এমন একটা উঁচুদরের বিশেষণে বিশেষিত করা হয় যা স্বয়ং প্রমীলার ভাগ্যেও বুঝি দুর্লভ (৩য়, ১৯; ৭ম, ২০); অথবা কেনই বা 'পশুপতি-ত্রাস অস্ত্র পাশুপতসম' (১ম, ৭৭৪); বা 'বলে রিপুকুল-কাল বলী' (১ম, ৫৮৪; ৬ষ্ঠ, ৩২৭) এই ধরণের অসার্থক শব্দ-চালনায় কবি মত্ত থাকেন,—এসবের কোনো জবাব নেই, জবাব শুধু একটি, অনুপ্রাস-সূত্রে শব্দধ্বনি-সৃষ্টিতে তিনি সর্বত্র অর্থ-সামঞ্জস্য বা ভাব-সৌষ্ঠবের প্রতি সজাগ থাকার দায়িত্ব মানেন নি। তাই 'প্রসন্ন প্রসন্নময়ী' (৫ম, ২২৭), 'অসংখ্য রাক্ষসগ্রাম' (৬ষ্ঠ, ৫৪), 'বামা-কুল-দল' (৩য়, ৩৭৫) 'বালিবৃন্দ' (১।২২৫), 'হৈমময় স্তম্ভাবলী' (১।৬২৬), 'রবিকুলরবি' (১।২৬৩), 'বাহুবলেন্দ্র' (৬।১৪৬, ৬।৭২৩), 'সলজ্জায়' (৮।৬১৮), 'গোকুল-কুল' (চতুর্দশপদী-জয়দেব), 'চিরজন্যে,' 'শোকের বিহ্বলে' (সীতা-বনবাসে), 'বারি-সংঘটিত-ঘটে' (২।২৩৬), 'মধুর-সুস্বরে' (২।১৯১), 'আশুতরে' (৬।২২১) বা 'অম্বুরাশি সুতা' (১ম, ৬৬১)-র মতো দুষ্ট বা খেয়ালী প্রয়োগে মাইকেলের কাব্যদেহ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে আছে।

মেঘনাদ-বধ কাব্যে 'রথী' শব্দটির প্রয়োগ-সংখ্যা নিঃসন্দেহে শতাধিক এবং তার ব্যুৎপত্তিগত অর্থের প্রতি চরম ঔদাসীন্যের দৃষ্টান্তবাহুল্য লক্ষ্য করে আমরা বুঝতে বাধ্য যে, কবি এটিকে রথ-নিরপেক্ষ কেবল 'বীর' বা 'শূর' এই অর্থেই নিয়েছেন; কিন্তু যেখানে যুদ্ধের বা যুদ্ধ-সংক্রান্ত বিচিত্র আয়োজনের কথায় চতুরঙ্গ সেনার বৃত্তান্তে রথী-কে বিশিষ্টার্থে ব্যবহারের বাধ্যতা রয়েছে, সেখানে অ-রথীরও রথী-পরিচয় বিভ্রান্তি-জনক বৈ কি। তাই আকাশচারী শিবদূতকে বা পক্ষিরাজ জটায়ুকে অথবা নবম সর্গের শোকশোভাযাত্রায় 'কাতারে কাতারে চলা' রাক্ষসের দলকেও মেঘনাদ-রাবণাদির মতো 'রথী'-রূপে চিন্তা করতে হলে কবির শব্দ-প্রয়োগে শৈথিল্যের ধারণা কিছুতেই এড়ানো সম্ভব নয়।

কবি-প্রকৃতির ঠিক এই শৈথিল্য বা খেয়ালীপনার জন্য উপমাদি অলঙ্কার-প্রয়োগের ক্ষেত্রেও অর্থাসঙ্গতি, অনৌচিত্য, বা অসার্থকতার দৃষ্টান্তের অভাব নেই। পৃথক আসরেই বিষয়টি আলোচিত হওয়া আবশ্যক।

তৃতীয় অধ্যায়

মেঘনাদ-বধে কৃত্তিবাসী ঋণের বহর

[১] ভূমিকা

যে কাব্যের বিষয়বস্তু রামায়ণেরই কোনো ঘটনাংশ সেখানে মূল রামায়ণ অথবা অনুবাদের কাছে কবির ঋণ তো গোড়াতেই স্বীকৃত। কুতূহলী পাঠক লক্ষ্য করতে পারেন, নূতন যুগের মহাকবি সেই প্রাচীন মহাকাব্যের কি ভাবে অনুসরণ করেছেন, কোথায় কতখানি মূলের সঙ্গে মিল রেখেছেন, কি বা নূতন আমদানী করেছেন, সুরের বা ভাবের কিছু রদবদল ঘটেছে কিনা, বস্তু-অংশ বা ভাব-অংশ, কোথায় কী মৌলিকতার পরিচয় ফুটেছে, ইত্যাদি নানা বিষয় সমালোচনার বস্তু হওয়াই স্বাভাবিক। মাইকেলের মেঘনাদবধ নিয়ে এমন বহু আলোচনাই হয়ে গেছে। বাল্মীকি-রামায়ণ ও কৃত্তিবাসী-রামায়ণ থেকে মূল বস্তু গ্রহণ করলেও মধুসূদন যে কতো অভিনবত্বের বা স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন তাও আলোচিত হয়েছে নানা হাতে নানা ভঙ্গিতে। আলোচিত হয়েছে মেঘনাদবধে কালিদাসের আনুগত্যও। কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণের কতো ঘনিষ্ঠ অনুসৃতি যে এই কাব্যের অঙ্গীভূত হয়ে আছে তার নিবিড় ধারাবাহিক আলোচনা কোথাও হয়েছে বলে জানি না। বিষয়ের অনুসরণ তো হবেই, সেটা এই ধরণের কাব্যে বিশেষ অর্থে ঋণ বলেই গণ্য নয়, কিন্তু কৃত্তিবাসী রচনা ও ভাষণভঙ্গিরও যে কতো নিবিড় অনুসরণ মেঘনাদবধে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে, তা লক্ষ্য করলে মাইকেলের কৃত্তিবাসী ঋণের বহর দেখে সত্যই বিস্মিত হতে হয়। বস্তুত আমাদের মাইকেল-প্রশস্তির আবেগাতিশয্যে এই ঋণের অনেকখানি এখনও উপেক্ষিত বলে মনে হয়। মনে হয়, নূতন যুগের কবির প্রতিভাকে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করার পবিত্র উন্মাদনায় এই উপেক্ষা অনেকের চোখে পড়েও উপেক্ষিত রয়েছে। এমন কি, মাইকেলের মৌলিকতা-প্রদর্শনের হিড়িকে এমন কিছু কিছু বস্তু-বা-ভাব-অংশও অত্যুজ্জ্বল করে দেখানোর প্রথা চলে আসছে, যা প্রায় হুবহু কৃত্তিবাসী রামায়ণ থেকেই গৃহীত, অথবা যার নমুনা মেঘনাদবধের চেয়ে কৃত্তিবাসী রামায়ণেই উজ্জ্বলতর। এ কথায় আজ হয়তো চমক লাগবে যে, খাঁটি বীরচরিত্র হিসাবে

কৃত্তিবাসের মেঘনাদ আদৌ মাইকেলের মেঘনাদের পাশে ম্লান নয়, বরং আরো সুন্দর, যেহেতু আরো সম্পূর্ণ। মাইকেলের হাতে মেঘনাদ-চিত্রের পালিশ বা জৌলস হয়তো খুলেছে বেশি, এবং খুলেছে নূতন ভাষা ও নূতন ছন্দের জোরে, কিন্তু বীরত্বের মূল কাঠামো কৃত্তিবাসের রামায়ণেই দৃঢ়তর ও প্রশস্ততর। এ কথাও স্বীকার্য নয় যে রামায়ণের রাক্ষস-চরিত্র মাইকেলের হাতে প্রভূত পরিমাণে সমুন্নত ও মার্জিত রূপে দেখা দিয়েছে। একথা সত্য নয় যে, রামায়ণে বর্ণিত লঙ্কার রাক্ষস-বংশ 'বীভৎস রসের আধার নরশোণিতপ্রিয় জীব' মাত্র, ঠিক যেমন সত্য নয় রামায়ণের বানর-বংশ 'বৃহল্লাঙ্গুল রোমশ পশু' মাত্র। প্রমীলা ও চিত্রাঙ্গদার যে চিত্র ও চরিত্র-মহিমা মেঘনাদবধে ফুটেছে তাতে কবিকে, আর যেখানে হোক, কৃত্তিবাসের দ্বারস্থ হতে হয় নি এটা ঠিকই, কিন্তু মাইকেলের সীতা, মন্দোদরী বা সরমা, কোনোটাই কৃত্তিবাসী চিত্রের চেয়ে উজ্জ্বলতর নয়, যদিও এদের পুরোপুরি নেওয়া হয়েছে কৃত্তিবাস থেকে। বিভীষণের উপর মাইকেলের অবিচার মেঘনাদবধোত্তর নাতিহ্রস্ব স্বরচিত আবেগময় আক্ষেপোক্তি সত্ত্বেও অবশ্যই সমালোচনা-সাপেক্ষ। আসল কথা, বিশাল রামায়ণের বিপুল ক্ষেত্রে যে ভাবে ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন চরিত্রের পরিচয়, তার তুলনায় মাইকেলের আয়োজন অতি সংক্ষিপ্ত, সুতরাং নিতান্ত অভিনব আমদানী ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে অপূর্ণতার ঘাটতি থাকবেই, স্বরূপ-উদ্‌ঘাটনেও ক্রটি দেখা দেওয়া সম্ভাবিত। সে কথা নয়, কথাটা হলো, মাইকেল-প্রশস্তির মোহে এ যুগের অনেকেই মনে করেন, কৃত্তিবাসের কাছ থেকে তিনি কেবল কাহিনীর কঙ্কালটুকুই নিয়েছেন, আর যা কিছু সবই তাঁর মৌলিক সৃজনী শক্তির ফল, কি চরিত্রগঠন, কি উপাদান-সমাবেশ, কি বিন্যাস-ধারা, বাগ্‌ভঙ্গির তো কথাই নেই। বর্তমান নিবন্ধের উদ্দেশ্য মেঘনাদবধে মাইকেলের মৌলিকতার প্রস্তাবটা উড়িয়ে দেওয়া নয়, এই কাব্যের রচনায় ও গাঁথুনিতে কৃত্তিবাসের ঘনিষ্ঠ অনুসৃতির নমুনা দেখিয়ে ঐ মৌলিকতার স্বরূপটি যথাসম্ভব স্পষ্ট করে তোলা।

এবিষয়ে প্রথমেই মনে আসে কবিপ্রদত্ত নিজস্ব ব্যাখ্যা বা কৈফিয়ৎ। পরে তাঁর ভক্তমহল তাঁর হয়ে যতো মৌলিকতার দাবী তুলেছেন, স্বয়ং কবির যে তা ছিল না, তার প্রমাণ নিজেরই প্রার্থনাবাক্যে। যে 'মধুচক্র' রচনা কবির পরম ঈপ্সিত, তাতে অপরাপর কবির 'চিত্তফুলবন' থেকে 'সংগ্রহ'ই তো প্রধান কাজ। এই সংগ্রহ হয়েছে কোথাও সূক্ষ্ম, অর্থাৎ 'মধু'র আকারে,

কোথাও স্থূল, অর্থাৎ গোটা ফুলের আকারে। পরিকল্পিত 'মধুচক্রে'র বিচারে বা মূল্যায়নেও তাই এক কথায় বলা যায় না 'মধুময়'। সংগ্রহ তাঁর খুবই ব্যাপক, বিচিত্র ও শ্রমসাধ্য, কিন্তু ফুলেতে মধুতে মেশামেশি হয়ে একটা ভাণ্ডার রচিত হয়েছে ঠিকই, মধুময় কোষে ভরা নিটোল মধুচক্র হয় নি। তাই এতো সমালোচনার অবসর। তাই মৌলিকতার দাবীর ধ্বজা নিয়ত উড্ডীন রাখা চলে না, চলে না সৃষ্টির চমৎকারিত্বে বা অনন্যতায় কেবলই বাহবা আদায়ের জবরদস্তি।

[২] মেঘনাদবধের প্রথমাংশে (প্রথম ৮০ লাইনে) কৃত্তিবাসের ঘনিষ্ঠ অনুসৃতি

মধুসূদন যে বাল্যকাল থেকেই ছিলেন কৃত্তিবাস-ভক্ত, মাতৃকণ্ঠের আবৃত্তি-শ্রবণে ও পরে নিজেই বার বার পাঠে অভ্যস্ত, তার কি বিপুল পরিচয়ই না পাওয়া যায় মেঘনাদবধ কাব্যে। দুরূহ জমকালো শব্দের বহুল ব্যবহারের জন্য মাইকেল তাঁর সামনে অভিধান খুলে রেখে কাজ করতেন, এমন অভিমতে হয়তো বাড়াবাড়ি করা হয়, কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণখানা বুঝি খোলাই থাকতো, এমন ধারণা এড়াতে হলে শুধু ভাবতে হয় গোটা রামায়ণখানাই কি কবির কণ্ঠস্থ ছিল?

বন্দনাটি সেরে নিয়েই যেই আরম্ভ হলো রাবণের রাজসভার বর্ণনা, অমনি দেখা যায় মোটা মোটা উপাদানগুলো সব নেওয়া হয়েছে কৃত্তিবাস থেকে, মায় তাদের বাণীরূপগুলো পর্যন্ত। 'ভূতলে অতুল সভা স্ফটিকে গঠিত, তাহে শোভে রত্নরাজি' এই বর্ণনার মূলীভূত কল্পনা কৃত্তিবাসই যুগিয়েছেন :—

কাঞ্চন রজতমণি স্ফটিকে নির্মাণ।
পুরীশোভা দেখিয়া বিস্মিত হনুমান॥

*　　*　　*　　*

মাইকেল বিভিন্ন মণিমুক্তার 'ঝল্‌মল্ করা'র কথা ('ঝুলিছে ঝলি ঝালরে মুকুতা') বা 'রতনসম্ভবা বিভা'য় নয়ন ঝলসিত হওয়ার কথা যে লিখেছেন, তার মূলে আছে কৃত্তিবাসের—

রাজপ্রাসাদ দেখে বীর রত্ন ঝল ঝল।

*　　*　　*　　*

চারিভিতে শোভা করে মুকুতার ঝারা।

*　　*　　*　　*

মণি-কাঞ্চন আর প্রবাল পাথর।
অন্ধকারে আলা করে লঙ্কাপুরীর ঘর ॥

মাইকেল— শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত স্তম্ভ সারি সারি
ধরে উচ্চ স্বর্ণছাদ,

কৃত্তিবাস— চারিভিতে কাঞ্চন দেওয়াল।
শ্বেত রক্ত নীল পীত, প্রস্তরেতে সুশোভিত,
তাহে শোভে রতন মিশাল ॥

রাবণের সর্বপ্রথম বর্ণনায় মাইকেল যে স্বর্ণময় পর্বতশৃঙ্গের উপমা এনেছেন,—'হেমকূট-হৈমশিরে শৃঙ্গবর যথা', লঙ্কাকাণ্ডে অপর এক রক্ষোবীরের বর্ণনায় ঐ একই উপমা যুগিয়েছেন কৃত্তিবাস যদিও সেখানে উপমেয় সেই বীর নয়, বীরের মাথার মুকুট,—

মুকুট শোভয়ে শিরে, যেন নীল ধরাধরে
সুবর্ণের শৃঙ্গ শোভা পায়।

বোধহয় বলা যেতে পারে, কৃত্তিবাসের এই নীল ধরাধরের উপর সুবর্ণ-শৃঙ্গের উপমায় শ্যামাভ রাক্ষসদেহের উপর স্বর্ণমুকুট-শোভার বর্ণনা মাইকেলের রাবণ-বর্ণনার চেয়েও আরও বাস্তবানুগ ও সুন্দর হয়েছে।

মাইকেলের রাবণ-'কিঙ্করী' যে 'চন্দ্রাননা' হয়েছে তাতে বাড়াবাড়ি মনে হলে কি হবে, কৃত্তিবাস যে বলে গেছেন, রাবণের আশেপাশে যে সব 'রূপসী কামিনী' আছে, তারা 'নানা অলঙ্কার পরে চন্দ্রবদনী'; শুধু এভাবে নয়, আরও কবিত্ব করে লিখেছেন, 'চারিদিকে পদ্ম যেন রমণীবদন।'

মাইকেলের 'দৌবারিক', 'কাকলী-লহরী' এবং সবশেষে রাজপুরীর অতুলনীয়তা বুঝাবার প্রয়াস, সবই আছে কৃত্তিবাসী বর্ণনায়, যথা—

রাজগৃহ দ্বারে দেখে শিয়রে প্রহরী।
* * *
সুযন্ত্রিত সুললিত সংগীত রসাল।
* * *
কোকিলের কুহুরব ভ্রমর ঝঙ্কার।
নানা পক্ষীকলরব লাগে চমৎকার ॥

আর মাইকেল যে রাবণের পুরীকে 'ইন্দ্রপ্রস্থের' পৌরবপুরী অপেক্ষাও

সুন্দর বলেছেন, বা অন্যত্র বলেছেন, 'এ স্বর্ণলঙ্কা দেবেন্দ্র-বাঞ্ছিত, অতুল ভবমণ্ডলে' সে বলার ছাঁচটি পাওয়া যায় কৃত্তিবাসের কথায়,—

ইন্দ্রভুবন জিনিয়া রাবণ অন্তঃপুর।

এইভাবে দেখা যায়, কেবল পদে পদে উপমা নিয়ে আসাটাই মাইকেলের নিজস্ব, আর সবই কৃত্তিবাসের কাছ থেকে নেওয়া।

সভা-বর্ণন শেষ হলো। অতঃপর,

মাইকেল— এ হেন সভায় বসে রক্ষঃকুলপতি
বাক্যহীন পুত্রশোকে! ঝর ঝর ঝরে
অবিরল অশ্রুধারা—

এরই ছাঁচ কৃত্তিবাসে—

দূতমুখে এত বাণী করিয়া শ্রবণ।
কিছুকাল স্তব্ধ হয়ে রহে দশানন॥

হইয়াছে অতিশয় শোকেতে মগন।
না পারয়ে করিবারে ধৈরয ধারণ॥
বিংশতি নয়নে ঘন অশ্রুধারা বয়। (পৃঃ ৩৫৮)

মাইকেল— কর যোড় করি,
দাঁড়ায় সম্মুখে ভগ্নদূত,

কৃত্তি— ভগ্নদূত একজন দিল পাঠাইয়ে॥
রাবণ সম্মুখে কহে যোড় করি হাত। (পৃঃ ৪১৫)

মাই— এ দূতের মুখে শুনি সুতের নিধন,
হায়, শোকাকুল আজি রাজকুলমণি
নৈকষেয়! সভাজন দুঃখী রাজ-দুঃখে।

কৃত্তি— দূতমুখে এত বাণী করিয়া শ্রবণ।
হইয়াছে অতিশয় শোকেতে মগন॥
রাজার ক্রন্দন শুনি কান্দে সর্বজনা।

মাই— কতক্ষণে চেতন পাইয়া
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি কহিলা রাবণ,

কৃত্তি— কিছুকাল পরে পুনঃ সম্বিত পাইয়া।
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ে হুঙ্কার করিয়া॥

বাগ্‌ভঙ্গির ও বাণীরূপের এই ঘনিষ্ঠ, নিবিড় ও ধারাবাহিক অনুসরণ মেঘনাদবধে মাইকেলের কৃত্তিবাসী ঋণের যে পরিচয় দেয় তা সত্যই বিস্ময়কর। যেন মনে হয়, বক্তব্য সবই কৃত্তিবাসের ভাণ্ডার থেকে নেওয়া, বাগ্‌বিন্যাসও সবই কৃত্তিবাসানুসারী, শুধু নূতন ছন্দে, নূতন ঢঙে ও সাজসজ্জায় উপস্থাপিত করা। কতো যে সুন্দর সুঠাম ধ্বনি-বৈশিষ্ট্যযুক্ত শব্দ হুবহু কৃত্তিবাসের রচনা থেকে সংকলিত, তার খবর অনেকেরই জানা নেই, যার ফলে সেগুলি সবই মাইকেলের নিজস্ব উদ্ভাবিত বলে ধরে নিয়ে মেঘনাদবধের রচনাকে সামগ্রিক ভাবে এতো উচ্চমূল্য দেওয়া হয়ে থাকে। 'পয়ার-লাচাড়ি'র জীর্ণ ছাঁদের বাঁধন থেকে কবিভাষা যাঁর হাতে পেলো মহামুক্তির আস্বাদন, তাঁর প্রতিভার জয়গান অবশ্যই গাইতে হবে, কিন্তু তাই বলে ঐ 'পয়ার-লাচাড়ি'র ছেঁড়াকাঁথায় যদি পরতে পরতে কোহিনূর মোড়া থাকে, তাকে যেমন উপেক্ষাও করা চলে না, তেমনি সেই মণিমুক্তাবলী যে ঐ মুক্তিদাতার নিজস্ব সম্পদ হয়ে যাবে, এটাও মানা চলে না। বস্তুত পয়ারের স্তিমিত খাতবাহী 'কৃত্তিবাস পণ্ডিতে'র পাণ্ডিত্য বা কবিত্ব কোনোটাই সামান্য নয়, তা 'বিচক্ষণ'ই বটে। তাই মেঘনাদবধ কাব্যের উদ্বোধনী ছত্রে মাইকেলকে সানন্দে বহন করতে দেখা যায় কৃত্তিবাসী শব্দ-ঋণ সেই ছত্র-দেহের চারটি শব্দেই ;—'সম্মুখসমরে পড়ি বীরচূড়ামণি বীরবাহু'। এর মধ্যে 'সম্মুখসমরে' ও 'বীরচূড়ামণি' এই দুটি চোখে-পড়ার-মতো শব্দই কৃত্তিবাসী রামায়ণে, বিশেষত লঙ্কাকাণ্ডে, বহু-ব্যবহৃত। এ ছাড়া, 'রাক্ষসকুলের চূড়া', 'কনকলঙ্কা', 'স্বর্ণলঙ্কাপুরী', 'বীরশূন্য লঙ্কাপুরী', 'রঘুকুলমণি', 'মজিল কনকলঙ্কা', 'সিংহনাদ', 'বিক্রম-কেশরী', 'দানবনন্দিনী', 'কালভুজঙ্গী', 'দিব্যরথে', 'রণস্থলী', 'ব্যোমপথে', 'কালান্তক', 'খরশান', 'জাঙ্গাল', 'আখণ্ডল', 'প্রচণ্ডা খর্পর খাণ্ডা', 'কৌতুকী', 'কৃশোদরী', 'গন্ধবহ', 'শমন-ভবনে', 'দেব-দৈত্যজয়ী', 'শূর', 'সুরী', 'রামা', 'বৈশ্বানরে', 'মিহিরে', 'বাসব', 'আয়ুধ', 'নিনাদে', 'কৃতান্ত', 'অলঙ্ঘ্য', 'চন্দ্রমা', 'তমোময়' তুরঙ্গম-তুরঙ্গ-কুঞ্জর-স্যন্দন ইত্যাদি কতো শব্দ বা শব্দগুচ্ছই না ছড়িয়ে আছে সুলভ প্রাচুর্যে কৃত্তিবাসী রচনায়, অথচ পয়ার ছন্দ থেকে এদের যেই তুলে আনা হলো অমিত্রাক্ষরে অমনি সকলের ধারণা হলো এমন শব্দ-যোজনায় রামায়ণ-কাহিনী-বিন্যাস পূর্বে আর কেউ কখনও করে নি। এমন কি, এদেরই মধ্যে অনেকগুলির প্রয়োগে

(যেমন, কনকলঙ্কা, রঘুকুলমণি, মজিল কনকলঙ্কা, বিক্রম-কেশরী, খরশান, জাঙ্গাল, আখণ্ডল, কৌতুকী, শূর, সুরী ইত্যাদি) অনেকে মাইকেলী প্রয়োগ-স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করে মুগ্ধ হয়ে থাকেন।

[৩] বিখ্যাত মাইকেলী প্রয়োগ ও প্রকাশভঙ্গির উৎস-উদ্ধার

আরও লক্ষ্য করার বিষয়, কয়েকটি বিখ্যাত মাইকেলী রচনা বা বাগ্‌ভঙ্গির আদল যুগিয়েছেন এই পাঁচালীকার কৃত্তিবাসই।

(১) 'নিঃশঙ্কা করিব লঙ্কা বধিয়া রাঘবে' অথবা 'সশঙ্ক লঙ্কেশ শূর স্মরিলা শঙ্করে' এই বাগ্‌বিন্যাসের মধ্যে 'শঙ্কা'য় ও 'লঙ্কা'য় যে অনুপ্রাস জমানোর ভঙ্গি, তারই অসংখ্য নমুনায় কৃত্তিবাসী রামায়ণখানি ভরা, যেমন, (ক) 'লঙ্কায় শঙ্কায় গেল লঙ্কার রাবণ (আদি), (খ) 'শঙ্কাকুলা লঙ্কায় চলিল মনদুঃখে' (আরণ্য), (গ) শঙ্কায় লঙ্কার লোক হয়ে রহে স্তব্ধ (লঙ্কা) ইত্যাদি।

(২) 'শৃগাল হইয়া, লোভি, লোভিলি সিংহীরে' (৪।৬০৯)এটি যেমন হুবহু কৃত্তিবাসের 'শৃগাল হইয়া তোর সিংহে যায় সাধ' (সুন্দরা,—রাবণের প্রতি সীতা) এই ছত্রেরই প্রতিধ্বনি, তেমনি কৃত্তিবাসের 'শ্রীরাম কেশরী তুই শৃগাল যেমন' (আরণ্য), 'শৃগালবেষ্টিত যেন সিংহ যায় দেখা' (ঐ), বা 'সিংহ প্রতি শৃগালের নাহি ভারিভুরি' (লঙ্কা) প্রভৃতি সিংহ-শৃগালে পার্থক্যসূচক বিচিত্র প্রকাশভঙ্গি মাইকেলের 'মৃগেন্দ্র-কেশরী কবে, হে বীর কেশরি, সম্ভাষে শৃগালে মিত্রভাবে ?' (৬ ৫৪৬) এই বাচনভঙ্গির আদল যুগিয়ে থাকবে।

(৩) দানবনন্দিনী আমি ; রক্ষঃ-কুল বধূ;
রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী,—

মাইকেলের এই বিখ্যাত বাচনভঙ্গির পাশ্চাত্য মডেল খুঁজেই আমরা হয়রান হয়েছি এবং কেউ কেউ উল্লসিত হয়েছেন Portia-র 'A woman that Lord Brutus took to wife, * * A woman well reputed Cato's daughter, ** Being so fathered and so husbanded' এই উক্তির সঙ্গে সুর-সাদৃশ্য উদ্ধার করতে পেরে; কিন্তু কৃত্তিবাসের গরীবের ভাণ্ডারেই যে মধুসূদন বাল্যকালেই খুঁজে পেয়েছেন এর নমুনা, তার প্রমাণ :—

(ক) জনকনন্দিনী আমি নাম ধরি সীতা।
দশরথ পুত্রবধূ রামের বণিতা॥ (আরণ্য)

(খ) যিনি জনকের কন্যা রামের কামিনী।
যাঁহার শ্বশুর দশরথ নৃপমণি॥ (ঐ)

(গ) জনক রাজার বংশে আমার উৎপত্তি।
দশরথ শ্বশুর যে তুমি হেন পতি॥ (লঙ্কা)

(৪) 'মূর্তিমতী দয়া তুমি' (৪।৬৬৮) অথবা 'ভবতলে মূর্তিমতী দয়া সীতারূপে' (৯।১৮২),—মধুসূদনের এই যে প্রকাশভঙ্গি, এর নমুনা যুগিয়েছেন কৃত্তিবাস তাঁর আরণ্যকাণ্ডে বর্ণিত অত্রি-মুনিপত্নী প্রসঙ্গে,—

দেখি মুনিপত্নীকে ভাবেন মনে সীতা।
মূর্ত্তিমতী করুণা কি শ্রদ্ধা উপস্থিতা॥

(৫) 'গ্রাসিল মিহিরে রাহু, সহসা আঁধারি তেজঃপুঞ্জ' এই ভঙ্গিতে মাইকেল যে বর্ণনা করেছেন লক্ষ্মণকর্তৃক আক্রান্ত মেঘনাদের আতঙ্কমলিন অবস্থা, কৃত্তিবাসে একাধিক স্থানে পাওয়া যায় তারই ছাঁচ,—

(ক) তরণী সেনের আঘাতে কাতর রামচন্দ্রের বর্ণনায় :—
শুকাইল মুখচন্দ্র নাহি চলে বাহু।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন গরাসিল রাহু॥

(খ) কৈকেয়ীর আঘাতে কাতর দশরথের বর্ণনায় :—
'চন্দ্র গিলিলে রাহু হয় যে মূরতি॥'

৬। (ক) আনায়-মাঝারে বাঘে পাইলে কি কভু
ছাড়ে রে কিরাত তারে ?

লক্ষ্মণের মুখে এই ব্যাঘ্র কিরাতের ছাঁচে জবাবের খসড়া রচনা,

(খ) ক্ষত্রকুলগ্লানি, শত ধিক্ তোরে,
লক্ষ্মণ! নির্লজ্জ তুই। ক্ষত্রিয় সমাজে
রোধিবে শ্রবণপথ ঘৃণায়, শুনিলে
নাম তোর রথিবৃন্দ!

মেঘনাদের মুখে এই যে কপট-সংগ্রামীর উদ্দেশে পর্যাপ্ত গ্লানি-জাগানে তিরস্কারের ঝাঁঝাল ভঙ্গি,

অথবা

(গ) তস্কর যেমতি
পশিলি এ গৃহে তুই,—

বলে জবরদস্ত 'তস্কর'-এর ছাঁচের আমদানী,—এগুলো মাইকেলের কবি-কল্পনার যতোখানি নিরঙ্কুশ মৌলিকতার প্রশস্তি পেয়ে এসেছে, তা সঙ্কুচিত হতে বাধ্য এদের প্রত্যেকটির মূলে কৃত্তিবাসপ্রদত্ত উপাদানগত খসড়ার নমুনার পরিচয়ে। কৃত্তিবাসের রামায়ণে লক্ষ্মণ আদৌ কপটসমরীর ভূমিকা নেন নি, মেঘনাদও কোন অন্যায় যুদ্ধে নিহত হয় নি, সুতরাং সেখানে এমন কোন বাদানুবাদের অবসর নেই। কিন্তু সুগ্রীবাগ্রজ বালি-বধের বৃত্তান্তে পাওয়া যায় এখানকার অনুরূপ একটি অন্যায় যুদ্ধের পরিবেশ, দেখা যায় নিহন্তা রামচন্দ্রকে তস্করের ভূমিকা নিতে। তাই কৃত্তিবাস রামচন্দ্রের মুখে ঐ অন্যায় বধের সমর্থনে যে দুর্বল যুক্তি বসিয়েছেন, তাতেই রয়েছে মেঘনাদবধের লক্ষ্মণের মুখের ব্যাঘ্র-কিরাতের ছাঁচ, এবং বালির মুখে কপট-সংগ্রামী রামচন্দ্রের উদ্দেশে যে তিরস্কার বসিয়েছেন, তাতেই রয়েছে মাইকেলের মেঘনাদ-মুখনিঃসৃত তিরস্কারের ছাঁচ ও মৌল উপাদানের সব কিছু :—

বালির প্রতি রামচন্দ্র,—

পৃথিবীতে যত রাজা আছে যুগে যুগে।
দয়া করি কোন্ রাজা ছাড়িয়াছে মৃগে॥
ঘাস খায় বনে চরে নাহি অপরাধ।
তবু মৃগ মারিতে রাজারা হয় ব্যাধ॥
* * *
ব্যাধগণ অবিরত কেন তারে হানে। (কিষ্কিন্ধ্যা)

রামচন্দ্রের প্রতি বালি,—

সম্মুখ সংগ্রাম বুঝি বুঝিলা কঠোর।
তেঁই রাম আমাকে বধিলে হ'য়ে চোর॥
* * *
কেমনে দেখাবে মুখ সাধুর সমাজে।
বিনা দোষে কপটে বধিয়া বালিরাজে॥
দশরথ রাজা যিনি ধর্ম অবতার।
তাঁর পুত্র হইয়াছে কুলের অঙ্গার॥

সন্ধানী পাঠকের চোখে অবশ্যই ধরা পড়বে এখানে প্রথমে 'তস্কর যেমতি' ও পরে 'ক্ষত্রকুলগ্লানি, শত ধিক্ তোরে',—এই তিরস্কারের ধরণটির সুরগত মূল ছাঁচ। তবে এখানে এই 'তস্কর যেমতি' ভাষণভঙ্গি সম্পর্কে অবশ্যই একবা

বাল্মীকি-রচনার ধরণটি স্মরণ করতে হয় এবং মাইকেল যে তাঁর সংগ্রহ ও প্রযুক্তির মধ্যে inversion-রীতির বিবিধ কৌশল ও নিজস্ব খেয়ালী পরিকল্পনার উপযোগী অনেক উদ্ভট twisting-এর কায়দা দেখিয়েছেন তাও লক্ষ্য করতে হয়। নিশ্চয়ই মাইকেলের খুব পছন্দ হয়েছিলো বাল্মীকির সেই শাণিত বচনটি—

'তস্করাচরিতো মার্গো নৈষ বীরনিষেবিতঃ' ॥

কিন্তু সেখানে লক্ষ্মণই ইন্দ্রজিতকে তস্কর-সদৃশ আচরণের জন্য ধমক দিয়েছেন, যেহেতু সে কথায় কথায় মায়ার আশ্রয়ে অদৃশ্য হয়ে চোরের মত লুকিয়ে বেড়ায়, চোরের মতো লুকিয়ে আক্রমণ করে, যা কখনই বীরোচিত আচরণ বলে গণ্য হতে পারে না। সমগ্র বচনটি হলো—

"অন্তর্ধানগতেনাজৌ যত্ত্বয়া চরিতস্তদা।
তস্করাচরিতো মার্গো নৈষ বীর-নিষেবিতঃ ॥"

(যুদ্ধ—৮৮।১৫)

মেঘনাদবধে ঠিক এই লক্ষ্মণের মুখের কথাটিই চালিয়ে দেওয়া হয়েছে মেঘনাদের মুখে, লক্ষ্মণকে উদ্ভট খেয়ালে চোর সাজিয়ে, এবং ঐ একই খেয়ালে ইন্দ্রজিতকে নিরস্ত্র ক'রে। লক্ষ্মণের বিরুদ্ধে আনা হয়েছে রথিকুলপ্রথা বা বীরাচার-লঙ্ঘনের মারাত্মক অভিযোগ,—মূল রামায়ণে যে-অভিযোগে স্বয়ং ইন্দ্রজিতই অভিযুক্ত।

(ঘ) "গতি যার নীচ সহ, নীচ সে দুর্মতি",

মাইকেলের এই মন্তব্যটিরও ছাঁচ পাওয়া যায় কৃত্তিবাসের ঐ বালি-বধ বৃত্তান্তে রামের উদ্দেশে নিক্ষিপ্ত বালির মন্তব্যে, যেখানে বালিরাজের বক্তব্য হলো, ইষ্ট-সাধনের উদ্দেশ্যে রাম পাপিষ্ঠ সুগ্রীবের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন, রামের এ কি অধঃপতন? এতো হবেই,—

"পাপী পাপী মিলনেতে পাপের মন্ত্রণা।"

(ঙ) "চণ্ডালে বসাও আনি রাজার আলয়ে?"

এই বাগ্‌ভঙ্গিতে যে 'চণ্ডাল'-এর প্রয়োগ, তা নিশ্চয়ই 'অধমকে' বোঝাবার জন্য, এবং বিপরীতের সমাবেশে সেই অধমত্ব আরো শাণিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে অপরপ্রান্তে এসেছে 'রাজা'র প্রসঙ্গ। কিন্তু কৃত্তিবাসে যখন দেখি,—

"অনেক অন্তর দেখ ব্রাহ্মণ চণ্ডাল" (সুন্দরা)

তখন মাইকেলের হাতের 'অধম'-বাচক 'চণ্ডাল'-এর নমুনা তো পাওয়াই যায়, অধিকন্তু কৃত্তিবাসে দেখা যায় বৈপরীত্যের সুন্দরতর সমাবেশ, কারণ, 'চণ্ডাল'-এর বিপরীত প্রান্তে 'রাজা'-র চেয়ে 'ব্রাহ্মণ'-এর প্রয়োগ সার্থকতর।

(৭) অরাবণ, অরাম বা হবে ভব আজি!" (১।৪১৬)

বিশেষজ্ঞদের কথা তুলতে চাই না, সাধারণ পাঠক বা শিক্ষা-শিক্ষণব্রতী-মহলে মাইকেলের এই ছত্রটির রচনা-বৈশিষ্ট্যে ও সম্ভবত এর মৌলিকতায় মুগ্ধতা দেখা যায়। কিন্তু এর মূল ছাঁচ বাল্মীকির হাতে গঠিত, কালিদাসের হাতে অনুশীলিত এবং কৃত্তিবাসের হাতে চর্চিত :—

বাল্মীকি—অরাবণমরামং বা জগদ্দ্রক্ষ্যথ বানরাঃ॥ (যুদ্ধ—১০০।৪৮)

কালিদাস—অরাবণমরামং বা জগদদ্যেতি নিশ্চিতঃ॥ (রঘু—১২।৮৩)

কৃত্তিবাস—অবানরা অরামা করিব ধরাতল।

(বক্তা প্রহস্ত,—লঙ্কাকাণ্ড)

আগে লঙ্কা অরামা ও অবানরা করি।

(বক্তা কুম্ভকর্ণ,—লঙ্কাকাণ্ড)

মাইকেলের হাতে কালিদাসী শব্দবিন্যাসেরই ঘনিষ্ঠ অনুসৃতি ঘটলেও কৃত্তিবাসের হাতে ঐ একই ছাঁচের সাবলীল বাংলা সংস্করণ মেঘনাদবধের কবিকে অবশ্যই প্রভাবিত করেছিল, তাই কৃত্তিবাসের মতো তিনিও 'অরাম' শব্দটি একাধিকবার ব্যবহার করেছেন এবং বিভিন্ন বক্তার মুখে। প্রথম বক্তা রাবণ, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দেবরাজ ইন্দ্র ;—

"…তুমি কৃপা না করিলে, কালি
অরাম করিবে ভব দুরন্ত রাবণি!" (২।১৬৬—৬৭)

(৮) 'নতুবা বাঁধিয়া আনি দিব রাজপদে' (১।৭৩৪)

'নাগ-পাশ দিয়া বাঁধি লব বিভীষণে' (৩।১৫৪)

'বাঁধি দিব আনি তাত বিভীষণে রাজদ্রোহী' (৫।৪৬৪)

'বাঁধি আনি রাজপদে দিব বিভীষণে রাজদ্রোহী' (৬।৪৬০—৬১)

মাইকেলের এই ছত্রগুলির পাশাপাশি—

'হাতে গলে বান্ধি আন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ' (৩৮২)

'আমরা বান্ধিয়া দিব শ্রীরাম-লক্ষ্মণে' (৩০৪)

'হাতে গলে বান্ধি আন লঙ্কার রাবণ' (৫৩৭)

কৃত্তিবাসের এই ছত্রগুলি লক্ষ্য করলেই ধরা পড়বে মাইকেলের ঐ বাগ্‌ভঙ্গিটির উত্তমর্ণ কে।

[৪] প্রথম সর্গের বাকী অংশে কৃত্তিবাসের অনুকরণের দৃষ্টান্ত

বর্তমান আলোচনার দ্বিতীয় [২] পরিচ্ছেদে বাগভঙ্গি, বাণীরূপ বা বর্ণনা-শৈলীতে মাইকেলের যে কৃত্তিবাসানুসৃতির ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, তার ব্যাপকতা ও বৈচিত্র্যের সম্যক ধারণার জন্য আরো যথেষ্ট উল্লেখ ও ব্যাখ্যা আবশ্যক। বস্তুত বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ইংরেজিতে লেখা সংক্ষিপ্ত মাইকেল-সমালোচনায় এই কবি-সম্বন্ধে "plagiarism"-এর যে একটি সকুণ্ঠ ক্ষীণ আভাস দিয়ে গেছেন, আসলে তার আয়তন ক্ষীণ নয়, বরং বিপুল ও বিচিত্র। যদিও বাংলা কাব্যের সেই নব গঠনের যুগে ঐ plagiarism হয়তো কিছুই নিন্দনীয় নয়, তবু এর স্বরূপ এবং বহর সঠিক জেনে নেওয়া অবশ্যই প্রয়োজন। স্বয়ং মাইকেল তাঁর এই ধার-করা সম্বন্ধে কি মনোভাবের বশবর্তী ছিলেন তার ইঙ্গিত পাওয়া যাবে মেঘনাদবধের গৌরচন্দ্রিকার শেষের দিকের বিখ্যাত উক্তি,—"কবির চিত্ত ফুল-বন-মধু লয়ে রচ মধুচক্র" ইত্যাদিতে; যার কোন উদার বা সম্মানজনক ব্যাখ্যায় কবিকে বাঁচাতে যাওয়ার চেষ্টা বৃথা। মেঘনাদ-বধের কবি যে 'মধু' সংগ্রহের পরিবর্তে একেবারে গোটা গোটা 'ফুল'ই তুলে নিয়ে খুসীমত বসিয়ে দিয়েছেন তাঁর কাব্যে নিজস্ব খেয়ালী পরিকল্পনা অনুযায়ী, একথা প্রথমটা আমাদের মন মানতে চায় না। কারণ যে 'কল্পনা' দেবীর কাছে তাঁর অমন প্রার্থনা, ঠিক ঐ ভাবে অপরের ফুল যোগাড় করা তার স্বাধীন ভূমিকাই নয়। আসলে কিন্তু মাইকেল এই কাজই করেছেন। তাই এদেশ-সেদেশের নানা কবির ব্যবহৃত উপাদানেই তাঁর মেঘনাদ-বধের কাব্য-দেহ রচিত হয়েছে। তবে অন্যদের কাছে তাঁর যত ঋণই থাকুক কৃত্তিবাসী ঋণের তুলনায় আর সবই সামান্য। এখন কবির স্বাধীন শক্তি বা মৌলিকতার পরিমাপ করতে বসে দেখতে হবে আমরা যেন কোন মোহ বা ভ্রান্তি-চালিত না হই।

মাইকেলের মেঘনাদবধে কৃত্তিবাসী ঋণের বহর সত্যই অপরিমেয়। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আমরা গ্রন্থারম্ভ থেকে মাত্র ৮০ লাইনের মধ্যেকার ধারাবাহিক অনুসৃতির উল্লেখ করেছি। এইবার সুরু হলো বীরবাহুর পতনে রাবণের বিলাপ। যেই মাইকেল লিখলেন,

কি পাপ দেখিয়া মোর, রে দারুণ বিধি,
হরিলি এ ধন তুই ?

অমনি আমরা মাইকেলী রচনায় Greek Fatalism-এর নিশ্চিত সন্ধান পেয়ে এই জাতীয় বিধিবাদ যেখানে যত আছে তার ভিত্তিতে মাইকেলের গ্রীক-প্রভাব আত্মসাৎ-করণের ক্ষমতা নিয়ে থিসিস্ লিখতে বসে গেলাম। কিন্তু কৃত্তিবাসে কি বিধিবাদ বা 'দৈবের নির্বন্ধ'-বাদ এর অভাব আছে? সেখানেও রাবণের বিলাপে শোনা যায়,—

'দৈবের নির্বন্ধ যাহা না হয় খণ্ডন'॥ (পৃঃ ৩৪১)

* * *

'হায় হায় কি হইল, ক্রূর বিধি কি করিল' (৩৫০)

এবং আরো অনেক দৈব বা বিধাতৃ-বিধান-প্রসঙ্গ। কৃত্তিবাসের ভঙ্গিতেই রচিত মাইকেলের রাবণের বিলাপী মনের চিন্তাধারা। তাঁর সেই বিপুল কুলমান কে আর রক্ষা করবে? দিন দিন তিনি যে হীনবল হয়ে পড়ছেন, এই ধারণা তাঁকে দুর্বল করে ফেলছে। মাইকেলের আলঙ্কারিক ভাষায় যার অভিব্যক্তি দেওয়ার জন্য এসেছে কাঠুরিয়ার দৃষ্টান্ত, যে একে একে শাখাদল ছেদন ক'রে অবশেষে বৃক্ষকে ভূপাতিত করে, ঠিক সেই শঙ্কাদুর্বল মনই কৃত্তিবাসের রাবণের আলেখ্যে—

মাই— কে আর রাখিবে
এ বিপুল কুল-মান এ কাল সমরে!

কৃত্তি— রাবণ বলে কাল হৈল নর আর বানর॥

* * *

আর কারে পাঠাইব যাইব আপনি॥

মাই— তেমতি দুর্বল, দেখ, করিছে আমারে
নিরন্তর! হব আমি নির্মূল সমূলে
এর শরে!

কৃত্তি— দিনে দিনে টুটে বল মনে পাই শঙ্কা। (৩৯১)

মাইকেলের রাবণ-চরিত্রের একটি অভিনবত্ব হিসাবে অনেকেই উল্লেখ করে থাকেন যে, এ-রাবণ প্রচলিত রামায়ণ-কথায় বর্ণিত লাম্পট্য-দুষ্ট রাবণ নয়, এই রাবণের সীতাহরণের মূল কারণ ভগিনী সূর্পণখার দুঃখে সমবেদনা।

মাই— হায় সূর্পণখা,
কি কুক্ষণে দেখেছিলি, তুই রে অভাগী,

* * *

কি কুক্ষণে (তোর দুঃখে দুঃখী)
পাবক-শিখা-রূপিণী জানকীরে আমি
আনিনু এ হৈম গেহে ?"

কবির এই প্রশংসনীয় শব্দ-যোজনায় অবশ্যই মুগ্ধ হতে হয়, কিন্তু তবু তাঁর রাবণের ছাঁচকে 'অভিনব' বলবার আগে যদি কৃত্তিবাসের রাবণ-কথায় একটিবার উৎকর্ণ হওয়া যায় তো অমনি শোনা যাবে ঠিক একই সুরের বিলাপ ;—

কৃত্তি— তিন সহোদর মোরা ভগ্নী মাত্র একা।
জননীর আদরের কন্যা সূর্পণখা॥

* * *

এইরূপে সূর্পণখা কিছুদিন থাকে।
দৈবের নির্বন্ধ ভাই কি কব তোমাকে॥

* * *

শূর্পণখার পরিতাপ সহিতে না পারি।
আমি গিয়া হরিয়া এনেছি তার নারী॥

এই 'দৈবের নির্বন্ধ'-ই মাইকেলের রচনায় হয়েছে 'কি কুক্ষণে', বাকী সবই কৃত্তিবাসের ছাঁচে ঢালা। সুতরাং মাইকেলের রাবণের এই বৈশিষ্ট্য-মূলক অভিনবত্বের দাবী ও প্রচলিত রামায়ণ-কথা-ধৃত রাবণ-ভাষ্য, দুইই অচল। আর, 'পাবকশিখারূপিণী'তে মাইকেলের কবিমানসের কোনো মৌলিক স্ফুরণের সন্ধান নিষ্প্রয়োজন, কারণ এটি বাল্মীকির বহু-ব্যবহৃত 'শিখামিব বিভাবসোঃ' (সুন্দর ১৫।২০, ৩২ ইত্যাদি) এরই প্রতিধ্বনি মাত্র।

সূর্পণখা-উল্লেখের পরবর্তী বিলাপাংশে মাইকেলের রাবণ বলছেন,—

হায় ইচ্ছা করে,
ছাড়িয়া কনকলঙ্কা, নিবিড় কাননে
পশি, এ মনের জ্বালা জুড়াই বিরলে!

কৃত্তিবাসের রাবণ-বিলাপে ঠিক এই ছাঁচেরই ছড়াছড়ি :—

ঘেরেছে কনকলঙ্কা চারিটা দুয়ার। (৩৪২)

* * *

যদি গেলি তোরা সবে, জীবনে কি কার্য তবে

মরিব ডুবিয়া রত্নাকরে। (৩৫৯)

* * *

মাই— তবে কেন আর আমি থাকি রে এখানে ?

কার রে বাসনা বাস করিতে আঁধারে ?

কৃত্তি— তোমা বিনা ঘর দ্বার সব হৈল অন্ধকার,

শূন্য দেখি এ তিন ভুবন। (৩৫৯)

দূতের নিকট রণবার্তা শুনিবার আগ্রহ রাবণের মুখে মাইকেল যে-ভাবে প্রকাশ করেছেন, কৃত্তিবাসেও অনুরূপ আবেগভঙ্গি লক্ষণীয়, কেবল শব্দ-যোজনাদিতে সামান্য পার্থক্য :—

মাই— কহ, রে সন্দেশ-

বহ, কহ, শুনি আমি···

কৃত্তি— কহ রে কহ রে রণমঙ্গল ত্বরিত (৩৫০)

মাইকেলের কাব্যে রাবণের রাজসভা-বর্ণনা যেমন বহুলাংশে কৃত্তি-বাসানুসারী, লঙ্কাপুরীর বর্ণনাতেও তেমনি দেখা যায় উপাদান সবই কৃত্তিবাসের যোগানো, ঐশ্বর্য-সৌন্দর্যগত গোটা আবেদনও কৃত্তিবাসে মাইকেলের তুলনায় কিছু অনুজ্জ্বল নয়।

মাই— চারিদিকে শোভিল কাঞ্চন-

সৌধ-কিরীটিনী লঙ্কা—মনোহরা পুরী

কৃত্তি— কাঞ্চন-রজতমণি স্ফটিকে নির্মাণ।

পুরীশোভা দেখিয়া বিস্মিত হনূমান॥ (২৪৪)

* *

সোণার প্রাচীর মধ্যে বাহিরে লোহার।

গগন মণ্ডলে চূড়া লাগয়ে তাহার॥ (২৪৫)

মাই— ···পুষ্পবন মাঝে ;

কমল-আলয় সরঃ * *

তরুরাজী, ফুলকুল—চক্ষু-বিনোদন···

* * *

চারি দিকে রম্য বনরাজী
* * * কুহরিছে ডালে
কোকিল ; ভ্রমরদল ভ্রমিছে গুঞ্জরি ;
বিকশিছে ফুলকুল ; মর্মরিছে পাতা ;
বহিছে বাসন্তানিল * * *

কৃত্তি— কোকিলের কুহুরব ভ্রমর-ঝঙ্কার।
নানা পক্ষীকলরব লাগে চমৎকার ॥
দীঘি সরোবর দেখে সলিল নির্মল।
প্রস্ফুটিত কোকনদ পঙ্কজ উৎপল ॥ (ঐ)

* * *

দেখিলাম পুষ্পবন, ময়ূর-ময়ূরীগণ
বায়ুভরে পুষ্পদল খসে।
প্রতি গাছে পিকধ্বনি বড়ই মধুর শুনি,
ভ্রমর ভ্রমরী রসে ভাসে ॥ (৩১৪)

* *

দেখিলাম সরোবরে হংস হংসী কেলি করে,
ঘাট সব বিচিত্রনির্মাণ।
কমল-কুমুদোপরে কেলি করে মধুকরে
রূপসী রাক্ষসী করে স্নান ॥ (৩১৩)

মাই— * * বাজে বাদ্য গম্ভীর নিক্বণে।
রতনে খচিত কেতু উড়ে শত শত
তেজস্কর।

কৃত্তি— বীণা বাঁশী বাজে তায়, কেহ বা সঙ্গীত গায় (ঐ)

* *

সুযন্ত্রিত সুললিত সংগীত রসাল ॥ (২৪৬)

* *

চালের উপরে শোভে সুবর্ণের ধারা।
চারিভিতে শোভা করে মুকুতার ঝারা ॥
প্রতি ঘরে ঘরে ধ্বজা পতাকা বিরাজে। (২৪৫)

মাইকেলের রাবণ সাগরের সেতুবন্ধন-দশা-দর্শনে যে সব উক্তি করেছেন, বা ঐ সময়ে কবির হাতে যে পরিবেশ-চিত্র অঙ্কিত হয়েছে সবই এক কথায় প্রশংসনীয়। কিন্তু তাই বলে যেই মাইকেল লিখলেন,

"সাগর—মকরালয়"—

অমনি "মকরালয়" শব্দটি নিয়ে গবেষণায় বসতে হবে, খুঁজে পেতে হবে ওরই মধ্যে লুক্কায়িত 'করাল' পদটি ও তার ব্যঞ্জিত ভাবটিকে, এটা বড়ো বাড়াবাড়ির কথা। ওদিকে কৃত্তিবাসের সহজ সাগর-কথায় যে রয়েছে—

"জলেতে না নামে কেহ মকরের ডরে"—

এবং কৃত্তিবাস-ভক্ত মাইকেল সেইটাই জানিয়েছেন ঐভাবে সাগরকে 'মকরালয়' ব'লে, সেটাতে যেন এযুগের মাইকেল-ভক্তদের মন ওঠে না।

তা ছাড়া, সাগরের ঐ বন্ধনে কেবল মাইকেলের রাবণই বিস্ময় ও ধিক্কারে বিচলিত ন'ন; কৃত্তিবাসের রাবণও তাই; উভয়ের কাছেই "অলঙ্ঘ্য" সাগরের গাছ-পাথরে বাঁধা-পড়া, এক দারুণ কলঙ্ক। মাইকেলের ভাষা ও ভাবণ-ভঙ্গি অধিকতর শাণিত ও বহুগুণ কাব্যসমৃদ্ধ; কিন্তু রাবণের বিস্ময়-ধিক্কার-খেদ-মূলক এখানকার মূল বস্তুটি যে সম্পূর্ণ মাইকেলেরই কল্পিত বা তাঁরই একান্ত মৌলিক কল্পনাসঞ্জাত, এমন মনে করা চলে না, যেহেতু কৃত্তিবাসেই এই ছাঁচের একটা জোরালো আভাষ পাওয়া যায়। সেখানে রাবণের মন্তব্যগুলির মধ্যে এখানকার রাবণের টিপ্পনীর মৌল উপাদান নিম্নোক্ত ধারায় ধরা পড়ে :—

মাই— এই কি সাজে তোমারে, অলঙ্ঘ্য অজেয়
তুমি ?

কৃত্তি— বৃক্ষ-পাথরেতে বান্ধে অলঙ্ঘ্য সাগর। (পৃঃ ৩৪২)

মাই— কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে
* * হা ধিক, ইত্যাদি

কৃত্তি— বলিতে না পারি একি দৈবের ঘটনা। (ঐ)

মাই— হায়, এই কি হে তোমার ভূষণ
রত্নাকর ? কোন্ গুণে, কহ, দেব, শুনি,
কোন্ গুণে দাশরথি কিনেছে তোমারে ?

কৃত্তি— রত্নাকর ভীত হৈল মনুষ্যের আগে।
যোড়হস্ত করিয়া বন্ধন নিল মেগে॥ (ঐ)

মাই— প্রভঞ্জন সম ভীম পরাক্রমে…

কৃত্তি— আছিল সাগর সেই অগাধ গভীর।
আপনার তেজেতে আপনি নহে স্থির॥ (ঐ)

মাই— * * এ জাঙাল ভাঙি
দূর কর অপবাদ * * এ কলঙ্করেখা…

কৃত্তি— এতদিনে অপযশ হৈল রত্নাকরে।
বৃক্ষ-পাথরেতে বান্ধে নর আর বানরে॥ (ঐ)

তবে, একথা ঠিকই যে মাইকেলের হাতে রাবণের সমুদ্র-সম্ভাষণের উন্নততর রূপান্তর কাব্যরসিকের নিকট এক অতি মূল্যবান ও অতি প্রিয় বস্তু।

মাইকেলের ভগ্নদূতের মুখে ও লঙ্কার রাক্ষস-সমাজের সাধারণ বর্ণনায় যে বীরবংশ-চেতনা ও সম্মুখ-সংগ্রামের মহিমা-চেতনা অনবদ্য কাব্যরূপ প্রাপ্ত হয়েছে, এবং সম্মুখ-সমরে দেশবৈরীবিনাশের জন্য আত্মোৎসর্গের প্রশস্তি-রচনায়

'দেশবৈরী নাশি রণে পুত্রবর তব
গেছে চলি স্বর্গপুরে'…

এইভাবে যে স্বর্গলাভের কথা বলা হয়েছে, এরও ইঙ্গিত রয়েছে কৃত্তিবাসের নানাস্থানে, যেমন,—

'জগতের কর্তা মোরা বীরবংশে জন্ম।'
* * *
'বিপক্ষ-সম্মুখে যদি সংগ্রামেতে মরি।
দিব্যরথে চড়িয়া যাইব স্বর্গপুরী॥' (৩৫২)

বীরবাহুর পতনের পর রাবণের যে যুদ্ধোদ্যমের চিত্র মেঘনাদ-বধে অঙ্কিত হয়েছে, সেটি কী মাত্রায় কৃত্তিবাস-প্রভাবিত, দেখা যাক্। প্রথমে রাবণের খেদোক্তি ও গর্জন।

মাই— এতদিনে বীরশূন্য লঙ্কা মম!

কৃত্তি— বীরশূন্য হইল কনকলঙ্কাপুরী
(৩৫০, ৩৭০, ৩৮২, ৩৯৫ ও আরো)

মাই— এ কাল সমরে,
আর পাঠাইব কারে? * * যাইব আপনি।

কৃত্তি— রাবণ বলে কাল হৈল নর আর বানর ॥

* * *

আর কারে পাঠাইব যাইব আপনি ॥ (৩৩১)

মাই— সাজ হে বীরেন্দ্রবৃন্দ···

* *

(অন্যত্র) এ কনক-পুরে
ধনুর্দ্ধর আছ যত, সাজ শীঘ্র করি···

কৃত্তি— রাবণ বলে যে যে বীর ধনু ধরিতে জানে।
ছোট বড় রাক্ষস চলুক মোর সনে ॥ (৩৩১)

* * *

ধনুক ধরিতে লঙ্কায় যে যে বীর জানে।
ছোট বড় সাজিয়া আসুক মোর সনে ॥ (৪১৮)

মাই— অরাবণ, অরাম বা হবে ভব আজি।

কৃত্তি— আগে লঙ্কা অরামা অবানরা করি। (৩৪৩)

এ ছাড়া,—

মাই— আইল রড়ে রথ স্বর্ণচূড়,
বিভায় পূরিয়া পুরী।

কৃত্তি— রাবণের রথখান সাজায় সারথি।
নানা রত্ন মণি মুক্তা নির্মাইল তথি ॥
কনকে রচিত রথ মাণিকের চাকা।
রত্নের কলসে সাজে নেতের পতাকা ॥ (৩৩১)

* * *

শতকোটি রবি জিনি রথের কিরণ ॥

* * *

কোটি সূর্য জিনিয়া সৌন্দর্য খরতর।
রথের কিরণ কত দেখ রঘুবর ॥ (৩৩২)

মাই— মেলিলা কেতনবর, রতনে খচিত,

কৃত্তি— রত্নময় কলসে পতাকা সারি সারি। (ঐ)

মাই— * * বাজিল চৌদিকে
রণবাদ্য * * শঙ্খ নাদিল ভৈরবে,

কৃত্তি— রাবণের বাদ্যভাণ্ড সাত অক্ষৌহিণী।

* * *

বাজিল চৌরাশী লক্ষ শঙ্খ আর বীণে

মাই— কোদণ্ড-টঙ্কার···

কৃত্তি— রাক্ষসের সিংহনাদ ধনুক-টঙ্কার।

মাই— রোধিল শ্রবণপথ মহা কোলাহলে।

কৃত্তি— প্রলয়ের কালে যেন উঠে গণ্ডগোল॥

মাই— টলিল কনক-লঙ্কা বীরপদভরে ;—

কৃত্তি— কটকের পদভরে কাঁপিছে মেদিনী। (৩৩১)

মেঘনাদ-বধের প্রথম সর্গের শেষের দিকে কবি স্থান নির্দিষ্ট করেছেন মেঘনাদ ও রাবণের বীরবাহু-পতনোত্তর প্রথম সাক্ষাৎকারের। কিন্তু এজন্য মাইকেলের ঘটনা-সন্নিবেশে মৌলিকতার কোনো দাবী নেই। কারণ, কৃত্তিবাসেও ঠিক ঐ বীরবাহুর মৃত্যুর পর ঐ পিতাপুত্রের একটি সাক্ষাৎকার বর্ণিত হয়েছে। উভয়ের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য লক্ষণীয় :—

মাই— নমি পুত্র পিতার চরণে

করযোড়ে কহিলা ; "হে রক্ষঃকুলপতি,

শুনেছি, মরিয়া না কি বাঁচিয়াছে পুনঃ

রাঘব ? এ মায়া, পিতঃ বুঝিতে না পারি !

কৃত্তি— যোড়হাত করিয়া বলিছে ইন্দ্রজিত ॥

* * *

কোথা শুনিয়াছ মরা পেয়েছে জীবন ॥

মরিয়া না মরে রাম একি চমৎকার। (৪০৩)

রাবণের উক্তিতে সাদৃশ্য :—

মাই— কে কবে শুনেছে, লোক মরি পুনঃ বাঁচে ?

কৃত্তি— মরিয়া না মরে রাম এ কেমন বৈরী।

অনুমানে বুঝিনু মজিল লঙ্কাপুরী ॥ (৩২৪)

* * *

মরিয়া না মরে রাম বিপরীত বৈরী।

বীরশূন্য হইল কনকলঙ্কাপুরী ॥ (৩৮২)

এ ছাড়া,—

মাই— কে কবে শুনেছে, পুত্র ভাসে শিলা জলে,

কৃত্তি— কোন্ কালে সলিলেতে ভেসেছে পাথর (৪৫০)

এমন কি, মাইকেল যে—

আলিঙ্গি কুমারে, চুম্বি শিরঃ—

ইত্যাদি ভঙ্গিতে রাবণের মেঘনাদকে আদর করার কথা লিখেছেন, সেই আলিঙ্গন ও চুম্বনের চিত্র কৃত্তিবাসেরই যোগানো—

মেঘনাদ কথা শুনি রাবণ হর্ষিত।
কোলে করি মেঘনাদে কহিছে ত্বরিত ॥
* * *
চুম্ব দিয়া রাবণ করিল আশীর্বাদ ॥ (৩৬৬)

এইভাবে দেখা যায়, কৃত্তিবাসী রচনার বিচিত্র অনুকরণ-অনুসরণের বিপুল ঋণ-ভার বহন করেই মেঘনাদ-বধের প্রথম সর্গ সম্পূর্ণ হয়েছে।

[৫] ২য় ও ৩য় সর্গের কথা—'নৃমুণ্ডমালিনী'-রহস্য

দ্বিতীয় ও তৃতীয় সর্গের ঘটনা-পরিকল্পনা প্রায় সবই রামায়ণ-বহির্ভূত; সুতরাং এখানে কৃত্তিবাসের প্রভাব নগণ্যই। কেবল আমাদের চোখে পড়ে, মাইকেলের মেঘনাদ-বধের আগে যে এক দফা হর-গৌরী-সংবাদ স্থান পেয়েছে, তার পূর্ব নমুনা হিসাবে কৃত্তিবাসেও আছে একটি হর-গৌরী-সংবাদ, যা লঙ্কাকাণ্ডে মেঘনাদ-বধের অনেক আগে স্থান পেয়েছে। এখানকার মত সেখানেও শিবের মুখে রাবণের বিনষ্টির মূলে বিধির বিধান বা প্রাক্তনের লীলার কথা শোনা যায়।

মাই— কিন্তু নিজ কর্ম-ফলে মজে দুষ্টমতি।
* * *
হায়, দেবি, দেবে কি মানবে,
কোথা হেন সাধ্য রোধে প্রাক্তনের গতি?

কৃত্তি— রাবণে রাখিতে নাহি আমার শকতি ॥
বিধাতার নির্বন্ধ যে নারি ঘুচাইতে।
আপনি যে আছি আমি আপনার মতে ॥

তবে কৃত্তিবাসে শঙ্করী নিয়েছেন রাবণের পক্ষ, মাইকেলে তার বিপরীত।

মাইকেলের শচীকান্ত যেখানে শচীকে নিয়ে রথারোহণে যাত্রা করবেন বলে ঠিক করলেন সেখানকার সেই,

'ধরিয়া পতির কর আরোহিলা রথে' (২।১১৬)

আমাদের মনে করিয়ে দেয় কৃত্তিবাসের

'তবে মহাদেব-উঠি শিবা করে ধরি।
আরোহণ করিলেন বৃষের উপরি ॥ (২৭৬)

যুদ্ধের সমাবেশে

মাই— ঘন-ঘনাকারে রেণু উড়িল চৌদিকে (৩।১৬৩)
কৃত্তি— কটকের ধুলায় পৃথিবী অন্ধকার। (৩১৫)

প্রমীলার সেনা-নায়িকা 'নৃমুণ্ড-মালিনী' মাইকেলের এক অতি অভিনব উদ্ভট পরিকল্পনা। চরিত্রটির পশ্চাতে কবির উদ্ভাবনী শক্তির বহর দেখে তাক লেগে যাওয়ারই কথা। যে ভূমিকা একে দেওয়া হয়েছে,—তার হয়তো আংশিক সাদৃশ্যযুক্ত কোনো নমুনা দেশী বা বিদেশী সাহিত্যের নারী-চরিত্রে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু উৎকট বৈপরীত্যযুক্ত ভূমিকা-পরিচয়ের সঙ্গে যে আকৃতি তাকে দেওয়া হয়েছে তার জুড়ি কোথাও মিলবে না। আমরা কিন্তু এর প্রাথমিক ছাঁচটি দেখতে পাই কৃত্তিবাসের রামায়ণে। সেখানে আছে, হনূমান লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করে প্রথমেই দেখতে পায় পুরী-প্রহরায় রতা—

মহাভয়ঙ্কর মূর্তি সম্মুখে প্রচণ্ডা।
বামহাতে খর্পর দক্ষিণ হাতে খাণ্ডা ॥ (২৪৪)
* * *
হাঁড়িয়া-মেঘের বর্ণ দেখিতে ভীষণ ॥
ব্যাঘ্রচর্ম পরিধান গলে মুণ্ডমালা। (ঐ)

চামুণ্ডা দেবীকে। মেঘনাদ-বধের তৃতীয় সর্গেও হনুমানের ঐ লঙ্কাপুরীর প্রথম অভিজ্ঞতার একটা বৃত্তান্ত দেওয়া হয়েছে। সেখানে তার বক্তব্য, সেই প্রথম বারে সে লঙ্কার নারীসমাজের সকলকেই দেখেছে, দেখেনি কেবল প্রমীলাকে। কিন্তু এই বক্তব্যের ভূমিকায় কেন যে ঠিক সেই কৃত্তিবাস-বর্ণিত চামুণ্ডা-দর্শনের প্রসঙ্গ এলো তা ভাববার বিষয়।

অলঙ্ঘ্য সাগর লঙ্ঘি, উতরিনু যবে
লঙ্কাপুরে, ভয়ঙ্করী হেরিনু ভীমারে,
প্রচণ্ডা, খর্পর খণ্ডা হাতে, মুণ্ডমালী।
দানব-নন্দিনী যত মন্দোদরী-আদি

* * *

দেখিনু সকলে একা ফিরি ঘরে ঘরে। (৩।২০৯-২১৬)

পূর্বোক্ত কৃত্তিবাস-বর্ণিত চামুণ্ডা-র সঙ্গে এখানে উদ্ধৃত দ্বিতীয়-তৃতীয় লাইনের বর্ণনা-সাদৃশ্য লক্ষণীয়। অতঃপর লক্ষ্য করা যাক প্রমীলা-দূতী নৃমুণ্ডমালিনীর পরিচয়,—

নৃমুণ্ড-মালিনী দূতী, নৃ-মুণ্ড-মালিনী
আকৃতি, (৩।২৪৮-৪৯)

এর অর্থ কী ? এই দূতী সম্পর্কেই অন্যত্র বলা হয়েছে,

'উত্তরিলা ভীমা-রূপী—' (৩।৩১৫)

বলা হয়েছে, সকলের সঙ্গে হলেও একেই বিশেষ লক্ষ্য ক'রে,—

ভীমারূপী, বীর্যবতী চামুণ্ডা যেমতি— (ঐ ৩৫৭)

যার জন্যে তৎক্ষণাৎ রামচন্দ্র বলেন,

দূতীর আকৃতি দেখি ডরিনু হৃদয়ে (ঐ ৩৫৯)

আরও

সর্ব-অগ্রে উগ্রচণ্ডা নৃ-মুণ্ড-মালিনী, (ঐ ৩৭৮)

আরও

নৃমুণ্ড-মালিনী, যথা নৃ-মুণ্ড-মালিনী
রণ-প্রিয়া। (ঐ, ৪৬৯-৭০)

মাইকেলের এই সব বচন-বাচন-ভঙ্গি-বিশ্লেষণসূত্রে বলতে হয়, কৃত্তিবাসের ঐ চামুণ্ডাই যে মাইকেলের নৃ-মুণ্ড-মালিনী,এমন মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে, যদিও অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্যে কণ্টকিত মাইকেলের এই পরিকল্পনা। উদ্ভাবনী শক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জোড়াতাড়ার কারিগরি, আর তাইতেই দেবী চামুণ্ডা হয়েছেন প্রমীলা-দাসীর আকৃতিগত ছাঁচ। 'নৃ-মুণ্ড-মালিনী'-র মতো উৎকট ভীতি-জাগানো নামটিও এসেছে ঐ একই উৎস থেকে। বেশ দেখা যায়,তৃতীয় সর্গের প্রমীলা-বাহিনী-বর্ণনারত কবি-মানসে চামুণ্ডা-চিন্তাটি নাছোড়-বান্দা ভঙ্গিতে অনেকবার যাতায়াত করেছে। তাই দূতীর নামটি নামমাত্র না হয়ে,

'আকৃতি'ও হয়েছে 'নৃ-মুণ্ড-মালিনী,' তার 'কটাক্ষশরে' কবি 'সর্বজনে' জর্জরিত করতে চাইলেও 'দড়ে বড়ে জড় সবে হয় স্থানে স্থানে' (৩।২৫৮)। রাম-শিবিরস্থ সকলের বিস্মিত দৃষ্টিতে, বিশেষত রামের দৃষ্টিতে সে "ভৈরবীরূপিণী বামা" (৩।২৯৫)। এমন কি, কবি যখন বিভীষণের মুখে প্রমীলা ও তার দাসীদের বর্ণনা দিচ্ছেন তখনও তাঁর খেয়াল নেই যে বক্তা যিনি, তিনি প্রমীলার খুড়শ্বশুর; ভ্রাতুষ্পুত্রবধূ ও তার দাসীমহল সম্বন্ধে তাঁর এমন একটা তাজ্জব ধারণা কখনই থাকতে পারে না। তাই বিভীষণের মুখেও শোনা যায়,—

"না জানি এ বামা-দলে কে আঁটে সমরে,
ভীমারূপী, বীর্যবতী চামুণ্ডা যেমতি—
রক্তবীজ-কুল-অরি ?" (৩।৩৫৬-৩৫৮)

[৬] ৪র্থ সর্গের কথা : মাইকেলের ও কৃত্তিবাসের সীতা : দীননাথ সান্ন্যাল : বাল্মীকির সীতা-প্রসঙ্গ

চতুর্থ সর্গের সীতা-সরমা-কাহিনীতে স্বভাবতই ঘটেছে কৃত্তিবাসের অনুসৃতি।

মাই— একাকিনী শোকাকুলা, অশোক-কাননে,
কাঁদেন রাঘব-বাঞ্ছা··· (৪।৪৬-৪৭)

কৃত্তি— কান্দেন অশোকবনে শ্রীরাম-প্রেয়সী। (২৯৯)

মাই— হেন কালে তথা
সরমা সুন্দরী আসি···

কৃত্তি— হেন কালে আইল সে সরমা রাক্ষসী ॥

মাই— হিতৈষিণী সীতার পরমা
তুমি, সখি!
* * *
সরমা সখি, মম হিতৈষিণী
তোমা সম আর কি লো আছে এ জগতে ?
* * *
কে আছে সীতার আর এ অরক্ষ-পুরে ?
* * *
আছে যে বাঁচিয়া হেথা অভাগিনী সীতা,
সে কেবল, দয়াবতি, তব দয়াগুণে!

এই আলাপের খসড়াটি সবই কৃত্তিবাসের যোগানো :—

কৃত্তি— সীতা বলিলেন এস সরমা বহিনী।
তব অপেক্ষায় আমি রাখিয়াছি প্রাণী ॥
বিষপানে মরি কিম্বা অনলে প্রবেশি।
এতক্ষণ আছে প্রাণ তোমারে আশ্বাসি ॥
* * * আমারে কর রক্ষা।
প্রাণ রাখিয়াছি আমি তোমার অপেক্ষা ॥ (২৯৯)

মেঘনাদ-বধের চতুর্থ সর্গে মাইকেল-প্রদত্ত পঞ্চবটী বনে, গোদাবরী-তীরে সীতার দিনযাপন ও 'দণ্ডক-ভাণ্ডারে'র কাহিনী কবির রচনা-মাধুর্যের এক উপভোগ্য নিদর্শন। তবে এখানেও উপাদানগত ও বক্তব্যের বাঁধুনীর সহায়ক বাগ্‌ভঙ্গিগত কতো সাহায্যই যে নেওয়া হয়েছে কৃত্তিবাসের ভাণ্ডার থেকে তা লক্ষ্য করবার মতো। "ছিনু মোরা সুলোচনে, **গোদাবরী-তীরে**" ইত্যাদি রচনাংশে সেই যে **"বাঁধি নীড়"** সুখে থাকার কথা আছে, **পঞ্চবটীর** প্রশংসায় বলা হয়েছে **"মর্ত্তে সুর-বন-সম"**,—এ সবেরই ইঙ্গিত রয়েছে কৃত্তিবাসী-রচনায় :—

গোদাবরী-তীরে রাম দিব্য আয়তন।
পঞ্চবটী গিয়া তথা থাক তিন জন ॥
* * *
লক্ষ্মণে বলেন রাম বাঁধ বাসাঘর।
জানকীর মনোমত করহ সুন্দর ॥

মাইকেল যে বলেছেন,

দণ্ডক ভাণ্ডার যার * * *
কিসের অভাব তার ?

তার ভিত্তি কৃত্তিবাসের খতিয়ানে,—

অগ্রেতে দণ্ডকারণ্য অতি রম্য স্থান ॥
* * *
ফল পুষ্প দেখেন গন্ধেতে আমোদিত।
ময়ূরীর কেকাধ্বনি ভ্রমরের গীত ॥

নানা পক্ষিকলরব শুনিতে মধুর।
সরোবরে কতশত কমল প্রচুর॥

*　*　*

রম্য জল রম্য ফল মধুর সুস্বাদ।　(১৪৯)

মাইকেল লিখেছেন,—

যোগাতেন আনি
নিত্য ফল মূল বীর সৌমিত্রি ;

কৃত্তি—　ফল মূল আহরণ করেন লক্ষ্মণ।
সুস্বাদু সুলভ গোদাবরীর জীবন॥　(১৫৪)

মাই—　ভুলিনু পূর্ব্বের সুখ। রাজার নন্দিনী,
রঘু-কুল-বধূ আমি — —

কৃত্তি—　পাতা-লতা-নির্মিত সে কুটীর পাইয়া।
অযোধ্যার অট্টালিকা গেলেন ভুলিয়া॥　(ঐ)

নানা বিচিত্র ভঙ্গিতে মাইকেল এই পঞ্চবটী বনের সৌন্দর্য্য-মাধুর্যের যে আলেখ্য অঙ্কিত করেছেন, তাতে প্রধান প্রধান বিষয়গুলি হলো,—ফুল, ফল, পাখী, ময়ূর-ময়ূরী, করভ-করভী, পদ্মবন, মধুমত্ত ভ্রমরের গুঞ্জন, কুরঙ্গ-কুরঙ্গী ও ঋষি-পরিবার-প্রসঙ্গ। এদের প্রায় সবই কৃত্তিবাসের বর্ণনায় দেখতে পাওয়া যায়। মাইকেল জানিয়েছেন সীতার কুটীরে ঋষি-বধূদের আগমনের কথা, কৃত্তিবাসেও ঐ পঞ্চবটী-জীবনের আলেখ্যে স্থান পেয়েছে—

ঋষিগণ সহিত সর্বদা সহবাস।　(ঐ)

মাইকেল "কুরঙ্গিণী-সঙ্গে রঙ্গে নাচিতাম বনে" এই লাইনটি লিখে রাজনারায়ণ বসুর বিরূপ মন্তব্যের ভাজন হয়েছিলেন, কিন্তু সম্ভবত তিনি ইঙ্গিতটা নিয়েছিলেন কৃত্তিবাসের রচনা থেকে—

"করেন কুরঙ্গগণ সহ পরিহাস॥"　(ঐ)

যদিও এ পরিহাসের কল্পনা সেখানে রামচন্দ্র প্রসঙ্গে। যাই হোক, এটা অবশ্যই অবিসম্বাদিত, মাইকেলের কাব্যে সীতার যে পঞ্চবটী-জীবনের আলেখ্য অঙ্কিত হয়েছে, এবং কবির উপস্থাপন-নৈপুণ্যে তার যে আবেদন রচিত হয়েছে, কৃত্তিবাসী ঋণ সত্ত্বেও, তার নিজস্ব আকর্ষণ বেশ উচ্চাঙ্গের। বক্তব্য শুধু এই যে, এযুগের পাঠক-সমালোচক যেন তাঁদের মাইকেল-সমীক্ষায় কৃত্তিবাসের প্রতি নির্ভরতার মাত্রা সম্পর্কে কোনো হাল্কা ধারণা পোষণ না করেন।

সীতার মুখে স্বর্পণখা-বৃত্তান্ত, খর-দূষণের যুদ্ধ-তাণ্ডব, মায়ামৃগরূপী মারীচের ছলনা, সীতা ও লক্ষ্মণের বাগ্‌বিনিময়, ভণ্ড-তপস্বী বেশে রাবণের সীতাহরণ, জটায়ু-সংবাদ, সুগ্রীবাদি পঞ্চবীরের সংযোগ, সমুদ্রের সেতু-বন্ধন ও রাম-কটকের লঙ্কাপুরী আক্রমণ, মতবিরোধের ফলে বিভীষণের রাবণপক্ষ পরিত্যাগ, উভয়পক্ষের তুমুল যুদ্ধ,কুম্ভকর্ণের অকালে নিদ্রাভঙ্গ ও রামহস্তে বিনাশ পর্যন্ত যে রামায়ণের ঘটনা এই চতুর্থ সর্গের সীতা-সরমা-সংবাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তাতে স্বভাবতই কৃত্তিবাসের অনুকরণ অপরিহার্য। এখানে লক্ষণীয় অভিনবত্ব—কবির উপস্থাপনের কায়দা—এক স্বপ্নের আমদানী—ঠিক রাবণ-জটায়ুর সংঘর্ষের মাঝখানে সীতার মূর্চ্ছিতাবস্থায়। অর্থাৎ সুগ্রীবাদি পঞ্চবীরের প্রসঙ্গ থেকে কুম্ভকর্ণের পতন পর্যন্ত যাটি রামায়ণ-কাহিনী ঐ স্বপ্নের মধ্যে স্থান দেওয়া হয়েছে। অতঃপর স্বপ্নভঙ্গের নাটকীয়তা যাতে উপভোগ্য হয় তার জন্য কবি আবার এক টুকরা কৃত্তিবাসী আখ্যান এইখানে জুড়ে দিয়েছেন, যেটা কৃত্তিবাসে একেবারে লঙ্কাকাণ্ডের শেষের দিকের কথা, রাবণ-বধান্তে সীতাদেবীর রামসমীপে গমন। এখানে কবি দেখিয়েছেন, রামচন্দ্রের দর্শন পেয়েই সীতা যেই তাঁর পাদস্পর্শ করতে যাবেন অমনি স্বপ্ন ভেঙে গেল। এটি তাঁর নিজস্ব। এর পর পুনরায় জটায়ু-প্রসঙ্গ ও রাবণের সীতাকে এনে অশোকবনে বন্দিনী করে রাখার কথায় এখানকার কাহিনী শেষ। এই স্বপ্ন ও দেবী বসুন্ধরা-ভূমিকার পরিকল্পনা কবির একটা উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দেয় বটে।

তবে এই প্রসঙ্গে এটাও উল্লেখযোগ্য, সম্ভবত কৃত্তিবাসী ছাঁচ এড়িয়ে বর্ণনায় অভিনবত্ব আনবার জন্য এখানে রাবণ-কর্তৃক সীতাহরণ ও অশোকবনে সীতার অবস্থান বিবৃত করার আয়োজন সুবিস্তৃত হওয়া সত্বেও দুটি জিনিষ কবির হাতে উপেক্ষিত হয়েছে।

"অশোকবনং নামঃ চতুর্থঃ সর্গঃ" (সীতা-সরমা-সংবাদঃ বা এই জাতীয় কিছু নয়) এইভাবে অশোকবনের নামে যার নামকরণ, তার মধ্যে অশোকবনের কোনো বর্ণনা নেই বললেই হয়। দূরে থেকে থেকে বাতাস বইছে, 'নড়িছে বিবাদে মর্মরিয়া পাতাকুল! বসেছে অরবে শাখে পাখী! রাশি রাশি কুসুম পড়েছে তরুমূলে', আর, দূরে একটা প্রবাহিনী বয়ে চলেছে,—এই কয়েকটি কৃত্রিম কথা ছাড়া অশোকবনের নিজস্ব কোনো নক্‌সা এখানে স্থান পায়নি।

এখানে হয়তো কারো মনে জাগবে দীননাথ সান্ন্যালের মন্তব্য। তিনি

লিখেছেন, 'কবি অশোককাননের যে শোকাবহ চিত্র দিয়াছেন, তাহা কি বাল্মীকি, কি কৃত্তিবাস, কাহারও কাছে পাওয়া যায় না।' পূর্বোক্ত ফুল-পাখি-বাতাস-প্রবাহিনী-র প্রসঙ্গের মধ্যে তিনি দেখেছেন, 'সমগ্র কাননটি যেন সীতার দুঃখে দুঃখী।' সমালোচকের এ ভাষ্য প্রশংসনীয়। তবে এটাও ঠিক, মাইকেল হয়তো অশোকবনের শোকাবহ চিত্র দিয়েছেন, কিন্তু অশোকবনের চিত্র দিতে ভুলে গেছেন, যেটা রামায়ণে, বিশেষত কৃত্তিবাসে প্রশস্তভাবেই চিত্রিত (পৃঃ ২৫০)। মাইকেল যেটা দিয়েছেন, তার কাব্যসৌন্দর্য চমৎকার, তবে সম্পূর্ণ কল্পনার লীলা, এবং কৃত্রিমতার আবেশ অতিরিক্ত মাত্রায় চড়ে যাওয়ায় কবি লিখেছেন, 'না পশে সুধাংশু-অংশু সে ঘোর বিপিনে।' বস্তুত লঙ্কার অশোক-কানন এমন 'ঘোর বিপিন' নয় যে, চন্দ্র-কিরণ তার মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না। বরং ঠিক তার বিপরীত। বহুবিধ ফল-পুষ্প-সমন্বিত বৃক্ষলতাদিতে মনোরমভাবে সুসজ্জিত কানন। কোকিলের কলতানে, ভ্রমরের ঝঙ্কারে, ময়ূরের কেকায় ও মনমাতানো নৃত্যে সে এক অতি রম্যস্থান। সীতার বিষাদের সুরে সুর মেলাতে গিয়ে মাইকেল একে দুর্ভেদ্য জঙ্গলে পরিণত করে ফেলেছেন। অথচ যে "বৈপরীত্যের সমাবেশ"কে দীননাথ সান্ন্যাল একটু আগেই "কাব্যকলার উৎকৃষ্ট অঙ্গ" বলে বরণ করেছেন, সেই কাব্যকলাই তো প্রদর্শিত হতো যদি অশোককাননের স্বাভাবিক সৌন্দর্যের মধ্যে সীতার বিষাদ-মলিন চিত্রখানি হতো উদ্‌ঘাটিত। আমরা অবশ্য এ নিয়ে কোনো বড়ো আপত্তি তুলতে চাই না, কারণ ঐ কটি ছত্রে পৃথকভাবে যে একটা কবিত্বের প্রকাশ ঘটেছে, তা উপভোগ্য। তবে কৃত্রিমতার আশ্রয়ী কবি এইখানে যে আরও অসঙ্গতি ঘটিয়ে বসে আছেন তা প্রশস্তিমুখী সমালোচনায় ধরা পড়তে চায় না।

মাইকেল সীতা-চিত্রখানি অঙ্কন করলেন, 'মলিন-বদনা'; জ্যোতিহীন ঠিক যেমন খনিগর্ভস্থ সূর্যকান্ত মণি, সূর্যরশ্মি ব্যতীত যা ম্লানাভ; সমল সলিলে কমল যেমন ফোটে না, এও তেমনি; কিন্তু একই নিশ্বাসে কবি আবার জানালেন, 'প্রভা আভাময়ী তমোময় ধামে যেন'। এই 'প্রভা'-দেবীর কবিদত্ত রূপ-বর্ণনা—

> শত দিবাকর জিনি,
> প্রভা—স্বয়ম্ভুর পাদপদ্মে স্থান যাঁর—
> উজ্জলেন দেশ ধনী প্রকৃতিরূপিণী……।

যদি শতদিবাকরেরও অধিক জ্যোতিতে সীতামূর্তি উজ্জ্বল, তবে তাকে মলিন, তিমিরগর্ভস্থ সূর্যকান্ত মণিসদৃশ বলা কেন? পয়ার-লাচাড়ীর কবি কৃত্তিবাস কিন্তু অশোকবনের সীতাকে যথাযথরূপেই দেখিয়েছেন :

গায়ে মলা পড়িয়াছে মলিনা দুর্বলা।
দ্বিতীয়ার চন্দ্র যেন দেখি হীন-কলা॥
দিবাভাগে যেন চন্দ্রকলার প্রকাশ।
শ্রীরাম বলিয়া সীতা ছাড়েন নিশ্বাস॥ (পৃঃ ২৫০)

এই সীতা-চিত্রেরই একান্ত প্রাসঙ্গিক দীননাথ সান্যালের এই মাত্র উল্লেখিত 'বৈপরীত্য-কাব্যকলা'-প্রদর্শনের মধ্যে আরো একটি মন্তব্যের অবসর রয়েছে। ভাষ্যকার দেখাতে চেয়েছেন, অশোকবনের বিষাদ-মলিন চিত্র উদ্‌ঘাটনের পূর্বে লঙ্কার আনন্দোৎসবের বর্ণনা যোজিত হওয়ায় ঐ কাব্যকলার উৎকৃষ্ট নমুনা ফুটেছে। কৌশলটি অবশ্যই সুন্দর। কিন্তু মাত্রাজ্ঞানরহিত কবি মাইকেলের অসংযত লেখনী-চালনায় ঐ কৌশল-প্রয়োগের মধ্যে যে নিদারুণ আপত্তিকর অসুন্দরের অনুপ্রবেশ ঘটেছে ভাষ্যকার তা লক্ষ্য করেন নি। কারুণ্যে, পবিত্রতায় ও গাম্ভীর্যে অতিবিশিষ্ট যে সীতা-প্রসঙ্গ, তারই prelude রচনায় কবি যে হীন নীতি-শৈথিল্যাশ্রয়ী সম্ভোগমত্ততার সুরের আবেশ সৃষ্টি করলেন,—

নায়কে লয়ে কেলিছে নায়কী,
খল খল খল হাসি মধুর অধরে!
কেহ বা সুরতে রত, কেহ শীধুপানে। (৪।২৫-২৭)

এতে কি রুচিবোধে আঘাত করে না? বৈপরীত্যের জন্য কি অতটারই দরকার ছিল? সে যাই হোক, 'অশোকবনং নামঃ' আলোচ্য সর্গে অন্যান্য অনেক বিষয়ের মতো কৃত্তিবাসের অনুসরণে অশোকবনের একটি বিশ্বস্ত আলেখ্যের অভাব যে এখানে অনুভূত হয়, এইটাই বক্তব্য।

দ্বিতীয় অভাব রাবণের স্বরূপ প্রকাশের পর তৎপ্রতি সীতার কোনো উক্তির। সেই যে "অমনি ধরিল হাসিয়া ভাসুর তব আমায় তখনি" এই বলে সরমার কাছে সীতা তাঁর আক্রান্ত হওয়ার পরিচয় দিলেন, তার পর থেকে বিচিত্র অভিজ্ঞতায়, বিচিত্র সংকটে ভরা দীর্ঘ পথ পরিক্রমান্তে একেবারে লঙ্কাপুরীর অশোকবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মধ্যে সীতার প্রতি রাবণের কিছু কিছু কথা থাকলেও তদুত্তরে সীতার মুখে কবি একটি কথাও বসান

নি। তিনি সীতাকে শুধুই কাঁদিয়েছেন। এ ছাড়া তাঁর সীতাকে দেখা যায়, আকাশ, বাতাস, মেঘ, ভ্রমর ও কোকিলের কাছে আবেদন করতে যেন তারা তাঁর দুঃখের কথা রাম-লক্ষ্মণের কাছে জানায়। এখানে কেউ যেন না মনে করেন, এই ভাবে প্রকৃতির কাছে দুঃখ-নিবেদন বা ঐকান্তিক আবেদন কৃত্তিবাসের অভাবিত, রোমান্টিক যুগের কবি মাইকেলেরই নিজস্ব উদ্ভাবন। অপহরণকালে কৃত্তিবাসের সীতা-বিলাপেও শোনা যায়—

বনের ভিতর যত আছে বৃক্ষলতা।
রামেরে কহিও গেল তোমার বনিতা॥

জটায়ুর সঙ্গে রাবণের সংঘর্ষকালে মাইকেলের সীতা দেবতাদের সাধাসাধি করেছেন (যেমন করেছেন কৃত্তিবাসের সীতাও), বসুধাকে অনুনয় করেছেন তাঁকে উদ্ধার করতে ;—প্রথমটি হয়েছে সম্পূর্ণ ব্যর্থ, দ্বিতীয়টির ফলে তিনি পেয়েছেন এক স্বপ্ন-সম্পদ। পরিশেষে সীতা আবেদন জানিয়েছেন জটায়ুর কাছেও (যার চিত্র কৃত্তিবাসে উজ্জ্বলতর),—কিন্তু রাবণকে তিনি একটি কথাও বলেন নি। এমন কি, রাবণের তরফে যেখানে সরাসরি সীতার উদ্দেশে কভু সরোষ শাসন, কভু সুমিষ্ট তোষণ, কভু বা পৌরুষ-প্রতিষ্ঠাসূত্রে মুগ্ধতা-অর্জনের প্রয়াস দেখানো হয়েছে, সেখানেও সীতার কোনো প্রত্যুত্তর নেই।

সীতা রথারূঢ়া হলেন। রাবণের প্রচেষ্টা সম্পর্কে কবি সীতার মুখে জানালেন,—

'কহিল যে কত দুষ্টমতি,
কভু রোষে গর্জি, কভু সুমধুর স্বরে, — —। (৪র্থ—৩৬৯-৭০)

সীতার প্রতিক্রিয়া ?

'স্মরিলে, শরমে ইচ্ছি মরিতে, সরমা !

অনুপ্রাস জমজমাট হলো, কবিও ক্ষান্ত হলেন। অতঃপর চললো সীতার ক্রন্দন—'কাল-সর্প মুখে কাঁদে যথা ভেকী,' যার কৃত্তিবাসী সংস্করণ—'গরুড়ের মুখে যেন বদ্ধা ভুজঙ্গিনী' (কিষ্কিন্ধ্যা—১৮৩)।

দ্বিতীয় আলাপের দৃশ্য এক পার্বত্য অঞ্চল। সীতা ভূতলে অবস্থিতা। চোখের সামনেই রাবণ, এক পাশে পড়ে আছে মুমূর্ষু জটায়ু। রাবণের আলাপ :—

"ইন্দীবর আঁখি
উন্মীলি, দেখ লো চেয়ে ইন্দু-নিভাননে,
রাবণের পরাক্রম !" ইত্যাদি।

সীতা নিরুত্তর। জটায়ুর শেষ উক্তিতে রাবণের প্রতি উপযুক্ত ভর্ৎসনা শোনা গেল। সীতাকে রাবণ পুনরায় রথে তুলে নিলেন, সেখানে বসে সীতা জটায়ুর কাছে নিবেদন করলেন তাঁর মনের কথা। কিন্তু রাবণকে তিনি কিছুই বললেন না।

এরই সঙ্গে যুক্ত হোক "বৃথা তুমি গঞ্জ দশাননে" সরমার কাছে সীতার এই অনুনয়। উক্তিটির নিজস্ব মূল্য ও মহিমা যথেষ্ট আছে, স্বীকার করি। স্বীকার করি, এতে সীতার চরিত্র সত্যনিষ্ঠায় ও ঔদার্যে আলোকিত হয়েছে। কিন্তু এত বড়ো দুষ্কৃতকারী যে রাবণ, তাকে একটি সামান্য মিথ্যা অপবাদ থেকে বাঁচাবার চেষ্টা হলো প্রাণপণে, অথচ সত্য যেটা, যে অপরাধের ক্ষমা নেই, যে স্পর্ধার সীমা নেই, যে নারকীয় প্রস্তাব সতীত্বের প্রজ্বলিত হুতাশনে তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হওয়ার কথা, তার প্রতিক্রিয়ায় সীতার মুখে যে সরাসরি সেই দুর্বৃত্তের প্রতি একটিও কথা সরলো না, এটা কি সীতা-চরিত্রের পক্ষে খুব স্বাভাবিক মনে হয়? সীতার এই নীরবতা ও 'বৃথা তুমি গঞ্জ দশাননে' এই দুটিকে পাশাপাশি নিলে কী অদ্ভুতই না দাঁড়ায় চিত্রখানি! যেন দশানন ব্যক্তিটি গঞ্জনার ঊর্ধ্বে! নচেৎ 'বৃথা' যেটি, সেটিকে না হয় গণনার বাইরে রাখা গেল, যে গঞ্জনা তার অবশ্য প্রাপ্য, তার ক্ষীণতম আওয়াজও যে শোনা গেল না সীতাদেবীর কণ্ঠে, সেদিকে কবি কোনো খেয়াল রাখেন নি। অথচ সীতা যে উপযুক্ত ক্ষেত্রে মন্তব্যে যথেষ্ট কঠোর হতে পারেন তার পরিচয় মাইকেলই দিয়েছেন।

"......ঘোর বনে নির্দয় বাঘিনী
জন্ম দিয়া পালে তোরে, বুঝিনু দুর্মতি!
রে ভীরু, রে বীর-কুল-গ্লানি, যাব আমি,
দেখিব করুণ স্বরে "কে স্মরে আমারে
দূর বনে?" (৪র্থ, ৩০৪—৩০৮)

মারীচের ছদ্ম আর্তনাদে রামের বিপদ-সংকেত লক্ষ্মণকে অগ্রাহ্য করতে দেখে সীতার এই যে তিরস্কার ও তার মূলে বক্তৃীর যে প্রকৃতি-গঠন, তার সঙ্গে অপহরণ-কালীন সীতা-প্রকৃতির সঙ্গতি রইলো কোথায়?

আলোচ্য ক্ষেত্রে কৃত্তিবাসের সীতা-চিত্র মাইকেলের মত নিতান্তই কান্নায় ভেঙে-পড়া একটি নারীমাত্র নয়। যেইমাত্র দুষ্ট রাবণ সীতার হস্ত ধারণ-

পূর্বক বলপ্রয়োগে মত্ত হলো অমনি সহসা সেই বিপরীত সংঘটনে সমস্ত সত্তায় ভূমিকম্প অনুভূত হলেও জানকীর মুখে ঝঙ্কৃত হলো তিরস্কার।

দুরাচার দূর হ রে পাপিষ্ঠ দুর্জন।
আমা লাগি হবে তোর সবংশে মরণ ॥

রাবণের তোষামুদী কথায় মাইকেলের সীতা শুধু লজ্জায় মরে যান (শরমে ইচ্ছি মরিতে), আর, কৃত্তিবাসের সীতার প্রতিক্রিয়া—

কোপান্বিতা সীতাদেবী রাবণ-বচনে।
রাবণেরে গালি দেন যত আইসে মনে ॥
অধার্মিক অগণ্য অধম-দুরাচার।
করিবেন রাম তোরে সবংশে সংহার ॥

মাইকেলের সীতা যেন রাবণের কথামতোই ইন্দুনিভানন-মণ্ডলস্থ দুটি ইন্দীবর আঁখি মেলে রাবণের পরাক্রম দেখলেন,—যার নিহিত ব্যঞ্জনায় রয়ে যায়, 'তবে রাবণ আর রামের চেয়ে নিকৃষ্ট কিসে?' পক্ষান্তরে কৃত্তিবাসের সীতা রাবণের অনুরূপ প্রস্তাবের উত্তরে বলেন,—

শ্রীরাম কেশরী তুই শৃগাল যেমন।
কি সাহসে তাঁহারে বলিস কুবচন ॥
বিষ্ণু-অবতার রাম তুই নিশাচর।
রাম আর তোরে দেখি অনেক অন্তর ॥
যদি রাম থাকিতেন অথবা লক্ষ্মণ।
করিতিস কেমনে এ দুষ্ট আচরণ ॥
একাকিনী পাইয়া আমারে বনমাঝ ॥
হরিস আমারে দুষ্ট নাহি তোর লাজ ॥

তা ছাড়া, মাইকেলের কাব্যে সরমার কাছে সীতার গল্প বলার ভঙ্গি থেকে মনে হয়, 'দশানন' তাঁর কাছে কেবল একটি মহিমান্বিত নামমাত্র, সেই নামের অধিকারীটির স্বরূপ-পরিচয় তিনি যেন কখনও পান নি। তাই মাইকেলের সীতাকে এক মুহূর্তের জন্যও 'দশাননে'র দশটি আনন ও তদানুষঙ্গিক মূর্তিগত বা শক্তিগত বিভীষিকায় কম্পিত হতে দেখা যায় না। অপহরণের ভয়ঙ্কর মুহূর্তেও না। এই কবির-কল্পনায় হয়তো দশাননের দশাননত্ব খারিজ বলেই ভাবতে হয়, কিন্তু সে ক্ষেত্রেও অন্তত পরদার-লুণ্ঠনরত ভীষণ দুর্বৃত্তের মূর্তিতে সেই দুষ্কর্মসাধন-কালে যে ভয়াবহতা না থেকেই পারে না,

তাও দেখা যায় সীতাকে স্পর্শ করে নি। সন্ত দস্যুহস্তগতা সীতার চোখে দস্যু রাবণ তপস্বিবেশ থেকে রূপান্তরিত হলেন "রাজরথী" বেশে (৪।৩৬৮), এবং এই অপহর্তার কীর্তি-কলাপের বর্ণনায় তদুদ্দেশ্যে প্রযুক্ত সীতার বচন-বাচনে রোষাবেশ বা ঘৃণার পরিবর্তে প্রায়ই একটা দরদের আভাসই পরিস্ফুট। রাজরথী সীতাকে হরণ করতে পারেন, তবে তুলে নিলেন কিন্তু 'স্বর্ণ-রথে'! রথ চলতে থাকলো। সীতার মুখে তার পরিচয়,—"চালাইল রথ 'রথী'। সীতার অবস্থা তখন ফাঁদে-পড়া পাখীর মতো, কিন্তু মুখের ভাষা,—"চালাইল রথ 'লঙ্কাপতি"। জটায়ু রাবণের সংঘর্ষে সীতা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছিলেন। চেতনা ফিরে পেয়েই দেখলেন রাবণকে, যে রাবণ তাঁরই সর্বনাশে প্রবৃত্ত, কিন্তু নিজমুখে তার পরিচয়ের বেলা সীতা বলছেন, "গগন-মার্গে রথে রক্ষোরথী যুঝিছে ..."। এইভাবে 'রাজরথী', 'রথী', 'লঙ্কাপতি,' 'রক্ষোরথী' ইত্যাদি সশ্রদ্ধ দরদী ভাষায় সীতার মুখে রাবণের উল্লেখ আলোচ্য ক্ষেত্রে যেমন অস্বাভাবিক তেমনই কৃত্রিম। বিমান-পথে রথ চলেছে, চলেছে সীতাকে নিয়ে তাঁর করাল দুর্ভাগ্যের দিগন্ত থেকে দিগন্তের অজানা নিশানায়, কিন্তু মাইকেলের সীতার মুখে তার বর্ণনা—

চলিল কনক-রথ, এড়াইয়া দ্রুতে
অভ্রভেদী গিরি-চূড়া, বন, নদ, নদী,
নানা দেশ!

যেন সীতাদেবী দেশ-ভ্রমণে বেরিয়েছেন! যে যান-বাহনের সুযোগ ঘটে গেছে তাঁর, তারই বা কত প্রশংসা!

স্বনয়নে দেখেছ, সরমা,
পুষ্পকের গতি তুমি; কি কাজ বর্ণিয়া?—

এ ছাড়া, রথের প্রসঙ্গ এলেই তাকে 'স্বর্ণরথ' বলে পরিচিত করার জন্য সীতাদেবীর কী আশোভন ব্যগ্রতা! "স্বর্ণ-রথ-চক্র ঘর্ঘরি নির্ঘোষে", "স্বর্ণরথ চলিল অস্থিরে",—সবই সীতার মুখের কথা। যেন সোনার মায়ায় আবদ্ধ জানকী সেই আকাশযানটিকে 'স্বর্ণরথ' বলে ঘোষণা করবার জন্য অস্থির!

Art-এর সঙ্গে বোধ হয় Artificiality-র সম্পর্ক একটা আছেই, তাই Literary (অর্থাৎ Artificial?) Epic রচনা করতে গিয়ে মাইকেল এমন বে-সামাল হয়ে পড়েছেন! জীবনের চরম-সংকট-মুহূর্তে সীতাদেবীকে এমন ভ্রমণ-বিলাসিনীর ভঙ্গিতে অঙ্কিত করেছেন!

কৃত্তিবাসে এই কৃত্রিমতা নেই। সেখানে অপহরণমুহূর্তে রাবণের ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখে

'জানকী কাঁপেন যেন কলার বাগুড়ি।' (আরণ্য ১৬৭)

রাবণের তর্জন-গর্জনে যদিও "জানকীর উড়িল জীবন", তথাপি—

জানকী বলেন আরে পাতকী রাবণ।
আপনি মজিলি বেটা আমার কারণ ॥

রাবণ তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে সীতাকে বলেন, 'কেন ভাব অকারণ'
'পাইলে এমন রত্ন ছাড়ে কোন জন ॥'

তদুত্তরে

জানকী বলেন শুন দুষ্ট নিশাচর।
অল্পায়ু হইয়া তুই যাবি যমঘর ॥

ক্ষেত্র যখন একই, রাবণ ও সীতার সম্পর্কও যখন অপহর্তা ও অপহৃতার, তখন উভয় কবির চিত্র-রচনা ও সংলাপ-রচনার পার্থক্য ও আধুনিক কবির এ বিষয়ে কৃতিত্বের দাবী বিজ্ঞ পাঠকের অবশ্যই সমালোচ্য।

সামগ্রিক বিচারে মাইকেলের হাতের সীতা-কাহিনী যে সত্যই মনোরম এবং সীতা-চিত্রখানিও সু-অঙ্কিত, তাতে কোনো দ্বিমত থাকতে পারে না। তবে দীননাথ সান্যাল যে মাইকেলের হাতের এই চিত্র ও চরিত্রকে রামায়ণের চেয়েও উৎকৃষ্টতর বলে দাবী করেছেন, মন্তব্য করেছেন, 'রামায়ণে সীতার আদর্শ খুব উচ্চে প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও, মধুসূদন তাঁহার কাব্যকলার গুণে যেন সেই আদর্শ আরও উচ্চে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন'—এটি নির্দ্বিধায় মেনে নেওয়া যায় না। মাইকেলের সীতার রাবণের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ অতিদুর্বলতায়, অস্বাভাবিকতায় ও অসঙ্গতিতে কণ্টকিত। এ সীতা বহুলাংশে আড়ষ্ট। কাব্যিক কোমলতা-পেলবতায় এখানকার সীতা এক রমণীয় চিত্র, কিন্তু প্রত্যাশিত ব্যক্তিত্বের অভাবে যথেষ্ট সজীব ও বিশ্বস্ত চিত্র নয়। লক্ষ্মণের প্রতি তিরস্কারের নূতন ছাঁচ রচনা করে মাইকেল অবশ্যই একটি প্রশংসনীয় সংস্কার সাধন করেছেন। তবে মাত্র এই একটি বিষয়ের জন্য সমগ্র সীতা-চিত্রের উন্নয়নের দাবী স্বীকৃত হতে পারে না। তা ছাড়া, ভুললে চলবে কেন, বাল্মীকির রামায়ণ খাঁটি Epic,—Epic of Growth, (মাইকেলের হাতে পাওয়া গেছে epic of art অর্থাৎ মেকি epic-এর ছাঁচ মাত্র), তার 'সীতা' একটা epic character। লক্ষ্মণকে তিরস্কারের বেলা যে অভব্যতার

আগুন ছুটেছে এই সীতার মুখে, সেটা সেই epic যুগেরই নিরাবরণ বিশ্বস্ততার পরিচয়। অভাবনীয় চরম বিপদে চরম ধৈর্যচ্যুতি ও আতঙ্কের ফলে মুখে যে কঠোরতম অমার্জিত তিরস্কার এসেছে, তার উপর কোনো প্রলেপ দেওয়ার কথা আদিকবির মনে জাগে নি। তিনি অবশ্যই বুঝেছিলেন অকলঙ্ক সীতা-চরিত্রে কলঙ্ক-স্পর্শ ঘটলো। কিন্তু চন্দ্রেও তো আছে কলঙ্ক-চিহ্ন। তাতেই যেমন চন্দ্রের স্বাভাবিকতা, বাল্মীকির সীতা-চরিত্রও তাই, চন্দ্রের মতোই এ কলঙ্কসত্ত্বেও অকলঙ্ক। তা ছাড়া, সীতা কেবল দেবীই নন, মানবীও বটেন। সেবা, ধৈর্য, ত্যাগ, ঔদার্য, স্নেহ প্রভৃতির সঙ্গে কচিৎ রাগ-অভিমান-জনিত স্থূলতার বিরল বুদ্‌বুদ্‌যোগে ঐ যে চরিত্র রচিত হয়েছে, ওই হলো দৈবী-মানবীর সমন্বয়ে রচিত epic-এর শক্তিশালী নারী-চরিত্রের আদর্শ। মধুসূদন যা করেছেন, তা প্রশংসনীয়, বাল্মীকি যা এঁকেছেন, তাও অনিন্দ্য, যেহেতু তা epic যুগের epic চরিত্রের বিশ্বস্ত আলেখ্য।

কথা আরও আছে। নূতনের মোহে যখন প্রশস্তির ঢেউ তোলা হয়, তখন প্রাচীন সৃষ্টির সমীক্ষায় বুঝি আর পর্যাপ্ত ধৈর্য বজায় রাখা চলে না! এ যুগের পাঠকের মন একেই চঞ্চল, তার উপর প্রাচীনের প্রতি শ্রদ্ধাহীন। সুতরাং মহর্ষির সীতা-চরিত্রের পূর্বোক্ত ত্রুটি ও তার পাশাপাশি মাইকেলের ঐ সংস্কারটুকু দেখিয়ে মহর্ষিকে নিন্দিত করে মাইকেল ও তাঁর সীতা-চিত্রের প্রশংসায় আসর মাত করা সহজ হয়েছে। এর ফলে যদি সাধারণ পাঠক বাল্মীকি-বিরূপতার বশবর্তী হন ও সীতা-চরিত্র তথা সমগ্র রামায়ণ-কাহিনীর উৎকৃষ্টতর দলিল হিসাবে তাঁর 'বুক্-কেস' থেকে ভারী-ওজনের ছেঁড়া-ময়লা বাল্মীকি কৃত্তিবাসী সংস্করণ সরিয়ে মেঘনাদবধ-কাব্য দিয়েই স্থান পূরণ করতে চান, তবে তাঁকে খুব দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু তাতে ঐ মহর্ষি-অঙ্কিত সীতা-চিত্রের অপরাপর অংশের যে বার্তা অবিদিত, উপেক্ষিত, অবজ্ঞাত থেকে যাবে, তার ক্ষতিপূরণের কোনো ক্ষমতাই নেই মেঘনাদবধ-কাব্যের। আর্য রামায়ণের সীতাদেবীর চোখে লক্ষ্মণকে যাঁরা আধুনিক সমালোচনার প্রসাদে কেবল ঐ আরণ্য তিরস্কারের আলোকেই চিনতে অভ্যস্ত হয়েছেন [এ অভ্যাসেরও মূলে যোগীন্দ্রমোহন বসু (পৃঃ ৩৭৭-৭৮), অতঃপর, দীননাথ সান্যাল], তাঁদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে সুন্দরকাণ্ডে হনুমানের নিকট লক্ষ্মণের উদ্দেশে সীতার উক্তি :—

স্রজশ্চ সর্বরত্নানি প্রিয়া যাশ্চ বরাঙ্গনাঃ ॥
ঐশ্বর্যং চ বিশালায়াং পৃথিব্যামপি দুর্লভম্ ।
পিতরং মাতরং চৈব সম্মান্যাভিপ্রসাদ্য চ ॥
অনুপ্রব্রজিতো রামং সুমিত্রা যেন সুপ্রজাঃ ।
আনুকূল্যেন ধর্মাত্মা ত্যক্ত্বা সুখমনুত্তমম্ ॥
অনুগচ্ছতি কাকুৎস্থং ভ্রাতরং পলায়ন্ বনে ।
সিংহস্কন্ধো মহাবাহুর্মনস্বী প্রিয়দর্শনঃ ॥
পিতৃবদ্ বর্ততে রামে মাতৃবন্মাং সমাচরৎ ।
হ্রিয়মাণাং তদা বীরো ন তু মাং বেদ লক্ষ্মণঃ ॥
বৃদ্ধোপসেবী লক্ষ্মীবাঞ্ শক্তো ন বহুভাষিতা ।
রাজপুত্রপ্রিয়শ্রেষ্ঠঃ **সদৃশঃ শ্বশুরস্য মে** ॥
মত্তঃ প্রিয়তরো নিত্যং ভ্রাতা রামস্য লক্ষ্মণঃ ।
ন যুক্তো ধুরি যস্যাং তু তামুদ্বহতি বীর্যবান ॥
যং দৃষ্ট্বা রাঘবো নৈব বৃত্তমার্যমনুস্মরৎ ।
স মমার্থায় কুশলং বক্তব্যো বচনান্ মম ॥ (সুন্দর ৩৮।৫৪-৬১)

হে হনুমান তুমি আমার হয়ে লক্ষ্মণকে কুশল প্রশ্ন করো! কেমন লক্ষ্মণ?—যে লক্ষ্মণ মাল্যাদি ভূষণ, সর্বরত্ন, প্রিয়া বরাঙ্গনা ও পৃথিবীর দুর্লভ ঐশ্বর্য ত্যাগ করেছেন ইত্যাদি ;···যিনি রামের সঙ্গে পিতৃবৎ এবং আমার সঙ্গে মাতৃবৎ আচরণ করেন, যে বীর লক্ষ্মণ আমার অপহরণ জানতে পারেন নি······যিনি রাজপুত্র রামের সর্বাপেক্ষা প্রিয়, যিনি আমার শ্বশুরের সদৃশ, যিনি আমার অপেক্ষাও রামের প্রিয়,······যাঁকে দেখে রাম মৃত পিতাকেও ভুলে থাকতে পারেন,—তাঁকে তুমি আমার হয়ে কুশল প্রশ্ন ক'রো।

এই সীতাকে মেঘনাদবধে খুঁজে পাওয়া যাবে কি? এবং এর আলোকে ঐ বিপজ্জালজনিত অসংবৃত মুহূর্তের আরণ্য তিরস্কারটুকু মানিয়ে নেওয়া কি একেবারেই অসম্ভব? এপিক চরিত্রের মহিমাই এখানে। দুর্বলতায় প্রলেপ নেই। সর্বাত্মক মহিমার অঙ্কেই তার স্থান। পাঠক সমগ্রকে দেখুন, কেবল তার পোষাকী অংশটুকু নয়। অতএব, মেঘনাদবধের স্থান নির্দিষ্ট হোক নূতন পালিশ-করা 'বুক-কেসে', কিন্তু বাল্মীকি-কৃত্তিবাসকে একেবারে ফেলে না দিয়ে অন্তত পুরানো পাঁজির টবের বাক্সেও যেন স্থান দেওয়া হয়!

'কাব্যকলার গুণে' কাহিনীর সাহিত্যিক আকর্ষণ বাড়তে পারে, চরিত্রাদর্শ উচ্চতর হয় কি? বিশেষ তো, মধুসূদনের যে বিশেষ কাব্যকলাটি দীননাথ সান্যালের প্রশংসামুখর সমালোচনায় বিশেষভাবে কথিত হয়েছে, সেই 'স্বপ্নে'র আমদানীতে সীতা-চরিত্রের আদর্শ আরও উচ্চে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এমন কল্পনা একটু অদ্ভুত লাগে বৈকি। এখানেও যে প্রশস্তি-বিহ্বলতা সক্রিয়, তার প্রমাণ, ঐ কলা-প্রসঙ্গের অবতারণামুখে দীননাথ লিখেছেন, "হরণকালে মূর্চ্ছাপ্রাপ্তা সীতার স্বপ্ন, উহার (নানাবিধ কাব্যকলার) অন্যতম।" এই বিবৃতি আপত্তিকর, কারণ, অসত্য। হরণকালে মূর্চ্ছাপ্রাপ্তা হলে, মাইকেলের সীতা-চিত্র অনেক স্বাভাবিক ও সুন্দর হতো, সীতা-চরিত্রও হতো জীবন্ত। কিন্তু দেখা যায়, হরণকালে সীতা দিব্যি ঠাণ্ডা মাথায় লক্ষ্য করলেন রাবণের হাসিটুকু,—'অমনি ধরিল হাসিয়া ভাস্কর তব আমায় তখনি'; ক্রন্দনের মধ্যেও নিপুণভাবে লক্ষ্য করলেন রাবণের রাজরথী বেশ, স্বর্ণরথ, রথের চালনা ইত্যাদি। মূর্ছিত হওয়ার কোনো লক্ষণই নেই। হয়তো তাঁর কোনো বিকারই ঘটতো না, যদি জটায়ু হাঙ্গামার সৃষ্টি না করতো। কান্নাকাটি ও আকাশ-বাতাস-ভ্রমর-কোকিলের কাছে আবেদন-নিবেদন সেরে নিয়ে মাইকেলের সীতা বেশ দেখতে দেখতে চলেছেন কনক-রথের পথ-পরিক্রমা। কতো গিরিচূড়া, কতো নদ-নদী-বন, কতো দেশ কতো দ্রুত এড়িয়ে চলেছে রাবণের পুষ্পক-রথ! মূর্ছিত হওয়ার কোনো কারণই নেই। সহসা তিনি শুনলেন জটায়ুর সিংহনাদ। লক্ষ্য করলেন, সেই ভয়ঙ্কর নাদে পুষ্পকবাহী বাজী-রাজি আতঙ্কে 'থরথরি কাঁপিল'। শুনলেন জটায়ুর অভিযোগ ও আক্রমণের আস্ফালন। সেই সঙ্গে যেই জটায়ু-'শূরেন্দ্র' একটি গর্জন করলেন, অমনি সীতা রথেই মূর্ছিত হলেন। কিন্তু এখন শুধুই মূর্ছা, স্বপ্ন নয়। স্বপ্নের জন্য এখনও ষ্টেজ সেট করা হয় নি! 'ভবিতব্যের দ্বার' খুলে দিয়ে যিনি মৈথিলীকে তাঁর ভাবী জীবনের ঘটনা 'Bioscope' করে দেখাবেন, সেই বসুন্ধরা জননীর কাছে সীতাকে দিয়ে একটা প্রার্থনা জানানো হয় নি। তাই এ মূর্ছা অচিরেই ভাঙিয়ে, ঐ প্রার্থনা জানিয়ে দ্বিতীয়বার সীতাকে মূর্ছিত করা হলে, সুরু হলো স্বপ্ন, যার সম্বন্ধে দীননাথ লিখেছেন, "তারপর বসুন্ধরা ভবিতব্য পট ঠিক Bioscope-এর মতো করিয়া স্বপ্নময়ী সীতার চক্ষে এক এক করিয়া দেখাইলেন।" সমালোচকের প্রশস্তিমুগ্ধতা এই বাগভঙ্গিতেই সুস্পষ্ট। স্বপ্নটি যে মাইকেলের একটি সুচতুর উদ্ভাবন এবং কাহিনীবিস্তারের পক্ষে

একটি মূল্যবান কাব্যকলা,—বড়জোর এই পর্যন্তই বলা চলে। কিন্তু এর অনু-প্রবেশের কৃত্রিমতা কি প্রকট নয় ? আর এমন একটি কৃত্রিম কলা-পরিবেশনায় সীতা-চরিত্রের আদর্শ যে কিভাবে কোথায় উন্নীত হয়েছে, তা আমাদের বোধগম্য নয়। পূর্ববিশ্লেষণে বরং এই কথাই প্রমাণিত হয় যে, কলা-কৌশলের খাতিরে মাইকেলের সীতার আলেখ্যটি কিঞ্চিৎ আড়ষ্টতা প্রাপ্ত হয়েছে, চরিত্রায়ণেও প্রত্যাশিত স্বাভাবিকতার অভাব রয়ে গেছে।

বস্তুত উন্নয়ন তো দূরের কথা, মহর্ষির হাতের সীতার চিত্র ও চরিত্রগত উৎকর্ষের মান মাইকেলের সীতা-চিত্রের দ্বারা কিছুতেই নির্ণীত হতে পারে না। এ বিষয়ে বর্তমান গ্রন্থের নবম অধ্যায়ে যৎকিঞ্চিৎ আলোকপাত করা হয়েছে।

[৭] মন্দোদরী ও সরমা : মাইকেলী ও কৃত্তিবাসী চিত্রের পর্যালোচনা

এ যুগের সাহিত্যিক উঁচু মহলে অনেকেরই ধারণা, মাইকেলের হাতে যে সরমা-চিত্র ও মন্দোদরী-চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তা সম্পূর্ণ কবির মৌলিক কল্পনা-প্রসূত। রামায়ণের রাক্ষসপুরীর মধ্য থেকে তিনি এই দুটি নারী-চরিত্রকে উদ্ধার করে খাঁটি বঙ্গনারীর মহিমা-মাখানো অভিনবরূপে যেভাবে উপস্থাপিত করেছেন, তাতে আর তাদের রামায়ণের অনার্য-প্রকৃতির রাক্ষস-নারী বলে চেনাই যায় না, একেবারে বঙ্গনারী বলেই ভ্রম হয়। বলা বাহুল্য, এই ধারণার মূলে আছে গতানুগতিক সমালোচন-ধারার উপর নিশ্চিন্ত নির্ভরতা। যোগীন্দ্র-নাথই হোন, আর মোহিতলালই হোন, যিনি যতো বড়ো করেই বলে থাকুন অমন কথা, তবু, মাইকেলের এই চিত্রগুলির নিরংকুশ মৌলিকতা মেনে নেওয়ার আগে, বাল্মীকি পর্যন্ত যদি নাও যাই, একবার অন্তত কৃত্তিবাসের চিত্র-শালায় উঁকি দিতে দোষ কি ?

সিন্দূর-কৌটা হাতে প্রবেশ, সীতার কপালে ফোঁটা দিয়ে, পায়ের ধুলো নিয়ে সেই পদতলে উপবেশন ও দরদী শ্রোত্রীরূপে তাঁর দুঃখের কাহিনী শ্রবণ,—মাইকেলের এই সরমা-চিত্র সু-অঙ্কিত, সন্দেহ নেই ; প্রথম সাক্ষাৎকার দৃশ্যটির মৌলিকতা উপভোগ্য, সংলাপ-রচনাতেও দক্ষতা অশেষ। তবে কৃত্তিবাসেও আছে, যেমন আছে মূল রামায়ণে, অশোকবনে সীতা-সরমা সংবাদে ব্যথার ব্যথী মনোভাবে ভরা আবহাওয়া। এই নিবন্ধের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের [৬]-র গোড়াতেই কৃত্তিবাস থেকে উদ্ধৃত করে দেখানো হয়েছে 'সরমা-বাহিনী'র সীতার প্রতি হৃদয়-ভাবের যে পরিচয় তাতে 'এয়োতি'-নিষ্ঠার আনুষ্ঠানিক

ঘটা না থাকলেও সরমার নারী-সত্তার মাধুর্য সহৃদয়তায়, সমবেদনায়, সখিসুলভ সমপ্রাণতায় ও পরম সান্ত্বনার উৎসরূপে অবশ্যই উপভোগ্য। রামায়ণের সরমা যে আদৌ "অনার্য প্রকৃতির রাক্ষসনারী" মাত্র নয়, 'মেঘনাদবধে'র প্রশস্তি-রচনার ধুমে বাঙালী পাঠক বুঝি সেইটাই ভুলতে বসেছে। আর যদি সত্যিই ভুলে থাকে, তবে তার জন্য দায়ী ঐ প্রশস্তি-মোহ-জনিত রামায়ণ-বিরোধী অপপ্রচার। দীননাথ সান্যালও এই মুগ্ধতারবশে মাইকেলের সীতার পাশাপাশি মাইকেলের সরমাকেও রামায়ণের চেয়ে উজ্জ্বলতর করে দেখানোর উদ্দেশ্যে ভ্রান্ত মন্তব্য চালাতে চেয়েছেন, "সরমা রামায়ণে রেখাঙ্কিতা মাত্র।" প্রকৃত পক্ষে রামায়ণের সরমা মাইকেলের সরমার চেয়ে অনেক বড়ো, অনেক বেশি মহিমময় ও অনেক বেশি শ্রদ্ধেয় নারী-চরিত্র। আবাল্য রামায়ণানুরাগী মধুসূদনের অন্তরে অবশ্যই সেই সরমা এক গভীর রেখাপাত করে থাকবে যদিও তাঁর নিজস্ব পরিকল্পনা রূপায়ণের উদ্দেশ্যে তিনি সেই বৃহৎ সরমা-চিত্রের সামান্য একটি ভগ্নাংশ নিয়ে কেবল তার মাধুর্যকেই আস্বাদ্যতর করে তুলতে প্রয়াসী হয়েছেন। কবির এই প্রয়াস যে সার্থক হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু একথা স্বীকার্য নয় যে, এমন একটা সৃষ্টির মূল উপাদান কৃত্তিবাসী সরমা-উপাখ্যানে খুঁজে পাওয়া যায় না, অথবা সেখানকার অনার্য সরমা এখানে এক অভিনবরূপে চিত্রিত হয়েছে। বরং এটাই না মেনে উপায় নেই যে কৃত্তিবাসী রামায়ণের সমগ্র সরমা-চিত্র অনেক বেশি আর্য-মহিমামণ্ডিত বেশ বড়ো বহরের এক নারী-চরিত্র। মাইকেলে যে-সরমা মাত্র এক সখিরূপে নগণ্যপ্রায় একটি ক্ষুদ্র চরিত্র, কৃত্তিবাসে পাওয়া যায় তার বিপুল পরিচয় একাধারে সখি, জায়া ও জননী, এই ত্রিমূর্তিতে, বুঝি, উত্তরোত্তর বর্ধিত মহিমায়। সেখানে প্রশস্ততর পটভূমিকায় সরমার কর্মক্ষেত্র ও সংসারজীবন লঙ্কাসমরের সেই ভয়াবহ উগ্রতার অন্তরালে অন্তঃশীলা প্রবাহের মতো এক পরম আদর্শনিষ্ঠ জীবনের সুশীতল স্পর্শ যুগিয়ে

বিভীষণ-কন্যা সে সানন্দা নাম ধরে।
তার মাকে পাঠাইল আমার গোচরে॥

মাইকেলের অবলম্বন যে সীতা-সরমা-সাক্ষাৎ-দৃশ্য, তারও আগেকার এই সরমা-সাহচর্যের প্রসঙ্গ। কন্যা সানন্দা যে তার মা-কে পাঠিয়েছিলো সীতার কাছে, এই আপাততুচ্ছ খবরটুকু সরমার জীবন-পরিবেশের একটি মূল্যবান সংকেত

বহন করে বৈ কি। সে নিজেই খালি পূতচরিত্রা, হৃদয়বতী নারী নয়, কন্যাটিও তদনুরূপ আদর্শে মানুষ হয়েছে ঐ লঙ্কার রাক্ষস-রাজের অন্তঃপুরেই।

তাছাড়া, এই সরমাই যে সুবিখ্যাত তরণীসেনের জননী, তা মেঘনাদবধের পাঠককে একবারও স্মরণ করতে হয় না,—একবারও ভেবে দেখতে হয় না, ঐ জননীর ভূমিকাটি রামায়ণে কতো বড়ো মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে আছে। বীরবাহুর যুদ্ধযাত্রার পূর্বেই রামায়ণে যে তরণীসেন বধের অপূর্ব কাহিনী স্থান পেয়েছে, সেখানে দেখা যায়, মহাবীর তরণীসেন লঙ্কাধিপতি রাবণকর্তৃক সেনাপতিত্বে বৃত হয়ে যুদ্ধযাত্রার পথে সহসা বিচলিত হয়ে ওঠে জননী সরমার কথা মনে করে। কৃত্তিবাস এখানে পরমযত্নে রচনা করেছেন যে মাতা-পুত্রের বিদায়ী আলাপ-দৃশ্য, তার মহিমা অনেকটা মন্দোদরী-মেঘনাদের বিদায়দৃশ্যের সমতুল। প্রথম প্রস্তাবেই সরমার মমতাময়ী জননীসত্তা টলমল করে উঠলো। সে কিছুতেই যেতে দেবে না তার গুণনিধি স্নেহের পুত্তলিকে সেই সর্বধ্বংসী লঙ্কাসমরে। কিন্তু তরণী জানে, জননী তার শুধু স্নেহময়ী নন, মহাজ্ঞানবতী; আর তাই বুঝি সম্ভব হয়েছে তরণীর মতো মহাজ্ঞানী সন্তানকে গর্ভে ধারণ করা। সরমার জননীসত্তা যেমন বাৎসল্যে ও মমতায় উত্তাল, তেমনি সৃষ্টিতত্ত্বের উপলব্ধিজনিত সংযমে অটল। বীরের কর্তব্য সংগ্রামে শৌর্যের পরিচয় দেওয়া, আর তাই বুঝে বীরপুত্রের জননীরও কর্তব্য স্নেহোদ্বেলতা সংবরণ করা। তা ছাড়া, ধর্মজ্ঞ বিভীষণের সাহচর্যে পুত্র তরণীসেন যেমন, সহধর্মিণী সরমাও তেমনি, এই দেহের অনিত্যতা ও জীবনের মায়াময়তা সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন। তাই অশ্রুপ্লুতা মাতাকে তরণী যেই সেকথা স্মরণ করিয়ে দিলো অমনি—

মহাজ্ঞানবতী সতী সরমা সুন্দরী।
বসিলেন সম্বরিয়া নয়নের বারি॥

এই তরণীসেনের মৃত্যুতে শোকের প্লাবন বয়েছে যুগপৎ লঙ্কার ভিতরে এবং বাইরে। রাবণ-শিবির ও রাম-শিবির উভয় শিবিরেই হাহাকার হয়েছে গগন-বিদারী। স্বয়ং লঙ্কেশ্বর ঐ নিদারুণ বক্ষোভেদী সংবাদে 'সিংহাসন হৈতে পড়ে ধরণী-উপর॥ চৈতন্য পাইয়া রাজা করয়ে ক্রন্দন। রাজারে প্রবোধ দেয় পাত্র-মিত্রগণ॥' সুতরাং সহজেই অনুমেয় এই পুত্রশোকের আঘাতে জননী সরমার অবস্থা। কিন্তু কৃত্তিবাসের অঙ্কিত এখনকার সরমা-চিত্রটি বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য —

পুত্রশোকে অনিবার কান্দিল সরমা।
বুঝিয়া অনিত্য দেহ মনে দিল ক্ষমা॥
অশ্রুজলে সরমার কলেবর ভাসে।
জানকী প্রবোধ দেয় অশেষ-বিশেষে॥

যাঁরা মাইকেল-প্রশস্তির নেশায় মত্ত থাকায় রামায়ণের রাক্ষসপক্ষীয় চরিত্রাবলীতে কেবল তমঃ-সর্বস্ব অনার্যত্ব লক্ষ্য করতেই অভ্যস্ত, তাঁরা এখানে দেখুন কতোখানি আর্য-সুলভ প্রজ্ঞা ও সংযমের মহিমায় মণ্ডিত কৃত্তিবাসের এই সরমা-চিত্র। মাইকেলের সরমার মধ্যে এই বাৎসল্যময়ী জননী ও মহাজ্ঞানবতীর অপূর্ব সমন্বয়ের কিছুই পাওয়া যায় না। অথচ দীননাথ সান্যাল অনায়াসে লিখে গেলেন, "রামায়ণে সরমা-চিত্র রেখাঙ্কিত মাত্র।" সমালোচক রামায়ণের সরমার প্রশস্ত চিত্রকে দেখবার কোন চেষ্টাই করেন নি। করলে, বুঝতেন, মাইকেলে খালি সরমার একটা পোষাকী রূপ, নিতান্ত আংশিক রূপ আড়ষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে। রামায়ণের সরমা এর চেয়ে সত্যিই অনেক বড়ো চরিত্র। সীতাকে সঙ্গদান বা সান্ত্বনাদান তার বিশাল ভূমিকার একটি অংশমাত্র। আমরা কি ভুলতে পারি—বিভীষণ-সহধর্মিণী ও তরণী জননী সরমাকে—মহাজ্ঞানবতী সরমাকে? আর, যে সখিসুলভ সহমর্মিতায় মেঘনাদবধের সরমাকে কবি অপরূপ করে দেখিয়েছেন সেটি যে একান্তই কবির মৌলিক উদ্ভাবন নয়, কৃত্তিবাসই এঁকে দিয়ে গেছেন ঐ দরদী ও মরমী সখি-সত্তার মজবুত কাঠামো, তাও এখানে পরিচ্ছন্নরূপে ধরা পড়বে পাঠকের কাছে। সহমর্মিতায় সরমা জানকীকে আপন করে নিয়েছে বলেই পুত্রশোকের নিদারুণ মুহূর্তে জানকী অশ্রুপ্লুতা সরমাকে প্রবোধদানে সুস্থ রাখবার চেষ্টা করেছেন।

মন্দোদরী সম্পর্কেও এই একই কথা। কৃত্তিবাসের মন্দোদরী-চিত্রের সম্যক পর্যবেক্ষণের পর মাইকেলের মন্দোদরী-চিত্রের প্রশংসায় মৌলিকতা বা অভিনবত্বের প্রশ্ন তোলার কোন কারণ থাকতে পারে না,—প্রশংসা যা কিছু ঐ বাগ্‌ভঙ্গি বা উপস্থাপনভঙ্গির। একবার পঞ্চম সর্গে ও একবার সপ্তম সর্গে, মেঘনাদবধ কাব্যে এই দু'বার মন্দোদরীকে যে-যে উপলক্ষে দেখানো হয়েছে, সে দুটি উপলক্ষই কৃত্তিবাস থেকে নেওয়া। মেঘনাদের যুদ্ধযাত্রার পূর্বে জননীর কাছে বিদায় নেওয়া এবং মহিষী মন্দোদরীর যুদ্ধগামী রাবণকে নিবৃত্ত করবার প্রয়াস, এ দুয়েরই চিত্র কৃত্তিবাসে অঙ্কিত হয়েছে। সুতরাং জননী ও মহিষী,

মন্দোদরীর এই দুটি ভূমিকারই রূপরেখা মাইকেল নিয়েছেন কৃত্তিবাস থেকে। মৌলিকতা, অভিনবত্ব বা সমুন্নয়ন কোথায় কতোটা লক্ষণীয়, দেখা যাক।

চল, প্রিয়ে, এবে
বিদায় হইব নমি জননীর পদে! (মা—৫।৩৯৩-৯৪)

মাইকেলে এই সর্বপ্রথম মন্দোদরী-প্রসঙ্গ। এতেই যদি কেউ মাইকেলের মৌলিকতার, বিশেষত মেঘনাদের মাতৃভক্তির পরিচয়দানের অপূর্ব আয়োজন লক্ষ্য করেন, তবে তাঁকে মনে করিয়ে দিতে হয় কৃত্তিবাসী মেঘনাদের কথা, যখন যুদ্ধের সমস্ত অয়োজন সম্পূর্ণ হলেও—

মন্দোদরী জননী তখন মনে পড়ে॥
মায়ে না কহিয়া যদি যুদ্ধে যাত্রা করি।
অন্নজল ত্যজিবেন মাতা মন্দোদরী॥
ভক্তিভাবে জননীকে প্রণাম করিয়ে।
তবে যাব রণস্থলে মাতৃ-আজ্ঞা ল'য়ে॥ (কৃ—পৃঃ ৩৬০)

যুদ্ধে যাওয়ার আগে মেঘনাদের অন্তরে জননী মন্দোদরীর প্রভাব সম্পর্কে কৃত্তিবাস যে কতো উজ্জ্বল নমুনা যুগিয়েছেন তা লক্ষণীয়। মন্দোদরীর পরিবেশ-মহিমা-রচনায় মাইকেল যে লিখেছেন,—

মন্দোদরী মহিষীর স্বর্ণ-মন্দিরে;
মহাপ্রভাধর গৃহ; মরকত, হীরা,
দ্বিরদরদ-মণ্ডিত, অতুল জগতে। (মা—৫।৪১১-১৩)

তারও পূর্বাভাস কৃত্তিবাসে—

সুবর্ণের ঘাট পাট স্বর্ণময় পুরী।
যে পুরীর তুল্য শোভা ভুবনে না হেরি॥ (কৃঃ—পৃঃ ৩৬১)

মন্দোদরীর পুরীকে দীপালোকে আলোকিত দেখানোর আয়োজন,—

তারাকারা দীপাবলী দীপিছে চৌদিকে (মা—৫।৪১৮)

এও যে কৃত্তিবাসেরই অনুসরণে তার প্রমাণ ঐ একই উদ্দেশ্যে লেখা—

নারায়ণ তৈলে জলে তিন লক্ষ বাতী। (কৃঃ—পৃঃ ৩৬১)

মাইকেলের মন্দোদরী-চিত্রের মৌলিকতা হিসাবে যেটি খুব ঘটা করে দেখানো হয়ে থাকে, তা হলো তাঁর শিবপূজারত কল্যাণী মূর্তি। যোগীন্দ্রমোহন বসু মেঘনাদবধের নূতনত্ব বোঝাবার জন্য এযুগের পাঠককে যেগুলি বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছেন, তার মধ্যে এই মন্দোদরীর 'স্বামিপুত্রের কল্যাণের

জন্য শিবারাধনা'ও অন্যতম। বলা বাহুল্য, সেই থেকে এযাবৎ মাইকেল-প্রশস্তি-ব্রতধারী সকলেই মন্দোদরী-চিত্রের মৌলিকতা-প্রতিপাদনে ঐ একই সুরে পোঁ ধরে চলেছেন। কিন্তু ঠিক এই একই দৃশ্যের অঙ্গহিসাবে কৃত্তিবাস যে লিখে গেছেন,—

মন্দোদরী পূজা করে মহেশপার্বতী ॥ (পৃঃ ৩৬১)

তার পরেও কি ঐ নূতনত্ব স্বীকার করতে হবে? কেবল মন্দোদরী কেন, লঙ্কার পুরবাসিনী রমণীসমাজে দেব-দেবীর পূজা যে কতো প্রচলিত ছিল, এই প্রসঙ্গে সে-কথাও বেরিয়ে এসেছে কৃত্তিবাসের মুখে—

আর যত রমণী লঙ্কার একত্তর।
শিব-দুর্গা পূজে মাগে রণজয়ী বর ॥

অথচ যোগীন্দ্রমোহন মাইকেলের চরিত্রায়ণের অভিনবত্ব হিসাবে সাড়ম্বরে লিখেছেন, "আর্য নরনারীগণের ন্যায় তাঁহারাও যজ্ঞ ও দেবপূজা করেন।" ইত্যাদি।

অনেকে আবার, মেঘনাদ যে অসভ্য রাক্ষসের মতো না হয়ে সুসভ্য মানুষের মতো মায়ের চরণে প্রণাম করেছে, আর মা খাঁটি আর্য রীতিতে শিরশ্চুম্বন করেছেন,—এই বর্ণনার মধ্যেও মাইকেলের মাতা-পুত্র-চরিত্রাঙ্কনে মৌলিকতা ও অশেষ কৃতিত্বের সন্ধান পেয়েছেন :—

প্রণমে দম্পতী পদে। হরষে দুজনে
কোলে করি, শিরঃ চুম্বি, কাঁদিলা মহিষী!
হায় রে, মায়ের প্রাণ, প্রেমাগার ভবে
তুই,......... (৫।৪৪৮-৫০)

কিন্তু কৃত্তিবাসের যে চিত্র থেকে মাইকেল এটি নিয়েছেন, তা হলো,—

প্রণমিল মেঘনাদ মায়ের চরণে।
মন্দোদরী পুলকিত চেয়ে পুত্রপানে ॥
আস্তে ব্যস্তে উঠি রাণী ধরে দুই হাতে।
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিল মেঘনাদের মাথে ॥
মন্দোদরী বলে আমি পূজি গঙ্গাধরে।
সেই পুণ্যফলে পুত্র পেয়েছি তোমারে ॥ (পৃঃ ৩৬১)

সুতরাং পূর্বোক্ত মৌলিকতার কোনো দাবীই স্বীকার্য নয়। নূতনত্বের মধ্যে শুধু পুত্রের সঙ্গে পুত্রবধূর যোগ। নচেৎ মাতা ও পুত্রের চরিত্র ও বিদায়-চিত্র

হিসাবে এবং বিশেষ করে পুত্র-গর্বিত বাৎসল্যবিগলিত মাতৃসত্তার রূপায়ণে বোধহয় পয়ার-লাচাড়ী-নির্ভর কৃত্তিবাসের হাতে যা পাওয়া গেছে, পূর্বোক্ত মাইকেলী চিত্রের চেয়ে তা অধিকতর চিত্তস্পর্শী। তা ছাড়া, এই প্রসঙ্গে, এমন কি, মেঘনাদের রূপের বর্ণনাতেও কৃত্তিবাসের অনুসরণ লক্ষণীয়। মাইকেলের এই বিষয়ে দুটি উদ্যোগ এখানে ; একটি, "পুত্র যাঁর রূপে শশাঙ্ক কলঙ্কী মানে।" আর একটি, "শরদিন্দু পুত্র"।

কৃত্তিবাস লিখেছেন,—

হেনকালে ইন্দ্রজিৎ হলো উপনীত।
পূর্বাচল হৈতে যেন আদিত্য উদিত ॥
কিরণে অরুণ জিনি রূপে চন্দ্রকলা। (পৃঃ ৩৬১)

আশা করি, নিরপেক্ষ বিচারক এখানে মাইকেলের ঋণ ছাড়াও স্বীকার করবেন কৃত্তিবাসের মেঘনাদ-বর্ণনার অধিকতর উৎকর্ষ।

বস্তুত কৃত্তিবাসের মন্দোদরীর বহুগুণান্বিত চরিত্রটি যে মাইকেল-প্রশস্তির অন্ধতায় কিভাবে উপেক্ষিত হয়েছে তার পরিচয় সমালোচকদের একটি ছিদ্রানুসন্ধী আবৃত্তি—

নয় হাজার নারী তব পরমাসুন্দরী।
আজি সেবা করুক যতেক বহুয়ারী ॥

যার মধ্যেই তাঁরা কৃত্তিবাসের মন্দোদরীর যেন সবটুকুই ধরা পড়েছে বলে দাবী করেন। মেঘনাদকে নিবৃত্ত করার জন্য মাইকেলের মন্দোদরীর প্রয়াস নিঃসন্দেহে অধিকতর সুন্দর, এবং তাঁর মুখের বিদায়ী আশীর্বাণী চরিত্রটিকে এক মুহূর্তে এক পরমা সমুন্নতির স্তরে উন্নীত করেছে, এটাও ঠিক ; কিন্তু একদিকে এই মাতৃসত্তার আর্য মহিমা, আর একদিকে সেই একই মাতৃ-ভূমিকায় কচিৎ প্রকটিত আপাত-অনার্য প্রস্তাব, এইভাবে তুলে ধরে তুলনামূলক আলোচনায় এক কথায় কৃত্তিবাসী চরিত্রটিকে নস্যাৎ করে দেওয়ার যে প্রয়াস চলে আসছে আমাদের গতানুগতিক সমালোচনায়, তা এক কথায় নিন্দনীয়। প্রথমত, সমালোচকদল মাইকেল-বন্দনার অত্যুৎসাহে কৃত্তিবাসী রামায়ণের সমগ্র মন্দোদরী-চরিত্রটি চোখ মেলে চেয়ে দেখেন নি ; দেখলে ঐ মন্দোদরী-চিত্রের পূর্বোক্ত আঙ্গিকগুলি তাঁদের চোখে পড়তো। আরো চোখে পড়তো, কৃত্তিবাসের মতোই মাইকেলের মন্দোদরীরও পুত্রকে যুদ্ধে পাঠাবার প্রবল অনিচ্ছা, ভীষণ আতঙ্কবোধ। উভয়ক্ষেত্রেই মন্দোদরীর কথার মধ্যে

রামচন্দ্রের শক্তি ও মাহাত্ম্যের প্রতি গুরুত্ব ফুটেছে, আর সেই কারণেই মন্দোদরীর পুত্রকে যুদ্ধে পাঠাবার ভয় বেড়েছে আরও বেশি। মাইকেলের মন্দোদরী বারে বারে জানিয়েছেন,—

"কেমনে বিদায় তোরে করি রে বাছনি!"

ঠিক এই ভাবটিরই অভিব্যক্তি, এই মাতৃহৃদয়ের ব্যাকুল আকৃতিই শোনা যায় কৃত্তিবাসের মন্দোদরীর মুখে :—

"তোমারে কপাট দিয়া রাখিব গৃহেতে।"

সুতরাং ছাঁচ যে মূলত একই, তা বলাই বাহুল্য।

শেষে যে "ন' হাজার নারী"-র প্রসঙ্গ এসেছে কৃত্তিবাসে, তাকে সংকীর্ণদৃষ্টি সুবিধাবাদীরা সুদীর্ঘ সমগ্র মেঘনাদ-মন্দোদরী-সংলাপ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে ঐ দিয়েই একটি তামসিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। দৃষ্টি সংকীর্ণ না হলে তাঁদের খেয়াল করতে হ'তো, ঐ ন' হাজার নারীর প্রস্তাবটি বারবনিতা-সম্ভোগ বা তজ্জাতীয় কিছু নয়, তারা সবাই মেঘনাদের বিবাহিতা স্ত্রী [যেমন সেকালের রাজা-রাজড়াদের অন্তঃপুরে থাকতো,—স্বয়ং দশরথের ছিলো সাড়ে তিনশ (বাল্মীকি রামায়ণ)]—মেঘনাদের মৃত্যুতে যাদের বৈধব্য পালন করতে হবে। এবং এই দৃশ্যে ঠিক ঐ নারী-প্রসঙ্গের অব্যবহিত পূর্বে যে করুণ চিত্রটি অঙ্কিত হয়েছে, দৃষ্টি সংকীর্ণ না হলে, তাও তাঁদের চোখে পড়তো।

জননীকে মেঘনাদ নানা কথায় আশ্বাস দিয়ে যুদ্ধযাত্রায় তাঁর সম্মতি আদায়ের চেষ্টা করছে; মন্দোদরী অনেকটা আশ্বস্তই হয়েছেন; হয়তো মেঘনাদ আর বিলম্ব না করে মাকে প্রণাম করেই বেরিয়ে পড়তে পারতো, কিন্তু মন্দোদরীর সঙ্গেই এসে যোগ দিয়েছিলো লঙ্কাপুরীর দুই লক্ষ বিধবা নারী, চক্ষে যাদের অশ্রুধারা, বক্ষে শোকের অনির্বাণ জ্বালা। মন্দোদরী নিরস্ত হতেই তারা সমবেতভাবে করযোড়ে জানালো তাদের করুণ মিনতি "নিবেদন করি শুন রাক্ষসের নাথ";—এই মিনতি-নিবেদনের ব্যাকুলতার কারণ মেঘনাদের পতনে ঐ 'ন' হাজার পরমাসুন্দরী'র ভাবী বৈধব্যের আতঙ্ক তারা এড়াতে পারছে না। নিবেদনটি তাদের এতোই করুণ এবং এতোই নিষ্ঠুর বিষাদঘন বাস্তবের উপাদানে রচিত যে, যুদ্ধযাত্রী মেঘনাদকে সকল ব্যস্ততার মধ্যেও স্থির হয়ে সেটা শুনতে হলো, যে-কাহিনীতে পাষাণ গলে, সে তো কারও না শুনে উপায় নেই। তারা বলে গেল যুদ্ধবিধ্বস্ত লঙ্কাপুরীর

সদ্যোবিধবাদের কান্নাভেজা কাহিনী, তুলে ধরলো শোক-প্লাবনের এক বিশাল চিত্র। কান পাতলেই শোনা যায় লঙ্কাপুরীর ঘরে ঘরে দল দল বিধবার অসহায় ক্রন্দন। আর বললো,—

গগনে যখন হয় দুই প্রহর বেলা।
পড়ে যায় রাণ্ডীদের হবিষ্যের মেলা॥
লঙ্কাপুরে ঘরে ঘরে জ্বলয়ে তিয়ড়ি।
কহিতে বিদরে বুক নিত্য ফেলি হাঁড়ী॥

তাই আরো যে ন' হাজার সুন্দরী তরুণী ঐ একই দুর্ভাগ্যের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছে, তাদের যেন এরা প্রাণপণে বাঁচাতে চায়, অন্তত আরও একটি দিন স্বামি-সাহচর্য পেয়ে বেঁচে থাকুক এরা সধবা হয়ে, তাই—

নয় হাজার নারী তোমার পরমাসুন্দরী।
করুক তোমার সেবা যত বহুয়ারী॥
সকলেরে তুষ্ট রেখে যাহ রণস্থলে।
নর ও বানর জিন পরম কুশলে॥

সম্ভবত আতঙ্কের উত্তালতায় তাদের মনে হয়েছে, এই দিনটি শুভ নয়, তাই বলেছে,—

শুভযোগে যাত্রা কৈলে নাহি পরাজয়।

তাদের আনুষঙ্গিক খেদও শুনবার মতো, যেহেতু তার মধ্যে আছে জগতের সকল বিধবার প্রতিই সমবেদনা, আছে লঙ্কার এই সর্বগ্রাসী বিপদের মূলে একটি বিধবার (সূর্পণখা) ভূমিকার প্রতি বলিষ্ঠ কটাক্ষ, এবং এ ছাড়াও, দশানন হর-পার্বতীর প্রিয়ভক্ত হওয়া সত্ত্বেও যে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছেন না এই জন্যে দেবতাদের উদ্দেশে নিষ্ফল আক্রোশ। মোটামুটি এই হলো তাদের নিবেদনের খসড়া; এইটা জানিয়ে

বিলাপ করিয়া কান্দে লক্ষ লক্ষ নারী।
শ্রাবণের ধারা যেন চক্ষে বহে বারি॥

মেঘনাদের হৃদয় ভরে গেল বিষাদে। সকলকে সে প্রবোধ দিল এই বলে যে, তাদের সকলেরই স্বামী স্বর্গলোকে স্থান পেয়েছে, আর শত্রুকে সে এখনই নিহত ক'রে সকলের শোকের আগুন নিবিয়ে দেবে।

মন্দোদরীর মুখে যে 'ন' হাজার নারী'র প্রস্তাব, যেটা তুলে ধ'রে কৃত্তিবাসী মন্দোদরীর প্রতি তাচ্ছিল্য দেখানো হয়ে থাকে, সেটি আসলে ঐ সমবেদনাকাতর

রোদন-বিবশা বিধবাদেরই মনের কথা। তারা যখন নিরস্ত হ'লো, তখন ঐ একই প্রস্তাব মাতা মন্দোদরীও একই মনের আবেগে, ন' হাজার পুত্রবধূর করুণ আতঙ্কে সচেতন হয়ে, অবোধ মায়ের প্রাণের অন্ধ আকৃতিতে শুনিয়েছেন তাঁর পুত্রকে এবং কৃত্তিবাস সেখানে লিখেছেন, "মন্দোদরী কথা কহে সকরুণ ভাষে"—সুতরাং তাঁর এই আকৃতিও যে অশ্রুসজল তা বলাই বাহুল্য।

এইবার আসুন সমালোচক যে যেখানে আছেন, বলুন তো, সত্যই কি ঐ একটুকরো কথায় কৃত্তিবাসের মন্দোদরীকে এমনই হীন নারীচরিত্র বলে মনে হয় যে, নিতান্তই নাসিকা-কুঞ্চনযোগে গণনার বহির্ভূত করার মতো?

মেঘনাদবধ-এর সপ্তম সর্গে মাইকেল আর একবার দেখিয়েছেন মন্দোদরীকে। ইন্দ্রজিত-বিয়োগ-বিধুরা রাণী মন্দোদরী সম্ভবতঃ যুদ্ধগামী রাবণকে নিবৃত্ত করতেই এসে শোকাকুল হয়ে রাজপদে পতিত হন। রাবণ সময়োপযোগী ভাষণে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে নিবৃত্ত করেন। মাইকেলের এই দৃশ্যটি যেমন সু-অঙ্কিত তেমনই হৃদয়গ্রাহী। রাবণই এখানে উজ্জ্বলতর, তবে শোকাহত মন্দোদরীর নীরবে প্রবেশ ও নীরবে প্রস্থান খুবই মর্মস্পর্শী।

কৃত্তিবাসেও এই একই দৃশ্যের অভাব নেই, অর্থাৎ রাবণ যুদ্ধযাত্রী, আর মন্দোদরী তাঁকে নিবৃত্ত করতে প্রয়াসী। কিন্তু লক্ষ্য ক'রবার বিষয়, রামায়ণের মন্দোদরী অনেক বেশি ব্যক্তিত্বসম্পন্না। তাঁর শোকও যেমন প্রবল, স্নেহও তেমনি প্রবল, আর তেমনি প্রবল তাঁর ন্যায়-বিচার-যুক্তি-বুদ্ধি-সম্মত স্বাধীন ভূমিকা। তাই ঠিক এই মেঘনাদবধোত্তর রাবণের যুদ্ধোদ্যমে মাইকেলের মন্দোদরীর মতো কৃত্তিবাসের মন্দোদরী শুধুই নীরবে এসে লুটিয়ে পড়েন না। শোকার্ত ক্রোধান্ধ রাবণকে প্রকৃতিস্থ করতে চেষ্টা করেন, তাঁর নিজের দোষেই যে বংশনাশ ঘটছে তা একবার ভেবে দেখতে বলেন। রাবণ অবশ্য সে কথায় কর্ণপাতও করেন না। রাজার এই আচরণ রাণীর পক্ষে যথেষ্ট পীড়াদায়ক, কিন্তু তবু তাঁকে সর্বান্তঃকরণে স্বামীর মঙ্গল কামনা করতে হয়, শুধু কামনা নয়,

> স্বামী প্রদক্ষিণ করি পড়িল মঙ্গল।
> মন্দোদরী চক্ষে জল করে ছলছল॥

বাইরে মাঙ্গলিকের অনুষ্ঠান, অন্তরে উদ্গত অশ্রু,—এই দ্বন্দ্ব-মথিত মন্দোদরী-চরিত্র পৃথক সমীক্ষার বিষয়। তা ছাড়া, রামায়ণে ঠিক এই দৃশ্যটির সংগে সংযুক্ত, মেঘনাদের মৃত্যু থেকে সুরু করে রাবণের এই যুদ্ধোদ্যম পর্যন্ত,

লঙ্কাপুরীর অভ্যন্তরস্থ সুদীর্ঘ আলোড়ন ও উত্তাল বিপর্যয়াত্মক সংঘটনের মধ্যে মন্দোদরীকেই দেখা যায় সব চেয়ে বড়ো হয়ে উঠতে, এমন কি রাবণের চেয়েও। আগেই বলা হয়েছে; গভীর নীরবতার মধ্যে গভীর শোকের প্রকাশসূচক মাইকেলের মন্দোদরী-চিত্রখানি হয়েছে যথেষ্ট মর্মস্পর্শী; কিন্তু কৃত্তিবাসী-চিত্রের তুলনায় একথাও বলতে হয় যে, রাবণকে উজ্জ্বল দেখাতে গিয়ে মাইকেলের হাতে মন্দোদরী হয়েছে উপেক্ষিত। জননী, মহিষী ও লঙ্কেশ্বরী হিসাবে মন্দোদরীর যে বিশাল চরিত্র, যে বিরাট সত্তা, তার পক্ষে শোক-জনিত যে বিপর্যয় তার সম্যক চিত্র দেখাবার কোনো প্রয়াস নেই এখানে।

> "× × শিশুশূন্য নীড় হেরি যথা
> আকুল কপোতী—"

এ চিত্র ঠিক ঐ বিশাল চরিত্রের উপযোগী নয়।

কৃত্তিবাসে মন্দোদরী চরিত্রটি যেমন বিরাট, তার শোকও তেমনি বিরাট। তাই শোকাহত লঙ্কেশ্বরের কিঞ্চিৎ বিবরণ দিয়েই, দেখা যায় কৃত্তিবাস বৃহত্তর পরিসরে বিপুলতর সংবেদন-জাগানো মন্দোদরী-বিলাপের আয়োজন করেছেন। মাইকেলের মতো সেখানে রাবণের শোক ও 'প্রতিবিধিৎসা'য় পুত্রশোকদীর্ণ বিরাট জননীহৃদয়ের বিশ্ববিকম্পী অভিব্যক্তি আচ্ছন্ন হয়ে যায় নি। মাইকেলের মন্দোদরীর প্রবেশ-প্রস্থানের মধ্যে নাটকীয়তা ফুটেছে যথেষ্ট, কিন্তু শোক-প্রকাশের স্বাভাবিকতার অভাব। এখানে মন্দোদরীকে মূর্ছিত হওয়ার সুযোগই দেওয়া হয় নি। 'রাজপদে পড়িল মহিষী'; 'পড়িল', কিন্তু চেতনা পুরোপুরি বজায় রহিল; নচেৎ 'যতনে সতীরে তুলি কহিলা বিষাদে রক্ষোরাজ' ইত্যাদি ভঙ্গিতে রাবণের নাটকীয় উক্তির অবসর থাকে না। আবার, উক্তিটুকু শেষ হ'লেই মন্দোদরীকে বিদায় দিতে হবে, কিন্তু হেঁটে চলে গেলে ভালো দেখায় না, তাই 'ধরাধরি করি সখী লইলা দেবীরে অবরোধে।' এ মন্দোদরী যে কতোখানি আড়ষ্ট তা বোঝা যাবে কৃত্তিবাসের ঐ মুহূর্তের চিত্রখানি পাশাপাশি রাখলে। সেখানে যেই 'ইন্দ্রজিৎ মৈল বার্তা পায় মন্দোদরী,' অমনি

> আছাড় খাইয়া পড়ে মন্দোদরী রাণী।
> উচ্চৈঃস্বরে কান্দে দশ হাজার সতিনী॥

স্পন্দহীন মন্দোদরী ধরাতলে পড়ে।
শিরে জল ঢালে কেহ দেখে নেড়েচেড়ে ॥

* *

চক্ষে বহে বারিধারা ঘন বহে শ্বাস।
এলোমেলো কবরীবন্ধন কেশপাশ ॥
চৈতন্য পাইয়া বলে কোথা ইন্দ্রজিত।
দেখা দিয়া প্রাণ রাখ মায়ের ত্বরিত ॥

অতঃপর তাঁর বিলাপের বাণী-বয়নে যে সব প্রসঙ্গকে স্থান দেওয়া হয়েছে, সেগুলিতে ঐ বিরাট শোকটি যেমন হয়েছে শাণিত, বিশ্বমর্মভেদী, তেমনি মেঘনাদের মতো পুত্রের অসামান্যতা, মহত্ত্ব ও মাহাত্ম্যও হয়েছে প্রোজ্জ্বল। মাইকেলের চিত্রটি রঙ্গমঞ্চোপযোগী, বিশ্বস্ত জীবন-চিত্র নয়। যেখানে অন্তঃপুরে শোক-বিবশা রাণী মন্দোদরীর কাছেই রাবণের ছুটে যাওয়া ছিল স্বাভাবিক, সেখানে "হেমকূট-হেমশৃঙ্গ-সমোজ্জ্বল তেজে চৌদিকে রথীন্দ্রদল" —বেষ্টিত রাবণকে রাজসভায় রেখে মন্দোদরীকে টেনে আনা হয়েছে নিতান্ত অসহায়ার মতো।

কৃত্তিবাসের ব্যক্তিত্ব-দীপ্তা মহীয়সী মন্দোদরীকে কেবল বিলাপে ভেঙে পড়লেই চলে না, লঙ্কাপুরীর বৃহত্তর কল্যাণের প্রতিও সজাগ থাকতে হয়। তাই তিনি যেই শুনলেন ক্রোধান্ধ হয়ে রাবণ সীতাবধের সংকল্প নিয়ে অশোক-বনের দিকে ধাবিত হয়েছেন, অমনি তাঁকে আবার শক্ত হতে হলো। 'মনেতে বিচার করে রাণী মন্দোদরী। সর্বনাশ হ'য়েছে ম'জেছে লঙ্কাপুরী ॥ তাহাতে রাবণ কেন স্ত্রীবধ করিবে। রমণীবধের পাপে পরকাল যাবে॥ এত ভাবি মন্দোদরী সস্বরে ক্রন্দন। ধূলায় ধূসর অঙ্গ লোহিত লোচন॥ পাগলিনীপ্রায় রাণী ছুটে উধ্ব'মুখে। উপনীত দশানন-সীতার সম্মুখে॥' সেখানে রাবণকে ঐ মহাপাপে উদ্যত হতে দেখেই

পিছে থাকি সাপটিয়া ধরে মন্দোদরী।
ছিছি মহারাজ বধ ক'র না হে নারী ॥

রাবণ দুর্বার। মন্দোদরীও দুর্নিবার। রাবণের মতো অমিতশক্তিধর পুরুষের মত্ততা প্রশমনের পথ তাঁর অবিদিত নয়। পৌরুষের মূর্ত প্রতীক তাঁর স্বামীর চরিত্রের বাহ্য প্রমত্ততার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন গুণাবলীতে গাঢ় প্রত্যয়ের বলে তিনি

করযোড়ে রাবণকে বললেন, “পরম পণ্ডিত তুমি রাক্ষসের নাথ।। বিশ্রবা পিতা তব সংসারে পূজিত। তোমার এ নারীবধ না হয় উচিত।। ইত্যাদি।”

বড়ো গাছেই বড়ো ঝড় লাগে, আর তা সামলাবার ক্ষমতা দেখিয়েই বড়ো গাছকে বড়ো হয়ে থাকতে হয়। কৃত্তিবাসের মন্দোদরী এই পরীক্ষায় সমুত্তীর্ণ। নিজস্ব সুগভীর পুত্রশোক, স্বামীর প্রমত্ততা, সমগ্র লঙ্কাপুরী ও রাক্ষসবংশের অকল্যাণ,—জননী-মহিষী-লঙ্কেশ্বরী—ত্রিবিধ সত্তায় যুগপৎ এসে লেগেছে ঘূর্ণীঝড়ের তাণ্ডব,—তারই মধ্যে স্থিতধীর মতো অটল রয়েছেন যিনি, সেই কৃত্তিবাসের মন্দোদরীকে মাইকেলের কাব্যে পাওয়া যাবে না, তৎপরিবর্তে পাওয়া যাবে এরই আংশিক প্রতিফলনযুক্ত মন্দোদরীর মঞ্চ-পোষানো একটা পোষাকী রূপ মাত্র।

[৮] ৬ষ্ঠ সর্গ: কৃত্তিবাসী ঋণ: শ্রেষ্ঠাংশটি বাল্মীকির নকল মাত্র

মেঘনাদবধ-এর ষষ্ঠ সর্গ যেমন মাইকেলের কীর্তি-কেন্দ্র, তেমনি, সমালোচনার অবসরও এখানে বিপুল। মূল রামায়ণ থেকে ঘটনার বিকৃতিযুক্ত পার্থক্য, সুতরাং অভিনবত্ব দেখিয়ে কবি সহজেই আদায় করেছেন পাঠকের সেই আকর্ষণ যা নূতনের প্রতি জাগে অতি সহজেই। নূতনত্বের প্রাবল্যে এখানে কৃত্তিবাসী ঋণের প্রসঙ্গ বুঝি কল্পনাতীত। রামায়ণে যেখানে পুরোপুরি সম্মুখযুদ্ধে মেঘনাদের মৃত্যু বর্ণিত, আর মাইকেলের কাব্যে ঠিক তার বিপরীত, —চোরের মত ঢুকে নিরস্ত্র পূজারত মেঘনাদকে কাপুরুষের মতো হত্যা,— সেখানে কোনো তুলনামূলক আলোচনা বা কবি-ঋণের অবসর কোথায়?

কিন্তু ষষ্ঠ সর্গের সামগ্রিক সমালোচনায় যতো কথা ভিড় করে আসে, উপস্থিত সেগুলো ঠেলে রেখে, ঠিক যে অংশটি এই সর্গের সর্বশ্রেষ্ঠ বলে গণ্য, যার দিকে দৃষ্টি রেখে বলা হয়েছে, “মেঘনাদবধের ষষ্ঠ সর্গ বাঙালীর জীবনবেদ হউক”, বলা হয়েছে, “জাতীয় কবি মধুসূদনের লাখ কথার এক কথা” (সমাজপতি), যাকে অবলম্বন করেই মাইকেলকে করা হয়েছে উনবিংশ শতকের বাংলার জাতীয় নব-জাগৃতির উদ্গাতা,—সেই অংশটির রচনায় কবির কৃতিত্বের প্রসঙ্গে কৃত্তিবাস ও বাল্মীকিকে স্মরণ না করে উপায় নেই।

তার আগে, এই ষষ্ঠ সর্গের বহুতর অভিনবত্বের অদ্ভুত সমাবেশের মধ্যেই বহু বিচিত্র বাগভঙ্গি কবি যে নিয়েছেন মূল রামায়ণ থেকে, তার দু’একটা নমুনা দেখানো যেতে পারে।

(১) মা—রামচন্দ্রের মুখে অতি অশোভন (অস্থানে প্রযুক্ত ব'লে) উক্তি—

'নাহি কাজ সীতায় উদ্ধারি' (৬।৫২)

'চল ফিরি' পুনঃ মোরা যাই বনবাসে,

লক্ষ্মণ ! (৬।৬৫)

কৃ— 'যাউক জানকী মোর রাজ্য যাউক ব'য়ে।

পুনঃ বনে যাই আমি তোরে লঙ্কা দিয়ে ॥' (পৃঃ ৩৯৭)

'কি করিবে রাজ্যভোগে পুনঃ যাই বন' (পৃঃ ৪২১)

'রাজ্যধনে কার্য নাই, নাহি চাই সীতে' (পৃঃ ৪২২)

(২) মা— 'গ্রাসিল মিহিরে রাহু' (৬।৪৩৯)

কৃ— 'পূর্ণিমার চন্দ্র যেন গরাসিল রাহু' (পৃঃ ৩৮৯)

(৩) মা— 'দেহ রণ মোরে অবিলম্বে' (৬।৪৩৩)

'দেবাদেশে রণে আমি আহ্বানি রে তোরে !' (৬।৪৭০)

লক্ষ্মণের মুখে ইন্দ্রজিতের উদ্দেশে।

বাল্মীকি— সমাহ্বয়ে ত্বাং সমরে সম্যগ্ যুদ্ধং প্রযচ্ছ মে। (যুদ্ধ—৮৭।৯)

সেখানেও আহ্বান ঐ লক্ষ্মণেরই মুখে।

(৪) মা— 'নিরস্ত্র যে অরি, নহে রথিকুলপ্রথা আঘাতিতে তারে'

(৬।৪৮১-৮২)

ইন্দ্রজিতের মুখে এই উক্তি বসিয়ে মাইকেল যেন সম্পূর্ণ অভিনব দৃষ্টিতে রাক্ষসদের ন্যায়-নীতিজ্ঞান, বিশেষত বীরোচিত ন্যায়-যুদ্ধের জ্ঞানের পরিচয় দেখিয়েছেন। কিন্তু তাদের অনুরূপ জ্ঞানের অভাব আদৌ যে ছিল না, মূল রামায়ণেই তার পরিচয় :—

বাল্মীকি— রথে স্থিতোঽহং শরচাপপাণি-

র্ন প্রাকৃতং কঞ্চন যোধয়ামি।

যস্যাস্তি শক্তির্ব্যবসায়যুক্তো

দদাতু মে শীঘ্রমিহাদ্য যুদ্ধম্ ॥ (যুদ্ধ—৭১।৪৫)

রাবণ-পুত্র অতিকায়ের মুখের কথা। 'নিরস্ত্র-অরি' তো দূরের কথা, অসমান অবস্থায় ও অসমস্তরীয়দের মধ্যেও যুদ্ধ তারা বর্জন করতো। অতিকায় নিজে রথারূঢ় ও ধনুর্বাণ নিয়ে প্রস্তুত, এ অবস্থায় রথহীন নিরস্ত্র কোনো প্রাকৃত (সামান্য) জনের সঙ্গে যুদ্ধ সে চায় না। লক্ষ্মণকেও বালক বলে ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলো।

(৫) মা— 'তস্কর যেমতি পশিলি' ইত্যাদি (৬।৪৯৭)
এর উপর কৃত্তিবাসী ছাঁচের প্রভাব পূর্বলিখিত ৩য় পরিচ্ছেদে দেখানো হয়েছে। আনুষঙ্গিকভাবে দেখানো হয়েছে সরাসরি বাল্মীকির প্রভাবও মাইকেলের তির্যক উপস্থাপনের চাতুর্যসহ। এখানে খালি পঙ্‌ক্তিটি উদ্ধৃত হলো,—

বাল্মীকি— 'তস্করাচরিতো মার্গো নৈষ বীরনিষেবিতঃ'।
(যুদ্ধ—৮৮।১৫)

(৬) মা— 'বিভীষণে বিভীষণ রণে'—
এই যে একই প্রয়োগের বার বার আবৃত্তি পাঠকের মনে জাগায় প্রয়োগ-নির্মাণে কবির মৌলিকতার প্রশ্ন, এরও মূলে আছে বাল্মীকি-রচনার অনুকরণ :—

বাল্মীকি— 'বিভীষণেনারিবিভীষণেন' (যুদ্ধ—৮৬।৩৫)

অতঃপর মাইকেলের সেই বহু-প্রশংসিত মেঘনাদবধ কাব্যের শ্রেষ্ঠাংশটিতে আসা যাক, যার জোরে তাঁকে বাংলায় নবজাতীয়তাবোধের প্রথম উদ্গাতা বলা হয়েছে।

কোন ধর্ম মতে, কহ দাসে, শুনি,
জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি,—এ সকলে দিলা
জলাঞ্জলি? শাস্ত্রে বলে, গুণবান্ যদি
পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি
নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ, পরঃ পরঃ সদা! (৬।৫৮৩-৮৭)

যাঁদের ধারণা কৃত্তিবাসে এজাতীয় প্রসঙ্গের নামগন্ধও নেই, তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিতে হয় ঐ একই উপলক্ষে কৃত্তিবাসী রামায়ণে বিভীষণের প্রতি মেঘনাদের উক্তি,—

নির্গুণ সগুণ হয় তবু বলে জ্ঞাতি।
জ্ঞাতি বন্ধু মিলে লোক করয়ে বসতি ॥ (পৃঃ ৪১১)

প্রসঙ্গক্রমে সমগ্র বক্তব্যের আসরটির উপযোগী সুর ও ভঙ্গী রচনায় কৃত্তিবাসানুস্মৃতি নিম্নবৎ :—

মা— নিকষা সতী তোমার জননী
কৃ— একের ঔরসে জন্ম রাক্ষসের কুলে

মা— 'ধর্মপথগামী' * *
'সহোদর রক্ষঃ শ্রেষ্ঠ' * * 'গুরুজন তুমি
পিতৃতুল্য'

কৃ— ধার্মিক বলিয়া তোমায় সর্বলোকে বলে ॥
পিতার সমান তুমি পিতৃসহোদর।
পিতার সমান সেবা করেছি বিস্তর ॥ (পৃঃ ৪১১)

মা— 'হে পিতৃব্য', 'হায় তাত' ইত্যাদি
সম্বোধনে মেঘনাদ বলতে চায় স্ববংশ ও স্বজন ছেড়ে পর-পক্ষগ্রহণের অন্যায়ের কথা।

কৃ— বন্ধুগণ ছাড়ি খুড়া আশ্রয় মানুষে।
বাতি দিতে না রাখিলে রাক্ষসের বংশে ॥

মা— 'তব বাক্যে ইচ্ছি মরিবারে'—এই ভঙ্গিতে বিভীষণকে লজ্জিত করার প্রয়াস।

কৃ— এত ভ্রাতুষ্পুত্র মারি ক্ষমা নাই তাতে।
কোন্ লাজে আসিয়াছ আমারে মারিতে।

মা— 'ছাড়হ পথ, আসিব ফিরিয়া
এখনি !' * * 'ছাড় দ্বার, যাব অস্ত্রাগারে'—
ইত্যাদি—

কৃ— বানর কটক খুড়া করহ অন্তর।
যজ্ঞপূর্ণ দিয়া আমি মেগে লই বর।

লক্ষ্য করলেই ধরা পড়বে, বাণী-রূপটিই কেবল পৃথক, নচেৎ মূল বক্তব্য যা কিছু এবং তাদের মূল সুর কৃত্তিবাসের রচনাতেই পরিব্যক্ত।

কিন্তু মহর্ষির মূল রচনা উদ্ধৃত করলেই দেখা যাবে মাইকেলের রচনাটি প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ মাত্র।

বাল্মীকির—মেঘনাদ বিভীষণকে দেখেই বলছে—

ইহ ত্বং জাতসংবৃদ্ধঃ সাক্ষাদ্ভ্রাতা পিতুর্মম।
কথং দ্রুহ্যসি পুত্রস্য পিতৃব্যো মম রাক্ষস ॥
ন জ্ঞাতিত্বং ন সৌহার্দং ন জাতিস্তব দুর্মতে।
প্রমাণং ন চ সৌদর্যং ন ধর্মো ধর্মদূষণ ॥

শোচ্যস্ত্বমসি দুর্বুদ্ধে নিন্দনীয়শ্চ সাধুভিঃ।
যস্ত্বং **স্বজন**মুৎসৃজ্য **পর**ভৃত্যত্বমাগতঃ॥
নৈতচ্ছিথিলয়া বুদ্ধ্যা ত্বং বেৎসি মহদন্তরম্।
ক্ব চ **স্বজন**সংবাসঃ ক্ব চ **নীচ**পরাশ্রয়ঃ॥
গুণবান্ বা পরজনঃ স্বজনো নির্গুণোঽপি বা।
নির্গুণঃ স্বজনঃ শ্রেয়ান্ যঃ পরঃ পর এব সঃ॥

(যুদ্ধ—৮৭।১১-১৫)

মাইকেলের নির্বাচিত শ্রেষ্ঠাংশে কেবল যে উল্লিখিত মহর্ষি-রচনার বহির্ভূত একটি কথাও নেই, তাই নয়, মূল রামায়ণের মেঘনাদের পিতৃব্যের উদ্দেশে বর্ষিত ধিক্কার ও তিরস্কার যেমন অধিকতর শাণিত তেমনি প্রবীণতায় প্রদীপ্ত। উল্লিখিত পাঁচটির পরে আরো দুটি, মোট সাতটি অমূল্য শ্লোকের আবৃত্তিতে মহর্ষির হাতে মেঘনাদ-চরিত্রের যে মহিমা ফুটেছে তা অপরিমেয়। মূল রামায়ণ থেকে এই অংশটি নিয়ে মাইকেল কী করেছেন ?

বাল্মীকি	মাইকেল
ন ধর্মো ধর্মদূষণ	কোন ধর্ম মতে
ন জ্ঞাতিত্বং * * ন জাতিস্তব	জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি
দুর্মতে প্রমাণং ন চ সৌদর্যং	এ সকলে দিলা জলাঞ্জলি
গুণবান বা পরজনঃ	গুণবান যদি পরজন
স্বজনো নির্গুণোঽপি বা	গুণহীন স্বজন
নির্গুণঃ স্বজনঃ শ্রেয়ান্	তথাপি নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ
যঃ পরঃ পর এব সঃ	পরঃ পরঃ সদা

একে কি আক্ষরিক অনুবাদও বলা চলে, না কি সংকলন মাত্র ? অথচ এই সংকলনের মধ্যেই আমরা খুঁজে পেয়েছি উনবিংশ শতকীয় বাংলার জাতীয়তা-বোধের নবোন্মেষের উদগাতা মাইকেলের নির্ভুল স্বরূপ! প্রশস্তিমোহ ছাড়াও মাইকেলের মৌলিকতা সম্পর্কে আমাদের ভ্রান্তধারণা গঠনের জন্য আরো যে বস্তুটি দায়ী, তা হলো কবির কতকগুলি অকারণ অশোভন দম্ভোক্তি, যেমন, 'I shall borrow as little as I can from Valmiki'.

মাইকেলের কৃত্তিবাসী ঋণ দেখাতে গিয়ে এখানে যে বাল্মীক-ঋণই অধিকতর প্রকট হলো, এর থেকে অব্যাহতি পাওয়া শক্ত। পূর্বসূরীর কাছে

ঋণ থাকাই স্বাভাবিক, তাই একই নির্দিষ্ট বিষয়ে দু'জন পূর্বসূরীর কার কাছে কী ঋণ, তার আলোচনা প্রাসঙ্গিক। ঋণী অনুবাদক কৃত্তিবাসও; কিন্তু, আলোচ্য ক্ষেত্রে, তাঁর রচনায় যে নিজস্বতা ও সাবলীলতা আছে, মাইকেলে তার একান্তই অভাব। এটি একেবারে সেই বঙ্কিম-কথিত plagiarism-এর দৃষ্টান্ত।

[৯] ৮ম সর্গ: প্রথমাংশের রচনায় কৃত্তিবাসের অনুকরণ: নরক-বৃত্তান্ত-প্রসঙ্গ

শক্তিশেলাহত লক্ষ্মণের শোকে যে দীর্ঘ রাম-বিলাপ মেঘনাদবধ-এর অষ্টম সর্গের প্রথমে স্থান পেয়েছে তার মধ্যে কৃত্তিবাসের ঘনিষ্ঠ অনুস্মৃতি বিশেষ লক্ষণীয়।

আজি এই রক্ষঃপুরে অরি মাঝে আমি,
বিপদ-সলিলে মগ্ন…রাখিবে আজি
কে কহ আমারে * * আজি কেন বিমুখ হে তুমি
সে ভ্রাতার অনুরোধে * * তিতি এবে নয়নের জলে
আমি, তবু নাহি তুমি চাহ মোর পানে—

আক্ষেপের এই ভঙ্গি যে কৃত্তিবাসই যুগিয়েছেন তার প্রমাণ

মোর দুঃখে লক্ষ্মণ যে দুঃখী নিরন্তর।
কেন রে নিষ্ঠুর হ'লে না দেহ উত্তর॥

মাইকেলের রামের মুখে

চল ফিরি যাই বনবাসে
নাহি কাজ, প্রিয়তম, সীতায় উদ্ধারি—

এই ধরণের কথা পেয়ে অনেকে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে থাকেন যে, তিনি ধর্মান্তরিত হওয়ায় খেয়ালের বশে রাম-চরিত্রে দুর্বলতার আরোপ করেছেন; কিন্তু আসলে এগুলি এসেছে রামায়ণেরই অনুকরণে।

কি করিবে রাজ্যভোগে পুনঃ যাই বন
অথবা
রাজ্যধনে কার্য নাই নাহি চাই সীতে

কৃত্তিবাসের এই বিলাপ-ভঙ্গিই মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দে অমন রূপ লাভ করেছে।

তনয়-বৎসলা যথা সুমিত্রা জননী
কাঁদেন সরযূতীরে, কেমনে দেখাব
এ মুখ……কি কহিব,… ..
কি বলে বুঝাব……পুরবাসী জনে ?

মাইকেলের রাম-বিলাপের এই ছাঁচও কবির নিজস্ব নয়। একদিকে বাল্মীকির রচনা—

কথং বক্ষ্যাম্যহং ত্বম্বাং সুমিত্রাং পুত্রবৎসলাম্

(যুদ্ধ—১০১।১৫)

আর একদিকে কৃত্তিবাসের রচনা—

লক্ষ্মণ সুমিত্রা মাতার প্রাণের নন্দন।
কি বলিয়া নিবারিব তাঁহার ক্রন্দন॥
এনেছি সুমিত্রা মাতার অঞ্চলের নিধি।
আসিয়া সাগরপারে কাল হৈল বিধি॥

* * *

সবাই সুধাবে বার্তা আমি গেলে দেশে।
কহিব তোমার মৃত্যু কেমন সাহসে॥ (পৃঃ ৪২১-২২)

এদেরই কিঞ্চিৎ ভিন্নতর বাণী-রূপ মাইকেলের রাম-বিলাপের ঐ ঐ অংশ। এ কথা বক্তব্য নয় যে, এই অনুকরণে অগৌরব সন্ধান করতে হবে, বক্তব্য শুধু এই যে, কৃত্তিবাসের কাছে, এবং সেই থেকে বাল্মীকির কাছেও মাইকেলের ঋণের বহর যে সুবিপুল, সে বিষয়ে সচেতন থেকেই এযুগের কবির মৌলিকতার রূপরেখা রচনা করা দরকার।

অষ্টম সর্গের নরক-বৃত্তান্তমূলক সংযোজনটির ভালো-মন্দ নিয়ে আধুনিক বাংলা সমালোচনায় অনেক মন্তব্যই পুঞ্জীভূত হয়েছে। বর্তমান গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ে এ বিষয়ে একটি পৃথক আলোচনা সত্যসন্ধী পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে তুলে ধরা হয়েছে। সকলেই এই সংযোজনের মধ্যে খুঁজেছেন দান্তে, ভার্জিল, মিলটন প্রভৃতি পাশ্চাত্য কবির প্রভাব বা অনুকরণ। আমাদের রামায়ণেও যে একটা নরক-বৃত্তান্ত আছে, এবং মাইকেলের মতো অনুরাগী রামায়ণ-পাঠকের তা অবিদিত থাকারও কথা নয়, এটা যেন এই অষ্টম সর্গ প্রসঙ্গে কাউকে চিন্তাও করতে দেওয়া হয় না। এ বিষয়ে ঐ ষষ্ঠ অধ্যায়েই

প্রয়োজনীয় তথ্য-মন্তব্যাদি লিপিবদ্ধ হয়েছে। এখানে নরকের নক্‌সা-রচনায় মাইকেলের শুধু কৃত্তিবাসী ঋণেরই আভাস দেওয়ার সংক্ষিপ্ত আয়োজন।

মাইকেলের নক্‌সায় প্রেতপুরীর পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, এই চারি দ্বারের এবং প্রথম তিনটি ধার্মিকের ও চতুর্থ টি পাপীবর্গের জন্য নির্দিষ্ট বলে যে পরিকল্পনা—

ধর্মপথগামী যারা যায় সেতুপথে
উত্তর, পশ্চিম, পূর্বদ্বারে ;—

তারই নমুনা অধিকতর পরিচ্ছন্ন আকারে যুগিয়েছেন কৃত্তিবাস তাঁর উত্তরাকাণ্ডে (পৃঃ ৫৫১)। বরং মাইকেল তাঁর কল্পনার অসংলগ্নতার জন্য 'উত্তরদ্বারে' ঘটিয়েছেন ধার্মিক ও পাপী, সুষমা ও বিভীষিকার সংকর-সমাবেশ (১৯২, ৫২০ ও ৫৪৪ লাইন দ্রষ্টব্য)। কৃত্তিবাস যেমন জানিয়েছেন—

পূর্ব আর পশ্চিম দুয়ার যে উত্তর।
তিন দ্বারে ধার্মিক লোক দেখে ত বিস্তর॥
যমের দক্ষিণ দ্বার ঘোর অন্ধকার।
রাত্রিদিন নাহি তথা সব একাকার॥
যত যত পাপী লোক সেই দ্বারে থাকে।
একত্র থাকিয়া কেহ কারে নাহি দেখে॥

তেমনি সুশৃঙ্খল ধারাবাহিকতায় যথাযথ দ্বারে যথাযোগ্য কর্মফলভোগের দৃশ্য রচনা করেছেন। পূর্বোক্ত কৃত্তিবাসী উদ্ধৃতিতে যমের দক্ষিণ দ্বারের যে 'ঘোর অন্ধকার' ও 'দিন রাত্রি একাকারে'র সংবাদ পাওয়া গেল, সেইটাই মাইকেলের প্রেতপুরী-চিত্রের অনেকগুলি অংশের সাড়ম্বর বর্ণনার রসদ যুগিয়েছে (১১০, ১২৪, ১৬৫, ১৭০, ২৮৩ লাইন দ্রষ্টব্য)। যথা—'তমোময় যমদেশে', 'অদূরে ভীষণ পুরী, চিরনিশাবৃত,' 'নাহি শোভে দিনমণি সে আকাশদেশে কিম্বা চন্দ্র, কিম্বা তারা,' 'অন্ধকারময় পুরী' ইত্যাদি। দক্ষিণ দুয়ারের বর্ণনায় মাইকেল পাপীর দণ্ডভোগ-কেন্দ্ররূপে (ক) চৌরাশি নরককুণ্ড, (খ) রৌরব ও (গ) কুম্ভীপাক, এই যে তিনটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন, এদের মধ্যে 'রৌরবে'র প্রসঙ্গ নেওয়া হয়েছে বাল্মীকি থেকে, আর বাকী দুটি কৃত্তিবাস থেকে।

কৃত্তি— চৌরাশী সহস্র কুণ্ড দক্ষিণ দুয়ারে।
নরকে ডুবায় সব যমদূতে মারে॥

মাই— দক্ষিণ দুয়ার এই ; চৌরাশি নরক-
কুণ্ড আছে এই দেশে।

কৃত্তি— যেই যত পরানিষ্ট ক'রেছে কৌতুকে।
সেই কুম্ভীপাকে পড়ি ডুবিছে নরকে ॥
সুতপ্ত তৈলের কুণ্ড অগ্নির উথাল।
তাহাতে ধরিয়া ফেলে যায় গা'র ছাল ॥

মাই— চল, রথি, চল দেখাইব
কুম্ভীপাকে ; তপ্ত তৈলে যমদূত ভাজে
পাপীবৃন্দে যে নরকে!

তা ছাড়া, বিভিন্ন কুকর্মের শাস্তির বর্ণনাতেও মাইকেলের কৃত্তিবাসের অনুকরণ সুস্পষ্ট ; এবং কৃত্তিবাসের শক্তিশালী হাতের বিপুল বিবরণের এক নগণ্য ভগ্নাংশ মাত্র মাইকেল গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছেন। প্রথমেই উদ্ভট কল্পনায় ন'টি রোগের মূর্তি দ্বারদেশে সাজিয়ে নিয়ে কবি আরো তিনটি মূর্তি রচনা করেছেন—ক্রোধ, হত্যা ও আত্মহত্যার। অতঃপর রৌরবের প্রসঙ্গে দুটি কুকর্মের কথা আছে, (ক) পরধন হরে যে দুর্মতি, আর (খ) বিচারী যদ্যপি অবিচারে রত ; আর আছে (গ) আত্মহত্যা-পাপের ফলে 'অন্ধতম কূপে বন্দী' থাকার কথা। তবে একটি বিশেষ কুকর্মের ফল-ভোগ কবি বেশ ফলাও করেই দেখিয়েছেন, যার সংক্ষিপ্ত পরিচয়, (ঘ) ন্যায়-ধর্ম-বিরোধী কাম-সেবা। (শেষোক্ত চিত্র সম্পর্কে বিস্তারিত মন্তব্য প্রথম অধ্যায়ে 'আদিরসের' প্রসঙ্গে ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে কবির 'নৈতিক দৃষ্টি'র সমালোচন-প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।)

এগুলির মধ্যে (ক) পরধন-হরণের প্রস্তাবটি কৃত্তিবাসেরই যোগানো। পরস্বাপহর্তার শাস্তির ব্যবস্থায় মাইকেল শুধু, অগ্নিময় রৌরবে 'তার চিরবাস', এই বলেই শেষ করেছেন। পক্ষান্তরে কৃত্তিবাস—

পরধন হরে যেবা করে পরগ্লানি।
তার প্রহারের কথা শুনহ কাহিনী ॥

ব'লে সুরু ক'রে প্রায় কুড়িটি ছত্রব্যাপী যে লোমহর্ষক পীড়নের কাহিনী দিয়েছেন, তার পাশে মাইকেলের দণ্ডভোগের চিত্র নিতান্তই নিষ্প্রভ ও দুর্বল। তা ছাড়া, ঐ পরস্বাপহরণের পাশাপাশি 'পরহিংসা' 'পরদ্বেষ', 'গচ্ছিত'-বা-'ন্যাপ্যধন-হরণ', 'চুরি-ডাকাতি' প্রভৃতি পাপ ও তাদের শাস্তির চিত্র সাজিয়ে কৃত্তিবাস যেভাবে

তাঁর নরক-বৃত্তান্তটি সার্থক আবেদনের যোগ্য করে তুলেছেন, তার কিছুই মাইকেলের কাহিনীতে ফোটে নি।

(খ) বিচারী হয়ে অবিচার করার প্রস্তাবটি কৃত্তিবাসের রাজ-কর্তব্য-লঙ্ঘনের মধ্যেই পাওয়া যায়। 'রাজা হয়ে প্রজা যদি না করে পালন' অথবা 'লোক রক্ষা করিয়া যে রাজা করে নাশ' ইত্যাদি পাপেরও ভয়াবহ শাস্তির ব্যবস্থা কৃত্তিবাস-কাহিনীতে স্থান পেয়েছে।

(গ) কামাসক্তিপাপের দণ্ডও কৃত্তিবাসের তালিকাভুক্ত, তবে মাইকেলের মতো সেখানে কাম-কেলির বিস্তারিত চিত্র-রচনায় আদিরসোদ্দীপনের মত্ততা বা চিত্তবিকার নেই, পরিবর্তে আছে সুস্থ কবি-মনের বাঞ্ছিত প্রবণতায় শাস্তি-চিত্রের ভয়াবহতা। মাইকেল যেখানে সুদীর্ঘ বহরে নারী-পুরুষের কাম-চর্চার লজ্জাকর নগ্নতা চিত্রায়িত করা হলে পরিশেষে দুই দলকে 'আশু তাড়াইবার' জন্য লৌহমুদ্গরধারী যমদূতের খবর নিয়েছেন, কৃত্তিবাস সেখানে পাপের প্রতি জলন্ত ত্রাস-সঞ্চারী হৃদ্‌কম্প জাগানোর উপযোগী ভঙ্গিতে লিখেছেন,—

পরনারী চুরি করিয়াছে যেই জন।
তাহার বিষম শুন যমের তাড়ন॥
লৌহময়ী এক স্ত্রী আনে যমদূতে।
অগ্নিমধ্যে তাহাকে তাতায় ভাল মতে॥
জলন্ত অনল যেন সেই লৌহ জলে।
পাপী সব ধরি ধরি তার গায় ফেলে॥
গা'র মাংস জলে পরিত্রাহি ডাকে পাপী।
তাহা দেখি রাবণ হইল অতি তাপী॥

* * * *

মহাপাপ করিয়াছে রাবণ বিস্তর।
বিষম প্রহার দেখি ভাবিত অন্তর॥

নরকের বিভীষিকা-বর্ণনের মধ্যে পদে পদেই কৃত্তিবাস রাবণের দুর্মতি দেখাবার ও তার পাপী-চিত্তে অনুতাপ জাগাবার আয়োজন করেছেন। মাইকেলের নরক-বৃত্তান্তে এর বিন্দুবিসর্গ না থাকলেও একালের প্রশস্তিব্রতী সমালোচক মেঘনাদবধের অষ্টম সর্গের পরিকল্পনামূলে ঐ দুর্মতি দেখাবার উদ্দেশ্য বা মাইকেলের 'নৈতিক দৃষ্টি' প্রভৃতি নানা মহৎ কবি-আদর্শের আমদানী করতে চেয়েছেন (৬ষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। আসলে এ জাতীয় প্রচেষ্টা কৃত্তিবাসী আদর্শকে

বিবিধ ভূষণ, বস্ত্র, চন্দন, কস্তুরী
কেশর, কুঙ্কুম—আদি দিল রক্ষোবালা
যথাবিধি········· (৯ম—৩৬৭-৭৩)

লঙ্কার রাক্ষসপুরীতে বেদপাঠ? যেখানকার সমাজ-জীবন সম্পর্কে যোগীন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন,—"তাঁহাদিগকে পশুপ্রকৃতি জীব ভিন্ন আমাদিগের আর কিছু মনে হয় না, * * সিংহ, ব্যাঘ্র, অথবা ভল্লুকে যে সকল ভাব লক্ষিত হয়, মহর্ষি-প্রণীত রামায়ণের রাক্ষস, রাক্ষসীতে আমরা সেই সকল ভাবই কল্পনা করি,"—(জীবন-চরিত—পৃঃ ৩৮৩) এবং সম্ভবত তদনুসরণে একে একে অনেক সাহিত্য-মহারথীই ঐ একই সুরে আমাদের শিখিয়েছেন, রামায়ণের অনার্য বর্বর রাক্ষস-চরিত্র মাইকেলের হাতেই আর্যসভ্যতাযুক্ত উন্নত চরিত্রে রূপান্তরিত হয়েছে,—সেখানে এই এক বেদপাঠের প্রসঙ্গই তো মাইকেলের ঐ উন্নয়নমূলক মৌলিকতার অকাট্য প্রমাণ! কিন্তু স্বয়ং কবিকে যদি জিজ্ঞাসা করা হতো, তবে সত্যের খাতিরে তিনি নিশ্চয়ই বলতেন, মূল রামায়ণেই আছে রাক্ষস-জাতির এই উন্নত সভ্যতার কথা, আছে বাল্মীকিতে, আছে কৃত্তিবাসেও।

বাল্মীকির সুন্দরকাণ্ডের ৫ম সর্গে লঙ্কাপুরীর বর্ণনায় পাওয়া যায়, 'কোথাও মধুর সংগীত, কোথাও ভূষণের নিক্বণ, কোথাও সিংহনাদ, কোথাও বা **বেদপাঠ** হচ্ছে।' ঐ একই কাণ্ডের ১৮শ সর্গে পাওয়া যায়, 'রাত্রিশেষে ষড়ঙ্গ **বেদবিৎ ব্রহ্মরাক্ষসগণের বেদধ্বনি** ও মঙ্গলবাদ্যের মনোহর রব শোনা গেল।' যুদ্ধকাণ্ডের একস্থানে বাল্মীকি লিখেছেন, রাবণের সীতাহরণ-জনিত দুষ্কর্মের ফলে লঙ্কায় পরিস্থিতি রাবণকে বোঝাবার সময় (৬-১৩) বিভীষণ বলছেন, 'নানাপ্রকার দুর্নিমিত্ত লক্ষিত হচ্ছে। হোমের অগ্নি ভাল করে জ্বলে না, ধূম আর স্ফুলিঙ্গ হয়, পাকশালা, হোমগৃহ ও ব্রহ্মস্থলীতে সরীসৃপ এবং হব্য দ্রব্যে পিপীলিকা দেখা যাচ্ছে।' যুদ্ধকাণ্ডের ১১১শ সর্গে দেখা যায় রাবণের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে বেদবিহিত রীতিতে, অধ্বর্যুগণের সহায়তায়, খাঁটি ঋগ্বেদীয় যমসূত্রানুযায়ী পন্থায় (বর্ততে বেদবিহিতো রাজ্ঞো বৈ পশ্চিমঃ ক্রতুঃ)।

কৃত্তিবাসও লিখেছেন,—

রক্তবর্ণ পুষ্পমাল্য ডুবাইয়া ঘৃতে।
দশ হাজার বিপ্র **বেদ** পড়ে চারিভিতে॥

বেদপাঠ ছাড়া অন্যান্য যে সব বস্তু-সমাবেশের উল্লেখ রয়েছে মাইকেল-রচনায় পূর্বোদ্ধৃত অংশে, তাদেরও প্রচুর ব্যবহার রামায়ণে দেখা যায়। রাবণের সৎকারের আয়োজনে কৃত্তিবাস লিখেছেন,—

নানা দ্রব্য বস্ত্র আনে ভাণ্ডার হইতে ॥
বিশদ চন্দন কাষ্ঠ আনে ভারে ভার।
অগুরু চন্দন আনে গন্ধ মনোহর ॥ (পৃঃ ৪৭৭)

রাবণের সৎকার-বর্ণনায় বাল্মীকিও লিখে গেছেন,—

রাবণস্যাগ্নিহোত্রং তু নির্যাপয়তি সত্বরম্।
শকটান্ দারুরূপাণি অগ্নীন্ বৈ যাজকাংস্তথা ॥
তথা চন্দনকাষ্ঠানি কাষ্ঠানি বিবিধানি চ।
অগুরূণি সুগন্ধীনি গন্ধাংশ্চ সুরভীংস্তথা ॥
মণিমুক্তাপ্রবালানি নির্যাপয়তি রাক্ষসঃ।

মেঘনাদের সৎকার উপলক্ষে আয়োজনের মধ্যে মাইকেল এক জায়গায় লিখেছেন,—

পশুকুলে নাশি তীক্ষ্ণ শরে
ঘৃতাক্ত করিয়া রক্ষঃ যতনে থুইল
চারি দিকে, (৯।৩৭৩-৭৫)

কেন যে এই আয়োজন, সৎকারের ক্ষেত্রে এই জাতীয় সমাবেশ না জানি কোন্ বিজাতীয় প্রথার অনুকরণে করা হয়েছে, এই নিয়ে হয়তো অনেকে মাথা ঘামিয়েছেন। কিন্তু এ যে নিছক রামায়ণেরই প্রতিধ্বনি, তার প্রমাণ কৃত্তিবাসের

খরশান খড়্গে ছাগ কাটি শীঘ্রগতি।
অগ্নি সন্তর্পণ করি দিতেছে আহুতি ॥
আতপ তণ্ডুল যব রাশি রাশি আনে।
ঘৃতের আহুতি সহ দিতেছে আগুনে ॥ (পৃঃ ৪০৪)

মাইকেলের ঐ চিত্রটি যে সত্যই স্বাধীন কল্পনাবলে "মহানবমীর দিনে শাক্ত ভক্ত-গৃহের" শক্তিপূজার দৃশ্য থেকে আমদানী করা নয়, রামায়ণ থেকেই ধার করা, তা বলাই বাহুল্য। উপরে উদ্ধৃত কৃত্তিবাসী রচনাটুকুর সঙ্গে মাইকেলী রচনার ভাষাগত মিল (বিশেষত, 'তীক্ষ্ণশরে' ও 'খরশান খড়্গে')

লক্ষ্য করবার পর, আরো ঘনিষ্ঠ মিল বাল্মীকি-রচনার সঙ্গে লক্ষণীয়। এখানে ঐ পশুবধ-এর চিত্র সরাসরি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সঙ্গেই গ্রথিত। রাবণের ক্ষেত্রে সেখানে দেখা যায়, "শাস্ত্রদৃষ্টেন বিধিনা মহর্ষিবিহিতেন চ। তত্র মেধ্যং পশুং হত্বা রাক্ষসেন্দ্রস্য রাক্ষসাঃ॥ পরিস্তরণিকাং রাজ্ঞো ঘৃতাক্তাং সমবেশয়ন্।" (যুদ্ধ—১১৯।১১৭-১১৮)। এখানে বিশেষ দ্রষ্টব্য, মাইকেল কী যান্ত্রিকভাবেই না মহর্ষিদত্ত চিত্র স্বীয় কাব্যের অন্তর্ভুক্ত করতে গেছেন। এক তো, 'মেধ্য' পশু বলতে যা বোঝায় তার কোন সংকেতের পরিবর্তে, 'পশুকুলে নাশি' ব'লে কবি একটা বন্যতার আভাস ফুটিয়েছেন। তা ছাড়া, মহর্ষির 'ঘৃতাক্তাং পরিস্তরণিকাং' প্রয়োগটির, বা সেখানে ঐ মেধ্য-পশু নিধনের কী অর্থ, বা উদ্দেশ্য থাকতে পারে, তা বুঝবার চেষ্টা না করেই, কবি পরিস্তরণিকার পরিবর্তে নিহত পশুদেরই 'ঘৃতাক্ত'-করণের আজগুবি চিত্র এঁকেছেন, যেগুলির কাজে লাগানোর কোনো কথাই আর নেই। সহসা আমদানীকৃত মহানবমীর বলিদানদৃশ্যের ঘটায় কবির ঐ খেয়ালীপনা চাপা পড়ে গেছে।

মাইকেলের কাব্যে সংকার-অনুষ্ঠানটি আরও মনোজ্ঞ হয়েছে কতিপয় খাঁটি আর্য প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্তিতে। যেমন,

অগ্নিসংস্কারের পূর্বে—

মন্দাকিনী-পূতজলে ধুইয়া যতনে
শবে, সুকৌষিক বস্ত্র পরাই, থুইল
দাহস্থানে রক্ষোদল (৯।৩৯১-৪৩)

কিন্তু সবই যে রামায়ণেই আছে, তাও মনে রাখা দরকার।

রাবণেরে স্নান করাইল সিন্ধুজলে।
সুগন্ধি চন্দন লেপে কণ্ঠ-বাহুমূলে॥
দিব্যবস্ত্র পরাইল সোণার পইতে।
সাগরের কূলে থুলে রাবণের চিতে॥

(কৃত্তি—পৃঃ ৪৭৭)

মাইকেলের চিত্রে যে সুকৌষিক বস্ত্রের কথা, সুবর্ণ-শিবিকায় শব-দেহ বাহিত হওয়ার কথা বা হোত্রীর মন্ত্রপাঠের কথা এমন জাঁকজমকের সঙ্গে স্থান পেয়েছে, তার জন্য কবির মৌলিকতায় ও আর্যসভ্যতার আমদানীতে মুগ্ধ হওয়ার আগে বাল্মীকি-রচিত রাবণের সংকার-চিত্রে একবার দৃষ্টি দিলেই ধার

পড়বে আসল তথ্য।—রামের আদেশে বিভীষণ রাবণের সৎকারে ব্যাপৃত হলেন ;—

সৌবর্ণীং শিবিকাং দিব্যামারোপ্য ক্ষৌমবাসসম্ ॥
রাবণং রাক্ষসাধীশমশ্রুবর্ণমুখা দ্বিজাঃ।
তূর্যঘোষৈশ্চ বিবিধৈস্তুবদ্ভিশ্চাভিনন্দিতম্ ॥
পতাকাভিশ্চ চিত্রাভিঃ সুমনোভিশ্চ চিত্রিতাম্।
উৎক্ষিপ্য শিবিকাং তাং তু বিভীষণ পুরোগমাঃ ॥
দক্ষিণাভিমুখাঃ সর্বে গৃহ্য কাষ্ঠানি ভেজিরে।
অগ্নয়ো দীপ্যমানাস্তে তদাধ্বর্যু-সমীরিতাঃ ॥

* * *

চিতাং চন্দনকাষ্ঠৈশ্চ পদ্মকোশীরচন্দনৈঃ।
ব্রাহ্ময়া সংবর্তয়ামাসু রাঙ্কবাস্তরণাবৃতাম্ ।
[বর্ততে বেদবিহিতো রাজ্ঞো বৈ পশ্চিমঃ ক্রতুঃ।]
প্রচক্রু রাক্ষসেন্দ্রস্য পিতৃমেধমনুপমম্।
বেদিং চ দক্ষিণাপ্রাচীং যথাস্থানং চ পাবকম্ ॥

* * *

গন্ধৈর্মাল্যৈরলংকৃত্য রাবণং দীনমানসাঃ (রাক্ষসাঃ) ॥
বিভীষণসহায়াস্তে বস্ত্রৈশ্চ বিবিধৈরপি।
লাজৈরবকিরন্তি স্ম বাষ্পপূর্ণমুখাস্তথা ॥
স দদৌ পাবকং তস্য বিধিযুক্তং বিভীষণঃ।
স্নাত্বা চৈবার্দ্রবস্ত্রেণ তিলান্ দর্ভবিমিশ্রিতান ॥
উদকেন চ সংমিশ্রান্ প্রদায় বিধিপূর্বকম্।
প্রদায় চোদকং তস্মৈ মূর্ধ্না চৈনং নমস্য চ ॥ (যুদ্ধ—১১১।১০৭-১২০)

সুতরাং দেখা যায়, মূল রামায়ণেই আছে 'সৌবর্ণী শিবিকা', 'ক্ষৌমবাস' (কৌষিকবস্ত্র) ও 'অধ্বর্যু' ('বহে হবির্বহ হোত্রী মহামন্ত্র জপি' বা 'পড়িলা গম্ভীরে মন্ত্র রক্ষঃ-পুরোহিত')-দের প্রসঙ্গ। এই তিনটি আঙ্গিক ছাড়াও উদ্ধৃত অংশে যে পরিবেশ-চিত্র ফুটেছে, তা হ'লো,—

অন্ত্যেষ্টির জন্য রক্ষোবীরকে যে সুবর্ণ-শিবিকায় তোলা হলো, তা নানাবর্ণের চিত্র-পতাকায় ও পুষ্পমাল্যে ভূষিত। রাক্ষসাধিপতি রাবণকে কৌষিকবস্ত্র পরিয়ে যে দ্বিজগণ ঐ সুবর্ণ-শিবিকায় স্থাপনকালে বিবিধ

মন্ত্রোচ্চারণে অভিনন্দিত করেন তাঁদের মুখমণ্ডল অশ্রুপ্লুত। আগে আগে চললেন বিভীষণ, সঙ্গে মন্ত্রপূত উজ্জ্বল হোমাগ্নিবাহক অধ্বর্যুগণ, (পশ্চাতে রোরুদ্যমানা পুরস্ত্রীগণ), অন্যান্যরা প্রয়োজনীয় কাষ্ঠাদি নিয়ে সকলে দক্ষিণাভিমুখে চললেন। যথাস্থানে (সিন্ধুতীরে) চিতা সাজানো হলো; কৃষ্ণসারমৃগচর্মের আস্তরণ বিছানো হলো, চন্দনলিপ্ত চন্দনকাঠ, পদ্মক, উশীর প্রভৃতি দাহ্যপদার্থ সাজানো হলো, এবং সবই হলো শাস্ত্রোক্ত বিধানে,—বেদ-বিহিত পদ্ধতিতে রাক্ষসরাজের অগ্নিকার্য-সংক্রান্ত যজ্ঞ নিষ্পন্ন হলো। চিতার দক্ষিণপূর্ব দিকে নির্মিত হলো পিতৃমেধযজ্ঞের উপযোগী বেদী, যথাযোগ্যস্থানে অগ্নিস্থাপন করা হলো। * * রাক্ষসেরা শোকার্তহৃদয়ে রাবণকে গন্ধমাল্যের দ্বারা অলংকৃত করলো। তারা সবাই শোকাচ্ছন্ন, তবু বিভীষণের সহায়করূপে নানাবিধ বস্ত্রযোগে রাবণের শবদেহের উপর লাজবর্ষণ করতে থাকলো। যথাকালে বিভীষণ শাস্ত্রোক্তবিধানে চিতায় অগ্নিসংযোগ করলেন। দাহকার্যান্তে স্নান করে, আর্দ্রবস্ত্রে তিনি তিল-কুশ-সংযুক্ত জলের দ্বারা শাস্ত্রীয় বিধানে তর্পণ করলেন, এবং সবশেষে পরলোকগত জ্যেষ্ঠভ্রাতার উদ্দেশে উদকাঞ্জলি নিবেদন-পূর্বক মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন। আশা করা যায়, এই ধরণের রাক্ষস-জীবন-ধারার পরিচয় যে মূল রামায়ণেই প্রদত্ত হয়েছে, এ কথা জানার পর আর, মাইকেলের হাতে ঐ জীবন-চিত্র সভ্যতা-সংস্কৃতির আলোয় বা আর্যভাবের আরোপে নবীভূত হয়েছে, এমন ধারণা করবার কোনই কারণ থাকবে না।

মহর্ষির পরে, অনুবাদক কৃত্তিবাসের হাতেও প্রাকৃত ভাষায় ফুটেছে ঐ রাক্ষস-জীবনের উন্নত সভ্যতার লক্ষণযুক্ত অজস্র চিত্র। কৃত্তিবাস-ভক্ত মাইকেল প্রাণভরে ভালোবেসেছেন সেগুলিকে, আর নিয়েছেনও সেই কৃত্তিবাসী বিপুল ভাণ্ডার থেকে দু'হাত ভ'রে,—নিয়েছেন চরিত্রাদর্শ, নিয়েছেন চিত্রের উপাদান, নিয়েছেন কাহিনী বিন্যাসধারা, এমন কি বাগ্‌-বিন্যাস ও বর্ণনা-ভঙ্গিরও বহু বহু আদল, ছাঁচ বা নমুনা। তাই, নবযুগের কবির প্রশস্তি গাইতে বসে আমরা যদি মাইকেলের এই কৃত্তিবাসী ঋণের বহর সম্পর্কে অবহিত না থাকি, তবে প্রশস্তিও যেমন হবে মেকিতে ভরা, তেমনি মহাকবি কৃত্তিবাসের (তথা বাল্মীকির) অবদানের ভ্রান্ত মূল্যায়ণের অপরাধও হবে অমার্জনীয়।

চতুর্থ অধ্যায়

"উপমা মধুসূদনস্য"

[১] প্রস্তাবনা: প্রধানত ডাঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্যের 'উপমা মধুসূদনস্য' ও 'কাব্যালংকার ও কবিমানস'-এ প্রচারিত মন্তব্যের সমালোচনা।

বাংলা কাব্যসাহিত্যে উনিশ শতকীয় রেনেসাঁসের যুগের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী কবি যে মাইকেল মধুসূদন, এ বিষয়ে কোনো বিতর্কের অবসর নেই। বহু উচ্ছ্বসিত প্রশস্তি বন্দনার বাহুল্যসত্বেও যেমন ঐ শ্রেষ্ঠত্বের দাবী কোনো ফাঁপাই দাবী নয়, তেমনি এই কবি-সম্পর্কে বিরূপ সমালোচনা যেখানে যেমনই হয়ে থাকুক, তবু ঐ দাবীর ভিত্তি কেউ এতটুকু নড়াতে পারে নি, পারবেও না। শুধু সমীক্ষার বিষয় এই, শক্তি বা প্রতিভার বিচারে সেযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বলেই কি তাঁকে সকল সম্ভাব্য আঙ্গিকে উৎকর্ষের চরম সাধনায় সিদ্ধপুরুষ বলে জাহির করা সঙ্গত হবে? মধুসূদনের কর্মজীবন বা ব্যক্তিজীবন যেমন বহুবিড়ম্বিত ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ, তাঁর কাব্যসৃষ্টিও তেমনি কোলাহল-বিড়ম্বিত, ভিড়ের চাপে হাঁপিয়ে ওঠা, কোথাকার যেন এক তাড়াহুড়োর নিষ্ঠুর ইঙ্গিতে গাদাগাদি-করে গুদাম-ঠাসা। কবির 'acquiring a pucca fist'—এই সূত্রেই যা পাওয়া গেল, সত্যিকারের pucca fist-এর কিছু রেখে যাওয়ার অবসর আর তাঁর হলো না। তাই আমরা যা পেয়েছি, তা অনুশীলিত বা পরিশীলিত প্রতিভার ফল নয়, কবির potential প্রতিভার পরিচয় মাত্র, পেয়েছি তাঁকে "এক অলিখিত মহা-কাব্যের মহাকবি" রূপে[১]।

অথচ স্তাবকতার মোহে, অথবা গবেষণার হিড়িকে, কবি মধুসূদনকে নিয়ে বাংলা সমালোচনার আসর জমাবার এমন সব জাঁকালো আয়োজন হয়ে আসছে, সমীক্ষায় নিরপেক্ষ আলোকসম্পাতে যাদের অসারতা বা দুর্বলতা ধরা পড়তে বাধ্য। সৃষ্টি যাঁর সত্যই নানা শৈথিল্যে লাঞ্ছিত, নানা অসঙ্গতিতে ভরা, অনুপ্রাসের যান্ত্রিকতায় ও চিত্র-চিত্রকল্প-রচনার খেয়ালীপনায় যেখানে অস্থির হতে হয়, সেখানে শব্দ-প্রয়োগের বৈজ্ঞানিকতায় মুগ্ধ হওয়া যেমন হাস্যকর, উপমাদি অলংকার-প্রয়োগে নিরঙ্কুশ নৈপুণ্যের জয়ধ্বজা উড্ডীন

(১) ডাঃ সুকুমার সেন।

করার প্রয়াসও তেমনি বাড়াবাড়ি ছাড়া কিছু নয়,—আর সব চেয়ে নিরর্থক এই শব্দ-প্রয়োগ বা উপমা-প্রয়োগের মধ্যে মাইকেলের কবি-মানসের কোনো মহনীয় ইঙ্গিত উদ্ধার করতে যাওয়া। গবেষকের খেয়ালী প্রতিপাদ্যের অনুকূল সুবিধামত কতিপয় দৃষ্টান্ত দ্বারা মাইকেল সম্পর্কে জমকালো একটি মতবাদ রচনায় বাহাদুরি-দেখানো বর্তমান গড্ডলিকাধর্মী সমালোচনার আসরে সহজসাধ্য হতে পারে, কিন্তু ব্যাপক সমীক্ষণাত্মক সামগ্রিক বিচারে মাইকেল-সংক্রান্ত ঐ সব চটকদারি মতবাদ একদেশদর্শী, পক্ষপাতদুষ্ট, অসতর্ক বা উদ্দেশ্যমূলক প্রশস্তিমাত্র বলে গণ্য হতে বাধ্য। শব্দনির্মাণে বা প্রযুক্তিবিদ্যায় কবি মধুসূদনের শক্তিমত্তা অসাধারণ, উপমা-প্রয়োগেও তাঁর দক্ষতা উচ্চ প্রশংসার দাবী রাখে; কিন্তু উভয়ক্ষেত্রেই সার্থক ও অসার্থক সৃষ্টির অনুপাতটা এমনই যে, নিরপেক্ষ সমালোচনায় সমালোচককে যথেষ্ট বিড়ম্বিত বোধ করতেই হবে। 'ভুলো দোষ, গুণ ধর'—এই নীতিই অনুসরণ ক'রে মধুসূদনকে তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ কবির বরণ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাই বলেই যে তাঁর গোটা সৃষ্টির প্রতি পদেই লক্ষ্য করতে হবে অলৌকিক প্রতিভার নির্ভুল স্বাক্ষর, তাঁর প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসেই খুঁজে পেতে হবে নিপুণ শিল্পকলার নির্দোষ অভিব্যক্তি, আর সবকিছুতেই এমন একটা কবিমানসের স্পর্শ পেতে হবে যার মধ্যে রেনেসাঁসের জাতীয় জাগরণ, ভারতীয় সনাতন ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাজনিত শিবসুন্দর ভাব, গভীর দেশপ্রেম প্রভৃতি নিয়ত ঢেউ খেলে চলেছে,—এটা অসত্য বলেই অসহ্য।

শব্দপ্রয়োগের মতো (আগেই দেখানো হয়েছে, ২য় পরিচ্ছেদে) উপমাদি অলংকারপ্রয়োগেও মধুসূদনের শৈথিল্য, অসঙ্গতি বা খেয়ালীপনার পরিচয় যে কতো বিপুল তা তাঁরাই বুঝবেন যাঁরা এই কবির কাব্যগুলির, বিশেষত মেঘনাদবধ-এর, নিবিড় ধারাবাহিক পাঠে অভ্যস্ত।

মলম্বা-অম্বরে তাম্র এত শোভা যদি
ধরে, দেবি, ভাবি দেখ বিশুদ্ধ কাঞ্চন-
কান্তি কতো মনোহর!

উপমাগর্ভ এই প্রকাশভঙ্গি সত্যই মনোহর। কিন্তু—

তুমিও আইস, দেবি, তুমি মধুকরী
কল্পনা, কবির চিত্তফুলবন-মধু
লয়ে রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।

উক্তিটির শেষাংশ যেমনই হোক প্রথমাংশে 'কল্পনা'র যে মধুকরী-বৃত্তি কল্পিত হয়েছে, তা অযৌক্তিক বলেই অচল। বিভিন্ন কবির চিত্তফুলবন থেকে মধু-সংগ্রহের যে ব্যাপার, তা আর যারই হোক, কল্পনার হতে পারে না। এই সঙ্গেই নেওয়া যাক মহাকাব্যের ঐ উদ্বোধনী অংশেরই আর একটি উপমা,—

হইল্ সে তোমার প্রসাদে
মৃত্যুঞ্জয়, যথা মৃত্যুঞ্জয় উমাপতি!

কী সার্থকতা এই 'যথা'-যোগে বাগ্‌বিস্তারের, কেবল একটা শব্দধ্বনির ঝঙ্কার তোলা ছাড়া? উপমার উদ্দেশ্য কি এতে কিছুমাত্র সিদ্ধ হয়েছে? অথচ এই 'যথা-যেমতি'-রই ছড়াছড়ি মেঘনাদবধ কাব্যে। বহু সুরচিত মনোজ্ঞ আবেদনযুক্ত উপমাও যেমন আছে, তেমনি আছে অনৌচিত্যে ভরা খেয়ালীপনাদুষ্ট অসার্থক উপমার জঞ্জাল। এদের মধ্যেই যে খুঁজে পাওয়া যায় কবির potential প্রতিভাকে, তাঁর শক্তিমত্তাকে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই; এবং সার্থকে-অসার্থকে ভরা যা পেয়েছি আমরা তাঁর হাতে, তাতেই আমরা গর্বিত, তাতেই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মাইকেল মধুসূদনের স্থান নির্দিষ্ট হয়ে গেছে সেযুগের শ্রেষ্ঠ কবি বলে।

কিন্তু 'উপমা মধুসূদনস্য'[১] বলে এই কবির উপমাসৃষ্টিতে যে কালিদাসীয় উপমা-মহিমা আরোপ করার চেষ্টা, অথবা মাইকেলের উপমাদি অলঙ্কার-প্রয়োগের মধ্যেই তাঁর কবিমানসের অতি গুরুত্বপূর্ণ বিবিধ সংকেতের নির্ভুল প্রমাণ-সন্ধান[২] একদিকে যেমন প্রশস্তি-মোহান্ধতার ফল, আর একদিকে, বিভ্রান্তিকর বলেই অসমীচীন।

বস্তুত উপমার অজস্রতা মাইকেলের কাব্যের জমক-চটক যতোটা বাড়িয়েছে, সৌন্দর্য-সুষমা বা সৌষ্ঠব কমিয়েছে ঠিক ততোটাই বা তার কাছাকাছি। সামঞ্জস্য ও সঙ্গতির অভাবে, মাইকেলের কাব্য যা হতে পারতো তা হয় নি। আর ঠিক ঐ অভাবের জন্যই তাঁর কাব্য থেকে শিল্পগণ্ডি-বহির্ভূত কবিমানসের কোনো মহত্ত্ব-ব্যঞ্জক বৈশিষ্ট্য, অথবা ভারতের জাতীয় জীবনে বা সাংস্কৃতিক জীবনে কবির কোনো বৃহত্তর শক্তিশালী অবদান সন্ধান করা বৃথা।

(১) রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা, জানু—মার্চ, ১৯৬৯ সংখ্যায় প্রকাশিত ডাঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্যের প্রবন্ধ। (২) 'মধুসূদনের কাব্যালংকার ও কবিমানস'-গ্রন্থকার ডাঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য।

মাইকেলের কাব্যে অভিনবত্ব অশেষ। ভাষায় ও ছন্দে, ঢঙে ও ভঙ্গিতে, সর্বোপরি উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয়ে এই অভিনবত্ব প্রবলভাবে অনুভাব্য এবং অকুণ্ঠ অভিনন্দনের যোগ্য। কিন্তু এই সবের ভিড়ে চাপা পড়লে চলবে না যে, ভারতচন্দ্রীয় শাব্দিক আড়ম্বর ও অনুপ্রাসের দাসত্ব থেকে মাইকেলের মুক্তিলাভ তো ঘটেই নি, বরং ঐ ঐ বিষয়ে ভারতচন্দ্রের স্বতঃস্ফূর্ত লালিত্য ও গীতিঝঙ্কারের পরিবর্তে মাইকেলে ফুটেছে শব্দকবির জড়-কলরোল ও অনুপ্রাসের যান্ত্রিকতা। তাঁর বহুতর উপমার আমদানী দেখা যায় নিছক শব্দঝঙ্কার ও অনুপ্রাসের মোহে। তাই বিশুদ্ধ কবিত্বের তাগিদে যে সব উপমা এসেছে তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে কবি পদে পদেই 'যথা-যেমতি'-র আমদানী করে তাঁর কাব্যকে চটকদারী করতে চেয়েছেন। কায়দাটি যে প্রধানত মিলটনীয় (হোমারাদি অন্য কবি ছাড়াও) রচনারীতির অনুসরণে, তা বলা বাহুল্য। মেঘনাদবধে ৯৫ পৃষ্ঠার গ্রন্থে অন্যভঙ্গিতে সন্নিবিষ্ট উপমা বাদেও "যথা-যেমতি"-যুক্ত উপমার সংখ্যা ৩৬০ এর মতো এবং মোট উপমার সংখ্যা মনে হয় ৪৫০ এর মতো। অতএব একদিকে এই উপমার ছড়াছড়ি, অপরদিকে এই কবির বিভিন্ন কাব্যে হুবহু কালিদাসীয় উপমা ও বাগ্‌ভঙ্গির অন্তর্ভুক্তিতে 'উপমা মধুসূদনস্য' বলে যে একটি প্রবচনোপম বচনের মাথা চাড়া দেওয়ার উপক্রম, তাতে প্রথমেই সাবধান করতে হয় সাহিত্যামোদী সাধারণ পাঠককে যেন তাঁরা ঐ বচনের দাপটে মধুসূদনকে উপমায় দ্বিতীয় কালিদাস বলেই ভাবতে সুরু না করেন।

এখানে পাঠককে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে বঙ্কিমের সমঝদারী মন্তব্য : "কোনও কোনও ভাব-বিহ্বল সমালোচক তাঁহাকে (মাইকেলকে) কালিদাসের সহিত তুলনীয় বলিয়া বিবেচনা করেন, আবার কেহ কেহ তাঁহাকে অতি নিকৃষ্ট লেখক বলিয়া তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন। আমরা উক্ত দুই শ্রেণীর সমালোচকগণের মধ্যে কোনও শ্রেণীর সমালোচকের সহিত একমত হইতে পারি না। তাঁহার রচনায় বিশিষ্ট গুণ আছে, স্বীকার করি ; কিন্তু তাহা বলিয়া আমরা মহাকবিদিগের মধ্যে তাঁহাকে আসন প্রদান করিতে প্রস্তুত নহি।"(১)

'উপমা কালিদাসস্য' রচনা করে ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত সাহিত্যজগতে উপমা-আদর্শের যে আলোকস্তম্ভের সন্ধান দিয়েছেন এবং তার মাহাত্ম্যও প্রতিষ্ঠিত করেছেন, প্রশস্তিমোহের বশে বা পাণ্ডিত্য-প্রকাশের ব্যাকুলতায় অনুরূপ ছাঁচে "উপমা মধুসূদনস্য" জাতীয় নূতন বচন রচনা করা হলে, ঐ আদর্শের মহিমাকে অবশ্যই ক্ষুণ্ণ করা হবে। কালিদাস ও মধুসূদন উপমা-সৃষ্টিতে তুল্যানুতুল্য, পাঠককে এই সাধারণ বোধের বশবর্তী করা যে কতো অসমীচীন, বর্তমান আলোচনায় তা যথেষ্ট প্রমাণিত হবে আশা করি, আর, প্রসঙ্গত উদ্‌ঘাটিত হবে উপমার কবি মাইকেলের মনোগঠনের আসল চেহারা।

কালিদাসীয় উপমার অন্যান্য সুষমা ও ঐশ্বর্য ছাড়াও যেটি তার অনুপম বৈশিষ্ট্য তা হলো ঔচিত্যবোধ। ঔচিত্য-বিচারে কালিদাসের উপমা উপমারহিত বলেই রসজ্ঞ বিচারক ডাঃ দাশগুপ্ত তাঁর বিদগ্ধ সমালোচনায় ঐ প্রাচীন বচনটির সার্থকতা সহজেই প্রমাণ করতে পেরেছেন। কিন্তু মাইকেলের যেন উপমা-সৃষ্টিতে ঔচিত্যরক্ষার কোনো বালাই নেই, আর, তাই তিনি দু'হাতে ছড়াতে পেরেছেন রাশি রাশি উপমা, যাদের মধ্যে ঔচিত্যের দাবী কোথাও মিটেছে কোথাও মেটে নি, এদের অনুপাত যেমনই হোক, ঔচিত্যের প্রতি এমন ঢালোয়া বেপরোয়া উপেক্ষা তাঁর উপমাসৃষ্টির বিচারে কখনই উপেক্ষণীয় নয়।

সাধারণ পাঠক কুতূহলী হয়ে যদি একবার 'অনৌচিত্য' কথাটির অর্থসন্ধানে জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধান খোলেন, তবে সম্ভবত তাঁর কৌতূহল আর এক দফা উদ্রিক্ত হ'বে যখন তিনি দেখবেন মাইকেলের রচনা থেকেই একটি অনৌচিত্যের দৃষ্টান্ত তুলে দেওয়া হয়েছে। খুব সম্ভব, অন্যথা শক্তিশালী মাইকেলের রচনা যে পদে পদে অনৌচিত্য-কণ্টকিত, এটা সুপণ্ডিত, তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি সুনিপুণ সংগ্রাহক জ্ঞানেন্দ্রমোহনের কাছে খুবই দৃষ্টিকটু ও শ্রুতিকটু মনে হয়ে থাকবে।

প্রণমিয়া কাম তবে উমার চরণে
কহিলা * * কেমনে মন্দির হতে, নগেন্দ্র-নন্দিনী
বাহিরিবা, কহ দাসে, এ মোহিনী-বেশে ?
মুহূর্তে মাতিবে, মাতঃ, জগৎ, হেরিলে
ও রূপমাধুরী * * ছদ্মবেশী হৃষিকেশে

হেরি ত্রিভুবন কামাকুল চাহিয়া রহিল
তার পানে। অধর-অমৃত আগে ভুলিলা
অমৃত। * * হেরি পৃষ্ঠদেশে বেণী, মন্দর
আপনি অচল হৈলা হেরি উচ্চ-কুচযুগ!

দেশ-কাল-পাত্র-ব্যবহারাদির বিপরীত বা অযথা বর্ণনই অনৌচিত্য, সুতরাং এখানে 'কহ দাসে' বলে সেবকের ভূমিকা নিয়ে, 'মাতঃ' বলে সম্বোধন করে ঐ জাতীয় উক্তি যে অনুচিত, এইটাই অভিধানকারের বক্তব্য।

বলা বাহুল্য, মাইকেলের ক্ষেত্রে কাব্যদেহের অন্তর্ভুক্ত এই ধরণের সাধারণ অনৌচিত্যের লক্ষণ খুঁজতে গেলে ঠগ বাছতে গাঁ উজোড় হওয়ার উপক্রম। মেঘনাদবধ-এর যে দ্বিতীয় সর্গ থেকে উপরের দৃষ্টান্তটি নেওয়া হয়েছে, সেখানকার ভবানীর গোটা ভূমিকাটাই বিশেষ ধরণের সংলাপ ও নানা অদ্ভুত ইঙ্গিত-সংকেতের সংযোগে অনৌচিত্যের আকর হয়ে উঠেছে। এ ছাড়া তৃতীয় সর্গের প্রমীলাচিত্রে ও অষ্টম সর্গের নানা অংশে রচনার এই দোষ উৎকটভাবে চোখে পড়ে।

সাধারণ বর্ণনায় এই যে ঔচিত্যের প্রতি উপেক্ষা, এর ফলেই মাইকেলের হাতের বহু বহু উপমা হয়েছে অনৌচিত্যদুষ্ট, খেয়ালীপনায় ভরা। কাব্যসৃষ্টির জোরে রত্নাকরের মৃত্যুঞ্জয়িতা উমাপতির মৃত্যুঞ্জয়িতার সঙ্গে যে কেন তুলনীয় (মেঘ ১।১৯) তা আমাদের বোধগম্য না হয়, না হোক; কিন্তু সামান্য কর্মচারী ছত্রধর বা দারোয়ানের উপমাস্থলরূপে যদি কথায় কথায় কামদেব বা মহাদেবকে টেনে আনা হয়, তবে ঔচিত্যের ছন্দাংশও খুঁজে পাওয়া যায় না (মেঘ ১।৫০-৫৫)।

রাবণের রাজপুরী-বর্ণনায় ইন্দ্রপ্রস্থে রচিত পাণ্ডবের রাজপুরীর প্রসঙ্গ-আনয়ন ভঙ্গিটি সুন্দর, কিন্তু ঐ সভায় প্রবাহিত বসন্তবায়ুর সঙ্গে মেশানো দূরাগত কোনো কাকলীর মাধুর্য বোঝাবার জন্য পুরাণোক্ত ও বৈষ্ণব সাহিত্যে বর্ণিত বৃন্দাবন-লীলার কেন্দ্রীয় দেবতা শ্রীকৃষ্ণের বংশীবাদনের প্রসঙ্গ-আনয়ন এক কথায় অসমীচীন। পাখীরই হোক বা যন্ত্রধ্বনিরই হোক, যে কাকলীর মিশ্রণ ঐ রাজসভায় প্রবাহিত বসন্তবায়ুর সঙ্গে কল্পিত হয়েছে, সেটি কতোই না সামান্য—তুচ্ছ একটি মিষ্ট-ধ্বনির আবেশ মাত্র, পক্ষান্তরে উপমানরূপে গৃহীত কৃষ্ণের বংশীরবের যে মাধুর্য, তার ব্যঞ্জনায় কতো গভীরতা, কতো গাম্ভীর্য, তার পরিমণ্ডলে কতো বিচিত্র ভাবের সমাবেশ। সামান্যের জন্য এই অসামান্যের

আমদানী একদিকে যেমন কবির উপমাসৃষ্টির শৈথিল্যের পরিচায়ক, আর একদিকে এই খেয়ালীপনায় ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি কবির যথেষ্ট সম্ভ্রমেরও অভাব সূচিত হয়।

এই প্রসঙ্গে স্বভাবতই আসে মন্তব্য মাইকেলের কবিমানস-সংক্রান্ত একটি বহু-ঘোষিত প্রস্তাব সম্পর্কে। "অন্তরের অন্তরে" মাইকেল "যে সহস্র হিন্দুর এক হিন্দু"(১) ছিলেন, "তাঁর অলংকার-জগৎ" থেকে এরই সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ে ডাঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য মাইকেলের ঐ অলংকার-জগতে, বিশেষত তাঁর উপমার মধ্যে কবির একটি "নৈষ্ঠিক বাঙালির ভূমিকা" ও খাঁটি হিন্দুত্বের উজ্জ্বল পরিচয় উদ্ধার করেছেন। খাঁটি হিন্দুসুলভ শাক্ত ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণব ভাবেরও "একান্ত দরদী ও মরমীর মতো অনুভূতির প্রগাঢ় রঙে রঞ্জিত"(২) যে কবির হাতের বৈষ্ণব চিত্রগুলি, এবং তিনি যে তাঁর "উপমাজগতে শক্তি ও বিষ্ণু দেবতা এবং শাক্ত-সাহিত্য ও বৈষ্ণব-সাহিত্যের স্থান ও কালানুযায়ী প্রয়োগ" (ঐ পৃঃ ৪২) দেখিয়ে হিন্দু সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধার পরিচয় দিয়েছেন, এই হলো ডাঃ ভট্টাচার্যের প্রতিপাদ্য। দৃষ্টান্তের বেলা লেখক কেবল দুটি বিরহের চিত্র বেছে নিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন যে, মাইকেল "উপমাসহযোগে বৈষ্ণব-সাহিত্যের বিরহের সুরটি সুসঙ্গত ও সুসমঞ্জসভাবেই ধ্বনিত করেছেন" (ঐ)।

বিচার-সৌকর্যার্থে চিত্র দুটি এখানে উদ্ধৃত করতে হলো :—

(১) বাহিরিল কাঁদিয়া পশ্চাতে / রক্ষঃপুরবাসী রক্ষঃ—আবাল বনিতা- / বৃদ্ধ; শূন্য করি পুরী, আঁধার রে এবে / গোকুল-ভবন যথা শ্যামের বিহনে!' / (মেঘ—৯ম)

(২) মাতৃকোলে নিদ্রায় কাঁদিল / শিশুকুল আর্তনাদে, কাঁদিল যেমতি / ব্রজে ব্রজকুলশিশু, যবে শ্যামমণি, / আঁধারি সে ব্রজপুর, গেলা মধুপুরে। / (মেঘ—৬ষ্ঠ)

এই চিত্রদ্বয়ে সুরের সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য যেমনই থাকুক, প্রশ্ন হলো, মাইকেলের হাতে বৈষ্ণব-সাহিত্যের এতো অজস্র উল্লেখ থাকতে কেবল দুটি বিরহ-চিত্রই বা নেওয়া হলো কেন? "বৈষ্ণব সাহিত্য মূলতঃ বিরহেরই সাহিত্য" (ঐ)—এটা কি কোনো স্বতঃসিদ্ধ প্রস্তাব? আর, তা যদি হয়ও তবে অবশ্যই সে অমন

(১) কাব্যালংকার ও কবিমানস, পৃঃ ৬১ (২) উপমা মধুসূদনস্য, পৃঃ ৪১

বারোয়ারি বিরহ নয় যে, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার ক্রন্দনে প্রকাশ পাবে। সে বিরহ মূলতঃ রাধাবিরহ, যার অভ্যন্তরে নিয়ত ওঠা-নামা করে ভাব-সম্মিলনের বুদ্‌বুদ্‌, যার জীব-গোস্বামীকৃত ভাষ্য 'ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে"। গোটা 'গোকুল-ভবন শ্যামের বিহনে' আঁধার হওয়ার মধ্যে বিচ্ছেদ-চেতনার ব্যাপ্তি যাই বোঝাক, ওটা সাধারণ বিচ্ছেদ-কারুণ্যের একটা সামাজিক রূপ মাত্র। বৈষ্ণব রস-তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত যে রাধা-বিরহ তার কোনো প্রত্যক্ষ স্পন্দন ওর মধ্যে নেই। সুতরাং 'বৈষ্ণব সাহিত্যের বিরহের সুরটি' বলে যা দেখানো হয়েছে তার মধ্যে উক্ত বিরহের স্বরূপ-উপলব্ধির অভাবই ধরা পড়ে। আর, তার ফলে খাঁটি বৈষ্ণব ভাবের ও রসের কোনো জীবন্ত উপলব্ধিকে কাব্যে প্রতিধ্বনিত করার চেষ্টা স্বয়ং মাইকেলের না থাকলেও সমালোচনায় ঐ বৈশিষ্ট্য আরোপ করার চেষ্টা হয়েছে।

[২] মাইকেলের বৈষ্ণবতা-বিচার : প্রসঙ্গত ডাঃ শিশিরকুমার দাসেরও প্রতিবাদ।

আসলে মাইকেল নিতান্ত হাল্কাভাবেই রাধা-কৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলার প্রসঙ্গ এনেছেন কথায় কথায়। তার মধ্যে ক্বচিৎ এখানে ওখানে ঐ লীলার মর্যাদা বজায় থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় পুরাণ-কাহিনীর মর্যাদার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করেই কবি নির্বিচারে ঐ লীলা-প্রসঙ্গকে তাঁর কাব্যের অঙ্গপূরণে ব্যবহার করেছেন। যেমন,—

(ক) প্রমদাগণবেষ্টিত মেঘনাদের বিহার-দৃশ্য। মধুকালে মত্ত মাতঙ্গিনীর ন্যায় নবীন যৌবন-মদে মত্ত সহচরীদের আয়ত-লোচনে খরতর শর। এই বিহারের উপমায় দেখা যায়—

বিহারেন রাখাল যেমতি
নাচিয়া কদম্বমূলে, মুরলী অধরে,
গোপ-বধূ-সঙ্গে রঙ্গে তোর চারু কূলে! (১।৬৫১-৫৩)

(খ) পঞ্চম অঙ্কে প্রমীলার ঘুম-ভাঙানোর দৃশ্য :—

চমকি রামা উঠিলা সত্বরে,—
গোপিনী কামিনী যথা বেণুর সুরবে!

অব্যবহিত পরবর্তী ছত্রটিও লক্ষণীয়—

আবরিলা অবয়ব সুচারু-হাসিনী
শরমে।

বর্ণনা অবশ্যই হয়েছে রিয়েলিষ্টিক। কিন্তু নায়িকার অনাবৃত দেহের প্রতি

এই ইঙ্গিত ও পূর্ববর্তী 'গোপিনী কামিনী'র চমকে জেগে ওঠা, একত্রে বৈষ্ণব কাহিনীর প্রতি উপমা-সূত্রে কবিমানসের যে কোন্ প্রবণতা ফুটলো তা আশা করি, স্পষ্টতর করার প্রয়োজন নেই। (৫।৩৮৭—৯০)

(গ) বিদেশে কবির কোনো প্রণয়িনীকে প্রেম-নিবেদনের আয়োজন। পুরোপুরি আদিরসাত্মক কবিতা। প্রেয়সীকে আপ্যায়িত করা হয়েছে 'কামের নিকুঞ্জ এই!' বলে। বক্তব্য হলো, কবি-কুল প্রেম-দাস ভবে। অতএব প্রণয়িনীর কাছে কবি-মাইকেলের প্রেমনিবেদন ব্যর্থ হতেই পারে না। প্রেয়সী তাঁর মদনের কুঞ্জে কুসুম-মঞ্জরী। কবির কাজ কী?

কভু রূপ ধরি
অলির, যাচে সে মধু ও কানে গুঞ্জরি,
ব্রজে যথা রসরাজ রাসের পরবে!
কামের নিকুঞ্জ এই!···ইত্যাদি। চতুর্দশপদী—১৫ নং

উপমাসূত্রে মাইকেলের বৈষ্ণব সাহিত্য ও বৈষ্ণব দেব-দেবীর প্রতি কী মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে লক্ষণীয়, এবং উপমায় বৈষ্ণব সাহিত্যের ও বৈষ্ণব কাহিনীর কেমন স্থান-কাল-পাত্রোপযোগী প্রয়োগ ঘটেছে তাও লক্ষণীয়!

(ঘ) কবিতার নাম 'শৃঙ্গাররস'। সম্ভোগশৃঙ্গারের একটি চিত্রে, কাম-কলারই মুখ্যস্থান এখানে। একটি রূপবান ফুলসাজে সজ্জিত পুরুষকে ঘিরে কামোদ্দীপনের প্রয়াসে রূপসী রমণীগণ প্রমত্ত। পুরুষটিও রমণীগণের হৃদয়ে অনুরূপ উন্মাদনাসৃষ্টিতে ব্যাপৃত। এ হেন একটি চিত্রাবলম্বী কবিতায় যে একটিমাত্র উপমা পরম যত্নে সন্নিবেশিত হয়েছে তার চেহারাটি এই রকম—

হাত ধরাধরি করি নাচে কুতূহলে
চৌদিকে রমণীচয়, কামাগ্নি-নয়নে,—
উজলি কানন-রাজি বরাঙ্গ-ভূষণে,
ব্রজে যথা ব্রজাঙ্গনা রাস-রঙ্গ ছলে! চতুর্দশপদী—৫৮ নং

ভাগবতোক্ত রাস-লীলার তত্ত্ব-গুরুত্বকে উপেক্ষা করে তাকে সামান্য কাম-কেলি-পর্যায়ে অবনমিত হতে দেখেও কি মাইকেলের উপমার ঔচিত্যে মুগ্ধ হতে হবে, না, তাঁর 'উপমাজগতে বৈষ্ণব-সাহিত্যের স্থান ও কালানুযায়ী প্রয়োগ'র ('উপমা মধুসূদনস্য' পৃঃ ৪২) প্রশংসা করতে হবে? কাব্যালংকারের মধ্যেই মধুসূদনের প্রাচ্য মানসের মহনীয় পরিচয় ফুটেছে বলে যাঁরা দাবী করেন, এই সব দৃষ্টান্তে, আশা করি, তাঁদের চোখ খুলবে। 'অন্তরের অন্তরে' মাইকেল

'সহস্র হিন্দুর এক হিন্দু' কিনা জানি না, তবে তাঁর অলংকার-জগত থেকে ওরই প্রমাণ দিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

(ঙ) চতুর্দশপদীর ১২ নং কবিতায় পূর্ববর্তী কবিতার 'মেঘদূত'-চিন্তার জের চলেছে। বিরহী যক্ষের মতো প্রবাসী বিরহী কবিও মেঘকে সাগরপারে তাঁর প্রিয়ার কাছে পাঠাতে চান। যাত্রাপথে সাগরের জলে মেঘ তার নিজের মূর্তিখানি প্রতিবিম্বিত দেখে খুশী হবে। অমনি উপমাচ্ছলে কবির কলমে এলো—

ব্রজে যথা ব্রজরাজ যমুনা দর্পণে
হেরেন বরাঙ্গ, যাহে মজি ব্রজাঙ্গনে
দেয় জলাঞ্জলি লাজে!

কবি যদি 'হেরেন বরাঙ্গ' পর্যন্ত লিখেই থামতেন, তাঁর উপমার উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ মাত্রায় সিদ্ধ হতো, কিন্তু পরবর্তী অংশটুকু না লিখে তাঁর তৃপ্তি নেই। বলা বাহুল্য, চিত্রখানি বস্ত্রহরণের, যমুনার জলে অবস্থিত বিবসনা গোপিনীদের লজ্জা-বিড়ম্বনার। এবং এই নিতান্ত বাড়তি সংযোজনে কবিমানসের যে ইঙ্গিত ফুটেছে, তা নিয়ে তাঁর বৈষ্ণব ভাবের প্রতি শ্রদ্ধা-নিষ্ঠার বড়াই করা চলে না।

(চ) সাধারণ ধর্ম-প্রাণ হিন্দুর সংস্কারে রাধা-চরিত্রের প্রতি যে দেবী-চিন্তা-সুলভ ভক্তি-শ্রদ্ধা মিশ্রিত থাকে মাইকেলের মধ্যে তার বিন্দুবিসর্গও ছিল না বলে তিনি চরম খেয়ালীপনার বশে যেখানে সেখানে রাধা-ভূমিকার বেপরোয়া উল্লেখযোগে তাঁর কাব্যদেহের সাজসজ্জা বিধান করে গেছেন। ফিরেও তাকান নি ঐ উল্লেখ কোথায় কেমন মানালো দেখবার জন্য। নিম্নের দৃষ্টান্তে দেখা যাবে মাইকেল বৃন্দাবন-লীলা-মাহাত্ম্যের আদ্যশ্রাদ্ধ করেছেন।

চতুর্দশপদীর ৯৭ নং কবিতা। বাংলা ভাষা সম্বন্ধে। ভাষা যোগ্য বক্তির প্রতিই প্রসন্ন হয়, অযোগ্যের প্রতি হয় বিরূপ। এমন একটি ভাবের অনুকূলে কবি উপমাচ্ছলে লিখেছেন,—

কামার্ত দানব যদি অপ্সরীরে সাধে,
ঘৃণায় ঘুরায়ে মুখ হাত দে সে কানে,
কিন্তু দেবপুত্র যবে প্রেম-ডোরে বাঁধে
মনঃ তার, প্রেমসুধা হরষে সে দানে।

এই ধরণের প্রেমলীলার প্রসঙ্গ আসতেই কবি বৃন্দাবন-লীলার উল্লেখ না করে পারেন নি, তাই ওস্তাদি ভঙ্গিতে লিখলেন,—

দূর করি নন্দঘোষে, ভজ শ্যামে, রাধে,
ও বেটা নিকটে এলে ঢাকো মুখ মানে।

খেয়ালের ঝোঁকে কবি ভুলেই গেছেন, নন্দ ঘোষ রাধার প্রণয়পাত্র হতেই পারে না; সম্ভবতঃ, আয়ান ঘোষের কথাই তিনি বলতে চেয়েছিলেন। তথাপি আয়ান ঘোষ যখন রাধার স্বামী, তখন সেই ব্যক্তিটি সম্পর্কে 'ও বেটা নিকটে এলে' এই নীচতা-হেয়তাজ্ঞাপক ভঙ্গিতে কথা বলা কেন? আর, সেই 'ও-বেটা'র সঙ্গে সম্পর্কিত ও শ্যামের সঙ্গে পীরিতে জড়িত রাধা-চরিত্রটির যে এখানে কী কুৎসিত ইঙ্গিত ফুটলো, তা কবি গ্রাহ্যই করলেন না। তিনি তাঁর কাব্যে কেবল একটা ভাব প্রকাশের ঢঙ দেখাবার জন্য এই প্রসঙ্গ এনেছেন। এই হলো কাব্যালংকারের জগতে প্রকটিত মাইকেলের বৈষ্ণবতার তথা কবির হিন্দু-সংস্কারের স্বরূপ।

উল্লিখিত দৃষ্টান্ত ছাড়াও বিরহ-সুর-বর্জিত বৃন্দাবন-লীলা-প্রসঙ্গ আমদানী করার ভঙ্গির মধ্যে মাইকেলের কবি-মনের গঠনটি লক্ষ্য করা যেতে পারে:—

(১) 'চল যাই, জয়দেব, গোকুল-ভবনে / তব সঙ্গে, যথারঙ্গে তমালের তলে / শিখিপুচ্ছ-চূড়া শিরে, পীত ধড়া গলে / নাচে শ্যাম বামে রাধা—সৌদামিনী ঘনে!' (জয়দেব)

(২) 'চল যাই মহানন্দে গোকুল-কাননে,/সরস বসন্তে যথা রাধাকান্ত হরি/নাচিছেন, গোপীচয়ে নাচায়ে; সঘনে/পূরি বেণুরবে দেশ!' (কল্পনা)

(৩) সুবর্ণ কন্দলী—/ফুলকুলবধূ সতী সদা লজ্জাবতী,/মাথা তুলি শূন্যপানে চাহিয়া হাসিল; / গোপিনী শুনি যেমনি মুরলীর ধ্বনি, / চাহে গো নিকুঞ্জপানে, যবে ব্রজধামে, / দাঁড়ায়ে কদম্বমূলে যমুনার কূলে, / মৃদুস্বরে সুন্দরীরে ডাকেন মুরারি।' (তিলো—১/৩৮৫-৯১)

(৪) দেব সেনাপতি কার্তিকেয় ভাষণ-প্রসঙ্গে—'মৃদু স্বরে, যথা বাজে মুরারির বাঁশী, / গোপিনীর মন হরি, মঞ্জু কুঞ্জবনে;' (তিলো—২/৩৪৬-৪৭)

(৫) দেবকামিনী কালিন্দীর প্রসঙ্গে—"যাঁর চারুকূলে / রাধা-প্রেম-ডোরে বাঁধা রাধানাথ, সদা / ভ্রমেন, মরাল যথা নলিনী কাননে।"

(তিলো—২/৫৪৮-৫০)

(৬) নন্দন কাননে দৈত্যরাজের শত শত নারীসহ বিহার প্রসঙ্গে—"কোনো

স্থলে নাচে বীণা বাজাইয়া / তরুমূলে বামাকুল, ব্রজবালা যথা / শুনি মুরলীর ধ্বনি কদম্বের মূলে।" (তিলো—৪/৩১২-১৪)

এইসব উল্লেখভঙ্গি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে বৃন্দাবন-কাহিনীটিকে মাইকেল দেখেছিলেন বৈষ্ণবতার প্রতি শ্রদ্ধাবান হিন্দুর চোখে নয়, দেখেছিলেন একটি রোমান্টিক প্রেমের কাহিনীরূপে নিছক রোমান্টিক কবির চোখে। রাধা-কৃষ্ণ-লীলা-চিত্র পদে পদেই এসেছে তাঁর লেখনীমুখে, কিন্তু যেমন খেয়ালী তাঁর কল্পনা-প্রবণতা, তেমনি খেয়ালী বা খুশী-মাফিক তাঁর ঐ চিত্রের রূপায়ণ। তাই যে-কোনো তুচ্ছ প্রসঙ্গে রাধা-কৃষ্ণ বা গোপী-কৃষ্ণের চিত্র আমদানী করতে কবির সংকোচ নেই। এবং 'কটিতটে পীতধড়া'-র পরিবর্তে 'পীতধড়া গলে,' অর্থাৎ কটিতটে পরিধেয় বস্তুটি গলদেশে জড়িয়ে কৃষ্ণকে কিম্ভুতকিমাকার সাজাতেও তাঁর আটকায় না।

প্রসঙ্গত এসে পড়ে আধুনিককালের অপর এক সমালোচক ডাঃ শিশিরকুমার দাসের মন্তব্য। 'ব্রজাঙ্গনা'র কবি-মানস সম্পর্কে তিনি লিখেছেন,—

"রাধাকৃষ্ণের যুগলপদ্মের ধারে কয়েক শতাব্দী ধরে বাঙালী কবির মনভোমরা গুঞ্জন করেছে। মধুসূদনও যে প্রাণের অন্তর্নিহিত প্রেরণায় সেই পদ্মমধুর সন্ধান করেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর সমগ্র রচনা থেকে অজস্র উপমা উৎপ্রেক্ষা তুলে তার প্রমাণ করা যায়।"

—(মধুসূদনের কবিমানস (দাস)—পৃঃ ৯০)

অর্থাৎ ডাঃ ভট্টাচার্যের চেয়ে আরও এক ধাপ এগিয়ে চলেছেন ডাঃ দাস মধুসূদনের বৈষ্ণবতা সম্পর্কে। তিনি মাইকেলের মধ্যে এযুগের বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস আবিষ্কার না করে ক্ষান্ত হতে পারেন নি। আশা করি, পূর্ববর্তী আলোচনায় এইটাই প্রমাণিত হবে যে, এজাতীয় মন্তব্যে কবি প্রশস্তির অন্ধতা ছাড়া আর কিছুই নেই। যিনি রাধার উল্লেখ করতে গেলেই 'Mrs. Radha', (ঠিক যেমন Mr. Ram), 'poor old Radha,' 'the poor old lady of Braja' ইত্যাদি ভঙ্গিতে কথা বলেন, তাঁর মধ্যে কি সত্যই কোনো বৈষ্ণব-ভাবনা কল্পনা করা চলে? কবি নিজে তো স্পষ্টই বলেছেন, সবই তাঁর নিছক বৈচিত্র্য-সৃষ্টির অভিনবত্বের উপাদান মাত্র। বাংলা কাব্যভাণ্ডারে Ottava Rima-র ছাঁচে কিছু নূতনের যোগান দেওয়ার তাগিদই ব্রজাঙ্গনা-রচনার মূল কথা, কোনো ভক্ত-হৃদয়ও নয়, বৈষ্ণবানুরক্তিও নয়।

এখানে ডাঃ সুকুমার সেনের মন্তব্যটি স্মরণীয় :—"একথা স্বীকার করিতে হইবে যে পদকর্তাদের মত ভক্তি বা বিশ্বাস কবির না থাকিলেও তাঁহার কবিতাগুলিতে কাব্যোচিত sincerity বা আন্তরিকতার অভাব নাই। বৈষ্ণব-পদাবলীর অপেক্ষা ভারতচন্দ্রের গানের প্রতিধ্বনি ব্রজাঙ্গনা কাব্যে বেশী শোনা যায়। ভারতচন্দ্রই এখানে মধুসূদনের গুরু, বৈষ্ণব-কবিরা নহেন।"(১) স্বয়ং কবির মনোভাবও সমীক্ষাযোগ্য। এমন একটা কাব্যসৃষ্টির কৈফিয়তে তাঁকে বলতে হয়,—"They are all about poor old Radha and her বিরহ। * * You are rather cold towards the poor old lady of Braja. Poor man! When you sit down to read poetry, leave aside all religious bias. Besides, Mrs. Radha is not such a bad woman after all…" 'শব্দ ও শ্রুতি' নিয়ে যিনি এতো গভীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন, তাঁর পক্ষে এই ইংরেজি ভাষণের শব্দ-ব্যঞ্জনা অবশ্যই সহজলভ্য। এই ভাষণ-ভঙ্গিতে কি সত্যই পাদপদ্মমধুপিপাসিত ভক্ত-হৃদয়ের সন্দেহাতীত পরিচয় পাওয়া যায়?

[৩] মাইকেলের শাক্তভাব-বিচার

উপমায় শক্তিদেবতার উল্লেখ বা শক্তিপূজা-সংক্রান্ত চিত্র-রচনার ক্ষেত্রেও কবি মধুসূদনের এই একই খেয়ালী মনের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর অনেক উল্লেখ অবশ্য যথোপযোগী ও নির্দোষ, কিন্তু অনুপযোগী, ত্রুটিপূর্ণ ও ঘোরতর আপত্তিকর চিত্র ও সংযোজনা এতো বেশি যে, উপমায় শক্তিদেবতা ও শাক্তভাবের প্রতি মধুসূদনের "দরদী ও মরমী অনুভূতি"যুক্ত কবিমানসেরই প্রতিফলন ঘটেছে, এ প্রস্তাব গ্রাহ্য হতে পারে না। কেবল স্মরণ বা উল্লেখেই পুলকিত হওয়া চলে কি? বৃন্দাবন-কাহিনীর ন্যায় শক্তিদেবতা-কাহিনী বা শাক্ত চিত্রের প্রসঙ্গও মাইকেল তাঁর কাব্যে এনেছেন কথায় কথায়। কিন্তু ভাগ্যক্রমে কোথাও কোথাও ঐ প্রসঙ্গ বা চিত্রের মর্যাদা বজায় থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কবি ঐ প্রসঙ্গ এনেছেন নির্বিচারে, বেপরোয়া উদ্ভট কল্পনা-বিলাসী এক কারিগরের মতো, ঔচিত্যের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করেই।

(১) মেঘনাদবধ কাব্যে কবির উপমায় সর্বপ্রথম শক্তিদেবতা স্মরণের রূপ ও ভঙ্গিটি উদ্ধৃত করা হলো :—

গহন কাননে যথা ব্যাধদল মিলি
বেড়ে জালে সাবধানে কেশরি-কামিনী
নয়ন-রমণী রূপে, পরাক্রমে ভীমা
ভীমাসমা ! (১।২৪০-৪৩)

'ভীমা ভীমাসমা' প্রয়োগটিকে নিরর্থকতার হাত থেকে বাঁচাতে গেলে অবশ্যই দ্বিতীয় 'ভীমা'-কে দুর্গা বা চণ্ডী অর্থে নিতে হবে। তা হলে একটি বনের সিংহীর উপমাস্থল হলেন স্বয়ং সিংহবাহিনী দুর্গা! কবির কল্পলোকে জগন্মাতার স্থান ও মান লক্ষ্য করে শাক্ত ভক্তসমাজের উল্লসিত হওয়ার কথাই বটে! আর উপমার ঔচিত্য? সুধীসমাজ বিচার করুন।

(২) দ্বিতীয় সর্গে উপমাবিশেষের মধ্যে বিধৃত না হলেও সর্গটির এক বিস্তৃত অংশ জুড়ে পার্বতী-চিত্রের যে লাঞ্ছিত প্রতিরূপ সোৎসাহে অঙ্কিত হয়েছে, সেই বহু-আলোচিত কবিকৃতির কথা অবশ্যই এখানে অপ্রাসঙ্গিক নয়। "প্রবেশি সুবর্ণ-গেহে, ভবেশ-ভাবিনী/ভাবিলা, 'কিভাবে আজি ভেটিব ভবেশে?" এই থেকে সুরু করে, "মোহন মূরতি ধরি, মোহি মোহিনীরে/কহিলা হাসিয়া দেব" পর্যন্ত, এই ১৬২ লাইন ধরে মহাদেব-পার্বতীকে, বিশেষত রতি-রতিপতি-সহায়া পার্বতীকে নিয়ে কবি-কল্পনা যে যথেচ্ছাচারে মত্ত হয়েছে তার মধ্যে শাক্ত দেব-দেবীর প্রতি কবিমানসের পরিচয়টিকে নিশ্চয়ই কেউ সাধারণ হিন্দু ভক্তজনোচিত বলবেন না। এরই মধ্যে অবশ্য চকিতের জন্য এসেছে খেয়ালী কবির কলমের মুখে 'তপের সাগরে মগ্ন, বাহ্যজ্ঞান-হত' দেবাদিদেবের ধ্যানগম্ভীর মূর্তি—সম্ভবত আঙ্গিকপূরণের শৈল্পিক দাবীতে। শিল্পের খেয়ালে মাইকেল সবই করতে পারেন। এখানকার পার্বতী-ভূমিকায় ও তার আনুষঙ্গিকে আদিরসের অত্যাচার এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

(৩) নামে ও রূপে কতো বিভিন্ন শক্তিদেবীকেই না মাইকেলের কল্পলোকে আনাগোনা করতে দেখা যায় উপমা-সূত্রে। চণ্ডী, দুর্গা, চামুণ্ডা, ভৈরবী, কালী প্রমুখ শাক্ত দেবীরূপের চিন্তায় সাধারণ হিন্দুর অন্তরে যে দিব্য সুগম্ভীর ভাবমণ্ডল স্বতঃই জেগে ওঠে, মাইকেলের কবিমানস অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যে তার তোয়াক্কা রাখতো না, তারই প্রমাণ বহন করে কবির উপমা-রচনার খেলায় এই সব দেবীরূপের নিতান্ত খেয়ালী আমদানী।

চামুণ্ডা-কেই নেওয়া যাক প্রথমে।

(ক) না জানি এ বামা-দলে কে আঁটে সমরে,
ভীমারূপী, বীর্যবতী চামুণ্ডা যেমতি—
রক্তবীজ-কুল-অরি ? (৩।৩৫৬-৫৮)

এ 'বামাদল' হলো প্রমীলার সখীদল, যাদের বর্ণনায় কবিই অন্যত্র বলেছেন 'এক শত চেড়ী', বলেছেন, 'ডাকিনী যোগিনী সম বেড়িলা সতীরে অশ্বারূঢ়া চেড়ীবৃন্দ' (৩।১৩২)। সুতরাং এই চেড়ীরাই কবির কল্পলোকে জাগালো সেই ভাবমণ্ডল, যা 'চামুণ্ডা'র ধ্যানের সঙ্গে জড়িত। তাও কেবল 'চামুণ্ডা' নামটাই নয়, পরিবেশটিকেও বিশেষিত করা হয়েছে 'রক্তবীজ-কুল-অরি' বলে ; অর্থাৎ একেবারে মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত শ্রীশ্রীচণ্ডীর অধ্যায়বিশেষের আবৃত্তিতে যে মানস-পরিমণ্ডল জাগে, ঐ চেড়ীরাই কবির মধ্যে তাই জাগালো—যদিও তারাই আবার ডাকিনী-যোগিনী ঐ একই কবিমানসে! তা ছাড়া, কেবল ডাকিনী-যোগিনী বলায় কোনো হাঙ্গামা ছিলো না (যদিও, একটু আগে, এদেরই কবি সাজিয়েছেন নানাবিধ সাজসজ্জায় অপরূপ করে, এবং পরেও তারা-দলের সঙ্গে উপমিত করে এদের সৌন্দর্যের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে— 'প্রমীলা, তারার দলে শশিকলা যথা' !), কিন্তু 'বামাদল'কে 'চামুণ্ডা যেমতি' বলায় হাঙ্গামা বাড়লো, তারা কি প্রত্যেকেই এক একটি রক্তবীজ-কুল-অরি চামুণ্ডা, না কি, সম্মিলিতভাবে বামাদলই চামুণ্ডা ? মাইকেলের কবি-কল্পনায় সবই সম্ভব !

(খ) এই দেবী চামুণ্ডা এই কবিরই কল্পলোক আলোড়িত করেন আর এক 'চেড়ী'র বর্ণনায়। যদিও তাকে আর কেউই—বাল্মীকি, কৃত্তিবাস বা বা কালিদাস,—কেউই এইভাবে চেড়ীমাত্র বলে জানান নি, এঁকেছেন তার চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন তুলিতে। এ হলো 'ত্রিজটা', যে ঐ সব মহাকবির হাতে সীতার প্রতি পরম দরদী এক বিশিষ্ট নারীচরিত্র প্রাপ্ত হলেও, যান্ত্রিক অনুপ্রাসের দাবীতে মাইকেলের হাতে সর্বদাই হয়েছে 'বিকটা,'—আর সেই সূত্রে এক ভয়ঙ্করী চেড়ীমাত্র, যে কথায় কথায় সীতাকে কাটতে যায়। এই জঘন্য চরিত্রটিও কবির কল্পনায় জাগায় চামুণ্ডার স্মৃতি,—

বিকটা, ত্রিজটা, সখি, লোহিতলোচনা,
করে খরসান অসি, চামুণ্ডারূপিণী, (৯।১৪১-৪২)

(গ) প্রেমালাপে কৌতুকরসের ফোড়ন দিতেও কবি নিয়ে আসেন এই চামুণ্ডাকে :—"অরিন্দম ইন্দ্রজিত কহিলা কৌতুকে ;—/'রক্তবীজে বধি বুঝি এবে, বিধুমুখি,/আইলা কৈলাস-ধামে ? যদি আজ্ঞা কর,/পড়ি পদতলে তবে ; চিরদাস আমি/তোমার, চামুণ্ডে!" শুধু তাই নয়, কবির 'চামুণ্ডা' কেবল কৌতুকেই পরিতুষ্ট না হয়ে সমুচিত জবাবে হয়ে ওঠেন মদনরসে টলোমলো,—"কিন্তু মনমথে না পারি জিনিতে"; হবেনই তো, উপমান চামুণ্ডার উপমেয় এই প্রমীলা যখন প্রথম যাত্রা সুরু করে, তখনই তার বীরাঙ্গনা সাজ সত্বেও সর্বাঙ্গীণ প্রভাবের বর্ণনায় কবি খুব ঘটা করে বলেন,—

অন্তরীক্ষে সঙ্গে রঙ্গে চলে রতিপতি
ধরিয়া কুসুম-ধনুঃ মুহুর্মুহুঃ হানি
অব্যর্থ কুসুম-শরে ! (৩।৩৮৮-৯০)

এই হলো কবিমানসে চামুণ্ডা-চিন্তার স্বরূপ ! শক্তি-প্রতিমার 'ভাব ও রূপ, চিত্র ও তত্ত্ব'(১) যে কিভাবে কবির কল্পলোকে প্রতিবিম্বিত হয়েছে, এবং কবি-অঙ্কিত ঐ দেবী-আলেখ্য যে কতো 'প্রাণস্পর্শী', কতো 'প্রাণ-কাঁদানো মন-মাতানো'(১) বা বর্ণনা কতো 'অনুভূতি-গাঢ়', তা অবশ্যই লক্ষণীয়!

(ঘ) মাইকেলের উপমার আসরে চামুণ্ডা আরো এসেছেন ; এবং এসেছেন কোনো নারীর উপমান রূপে নয়, পুরুষের ;—রাবণের রাক্ষস-সৈন্যদলের ! আর এই উপলক্ষে দেবীর তিনটি নামই ব্যবহৃত হয়েছে—একে একে তিনটি ঢেউয়ের দোলায় কবি-কল্পনা যখন দোল খেতে চেয়েছে,—চণ্ডী, দুর্গা, চামুণ্ডা। একই সপ্তম সর্গে ঐ একই সৈন্যদলের কথায় তিনবার একই চণ্ডী-চামুণ্ডার উপমানের সমারোহ খাড়া ক'রে কবি যে ধারাবাহিক পাঠকের যথেষ্ট বিরক্তির সৃষ্টি করেছেন, তা বলাই বাহুল্য। বিরক্তির কারণ, প্রথমত, কল্পনার যথেচ্ছাচার, দ্বিতীয়ত, তারই উৎকট পুনরাবৃত্তি। কবির যখন প্রথম খেয়াল চাপলো ঐ উপমান-রচনার, তখনকার কবি-মানসে দেবী-মাহাত্ম্যের পরিবর্তে লক্ষণীয়—পাণ্ডিত্যপূর্ণ উদ্ভাবনের নৈপুণ্য-প্রদর্শনে হাস্যোদ্দীপক বান-ডাকানো উচ্ছ্বাস :—

যথা দেবতেজে জন্মি দানবনাশিনী
চণ্ডী, দেব-অস্ত্রে সতী সাজিলা উল্লাসে

(১) 'উপমা মধুসূদনস্য' পৃঃ ৪১

অট্টহাসি, লঙ্কাধামে সাজিলা ভৈরবী
রক্ষঃকুল-অনীকিনী—উগ্রচণ্ডা রণে।
গজরাজতেজঃ ভুজে ; অশ্বগতি পদে ;
স্বর্ণরথ শিরঃচূড়া ; অঞ্চল পতাকা
রত্নময় ; ভেরী, তুরী, দুন্দুভি, দামামা
আদি বাদ্য, সিংহনাদ ! শেল, শক্তি, জাটি,
তোমর, ভোমর, শূল, মুষল, মুদগর,
পট্টিশ, নারাচ, কৌন্ত—শোভে দন্তরূপে !
জনমিল নয়নাগ্নি সাঁজোয়ার তেজে,

*　　*　　*

অধীর ভূধরব্রজ—ভীমার গর্জনে,—
পুনঃ যেন জন্মি চণ্ডী নিনাদিলা রোষে ! (৭।১৫৮-৯২)

লোকে পাছে কবির এই অপূর্ব কল্পনায় অপূর্বতর উপমানের স্বরূপ বুঝতে অক্ষম হয়, তাই কবি উপমানস্থানীয়া দেবী চণ্ডিকার অদ্ভুত বেশবিন্যাসের সঙ্গে অভিনব অঙ্গ-সংস্থানও সুস্পষ্ট সুনির্দিষ্ট করে দেখিয়েছেন। কোথায় দেবীর হাত, কোথায় পা, কোথায় চোখ, কোথায় দাঁত, সব নির্দিষ্ট ; এ ছাড়া শাড়ীর আঁচল এবং মাথার চূড়াও দেখানো হয়েছে। বড়ো ঘটা করেই শোনানো হয়েছে দেবীর সিংহের গর্জন—ভেরী, তুরী, দুন্দুভি, দামামা প্রভৃতি বাদ্যধ্বনিতে। কিন্তু দেবীর দন্ত-বিকাশের ঘটায় অপর সমস্ত ঘটাই লজ্জা পেতে বাধ্য! শেল থেকে সুরু করে কবি পর পর সাজিয়ে গেছেন যুদ্ধের অস্ত্রগুলি দেবী চণ্ডিকার দন্তাবলীর অনুপম উপমানরূপে এবং হঠাৎ থেমে গেছেন একাদশ অস্ত্রে এসে, কারণ 'কৌন্ত' আর 'দন্ত', এমন অনুপ্রাস হাতছাড়া করা চলে না। হয়তো দেবীর এই দন্তবিকাশের ব্যবস্থায় কবি প্রচুর আনন্দ পেয়েছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, দেবী-চণ্ডিকার চিত্র-রচনায় এই যথেচ্ছ চপলতায় যুগপৎ হাস্য ও বিরক্তি সংবরণ করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে।

আসলে, মাইকেলের কাব্যে কবির এমন বহু বিচিত্র খেয়ালীপনা উপেক্ষা করেই তাঁর কবিকৃতির অপরাপর বৈশিষ্ট্যে মনোযোগী হতে হবে। শুধু, যাঁরা তাঁর সব কিছুতেই মুগ্ধ, যাঁরা মাইকেলের উপমামাত্রেই খুঁজে পান কালিদাসীয় মহিমা, আর উপমায় দেব-দেবীর উল্লেখমাত্রেই খাঁটি ভক্ত হিন্দুসুলভ কবিমানসের অব্যর্থ নিদর্শন পেয়ে, তাকেই মহামূল্য আবিষ্কার বলে ঘোষণা

করতে চান, তাঁদের ভ্রান্তি অপনোদনের জন্যই এমন বিশ্লেষণ-ধারার আশ্রয় নিতে হয়েছে।

সপ্তম সর্গের অপর দুটি দৃষ্টান্ত,—

(ঙ) সে ভৈরব রবে রুষি, রক্ষঃ-অনীকিনী
নিনাদিলা বীরমদে, নিনাদেন যথা
দানবদলনী দুর্গা দানবনিনাদে!— (৭।২৫৭-৫৯)

(চ) পশিলা পুরে রক্ষঃ-অনীকিনী—
রণ-বিজয়িনী ভীমা, চামুণ্ডা যেমতি
রক্তবীজে নাশি দেবী; তাণ্ডবি উল্লাসে,
অট্টহাসি রক্তাধরে, ফিরিলা নিনাদি,
রক্তস্রোতে আর্দ্রদেহ! দেবদল মিলি
স্তুতিলা সতীরে যথা, আনন্দে বন্দিলা
বন্দিবৃন্দ রক্ষঃসেনা বিজয় সঙ্গীতে! (৭।৭৬৫-৭১)

(ঙ)-তে রাক্ষস-সেনাবাহিনীর যুদ্ধক্ষেত্রে উন্মত্ত গর্জন হলো কবির বর্ণনার বিষয়। উপমার অন্তরালবর্তী কবি-কল্পলোক যেভাবে এখানে ধরা দিয়েছে, তাতে দেখা যায়, রাক্ষস-সেনার গর্জন কবির কাছে দানবদলনী দুর্গার গর্জনের তুল্য। শ্রীশ্রী৺চণ্ডী গ্রন্থে বর্ণিত মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গার বিশ্বের অশিব শক্তির বিরুদ্ধে বিশ্ববিকম্পী রণহুঙ্কারের মধ্যে পুঞ্জীভূত দেবরোষের সাদৃশ্য যদি জাগ্রত হয় রাক্ষসবাহিনীর গর্জনের দ্বারা, এবং ঐ সাদৃশ্য সূত্রে গোটা বাহিনীকেই মনে হয় স্বয়ং দুর্গার প্রতিরূপ বিশেষ, তবে যেমন উপমার ঔচিত্য, তেমনি কবির শক্তিদেবতার প্রতি, তথা বাঙালীর জাতীয় উৎসবের ভাবরূপের প্রতি শ্রদ্ধা-মমতা, উভয়েরই নিদর্শনে মোহিত হওয়ার কথাই বটে!

(চ)-তে আর নূতন মন্তব্যের অবসর স্বল্পই। কবি-মানসে সেই একই খেয়ালী কল্পনার আরো একটি তরঙ্গভঙ্গ। যুদ্ধের বর্ণনা শেষ হয়েছে, এইবার প্রসঙ্গান্তরে যেতে হবে। যাওয়ার আগে ঐ অনীকিনী-চামুণ্ডায় একাকার-ঘটানো অতি প্রিয় উপমা-রচনার অভিনবত্বের তরঙ্গে আর একবার মাতামাতি করার প্রলোভন কবি যেন এড়াতে পারছেন না। তাই যুদ্ধান্তে রণ-বিজয়ী মহাবীর রাবণের কথা সংক্ষেপে সেরে দিয়েই কবি ধরে রইলেন সেই রাক্ষস-সেনাদলকে; নিয়ে এলেন ঐ সেনাদলের পুরীপ্রবেশের উপমানরূপে অসুর-বিনাশান্তে দেবীচণ্ডিকার স্বর্গপুরী-প্রবেশের চিত্র। রাক্ষসের 'তাণ্ডব-উল্লাস'

কবির অনুভূতিতে জাগিয়েছে রক্তবীজবিনাশিনী চণ্ডীর তাণ্ডব উল্লাসের সাদৃশ্য, এবং সে অনুভূতি এতোই জীবন্ত যে কবি যেন ঐ বাহিনীর মধ্যেই দেবীর 'রক্তাধরে অট্টহাসি'ও প্রত্যক্ষ করেছেন। কিন্তু উদ্‌ভ্রান্ত কবি-কল্পনার দৌড় এখানেই শেষ নয়। ঐ কল্পলোকে রাক্ষসবাহিনী আর চণ্ডী একেবারেই একাত্ম হয়ে গেছে, দেখা যায়। তাই লঙ্কাপুরীতে প্রবেশের পরেও কবি রাক্ষস-সেনাদলকে স্বয়ং 'সতী' ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছেন না। রাক্ষসরাজের রাজপুরীতে আছে বিজয়ীর বন্দনা গাওয়ার ব্যবস্থা। কবির উপমায় আমরা দেখতে পাচ্ছি কেবল বাহিনীকে সতীরূপে নয়, ঐ গায়কদলকেও দেবতার দল রূপে দেখাবার সুযোগ পেয়ে কবি পরম পরিতৃপ্ত! অতএব, উপমার ঔচিত্য ও শক্তিদেবতাসংক্রান্ত কবিমানস সম্পর্কে সেই একই মন্তব্য প্রযোজ্য।

(৪) পূর্বাপর-বর্ণনা-নিরপেক্ষ কোনো বিচ্ছিন্ন উল্লেখ বা উদ্ধৃতিমাত্রকে মাইকেলের কবিমানসের সংকেত রূপে গ্রহণ করা বিপজ্জনক; কারণ রচনায় সঙ্গতি-সামঞ্জস্য রক্ষার দায়িত্ব এই কবি কদাচিৎ পালন করেছেন। যাঁরা ঐ ধরণের উল্লেখ বা উদ্ধৃতির সাহায্যে মাইকেলের কবিমানসের বিচিত্র মহামূল্য পরিচয় বা বিচিত্র মহিমা আবিষ্কার করতে প্রয়াসী, তাঁরা ভ্রান্ত; এবং প্রশস্তি-মোহগ্রস্ত বলে, ভ্রান্তিকেই চালিয়ে দিতে চান মহাকবির পূজার উপচার বলে। প্রমীলার বর্ণনায় যদি উদ্ধৃত করা হয়,—

সিংহ পৃষ্ঠে যথা
মহিষ-মর্দিনী দুর্গা; ঐরাবতে শচী
ইন্দ্রাণী; খগেন্দ্রে রমা উপেন্দ্র-রমণী, (৩।৩৯০-৯২)

তবে আপত্তির কিছুই থাকার কথা নয়, যেহেতু উপমান যেমনই হোক, উপমেয় এখানে প্রমীলার মতো নারীরত্ন। আর এখানে, বিশেষত দুর্গা-চিত্রের সমাবেশে, উপমাসূত্রে কবির শক্তিদেবতা-স্মরণের ভঙ্গিটি বেশ মনোজ্ঞ বলেই মনে হয়। কিন্তু পরবর্তী দুই ছত্র—

শোভে বীর্যবতী সতী বড়বার পিঠে—
বড়বা, বামী-ঈশ্বরী, মণ্ডিত রতনে;

—যা অবশ্যই পূর্বের সঙ্গে একত্রে পাঠ্য,—আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে হয়, এই বাক্যটি সংযোজনের প্রেরণামূলে আছে যতো না প্রমীলা-ভাবনা, ততো বড়বা, —প্রমীলার বাহন। প্রমীলা যে যথাযোগ্য বাহনে কেমন শোভা পাচ্ছে, সেইটাই এখানে বলার আয়োজন;—তাই উপমানস্থানীয়া দুর্গা, শচী বা রমা

অপেক্ষা, তাঁদের বাহন—সিংহ, ঐরাবত বা খগেন্দ্রের দিকেই কবির লক্ষ্য বেশি। প্রমীলা অশ্বারোহণে চলেছে, কিন্তু সে সামান্যা ঘোটকী নয়, বামী-ঈশ্বরী, 'বড়বা' নামে খ্যাত। বড়বা যে ঐ সিংহবাহিনীর সিংহ, ইন্দ্রের ঐরাবত ও গরুড়বাহনের গরুড়েরই উপমানে উপমিত হওয়ার যোগ্য, এইটাই কবির প্রধান বক্তব্য। নচেৎ সূক্ষ্মবিশ্লেষণে বলতে হয়, প্রমীলার স্বরূপ-শোভা বিকাশের জন্য এখানকার এই উপমামালা রচিত হয়ে থাকলে কবির সে উদ্দেশ্য কেবল প্রথমটিতে সিদ্ধ হতে পারে, পরবর্তী দুটিতেই ব্যর্থ হয়েছে। ঐরাবতে শচী ও খগেন্দ্রে রমা কেবলই ইন্দ্র ও বিষ্ণুর সঙ্গিনী রূপে শোভা বর্ধন করে থাকেন, বড়বা-বাহিনী প্রমীলার ভূমিকা ও শোভা সম্পূর্ণ ভিন্ন পর্যায়ের। অতএব এখানে বড়বার খাতিরে কেবল একটি 'মহিষ-মর্দিনী দুর্গা'র উল্লেখে কবির শাক্ত-ভক্তি-প্রীতিতে উচ্ছ্বাস বোধ করবার কারণ নেই।

(তুঃ 'উপমা মধুসূদনস্য'—পৃঃ ৪০)

দ্বিতীয়ত, যদি সত্যই কবির অমন মানসগঠন থাকতো তবে উল্লেখটির অব্যবহিত পূর্বেই কবি 'মহিষমর্দিনী দুর্গা'র উপমানযুক্ত প্রমীলার চিত্রটিকে এভাবে শৃঙ্গাররসের স্থূল অবলেপে বিবর্ণ পটভূমিকায় স্থাপন করতে পারতেন না (অন্তরীক্ষে সঙ্গে রঙ্গে চলে রতিপতি ধরিয়া কুসুম-ধনুঃ, মুহুর্মুহুঃ হানি অব্যর্থ কুসুম-শরে !)।

(৫) ভৈরবী, কালী ইত্যাদি প্রসঙ্গেও যেই চোখে পড়লো—

(ক) 'দিগম্বরী যথা দিগম্বরে' (৩।৪২২)

অথবা (খ) 'যথা নৃমুণ্ডমালিনী রণপ্রিয়া' (৩.৪৬৯)

অথবা (গ) 'দানব-দলনী-পদ্ম-পদযুগ ধরি
বক্ষে, বিরূপাক্ষ সুখে নাদেন যেমতি' (৩।১১১-১২)

অথবা (ঘ) 'সমর-রঙ্গে হরপ্রিয়া যথা কালী !' (৮।২৫০)

আর অমনি উপমাসূত্রে কবির কল্পলোকে শক্তি-দেবতার আবাহন লক্ষ্য করে পাঠক যে কবির মানস গঠনটিকে বিশুদ্ধ শাক্তভাব-দরদী বলে ঘোষণা করবেন তার উপায় নেই। 'সাহেব-কবির লেখনী'তে খাঁটি 'শাক্ত পরিবারের সন্তানসুলভ সংস্কারের কাব্যিক প্রতিফলন দেখে যাঁরা প্রশস্তিতে গদগদ হয়ে ওঠেন(১) তাঁদের ভ্রান্তি বা illusion পরিতাপজনক। কারণ, সমীক্ষায় দেখা

(১) 'উপমা মধুসূদনস্য' পৃঃ ৪১

যাবে, এই শক্তিদেবতার উল্লেখগুলি দেবতা-চরিত্রের বাঞ্ছিত মহিমা বা ভাব-ব্যঞ্জনার কোনো তোয়াক্কা রাখে না, বরং স্থানবিশেষে কবির উৎকট রুচি-বিকারের জঘন্য পরিচয় দেয়।

(ক)-তে আদ্যাশক্তি কালীর যে চিত্রখানির সংকেত, শাক্ত পরিবারের সন্তান মধুসূদন বাল্যাবধি যা দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন, তা হলো "শব-রূপ-মহাদেব-হৃদয়োপরিসংস্থিতা" অথবা "শব-শিরারূঢ়া" কালীমূর্তি, তন্ত্রোক্ত বিধিমতে সংযমপূত কঠিন নৈষ্ঠিকতায় যে মূর্তির পূজা অনুষ্ঠিত হয় শাক্তভক্ত পরিবারে সুগম্ভীর পরিবেশে। মহাকালের বুকে মহাকালী, এই রূপ-কল্পনার মূলে কতো সাধকের কতোই না ধ্যানের ও ভাবের জটিলতা, বিশ্বসৃষ্টির কতো ইঙ্গিত-সংকেতই ভিড় করে আছে। কিন্তু মাইকেল তাঁর 'যথা'-যোগে উপমা ছড়াবার মত্ততায় মূর্তিটির যে সহজ ব্যাখ্যা করে নিয়েছেন তাতে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর অভিনবত্ব তারিফ করবার মতো! এর মধ্যে কবি দিগম্বরীর দিগম্বরকে পদতলে দাবিয়ে রাখার কায়দাটাই লক্ষ্য করেছেন! এবং যে শক্তিতে দিগম্বরী ঐ বিষয়ে সফল হতে পেরেছেন তা হলো 'বিমোহিনী' শক্তি। মেঘনাদের উপর প্রমীলার প্রভাব বর্ণনপ্রসঙ্গেই কবির এই শক্তিদেবতার স্মরণ :—

দম্ভোলি-নিক্ষেপী
সহস্রাক্ষে যে হর্যক্ষ বিমুখে সংগ্রামে,
সে রক্ষেন্দ্রে, রাঘবেন্দ্র, রাখে পদতলে
বিমোহিনী, দিগম্বরী যথা দিগম্বরে!

আর প্রসঙ্গটিকে সহজে ছাড়তেও কবি নারাজ, কারণ আরো কিছু উপমার খেলা দেখানো যেতে পারে এই উপলক্ষে। তাই যে প্রমীলা-মেঘনাদ এইমাত্র হলো দিগম্বরী-দিগম্বর, এবং সম্পর্ক উভয়ক্ষেত্রেই হলো নারীর মোহিনী শক্তিতে পুরুষ অভিভূত, পরের চিত্রগুলিতে অনুরূপ ধারণার বশীভূত কবিকল্পনায় (১) প্রমীলা হলো 'নিগড়, যাহে বাঁধা মেঘনাদ বলী—মদ-কল কাল হস্তী!' (২) মেঘনাদ হলো 'কালাগ্নি', যা প্রমীলাই সর্বদা নির্বাপিত রাখতে সক্ষম প্রেম-আলাপনের বারিধারায়, (৩) মেঘনাদ হলো 'কাল-ফণী', আর প্রমীলা যমুনার জল, যার মধ্যে ঐ কাল-ফণী ডুবে থাকে বলে, সবাই সুখে বাস করতে পারে।

লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, সব ক'টি চিত্রেই কবি-কল্পনা ও মনন-ধারা মোটামুটি একই প্রকৃতির। পুরুষের উপর নারী আধিপত্য করে 'মোহিনী' শক্তিতে। এই মননের পরিমণ্ডলেই এবং এই মননেরই চিত্র-প্রমাণরূপে কবি-

মানসে জেগেছে 'দিগম্বরী-দিগম্বরের' প্রসঙ্গ। মাইকেলের দৃষ্টিতে 'কালী'ও 'মোহিনী', 'দুর্গা'ও 'মোহিনী' (যথা—'মোহন মূরতি ধরি, মোহি মোহিনীরে কহিলা হাসিয়া দেব' ২।৪২৫)।

কিন্তু তথাপি কিভাবে মাইকেলের 'উপমার অন্তরালে শক্তিপূজা ও শক্তি-প্রতিমার বিচিত্র ভাব ও রূপ, চিত্র ও তত্ত্ব প্রতিবিম্বিত হয়েছে', এবং তাঁর 'আলেখ্যমালা' কতো 'প্রাণস্পর্শী ও অনুভূতিগাঢ়'—এরই নিদর্শনস্বরূপ ডাঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যের ('উপমা মধুসূদনস্য') নির্বাচিত উদ্ধৃতির তালিকায় এই 'দিগম্বরী যথা দিগম্বরে'-ও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্থান পেয়েছে।

(খ) 'নৃ-মুণ্ড মালিনী'—কবি মধুসূদনের শক্তিদেবতা স্মরণের আর এক প্রকাণ্ড নিদর্শন! ভক্ত যেমন ইষ্টদেবতার নাম জপ করে, মধুসূদনও যেন তেমনি 'নামের নেশায়' মাতাল হয়ে তাঁর মেঘনাদবধে এই দেবতার নামটি দশবার জপ করবার সুযোগ নিয়েছেন (—যদিও নিন্দুকে হয়তো বলবে, ওটা 'নামের নেশায়' নয়, শব্দের নেশায়)! যাই হোক, জপের ঘটা কিন্তু দেখবার মতো। যে 'নৃ-মুণ্ড-মালিনী' নামে সবারই মনে জাগে মুণ্ডমালাবিভূষিতা আদ্যাশক্তি মহাকালীর দেবী-প্রতিমা, মাইকেল সেই নামটি আদর করে দিয়েছেন প্রমীলার এক চেড়ীকে। 'আদর করে' কথাটি একশোবার প্রযোজ্য, কারণ, কবির মৌলিক সৃষ্টি—তাঁর উদ্ভাবনী শক্তির অন্যতম নিদর্শন এই নৃ-মুণ্ড-মালিনী চরিত্রটি, এবং তাকে নিয়ে কবি-কল্পনার বিভোরতাই প্রমাণ করে ঐ 'আদর'। শুধু নামই নয়, কবি খুব স্পষ্ট করেই এই প্রমীলা-সখীটির সঙ্গে ঐ মুণ্ডমালিনী শক্তিদেবীর ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা করতে চেয়েছেন। বলেছেন—

> নৃ-মুণ্ড-মালিনী দূতী, নৃ-মুণ্ড-মালিনী
> আকৃতি, (৩।২৪৮)

আরও বলেছেন,—

> নৃ-মুণ্ড মালিনী, যথা নৃ-মুণ্ড মালিনী,
> রণপ্রিয়া। (৩।৪৬৯)

সুতরাং কবির ঐ দেবী-চিন্তা এই এক চেড়ীর মধ্যেই কী সশ্রদ্ধ প্রকাশের মহিমা প্রাপ্ত হয়েছে, তা ভেবে দেখবার মতো।

কিন্তু 'এহো বাহ্য'। ঐ যে চেড়ী-চরিত্র, যাকে অবলম্বন ক'রে কবি-কল্পলোকে শক্তি-দেবতার রূপ ও ভাবের আনাগোনা ঘটেছে বলে হয়তো মাইকেল-ভক্তগণ পুলকিত হতে পারেন, তাকে নিয়ে ঐ কল্পলোকেরই কত রঙ্গ!

নামটি হয়তো ভয়াবহ, একবার একটু বলাও হলো, 'দড়ে রড়ে জড় সবে হয়ে স্থানে স্থানে',—কিন্তু এসব বুঝি গৌণ ; কবি খুব ঘটা করে বলতে চান, তার রূপ ও ভঙ্গিমায় অব্যর্থ মোহিনীর বিচ্ছুরণের কথা। 'কামের পতাকা' সদৃশ মণিময় বেণী পিঠে তুলিয়ে—

চলে নিতম্বিনী
জরজরি সর্বজনে কটাক্ষের শরে
তীক্ষ্ণতর, (৩।২৬০-৬২)

নবম সর্গেও শেষবারের মতো নৃ-মুণ্ড-মালিনী-চিন্তায় কবির আক্ষেপ,—

কোথা সে কটাক্ষশর, কামের সমরে
সর্বভেদী ?

শক্তি-দেবতার নাম জপের কী অপূর্ব ফলশ্রুতি ! শাক্ত প্রতিমার রূপ ও ভাবের এমন অদ্ভুত অনুধ্যান একমাত্র মাইকেলের মতো অসংযত যথেচ্ছাচারী কবি-কল্পনাতেই সম্ভবপর ! অথচ এতৎসত্ত্বেও এই কবির উপমাদি অলংকরণের মধ্যে শাক্ত চিত্রের প্রসঙ্গমাত্রেই তাঁর শাক্তভাবের প্রতি শ্রদ্ধা-মমতা বা দরদী-মরমী অনুভূতির প্রগাঢ়তায় অনেকেই মুগ্ধ হন।

(গ) এই দৃষ্টান্তটি অধিকতর উচ্চধাপের। এখানেও ঐ একই শক্তি দেবতা-মূর্তির অনুধ্যান। সেই মহাদেবের বুকে দাঁড়িয়ে দানব-দলনী কালী-মূর্তি। অর্থাৎ শক্তি-ব্যূহের কেন্দ্রীয় দেবতা। বর্ণনার ভাষার সৌন্দর্যে ও লালিত্যে মন কেড়ে নেয়। 'দানব-দলনী-পদ্ম-পদ-যুগ' বলার সঙ্গে সঙ্গে যেমন রচিত হয় মায়ের পাদপদ্মের স্মৃতি-জনিত এক গম্ভীর স্বর্গীয় ভাবের পরিমণ্ডল, তেমনি যে-কবির লেখনীতে এমন রূপরেখা অঙ্কিত হয় তাঁর ভক্তি-সুন্দর মনোগঠনেও মুগ্ধ হতে হয় বৈ কি। কিন্তু ঐ সুযোজিত ধ্বনি-সুন্দর পদটি অথবা পরবর্তী 'বিরূপাক্ষ' শব্দটি কী সূত্রে কী ভঙ্গিতে কী উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে, এই দিকে দৃষ্টি দেওয়ামাত্র চমকিয়ে উঠতে হয় ! চুরমার হয়ে যায় ঐ ভাবের পরিমণ্ডল, দিশেহারা হতে হয় কবির মনোগঠনের কুশ্রীতায় ! যাঁরা উপমায় মধুসূদনের কবিমানস উদ্ধারে ব্রতী ও সেই কবিমানসে শক্তি-প্রতিমার রূপ ও রহস্যের প্রতি একান্ত দরদী-মরমী অনুভূতির আনা-গোনাই আবিষ্কার করেছেন, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি যে কতো বিভ্রান্তিকর, এই

প্রসঙ্গে তা আর একবার মনে জাগে। উপমাটির শিল্পদেহ-রচনায় কবির যত্ন অশেষ, কল্পনাশক্তির পরিচয়ও Titanic!

হেষিল অশ্ব মগন হরষে,
দানব-দলনী-পদ্ম-পদ-যুগ ধরি
বক্ষে, বিরূপাক্ষ সুখে নাদেন যেমতি!

প্রমীলার চেড়ীরা অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করায় অশ্বগণ আনন্দে হ্রেষাধ্বনি করলো। এই চিত্রেরই উপমা-চিত্র ঐভাবে অঙ্কিত করা কখনই সামান্য কল্পনা-শক্তির কাজ নয়। কিন্তু অসামান্য শিল্প-শক্তি-প্রয়োগ কবি কী করলেন? দানব-দলনী-বিরূপাক্ষ সমাবেশের, বিশেষত দেবীর পাদ-পদ্ম বক্ষে ধারণ-চিত্রের ট্রাডিশনাল সংবেদন অগ্রাহ্য করে, শুধুই এক মাথাওয়ালা কারিগরের মতো কল্পনার অদ্ভুত কারিগরি দেখালেন। মাইকেলের হাতে প'ড়ে দেবাদিদেব মহাদেবের কী দুর্দশা ঘটলো একবার চিন্তা করবার মতো। তিনি তো এখানে হলেন চেড়ীর (যে-কোন চেড়ী) ঘোড়ার (যে-কোনো ঘোড়া) উপমাস্থল! আর ঘোড়ায়-চড়া চেড়ীর দুইপাশে ঝোলানো দোলানো পা'য়ের শোভায় কবিমন এমনই দুলে উঠেছে যে তিনি দেবী আদ্যাশক্তির পাদ-পদ্মের উপমা এনে তবে তৃপ্ত হয়েছেন। সুতরাং দেবীও হলেন চেড়ীর উপমাস্থল! অতঃপর 'নাদ'। ঘোড়ার নাদ আর মহাদেবের নাদ হোল সমতুল! (অবশ্যই by clair-audience বা অপার্থিব শ্রুতিশক্তির বলে!) কিন্তু দানব-দলনীকে বুকে নিয়ে মহাদেব যে 'নাদে' মত্ত হয়ে উঠেছিলেন (যে বিষয়ে মনে হয় যেন মাইকেলের তথ্যগত কোনো দুর্বলতাই নেই) এমন তো কখনও শোনা যায় নি। তবে কি কবি শবরূপে আচ্ছন্ন মহাদেবের নাসাগর্জনের কথা বলতে চেয়েছেন! যাই হোক, ঘোড়ার ভাগ্যটা এখানে বেশ ঈর্ষার বস্তু হয়েছে বলতে হবে! (এখানে কবি-মানসের অন্দরমহলের কথা হলো, অমন যে-কোন সুন্দরীর পাদ-পদ্ম বক্ষে ধারণ করতে পেলে তিনি হর্ষ-মগ্ন-চিত্তে সুখে নাদ ছাড়তে রাজী ছিলেন!) উপমার যথেচ্ছাচার আর কাকে বলে! একমাত্র সুরা-প্রভাবেই এমনটা হতে পারে! তাই ক্ষণেকের জন্যে মনে হয়, "worthless issue of drunkenness and stupidity"—বিদ্যাসাগরের এই অসহিষ্ণু মন্তব্য উপহাসের বস্তু হলেও, হয়তো নিতান্ত অকারণে তাঁর মুখ থেকে বেরোয় নি।

(ঘ) "সমর-রঙ্গে হরপ্রিয়া যথা কালী"! (৮।২৫০)

মাইকেলের 'যথা'-ব্যাধির আর এক বিকারের ফল। যেখানে সেখানে একটা 'যথা' যোগ করে পণ্ডিতী ফলানোর যে ব্যাধি, মাইকেল সেই ব্যাধি-গ্রস্ত। যে-কবির চরিত্রে নেই সংযম, নেই সংগতি-সামঞ্জস্য বা ঔচিত্য রক্ষার দায়িত্ববোধ, তাঁর কি পদে পদে উপমা এনে কালিদাসের মতো উপমা-র কবি সাজতে যাওয়া চলে?

নরকের বর্ণনা চলেছে। 'উন্মত্ততা'-রোগের বর্ণনায় এলো,—"কভু বা উলঙ্গ" —আর অমনি একটা উপমা ঝেড়ে দিলেন কবি, "সমর-রঙ্গে হরপ্রিয়া যথা কালী!" 'উন্মত্ততা'কে নিয়ে কবির কল্পনাই বুঝি উন্মাদ হয়ে উঠলো। এলো উন্মত্ততা-রোগ-মূর্তিটির উলঙ্গ-দশা কবির কল্পনায়, আর অমনি সেই ঝোঁকে যে উলঙ্গ ছবিই তাঁর মাথায় ঢুকলো, তাই দিয়ে কবি উপমার ডালি সাজিয়ে চলে গেলেন, ফিরেও তাকালেন না,—হিন্দুর ধ্যান-কল্পনায় দেবী আদ্যাশক্তির যে মূর্তি সাধন-ভজনের শুচি-শুভ্র-পরিমণ্ডলে চিরপূজিত, দশমহাবিদ্যার সেই কেন্দ্রীয় দেবতা কালীর উপমানটি এখানে কেমন মানালো দেখবার জন্য! এতৎসত্ত্বেও কিন্তু শব্দযোজনা ও বাণীমূর্তিরচনায় মাইকেলের নিত্যসচেতনতায় মোহিত-লালের মতো অনেকেরই অখণ্ড বিশ্বাস। যাঁরা কবির "The words come unsought, floating in the stream of Inspiration", অথবা "The thoughts and images bring out words with themselves" এই ধরণের ঘোষণার নিত্য-সার্থকতায় বিশ্বাস রেখেই মাইকেলের কাব্যালংকার থেকে কবিমানস উদ্ধারে ব্রতী হয়েছেন, তাঁরা দেখুন, ঐ নরকের উন্মত্ততা-রোগের উলঙ্গ মূর্তি কবি-মনে যে "হরপ্রিয়া কালীর" উলঙ্গ মূর্তির সাদৃশ্য জাগিয়েছে, তাতে কী কবিমানস প্রতিফলিত হয়েছে! এই কালী মূর্তির অঙ্কনে শাক্ত-পরিবারের সন্তান কবি মধুসূদনের শক্তিপূজা-সংক্রান্ত পরিবেশ ও শাক্ত-প্রতিমার প্রতি কী দরদী-মরমী সশ্রদ্ধ অনুভূতির জীবন্ত প্রকাশ ঘটেছে (তুঃ ডাঃ ভট্টাচার্যের 'উপমা মধুসূদনস্য')! উপমার ঔচিত্য চুলোয় যাক, এখানে আর একবার মনে হয় না কি পূর্বোক্ত বিদ্যাসাগরী মন্তব্যের কথা? বস্তুত কবির বৈষ্ণবতার আলোচনায় যেমন একস্থানে বলতে হয়েছিলো, তেমনি এখানেও বলা চলে, মাইকেল এই শেষোক্ত দুটি উপমায় শাক্ত-মাহাত্ম্যের আদ্যশ্রাদ্ধ করেছেন!

[৪] কবিমানসের প্রকৃত স্বরূপ

একটি বিশেষ কথা। এই যে মাইকেলের বৈষ্ণবতা বা শাক্ত অনুরাগ নিয়ে এমন অপ্রিয় সমালোচনা করতে হলো, এর জন্য দায়ী কিন্তু কবি ন'ন,—কবির অত্যুৎসাহী স্তাবকসমাজ। কবি মাইকেল চিরকালই খেয়ালী। খেয়ালী তাঁর কল্পনা, খেয়ালী তাঁর শিল্প-কলা, তাঁর কাব্যসৃষ্টি। ঐ সৃষ্টির আনন্দই তাঁর কবি-জীবনের লক্ষ্য। তাঁর হাতে যা কিছু আমরা পেয়েছি, তা ঐ আনন্দলীলার সূত্রে, এবং যা পেয়েছি তারও তুলনা নেই। কিন্তু যিনি বন্ধুর নিকট আত্ম-পরিচয়ে অকুণ্ঠচিত্তে ঘোষণা করেছেন,— "—as a jolly Christian youth, I don't care a pin's head for Hinduism," তাঁর বৈষ্ণবতা বা শাক্ত অনুরাগের গভীরতা প্রমাণের বিড়ম্বনা কেন? অনেকে কবির ঐ ঘোষণাটির পরবর্তী অংশেই যে আছে—'I love the grand mythology of our ancestors' এতেই বিগলিত হয়ে কবিরুচির পরিচয়মূলক ঐ দুই আপাত-বিরোধী উপাদানের সাহায্যে মাইকেলের কবিমানস সম্পর্কে গভীর দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় রহস্যাবেশ আবিষ্কার করেছেন এবং তারই অনুকূলে সুবিধামত কাব্যাংশ বা চরিত্রাংশ বেছে নিয়ে তাঁদের গবেষণার আসরে প্রচুর জল ঘুলিয়েছেন। এতে আমাদের 'গবেষণা'-সাহিত্যে হয়তো অনেক পাণ্ডিত্যের কসরৎ পুঁজি হয়েছে, কিন্তু কবিমানসের স্বরূপ অথবা কাব্যের স্বরূপ-প্রকৃতি তার ফলে, আরো আচ্ছন্নই থেকে গেছে। আসলে কিন্তু কবি তাঁর মনোগঠন সম্পর্কে কোনো হেঁয়ালীই রাখতে চান নি, যা বলেছেন, খুব স্পষ্ট করেই বলেছেন। তিনি যেই বললেন, 'I love the grand mythology of our ancestors', অমনি আমরা তাঁর পুরাণ-প্রীতি শুধু নয়, তাঁর ভারতীয় ঐতিহ্যপ্রীতি, তাঁর "খাঁটি হিন্দু-সংস্কার", প্রাচ্য-নিষ্ঠা, তাঁর "প্রতিভার অমায়িক দেশীয় ও জাতীয় মূর্তি" ইত্যাদি সব কিছুরই ইঙ্গিত নিলাম ঐ উক্তি থেকে, আর সেই সবের অকাট্য প্রমাণও সংগ্রহ করতে থাকলাম তাঁর কাব্য থেকে! কবির ঐ love, for mythology যে কী জাতীয় love এবং কেন তাঁর ঐ love তার পরিচয় কবি নিজেই দিচ্ছেন ঠিক পরেই, কিন্তু আমাদের তা শুনবার ধৈর্য নেই। স্পষ্টবাদী কবি কারণ দেখিয়ে বলেছেন, 'It is full of poetry'. অর্থাৎ mythology-এর প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি নয়, সেটি যে poetry অর্থাৎ কাব্যসৃষ্টির উপযোগী প্রচুর উপাদান-উপকরণে ভরা, এইজন্যই কবির হিন্দু-পুরাণের প্রতি এতো টান। আরো বিস্তারিত ক'রে কবি বলেছেন,'A

fellow with an inventive head can manufacture the most beautiful things out of it,' এর প্রত্যেকটি কথা দামী। আমরা mythology-কে ধরেই টানাটানি শুরু করেছি; কবি কিন্তু শুধুই ওর থেকে (out of it) কিছু নির্মাণ করার (manufacture) জন্যই ওকে ভালোবেসেছেন। এ ভালোবাসা সকলের সাজে না, খালি যার আছে উদ্ভাবনী শক্তি (inventive head), তারই সাজে। আত্মসচেতন কবি খুব ভালোই জানেন তাঁর ঐ শক্তির কথা। জানেন বলেই অমন একটা আইডিয়া, ও তারই প্রেরণায় ঐ পুরাণ-প্রীতির তাগিদ এসেছে। কী এই কবির ambition, কী বা তাঁর motto, অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে পাওয়া যায় কবির নিজেরই সুস্পষ্ট উক্তিতে :—"It is my ambition to engraft the exquisite graces of the Greek mythology on our own; in the present poem, I mean to give free scope to my *inventing Powers* (such as they are) ·······" সুতরাং ambition হলো, inventing powers-এর সাহায্যে 'engrafting', অর্থাৎ বিজাতীয় বস্তুর জোড়কলম লাগানো পদ্ধতির প্রয়োগ, আর তাই থেকে একটা কিছু গড়ে তোলা (manufacture)। আর motto? "The Muses before everything is my motto!" সকলের উপরে কাব্য। অর্থাৎ ধর্ম নয়, সংস্কার নয়, নীতি নয়, আদর্শ নয়,—কাব্য ছাড়া আর কিছুরই প্রাধান্য স্বীকার্য নয়। বলা বাহুল্য, এই হলো মনে-প্রাণে কবিদের একশ্রেণীর আদর্শ। তবে আমাদের কবির আরো একটু কথা হলো—'There never was a fellow more madly after the Muses than your poor friend!' বড়ই রূঢ় সত্য এই আত্মপরিচয়, এই madliness-এর স্বীকৃতি! এরই আলোকে নিতে হবে তাঁর কাব্যের un-Hindu character সম্পর্কে বন্ধুকে অভয়দানের আশ্বাস। কাব্যের 'un-Hindu' চরিত্রে কবি নিজে কিছুমাত্র বিচলিত নন, তবে অপরে, বিশেষত তাঁর বন্ধুবর্গ যদি বিচলিত হন, সেটি তাঁর অবাঞ্ছিত। তাই আশ্বাস দেওয়া হয়েছে,—'Do not let this startle you, you shan't have to complain again of the un-Hindu character of the poem'. কিন্তু Muses-এর জন্য madliness এর দিক থেকে কোথাও কোন জুড়ি নেই বলে যে-কবি আত্মপ্রসাদে বিভোর, তাঁর পক্ষে ঐ Hindu-un-Hindu বিচার বজায় রাখা যদি সম্ভব না হয়, তবে সেটাকে কোন সমালোচনার আওতায় না আনাই সংগত।

এই যেখানে কবিমানসের মৌল প্রকৃতির আদি পরিচয়, সেখানে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে নিজেদের মন-গড়া শাক্ত বৈষ্ণব প্রভৃতি নানা আদর্শের প্রতি কবির নিষ্ঠা, অথবা শাক্ত-পরিবারের সন্তানরূপে কবির নিজস্ব মৌলিক পরিচয় খুঁজতে যাওয়া বৃথা। এতে ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তি অপরিহার্য। হিন্দু-পুরাণের ও পূজা-উৎসবময় বাংলার জীবনের বহু উল্লেখ ও বিচ্ছিন্ন বহু খণ্ড-চিত্র মাইকেলের কাব্যে স্থান পাওয়া এক জিনিষ, আর মাইকেলের কবিমানসের খাঁটি হিন্দুত্ব, বৈষ্ণবতা বা শাক্তত্ব, সম্পূর্ণ পৃথক জিনিষ। কাব্যের রকমারি আসর (সিনেমার 'সেট্') সাজাবার জন্যে যখন যেটিকে হাতের কাছে পেয়েছেন, তাই দিয়ে কবি সৌখীন সজ্জা-শিল্পীর মতো পুরাণ থেকে বা সমাজ-জীবন থেকে অজস্র খণ্ডচিত্র দিয়ে সাজিয়েছেন সেই আসরগুলি। তাদের কোনো সামগ্রিক রূপ অথবা প্রয়োগগত সৌষ্ঠব-সংগতি খুঁজতে গেলেই বিপদ। অমনি ধরা পড়বে তাদের অন্তরালবর্তী কবি-মানসের শিথিলতা, সুতরাং তাদের কৃত্রিমতা। ধরা পড়বে, এই কাব্যের সজ্জা-বিধানে বেশীর ভাগ ফুলই 'অর্কিডের ফুল'*। তাই শক্তি-দেবতা, বৈষ্ণব-দেবতা ছাড়া অন্য দেব-দেবী-চরিত্রের আলেখ্যও নানা বিকার-বিকৃতিতে ভরা।

[৫] মাইকেলের হাতে লক্ষ্মী-চরিত্র

'কাব্যালংকার ও কবিমানস' গ্রন্থে মেঘনাদবধ কাব্যের লক্ষ্মী-চরিত্রটি সম্পর্কে কবির খাঁটি দেশীয় মনোগঠন একটি উপমার সাহায্যে বোঝাতে গিয়ে যে কী বিপদ ডেকে আনা হয়েছে, গ্রন্থকার তা বোধহয় ভেবে দেখেন নি।

ফিরায়ে বদন, ইন্দু-বদনা ইন্দিরা
বসেন বিষাদে দেবী, বসেন যেমতি—
বিজয়া-দশমী যবে বিরহের সাথে
প্রভাতয়ে গৌড়গৃহে—উমা চন্দ্রাননা
করতলে বিন্যাসিয়া কপোল, কমলা
তেজস্বিনী,... (১।৫০২-৭)

এই উপমা-চিত্রের মূলধন হাতে নিয়ে উক্ত গ্রন্থকার প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে কবির 'সহজ ও অমায়িক সত্তা'য় এইভাবে তাঁর লেখনীমুখে লক্ষ্মী-চরিত্রের খাঁটি রূপ—'মৌলিক রূপ'টাই ফুটে উঠতে চায়। প্রস্তাবটির

---

* প্রমথ চৌধুরী। সবুজপত্রের মুখপত্র, বৈশাখ, ১৩২১।

প্রতিষ্ঠায় বলেছেন,—"তাই লক্ষ্মী-চরিত্র আপাতদৃষ্টিতে কিছুটা গ্রীকভাবাপন্ন মনে হলেও লংকার সমূহ বিপদে তাঁর বিষাদ-ম্লান মূর্তিখানি কবির লেখনীমুখে গৌড়-গৃহের বিজয়া-প্রভাতের চিন্তাকুলা উমা-চরিত্রের সহোদরারূপে ফুটে উঠেছে।" (পৃষ্ঠাসংখ্যা—১৪৬)।

প্রথমত, 'উমা-চরিত্রের সহোদরা' হতে পারায় লক্ষ্মী-চরিত্রের কী 'মৌলিকরূপ' ফুটতে পারে, তা আমাদের বোধগম্য নয়। দ্বিতীয়ত, আলোচ্য মুহূর্তে লক্ষ্মীর বিষাদ ও বিজয়া-প্রভাতের উমার বিষাদ, এ দুটি সম্পূর্ণ ভিন্নগোত্রীয়। লক্ষ্মীর বিষাদ লংকার সমূহ বিপদে (যদি অবশ্য একথা সত্য হয়!), উমার বিষাদ কেবল সাময়িক বিচ্ছেদ-চেতনায়,—সম্বৎসরব্যতীতে পুনরাগমনের আশ্বাস-সান্ত্বনায় সে বিষাদ বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত। উভয় বিষাদের এই প্রকৃতিগত বৈসাদৃশ্যে উপমার অনৌচিত্য প্রকট। মিল যদি কিছু থাকে, তো শুধুই চিত্রগত বা আকৃতিগত। অতঃপর যখন দেখা যাবে লক্ষ্মীর এই বিষাদ মাইকেল-অঙ্কিত গোটা ভূমিকাটির মতোই ভণ্ডামি-লাঞ্ছিত, তখন 'সহোদরা' তো দূরের কথা, বৈমাত্রেয়া-রূপেও চিন্তা করা সম্ভব হবে না।

'বসেন বিষাদে দেবী' ব'লে যাঁর চিত্রের পাশাপাশি কবি একখানি উমা-চিত্র সাজিয়ে এখানে আসর জমিয়েছেন, সেই দেবীটি যে এই কাব্যে ঘুরে ফিরে প্রায়ই গিয়ে বসেন বিষাদে, মেঘনাদবধের ধারাবাহিক পাঠে অভ্যস্ত পাঠকমাত্রেরই চোখে এটি ধরা পড়বে; আরো পড়বে এই জন্যে যে, এই লক্ষ্মীদেবীর 'বিষাদ' ও 'বিষাদে নিঃশ্বাস ছাড়া'র ঘনঘটার সঙ্গে কার্যকলাপের উৎকট অসংগতি যেমন চরিত্রটিকে তেমনি তার মূলীভূত কবি-কল্পনাকে কিম্ভূৎকিমাকার বলেই প্রতিপন্ন করে।

কালিদাস যে অপূর্ব সাংকেতিকতায় রক্ষঃকুলরাজলক্ষ্মীর ইংগিত দিয়ে গেলেন,—"বিভীষণঃ স্নেহাদ্রাক্ষসলক্ষ্মোব বুদ্ধিমাবিশ্যচোদিতঃ" (রঘু—১২।৬৮), এ যুগের কবির তাতে মন উঠলো না। তিনি Regular Iliad রচনার স্বপ্নে বিভোর। তাই 'রাক্ষসলক্ষ্মী'র ঐ ভাব-সত্তা ভাঙিয়ে যোগাড় করলেন 'রক্ষঃকুলরাজলক্ষ্মী'র রূপ-সত্তা। সূক্ষ্ম ভাব-লোকে অবস্থান কবি মাইকেলের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। তিনি স্থূল বস্তুর কারবারী। তাই রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মীকে তিনি সাজিয়েগুজিয়ে নিয়ে আসেন যুদ্ধ-শিবিরে, বসিয়ে দেন তাঁকে একেবারে নিদ্রিত-বিভীষণের শিয়রে স্বপ্ন দেওয়ার জন্য। স্বপ্নাদেশ ও তার টীকা-ব্যাখ্যা শেষ করেও দেখা যায় তাঁর অন্তর্ধানের কোনো তাড়া নেই; নিদ্রাভঙ্গে

বিভীষণ দ্বারপ্রান্তে দেখবেন তাঁর রূপমাধুরী, তারিফ করবেন তাঁর গ্রীবাদেশ আচ্ছাদনকারী কাদম্বিনীরূপী কবরী, কবরী-সংলগ্ন রত্নরাজি, যার কাছে বিজলীর ছটাও তুচ্ছ, তার পর তিনি 'আচম্বিতে অদৃশ্য' হবেন। হলেনও তাই। যাই হোক, মাইকেলের এই বিভীষণ-রাক্ষসলক্ষ্মী-সংবাদ-এর প্রেরণামূলে লক্ষ্মী-প্রভাবের ধারণাটি যে কালিদাসই যুগিয়েছেন এমন মনে করার কারণ আছে। অথচ রূপায়ণে কতোই পার্থক্য; এবং লক্ষ্মীকে নিয়ে কবি-কল্পনা বহুবিধ যথেচ্ছাচারে মত্ত হবে বলেই ঐ পার্থক্য। আবার মাইকেল যখন সরমার উদ্দেশে একাধিকবার বলেন "রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী রক্ষোবধূ-বেশে" (৪।৭১, ৪।৫৮৫), তখন সেই কালিদাসীয় রাক্ষস-লক্ষ্মী-ভাবনারই একটা দূরবর্তী প্রতিধ্বনি শোনা যায়। কিন্তু ঐ একই ভাষায় কবি বর্ণিত করেন স্বয়ং লক্ষ্মীকেই,—"যথায় কমলাসনে বসেন কমলা—/ রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী—রক্ষোবধূ-বেশে" (৬।২৪৬-৪৭)। সুতরাং 'রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী'র abstract-রূপ, concrete রূপ, স্বপ্ন-দেওয়া রূপ, রক্ষোবধূ-রূপ,—এমনভাবে কবির কল্পলোকে আনাগোনা চালিয়েছে যে দেবীটির বহুরূপী-ভূমিকা আমাদের মাথা খারাপ করে দেয়।

কিন্তু এহো বাহ্য! লক্ষ্মীদেবী তাঁর পরম ভক্ত রাবণের ভক্তিতে বাঁধা, অথচ সেই রাবণেরই বিনাশে তিনিই প্রথম উদ্যোগী। রাক্ষসকুলের সমূহ বিপদে তিনি নাকি বিষণ্ণ, কিন্তু আসলে বিপদ আর কোথায়। এ তো কেবল রাজাবদলের ব্যাপার। মদে মত্ত রাবণ পাপে ভরিয়ে ফেলেছে লঙ্কাপুরী, সুতরাং তাকে বিনষ্ট করে রক্ষঃকুলনাথ-পদে যোগ্যতর একজনকে অভিষিক্ত করতে হবে। সে কাজ তো লক্ষ্মী নিজেই করলেন,—"রক্ষকুলনাথপদে আমি তোরে / করি অভিষেক আজি বিধির বিধানে, / যশস্বি!" এবং তাঁরই কণ্ঠে শোনা গেল, "রে ভাবী কর্বুর-রাজ!" বিভীষণের প্রতি এই দরদী সম্ভাষণ। সুতরাং রক্ষঃকুলের ভিত্তি যখন অটুট বা দৃঢ়তর হয়ে রইলো, তখন রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মীর পদটাই বা তাঁর যাবে কেন? ভাবী কর্বুররাজের প্রতি তিনি নিজেই যখন এতো প্রসন্ন, আর পরম ধার্মিক বিভীষণের তরফেও যখন ভক্তি-বিনম্র পূজার্চনায় কোনো ত্রুটির আশংকা নেই, তখন লক্ষ্মীদেবীর তো প্রকৃত বিষাদের কোনো কারণই থাকতে পারে না।

সে থাকুক বা না থাকুক, মাইকেলের এই দেবী-চরিত্রটির বিশেষ দরকার, এবং বিশেষ দরকার তাঁর বিষাদম্লান মূর্তিখানির, যদিও ঐ বিষাদ ও ঐ মূর্তির

সঙ্গে দেবীর কার্যকলাপের সঙ্গতি-সামঞ্জস্য বজায় করার কোনো দায়িত্বই কবির নেই!

রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মীর ভূমিকাটি দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে বেশ গণ্যমান্য। সমগ্র নবম সর্গের যে আয়তন (৪৪৩ লাইন) এই একটি দেবী-ভূমিকা প্রায় সেই একই আয়তন (৪২৯) জুড়ে আছে। প্রথম সর্গে ১৯৩, দ্বিতীয়ে ৭৭, ষষ্ঠে ২৮+৬৩ =৯১, ও সপ্তমে ৬৮ লাইন এই লক্ষ্মী-বৃত্তান্তে ব্যাপৃত। কাজও এঁর অনেক। যে কুলের কুললক্ষ্মী ইনি, তার বিনাশের উদ্যোগপর্বে সর্বপ্রথম এঁকেই উদ্যোগী হতে দেখা যায়। "যাই আমি যথা/ইন্দ্রজিৎ, আনি তারে স্বর্ণলঙ্কাধামে।" কে যে তাঁকে যেতে বলেছে, তা আমরা জানি না। চক্ষুলজ্জার খাতিরেই বোধহয় মুখে একটা বুলি ধরলেন, 'প্রাক্তনের ফল ত্বরা ফলিবে এ পুরে'। সুতরাং তিনি হলেন প্রাক্তনের এজেন্ট, অথবা বুঝি দত্ত-কবির খাস এজেন্ট! ইন্দ্রজিতকে আনা যে বধের জন্য, তা বলাই বাহুল্য। তবু লক্ষ্মীদেবী গেলেন তার কাছে ধাত্রীমাতার ছদ্মবেশে। ভূমিকা জহ্লাদের, কিন্তু পেলেন মাতৃ-সম্বোধন ও সভক্তি প্রণাম। শিরশ্চুম্বনে আশীর্বাদের অভিনয় করলেন নিখুঁত।

ইন্দ্রজিতকে লঙ্কায় আনা হলো, এইবার দেবী ছুটলেন স্বর্গে ইন্দ্রের কাছে। রাত্রি প্রভাতেই যে মেঘনাদ যুদ্ধে নামবে, এ বার্তাটি ইন্দ্রের অবিদিত থাকতো যদি এই রক্ষঃকুলরাজলক্ষ্মী রক্ষঃকুলের ধ্বংসের জন্য এই দ্বিতীয় উদ্যোগটি না করতেন। কুল-লক্ষ্মীর মতো ভূমিকাই বটে! দেবরাজের মধ্যে প্রয়োজনীয় উত্তেজনা-আতঙ্কাদি বেশ নিপুণভাবেই জাগানো হ'লো। দেবরাজকে তখনই কৈলাস যাত্রায় তৎপর হতে দেখে লক্ষ্মীদেবী খুশী হলেন। ইতিমধ্যে অবশ্য তাঁর mission এর ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে তাঁর ও রাবণের মধ্যে ইষ্টদেবতা ও ভক্তের বাঁধন এবং বিধিবাদ নিয়ে বেশ খানিক জাঁকজমক ফলানো হয়েছে। তারই ফাঁকে রাবণের ভক্ত-সত্তার মহিমা ও পূজার বিপুল আয়োজন-সমারোহের কথার মধ্যে হঠাৎ একটা 'হায়' দিয়ে এই দেবী যখন বলেন, 'এতদিনে বাম তার প্রতি বিধি', তখন আমাদের মন্তব্য করতে ইচ্ছা করে, বিধি বাম হোন বা না হোন, তুমি তো, ঠাকরুণ, আগেই বাম হয়ে ছটফট করছো, দেখছি; বলি, তার কারণটা কি? বস্তুত এই স্ত্রীদেবতাটিকে দত্ত-কবি এমন একটি role দিয়েছেন, যাতে diplomacy চলে পুরোদস্তুর, আবার, 'বিধিবাদ', 'প্রাক্তন-বাদ' বা 'নিয়তিবাদ'-এর আবৃত্তি পাঠককে শোনানো যায় যত খুশী। যাই

হোক, স্বর্গীয় mission তাঁর সফল হয়েছে দেখে, লঙ্কার সমূহ বিপদে বিষাদ-ভারাক্রান্ত বলে যে দেবীকে এই কাব্যে বহুবার চিত্রিত করার প্রয়াস, সেই রক্ষঃকুলরাজলক্ষ্মী কৈলাস-গমনোদ্যত ইন্দ্রের মারফত 'বিজ্ঞ জটাধরে'র কাছে একটু আহ্লাদী-পনা না জানিয়ে থাকতে পারলেন না—'বড় ভাল বিরূপাক্ষ বাসেন লক্ষ্মীরে' ইত্যাদি।

অতঃপর এই দেবীর কাজ হলো 'ভাবী কর্বুররাজ' বিভীষণকে স্বপ্নে রক্ষকুলনাথ-পদে অভিষিক্ত করে সেই তাঁর স্বর্ণমন্দিরে কমলাসনে গিয়ে বসে থাকা—অপর diplomat দেবতা মায়াদেবীর প্রতীক্ষায়। 'রঙ্গিণী' যে এসেছেন কিছু রঙ্গের প্রস্তাব নিয়ে তা অনুমান করেই লক্ষ্মীর মুখে হাসি ফুটন্ত। লক্ষ্মীর তেজসংবরণের আর্জি মায়াদেবীর। পেশ মাত্রই মঞ্জুর। তবে 'বিষাদে নিঃশ্বাস' ছাড়ার কামাই নেই। এটি এ দেবীর যেন একটা ভঙ্গি দেখানোর টেকনিক, অথবা, বুঝি কবিরই এই টেকনিক, সম্ভবত অনুপ্রাসের টানে। তাই মুরলা-আলাপের মধ্যে একবার, ও মায়াদেবী-আলাপে দু'বার, এই একই "বিষাদে নিঃশ্বাস ছাড়ি" স্থান পেয়েছে—ইন্দিরার ভাষণভঙ্গির নিত্য বিশেষণের মতো। এ ছাড়া, নিঃশ্বাস-বর্জিত কেবল 'বিষাদে'র ঢঙ তো লেগেই আছে!

ইন্দিরা-মায়ার চক্রান্তে সৃষ্ট সুযোগ-সুবিধায় মেঘনাদবধ সম্পন্ন হলো। এলো সপ্তম সর্গ। রাবণের যুদ্ধোদ্যম চলেছে। কিন্তু রক্ষঃকুলরাজলক্ষ্মীর স্বস্তি নেই। তিনি আবার ছুটলেন দেবরাজের কাছে। প্রশ্ন জাগে, আমাদের 'grand mythology'-র প্রতি কবির শ্রদ্ধা-ভক্তির কথাটি তো এযুগে আবার নবোদ্যমে ঢক্কানিনাদে ঘোষিত হচ্ছে, তা এই যে লক্ষ্মীর মতো দেবী-চরিত্র, যিনি পুণ্ডরীকাক্ষ-বক্ষোনিবাসিনী এবং ইন্দ্রাদি দেবতাবর্গের মাতৃস্থানীয়া, তাঁকে একটা সামান্যা দূতীর মতো পদে পদে স্বর্গে মর্তে ছুটোছুটি করানো, এমন কি, লঙ্কার আনাচে কানাচে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ানোর মধ্যে কবির যে ঠিক কী জাতীয় পুরাণ-প্রীতির পরিচয় ফুটেছে, তা কি ঐ ঢক্কা-নিনাদ বিভোর ভক্তগণ একবারও ভেবে দেখেছেন? 'রত্নাকর-রত্নোত্তমা ইন্দিরা সুন্দরী'র এই স্বর্গ-মর্ত-দাপাদাপি ও আনুষঙ্গিক বৈজয়ন্তধামের জাঁকজমক যে আসলে ঐ 'অর্কিডের ফুলে' আসর সাজানোর নেশাতেই এসেছে, তা বলাই বাহুল্য। বস্তুত কবি ঐ নেশায় নিতান্ত বিভোর বলেই এই লক্ষ্মীর ভূমিকায় যে কোথায় কতো হীনতা, তুচ্ছতা ও কৃত্রিমতা বা ভণ্ডামির স্পর্শ ঘটছে, সে দিকে একটুও খেয়াল রাখেন নি। এই শেষ বারে তিনি স্বর্গে

ছুটেছেন কেবল ইন্দ্রকে একটু তাতিয়ে আসার উদ্দেশ্যে, যদিও দেখা যায়, এর কোনই প্রয়োজন ছিল না। বলতে চান, রাবণের বিনাশের জন্য ইন্দ্রের তরফে যেন কোনরকম শৈথিল্য না ঘটে। রক্ষঃকুলরাজলক্ষ্মীর উপযুক্ত আচরণই বটে! যখন দেখলেন, না, সবই ঠিক আছে, পরমভক্ত রাবণের বিনাশের আয়োজনে ইন্দ্রের কোনো ত্রুটি নেই, তখন দেবরাজকে আশীর্বাদ করে ফিরে এলেন,—ফিরে এলেন নিশ্চয়ই সুখী নিশ্চিন্ত মনে,—স্বীয় তদারকির তৎপরতায় এবং আত্মস্ত তাঁরই diplomacy'র সফলতায়—'সব ঠিক হ্যায়' গোছের আত্ম-প্রসাদে ভরপুর হয়ে,—কিন্তু কমলাসনে এসে বসবার সময় কেমন ভাড়া-করা মুখ নিয়ে বসলেন,—

পশি স্বমন্দিরে,
বিষাদে কমলাসনে বসিলা কমলা।—
আলো করি দশ দিশ রূপের কিরণে,
বিরসবদন, মরি, রক্ষঃকুলদুঃখে! (৭।৩২৫-২৮)

ইচ্ছা করলে কবি এখানেও আর একবার বিজয়া-প্রভাতের উমা-চিত্রের উপমান খাড়া করতে পারতেন। তবে আশা করি, এই বিশ্লেষণের পরে আর ঐ লক্ষ্মীর বিষাদের মুখোশ-পরা মূর্তিকে উমা-চরিত্রের সহোদরা-রূপে দেখাবার উৎসাহ থাকবে না।

[৬] মাইকেলের উপমা-শৈথিল্যের বিচার-বিশ্লেষণ

প্রসঙ্গ, পরিবেশ বা ভাবমণ্ডলের সঙ্গে সঙ্গতিহীন উপমাসৃষ্টি যেমন শিল্পের ত্রুটি-দুর্বলতার পরিচায়ক, তেমনি উপমার বিচারেও ঐ সব সঙ্গতি-নিরপেক্ষ যে দৃষ্টি, তা অবশ্যই ত্রুটিহীন নয়, আর সেই দৃষ্টিতে উপমার নক্সা-রচনা থেকেই কবিমানসের সংকেত উদ্ধার করতে গেলে সেটাও যে হবে প্রমাদপূর্ণ, তা বলা বাহুল্য। প্রায়ই দেখা যাবে, মাইকেল stamp-collecting hobby-বিশিষ্ট উৎসাহী তরুণের মতো কাঁটা-ছাঁটা ছবিতে ভরানো তাঁর চকমকে গ্ল্যাড্‌স্টোন ব্যাগ থেকে যে-কোনো একটা ছবি টেনে বার করছেন, আর খুশীমতো এঁটে দিচ্ছেন তাঁর বর্ণনার এখানে-ওখানে কেবল একটা ক্ষীণ অথবা ভাসা-ভাসা সাদৃশ্যের সূত্র ধরে। এই ছবি দিয়ে সাজাবার প্রবল নেশাতেই ভাবের

গভীরতা, উপমান-উপমেয়ের আঙ্গিকগত ও আবেদনগত মিল অথবা সঙ্গতি-সৌষ্ঠব, এসব প্রায়ই উপেক্ষিত হয়েছে। একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত :—

পশুকুলে নাশি তীক্ষ্ণ শরে
ঘৃতাক্ত করিয়া রক্ষঃ যতনে থুইল
চারি দিকে, যথা মহানবমীর দিনে,
শাক্ত ভক্ত-গৃহে, শক্তি, তব পীঠতলে ! (৯।৩৭৩-৭৬)

উপমানটি উৎসবমুখরতায় সর্বশ্রেষ্ঠরূপে চিহ্নিত এক আনন্দময় দিন ; সর্বাধিক বলিদানে মহানবমীতে দুর্গার সর্বাধিক তৃপ্তিসাধনের আয়োজনে ঐ আনন্দ ; আর উপমেয় প্রাচীন অন্ত্যেষ্টিকৃত্য ; সেখানকার পশুমেধের লক্ষ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন-তন্ত্রীয়, তার পরিমণ্ডলও অধিকতর ভিন্ন শ্রেণীর। ('কৃত্তিবাসী ঋণের বহর' অধ্যায়ের ১০ম পরিচ্ছেদে বিস্তৃততর আলোচনা পাওয়া যাবে)। সাধারণ পাঠক হয়তো কেবল মহানবমীর উল্লেখেই তুষ্ট রইলেন, কিন্তু উপমা-শিল্পের সূক্ষ্ম বিচারে এখানে ত্রুটি ধরা পড়বেই, এবং এই জাতীয় সংযোজনে কবির যে খেয়ালী মনের প্রকাশ, তাই দিয়ে পরিমাপ করতে হবে তাঁর শাক্ত ভাবের গভীরতা। এমন কি, তাঁর সুবিখ্যাত উপমালংকৃত উক্তি—

'বিসর্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে'

কেবল করুণরস-প্রবণ বাঙালী হৃদয়ের সহজ সংবেদনশীলতা ও বিজয়া প্রীতির জোরেই অভিনন্দিত, এবং সপ্ত দিবানিশি লঙ্কার বিষাদ-কান্নার প্লাবনে ঐ অভি-নন্দন চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে। কিন্তু নিখুঁত উপমা হিসাবে এটি অভিনন্দন যোগ্য নয়। কারণ স্বর্ণলঙ্কা ও তার মহিমান্বিত রক্ষোবংশের পক্ষে লঙ্কার পঙ্কজরবি মেঘনাদের মৃত্যু-জনিত বিসর্জন ও বিজয়া-দশমীর বিসর্জন কখনই তুল্যানুতুল্য নয়। বিজয়ায় একটা বিসর্জন আছে বটে, এবং আছে তজ্জনিত কাতরতাও, কিন্তু কী তার গোত্র-পরিচয় ? মৃত্যু-শোকের সগোত্র বলে তাকে চিন্তা করা যায় কি ? এক তো বিজয়ার বিসর্জন বৎসরান্তে পুনরাগমনের প্রত্যাশার সঙ্গে গাঁটছড়ায় আবদ্ধ ; তার উপর বিজয়া যে 'বিজয়া', এবং সেটাও যে একটা 'উৎসব', এবং পূজা শেষ হলেও বিজয়োৎসব শেষ হতে চায় না, প্রীতি-বিনিময়ের মাধুর্য দীর্ঘকাল তরঙ্গায়িত হতে থাকে, এ কথা কে না জানে ? 'সপ্ত দিবানিশি' অর্থাৎ অনন্ত ক্রন্দনের হেতুস্বরূপ মেঘনাদ-বিসর্জন কি উৎসব-মূলক প্রতিমা-বিসর্জনের সঙ্গে উপমিত হতে পারে ?

তবে মাইকেলের উপমা-শৈথিল্যের দৃষ্টান্ত যে এতো সূক্ষ্মবিচার-দৃষ্টিতেই অতি কষ্টে খুঁজে বার করতে হবে, তা নয়। কবি মাইকেল শক্তিমানও যতো, বেপরোয়া বেহিসাবী বা খেয়ালীও ততো বা ততোঽধিক। তাই উপমা তাঁর কাব্যে তিনি দেদার ছড়িয়েছেন, কিন্তু যথেষ্ট শিল্পসুন্দর সৃষ্টি সত্ত্বেও শৈথিল্যদুষ্ট উপমার আগাছায় তাঁর কাব্যক্ষেত্র যে ভরে গেল সেদিকে খেয়াল রাখেন নি। পূর্বালোচিত উপমাবলীতে ছাড়াও, নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তগুলিতে প্রকটিত কবি-স্বভাবের ঐ শৈথিল্যের পরিপ্রেক্ষিতে 'উপমা মধুসূদনস্য'-জাতীয় প্রশস্তিবাদের 'ভিত্তি অবশ্যই যাচাই হয়ে যাবে, ক্ষেত্রবিশেষে যাচাই হবে কবি-মানসের স্বরূপটাও, যে কবি-মানস কাব্যালংকারেই প্রতিফলিত দেখে অনেকে মুগ্ধ হয়েছেন।

(১) বাহিরিল বেগে
বারী হতে (বারিস্রোতঃ সম পরাক্রমে
দুর্বার) বারণযূথ। (১।৪২১-২৩)

'বারী', 'বারি' ও 'বারণে' যমক-অনুপ্রাস জমাতে গিয়েই কবির হাতে উপমাটির এই তুচ্ছতা। বারিস্রোতের অর্থ কী? পরাক্রম প্রকাশে এই উপমান নিরর্থক নয় কি?

(২) উঠিলা মুরলা সখী, বারুণী-আদেশে
জলতল ত্যজি, যথা উঠয়ে চটুলা
সফরী, দেখাতে ধনী রজঃ-কান্তি-ছটা-
-বিভ্রম বিভাবসুরে। (১।৪৮৩-৮৬)

চটুল ও খেয়ালী এই পরিকল্পনাটি আরো খেয়ালী মনে হয় যখন খানিক বাদেই আবার এই মুরলাকে সাড়ম্বরে উপমিত হতে দেখা যায় ময়ূরীর সঙ্গে;—

(৩) উঠিলা পবন-পথে মুরলা রূপসী
দূতী, যথা শিখণ্ডিনী, আখণ্ডল-ধনুঃ-
বিবিধ-রতন-কান্তি আভায় রঞ্জিয়া
নয়ন, উড়য়ে ধনী মঞ্জু কুঞ্জবনে! (১।৬১৪-১৭)

একই ব্যক্তি কখনও ময়ূরী আর কখনও পুঁটিমাছ-এর সঙ্গে উপমিত হলে ঔচিত্য ও সামঞ্জস্যের অভাব রসবোধে আঘাত করে না কি? দ্বিতীয়টির সমর্থনে কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যথেষ্ট মেহনত করেছেন। বোঝাতে চেয়েছেন, 'মুরলার গৌরবর্ণ, নীলবস্ত্র এবং মণিময় স্বর্ণালংকার সকলের

একত্রীভূত আভা ইন্দ্রধনুঃসদৃশ।' কিন্তু এটি নিতান্তই হেমচন্দ্রের মেহনতী আবিষ্কার। রাধার মতো মুরলাকে নীলাম্বরী শাড়ী-পরানোর প্রস্তাব মাইকেলও সমর্থন করতেন কিনা সন্দেহ। মাইকেলের বচন-বাচন-ছটায় স্বয়ং পুঁটিমাছও 'ধনী' শিখণ্ডিনীও 'ধনী', সুতরাং 'রজঃ-কান্তি' ও (আখণ্ডল)-'ধনুঃ-কান্তি'-তে একাকার হলেও ক্ষতি নেই! ওদিকে পুঁটিমাছের মতো লাফিয়ে-ওঠা মুরলার চিত্রটিকে বিশেষ নির্বাচনের মর্যাদা পেতে দেখা যায় ডাঃ ভট্টাচার্য্যের 'কাব্যালংকার ও কবিমানস' গ্রন্থে (পৃঃ ৩৫) চিত্ররচনায় যুগপৎ হোমার ও কালিদাসের সঙ্গে মধুসূদনের সমধর্মিতা ও সহমর্মিতার নিদর্শন হিসাবে। পূর্বোল্লিখিত 'পুঁটি-ময়ূরী'র অসঙ্গতি অবশ্যই সেখানে স্থান পাওয়ার কথা নয়, তবে হোমার ও কালিদাসের দুটি উদ্ধৃতির কোনোটিই যে ঐ 'সমধর্মিতা' বা 'সহমর্মিতা'-প্রমাণের কাজে লাগানো চলে না, এটাও উল্লেখযোগ্য।

'As from the surface-shiver leaps a fish
By Boreas flung, beside a weed-strewn shore,
And swift again in the black wave is hid ;
So by the blow clean-lifted he was flung.

হোমারের এই উপমায় দেখা যায়, একটা তীক্ষ্ণ আঘাতে নিক্ষিপ্ত ব্যক্তির দ্রুত-নিক্ষিপ্ত অবস্থার বর্ণনায় এসেছে আহত মৎস্যের উৎপ্লবনের চিত্র। এ ভাষাচিত্র ঘটনার ভাবজ্ঞাপনে নির্দোষ। পক্ষান্তরে মাইকেলের চিত্রটি চটুলতায় ও খেয়ালীপনায় হাস্যোদ্দীপক।

'চটুল-সফরোদ্বর্তন-প্রেক্ষিতানি।' —পূর্বমেঘ—৪০।

কালিদাসের এই উদ্ধৃতিতে আরো বাস্তবসম্মত রূপক-কল্পনার কাজে লাগালো হয়েছে সফরোদ্বর্তনকে। শুভ্রকান্তি সফরীর নয়নাভিরাম চকিত লম্ফনের মধ্যে কবি কল্পনা করেছেন নদীর কটাক্ষপাত। এই নিটোল সঙ্গতিময় প্রাণদ চিত্রের পাশে, খালি ঐ সফরীর লাফানিটুকু নিয়ে কবি মধুসূদন যা করেছেন, তা প্রায় বালকের লাফালাফির মতোই তুচ্ছ শব্দ-ক্রীড়া। ডাঃ ভট্টাচার্য্য কয়েকটি পদের যে 'অবিকল প্রতিধ্বনি' লক্ষ্য করেছেন, তা যে নিছক শব্দেরই যান্ত্রিক প্রতিধ্বনি তা লক্ষ্য করেন নি, এবং কালিদাসের 'প্রেক্ষিতানি'-পদটিরও প্রতিধ্বনি যে মাইকেলের উদ্ধৃতির মধ্যে পাওয়া গেছে, এই প্রস্তাবে আমাদের সন্দেহ হয়। 'দেখাতে' শব্দটিতেই বোধহয় সমালোচকের এই 'বিভ্রম' দেখা দিয়ে থাকবে।

(৪) 'চলে দন্তী, আস্ফালিয়া শুণ্ড, দণ্ডধর যথা কালদণ্ড।' (১।৫৬১)
শুণ্ড-আস্ফালনকারী হস্তীর উপমানরূপে যে দণ্ড-আস্ফালনকারী যমরাজকে খাড়া করা হলো, এ কিন্তু কেবলই শুণ্ড-দণ্ডের অনুপ্রাসের মহিমায়। নচেৎ যাঁকে কবি 'দণ্ডধর' বলে পরিচিত করেছেন, সেই পৌরাণিক দেবতা যমরাজের ঐ শুঁড়-তুলিয়ে চলার ভঙ্গিতে দণ্ড-তুলিয়ে দাপাদাপি করার চিত্রটি আদৌ শোভন নয়। পদে পদে পুরাণ-স্মরণের বা পুরাণোল্লেখের মধ্যে কবির মনোভঙ্গির এই হলো স্বরূপ।

(৫) অশ্বারোহী দেখ ওই তালবৃক্ষাকৃতি
তালজঙ্ঘা, হাতে গদা, গদাধর যথা
মুরারি! (১।৫৮৫-৮৭)

ঐ 'দণ্ডধর'-এর মতো একই তাগিদে এসেছেন 'গদাধর'ও। ওখানে 'শুণ্ড', থেকে দণ্ড, দণ্ড থেকে দণ্ডধর ; এখানে 'গদা' থেকেই 'গদাধর', এবং 'গদাধরের অবস্থা অধিকতর শোচনীয়। তাঁকে উপমান হতে হয়েছে এক নগণ্য রাক্ষসের, নাম 'তালজঙ্ঘা', এবং তালে তাল দেওয়ার জন্যই সে 'তালবৃক্ষাকৃতি', তথাপি অশ্বারোহী এবং হাতে গদা। এমন একটি কিম্ভূতকিমাকার চিত্র যে কবিমানসে গদাধর-চিন্তা জাগায় সেটা শুধু 'গদা'-'গদাধরে' শব্দজমক সৃষ্টির জন্য ; এবং এই জমক কবির এতোই মনঃপূত যে, যেখানেই তালজঙ্ঘা, সেখানেই কবিচিত্ত গদাধর-স্মরণে গদগদ (যথা—'তালবৃক্ষাকৃতি দীর্ঘ তালজঙ্ঘা শূর—গদাধর যথা মুর-অরি' ৬।৩২৪-২৬)। অথচ কবির আধুনিক ভক্তগণ এতেই গদগদ হয়ে লক্ষ্য করেন খাঁটি হিন্দুসুলভ সুগভীর পুরাণ-নিষ্ঠার উজ্জ্বল প্রকাশ মাইকেলের উপমা-রাজ্যে।

(৬) বিড়ালাক্ষ (বিরূপাক্ষ যথা
সর্বনাশী)······সংগ্রাম। (৭।৫৩৮-৪০)

মাইকেলের পাল্লায় পড়ে যেমন মুরারিকে তালজঙ্ঘার উপমান হতে হয়েছে, তেমনি এখানে বিরূপাক্ষ অর্থাৎ দেবাদিদেবকেও হতে হলো অধিকতর নিকৃষ্ট রাক্ষসসেনা বিড়ালাক্ষের উপমান। কারণ সেই একই। মাইকেলের কাব্যে অনুপ্রাস বা শব্দধ্বনির দাবীর কাছে কারও কোনো খাতির নেই। বিড়ালাক্ষ-বিরূপাক্ষ, এমন ধ্বনিসাম্যযুক্ত দুটি শব্দ জুড়ে দিয়ে একটু খেলা-দেখানোর নেশা কবি মাইকেলের পক্ষে দুর্বার। এতে 'বিরূপাক্ষ' নামক দেবতাটির মান-মর্যাদা বা মাহাত্ম্য কোথায় গিয়ে দাঁড়ালো, সেদিকে কবির ভ্রূক্ষেপ নেই, তিনি খালি

'সর্বনাশী' বলে বিনাশের দেবতার সমস্ত পাওনা মিটিয়ে দিলেন! শিবের 'রুদ্রমূর্তির সশ্রদ্ধ ধ্যান'ই বটে!

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'কাব্যালংকার ও কবিমানস' গ্রন্থে লেখক কবির এই 'সশ্রদ্ধ ধ্যানে'র নিদর্শন হিসাবে একটি উদ্ধৃতিকে একাধিকবার তুলে ধরেছেন (পৃঃ ৮১, পৃঃ ১২০)। বলতে চেয়েছেন, 'মহাযুদ্ধের প্রচণ্ড দুর্ধর্ষ বীরের প্রলয়ংকর মূর্তি রামায়ণ-মহাভারতে' যেমন 'প্রতিপদেই শিবের প্রলয়ংকর রুদ্রমূর্তির মাধ্যমে চিত্রিত হয়েছে', তেমনি 'মধুকাব্যের উপমাশিল্পে'ও এর নমুনার অভাব নেই; অথবা 'মহাকাব্যে যুদ্ধের প্রলয়ংকর লীলা-রচনায় কালিদাস' যেমন 'প্রলয়কালীন শিবের রুদ্রমূর্তির প্রশস্তি রচনা করেছেন', তেমনি—'মধুসূদন তাঁর কাব্যে এই রূপেরই সশ্রদ্ধ ধ্যান করেছেন।'
উদ্ধৃতিটি হলো,—

(৭) ঘন ঘনাবলী
উগারি পাবকরাশি, ভ্রমে শূন্য পথে
বাতগর্ভ গর্জি উচ্চে, প্রলয়ে যেমতি
পিনাকী, পিনাকে ইষু বসাইয়া রোষে। (৮।১৭১-৭৪)

দৃষ্টিবান পাঠকমাত্রেই বুঝবেন, শিবের এই চিত্রটি এসেছে কোনো প্রচণ্ড দুর্ধর্ষ বীরের মূর্তির জন্যও নয়, কোনো মহাকাব্যীয় যুদ্ধের প্রলয়ংকর লীলার জন্যও নয়; নরক-বর্ণনায় এক কাল্পনিক দৃশ্যের উপমানরূপে খাড়া করা হয়েছে এই পিনাকী-চিত্র। সুতরাং তুচ্ছ প্রয়োজনে নিতান্ত বেমানান এই পিনাকী-প্রসঙ্গ। অথচ এমন একটা খেয়ালীপনাকে 'কালিদাসের মতোই শিবের রুদ্র-মূর্তির 'সশ্রদ্ধ ধ্যান' বলে জোর করে চালানো হয়েছে। প্রসঙ্গকে বাদ দিয়ে, অথবা তার স্বরূপের ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে মাইকেলের এই সব চিত্র-সংযোজনের মূল্যায়ন যেমন প্রমাদপূর্ণ হবেই, তেমনি পাঠককে অধিকতর প্রমাদের বশবর্তী করা হবে ঐ জাতীয় চিত্র-রচনার মধ্যেই কবিমানসের ঐ বিশেষ সংকেতের ঘোষণায়। এই একই দেবতার (বিরূপাক্ষ) ঘৃণ্যতম নিগ্রহের চিত্র আগেই দেখানো হয়েছে (দানব-দলনী-পদ্ম-পদযুগ···বিরূপাক্ষ সুখে নাদেন যেমতি! ৩।১১১-১২)। তা ছাড়া,—

(৮) হায় রে, এ ফণী হেরি কে না চাহে এরে
বাঁধিতে গলায়, শিরে, উমাকান্ত যথা,
ভুজঙ্গ-ভূষণ শূলী? (৫।২৭৭-৭৯)

কবির এই উচ্ছ্বাসভরা শূলী-শম্ভুর উপমান-চিত্র-রচনার প্রেরণামূলে যে কামোদ্দীপক বেণীর মহিমা কবি-কল্পনাকে আলোড়িত করেছে, তাকে বাদ দিয়ে তো এ চিত্রের অস্তিত্বই নেই ; এবং কামের নিগড় যে 'অলক' এবং তাতেই রচিত দোদুল্যমান মণিময় যে বেণী, যার প্রতিক্রিয়া,—'হেরি তারে কামবিষে জ্বলে পরাণ !', —তারই প্রকৃষ্ট উপমানরূপে যদি প্রবল আগ্রহে নির্বাচিত হয় 'ভুজঙ্গ-ভূষণ শূলী'র চিত্র, তবে কবিমানসে শিব-চরিত্রের স্থান ও মান লক্ষ্য করে লজ্জিত হতে হয় না কি ? আর, উপমার ঔচিত্য ? অলং বিচারেণ !

(৯) 'চন্দ্র-চূড়-রথী তুমি, বড় ভয়ঙ্করী', (চতুর্দশপদী—৫৯)

মণ্ডনকলার অঙ্গহিসাবে কবির এই মহাদেব-স্মরণও চমকপ্রদ। 'শৃঙ্গাররস' নামক কবিতার পরিপূরক এই পদটিতে কবির কাম-কলা-রূপায়ণে দক্ষতা-প্রদর্শনের আয়োজন। কামোন্মত্তা নারীর পুরুষের উপর প্রভাব দুর্জয়, এই সিদ্ধান্তের প্রতিপাদনে রমণোন্মাদিনী নারীকে বলা হয়েছে 'চন্দ্র চূড়-রথী'। মদনভস্মকারী মহাদেবের এই কামদুর্বলতার ইঙ্গিত ফুটিয়ে কবি যে কী সশ্রদ্ধ শিব-ধ্যান করেছেন, এবং প্রসঙ্গ-বিচার বিসর্জন দিয়ে নগ্ন-কাম-কেলি-চিত্রে নিছক একটা বাক্‌চাতুরী ফলানোর উদ্দেশ্যে মহাদেবকে আসরে নামিয়ে আনায় যে কী কবিমানসের পরিচয় ফুটেছে, তা সহজেই অনুমেয়।

(১০) দেখ হে চাহিয়া

উথলিছে চারিদিকে ঘোর কোলাহলে
হলাহল সহ সিন্ধু ! নীলকণ্ঠ যথা
(নিস্তারিণী-মনোহর) নিস্তারিলে ভবে,
নিস্তার এ বলে, সখে, তোমারি রক্ষিত। (৩।৪৪০-৪৪)

এখানে যদিও পূর্বের মতো শিব-চরিত্রের হেয়তা লক্ষণীয় নয়, তবু উপমায় শিব-প্রসঙ্গের জবরদস্তি আমদানী, রচনার যান্ত্রিকতা ও কষ্টকল্পিত চিত্র উপমা-শিল্পী মধুসূদনের বিচারে উল্লেখযোগ্য বৈ কি। বিভীষণ যে লঙ্কাযুদ্ধে কোথায় কিভাবে নীলকণ্ঠ-অভিধাযোগ্য ভূমিকা নিলেন, তা কেউ জানে না। কবিও জানেন, এটি একটি অসার বাহুল্যোক্তি ছাড়া আর কিছু নয়। তবু, বাগাড়ম্বরের খাতিরে বিভীষণকে 'নীলকণ্ঠ' করা হলো। হয়তো 'নিস্তার' নিয়ে শব্দক্রীড়ার প্রলোভনই ছিল এই উপমা-রচনার মূল কথা। উপমাটির প্রযোজ্যতা বা ঔচিত্য বিচার করতে বসলেই ধরা পড়বে এই কথা।

(১১) ভয়াকুল ফুল-ধনুঃ পশিলা অমনি
ভবানীর বক্ষঃস্থলে, পশয়ে যেমতি
কেশরি-কিশোর ত্রাসে, কেশরিণী-কোলে,
গম্ভীর নির্ঘোষে ঘোষে ঘনদল যবে,
বিজলী ঝলসে আঁখি কালানল তেজে ! (২।৩৯৩-৯৭)

এই উপমায় একমাত্র শিবের ক্রোধানলের ভীষণতা ও আতঙ্কের অভিব্যক্তিটুকু সুন্দর, তার জন্য যে মেঘগর্জনসহ বজ্রানল কল্পিত হয়েছে তা সুসঙ্গত। কিন্তু আসল যায়গায় কোনো সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায় না। মদন আর ভবানীর জন্য যে কেন সিংহশাবক ও সিংহীর উপমান-চিত্র আমদানী করা হলো তা ভেবে পাওয়া যায় না। মূল উদ্দেশ্য, একটা অসহায় আতঙ্কের পরিস্থিতিতে পরম আশ্রয়লাভের ভাব-ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তোলা। ঐ ভাবের অবলম্বনরূপ যে সিংহশাবক ও সিংহীর চিত্র, তা উপমেয়-যুগলের চিত্রের পাশে নিতান্ত অসংগত। শাবক ও সিংহীর মধ্যে যে অঙ্গাঙ্গিভাবের নিত্যসম্পর্ক ও ঘনিষ্ঠতা, উপমেয়ে তা কল্পনা করা যায় কি ? তা ছাড়া, ভবানীর বক্ষঃস্থলে তাঁরই আজ্ঞাবহ কিঙ্করের প্রবেশ, কল্পনাটি যথেষ্ট আজগুবি, এবং সেই পরিমাণে আপত্তিকর (এ বিষয়ে গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে)।

(১২) নিশ্বাসি বিষাদে
(পতি-খেদে সতী-প্রাণ কাঁদে রে সতত !)
বসিলা ত্রিদেব-দেবী দেবেন্দ্রের পাশে।
উর্বশী, মেনকা, রম্ভা, চারু চিত্রলেখা
দাঁড়াইলা চারিদিকে ; সরসে যেমতি
সুধাকর-কররাশি বেড়ে নিশাকালে
নীরবে মুদিত পদ্মে। কিম্বা দীপাবলী
অম্বিকার পীঠতলে শারদ-পার্বণে,
হর্ষে মগ্ন বঙ্গ যবে পাইয়া মায়েরে
চির-বাঞ্ছা ! (৫।৪৩-৫২)

এখানে একই উপলক্ষে পর পর দুটি উপমার সন্নিবেশে নিখুঁত ও সখুঁত উপমা নির্বিচারে সাজিয়ে যাওয়ার একটি বিশেষ কবি-প্রবণতার পরিচয় ফুটেছে, যে পরিচয় আরো অনেক ক্ষেত্রে লক্ষণীয়। প্রথমটি নিখুঁত ; সুধাকর কররাশিতে যেমন অপ্সরীদের সৌন্দর্য ব্যক্ত হলো, তেমনি মুদিত পদ্মের উপমানটিও হয়েছে

যথাযোগ্য, বিষাদমগ্ন শচীর (বা দেব-দম্পতীর) পরিচয়ে। কিন্তু দ্বিতীয়টিতে কেবল অপ্সরী-চিত্রই হয়তো সঠিক ফুটলো দীপাবলীর উপমানে, কেন্দ্রীয় মূর্তির সঙ্গে কিছুই সঙ্গতি রইলো না, এবং উপমেয়ের ভাব-পরিবেশ যেখানে বিষাদে ভরা, সেখানে যে উপমানে ঘটা করে দেখানো হলো হর্ষমগ্নতা, এই ভাব-বিরোধ উপেক্ষিত হয়েছে। অথচ শাক্ত ভক্তগৃহের যে চিত্র এখানে তুলে ধরা হয়েছে, তাতে পীঠতলস্থ দীপাবলী নয়, পীঠস্থ প্রতিমা-মূর্তিই সর্বাগ্রে মানসচক্ষে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, যার কোনো প্রতিরূপ এখানকার বর্ণনীয় চিত্রে দেখাবার আয়োজনই নেই, বরং আছে সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব-পরিমণ্ডল। অর্থাৎ খণ্ড-দৃষ্টিতে দেখা এক খণ্ড-চিত্র নিয়ে কবির এই ছবি-আঁটা কারবার। তাই চিত্র-সংলগ্ন শাক্ত ভাবের গভীরতা নিয়ে কবি-মানসের কোনো মূল্যবান ভাষ্য-রচনা নিরর্থক।

(১৩) শরদিন্দু পুত্র ; বধূ শারদ-কৌমুদী,
তারা-কিরীটিনী নিশি-সদৃশী আপনি
রাক্ষস-কুল-ঈশ্বরী ! (৫।৪৫৩-৫৫)

পুত্র ও পুত্রবধূকে যথাক্রমে চন্দ্র ও চন্দ্রমার সঙ্গে উপমিত করে কবি কি যার যা প্রাপ্য তা দিতে পেরেছেন ? এতে হয়তো উভয়ের একাত্মতার উপর আলোকপাত ঘটেছে, কিন্তু আলোচ্যাংশে কবির উদ্দেশ্য পুত্র, পুত্রবধূ ও মাতা, প্রত্যেকেরই সুষমা-মহিমার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা। বধূ বিনা পুত্র নিষ্প্রভ, অথবা পুত্র বিনা বধূর অস্তিত্ব নেই একথা জানানো উদ্দেশ্য নয়,—সৌন্দর্য-বর্ণনাই কবির লক্ষ্য। সুতরাং একটি উপমানের (চন্দ্র) দুটি অবিচ্ছেদ্য উপাদান (চন্দ্র ও চন্দ্রমা) বিচ্ছিন্ন করায় উপমান-রচনায় খুঁত থেকে গেছে। তা ছাড়া, 'তারাকিরীটিনী' এই স্বরচিত বিশেষণটিতে বহুবীরধাত্রী সমগ্র লঙ্কার জননীস্বরূপিণী রাণী মন্দোদরীর পরিচয়টি অনবদ্য হয়েছে বটে, কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে মেঘনাদ-প্রমীলা-মন্দোদরীকে নিয়ে যে চিত্র-রচনার প্রয়াস, তাতে কিছু অসঙ্গতিই ধরা পড়ে। 'তারাকিরীটিনী নিশি' বললে কৃষ্ণপক্ষীয় নিশিই বোঝায়। নচেৎ চন্দ্র থাকতে নিশি তারার কিরীট-শোভায় মহিমান্বিত বোধ করবে কেন ? অন্যত্র পৃথগভাবে রাণী মন্দোদরীর এই পরিচায়িকা অবশ্যই সুন্দর হতে পারতো। চন্দ্রোপম পুত্রের প্রসঙ্গে মাতার এই পরিচয়ে পুত্র যে উপেক্ষিত হয়েছে, কবি তা খেয়াল করেন নি।

(১৪) ঘন বনে, হেরি দূরে যথা
মৃগবরে, চলে ব্যাঘ্র গুল্ম-আবরণে,

স্থযোগ-প্রয়াসী ; কিম্বা নদীগর্ভে যথা
অবগাহকেরে দূরে নিরখিয়া, বেগে
যমচক্ররূপী নক্র ধায় তার পানে
অদৃশ্যে, লক্ষ্মণ শূর, বধিতে রাক্ষসে,
সহ মিত্র বিভীষণ, চলিলা সত্বরে। (৬।২৯৫-৩০১)

'কাব্যালংকার ও কবিমানস' গ্রন্থের লেখক কবি মধুসূদনের এই উপমা-সৃষ্টির মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন "ভাব ও রসের গাঢ়তা, নবীনতাও নতুন করে আস্বাদ্য উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। তা ছাড়া, চিত্র ও চরিত্রের দৈহিক ও মানসিক অখণ্ড মূর্তি গঠনে উপকরণের বৈচিত্র্যও জুগিয়েছে যথেষ্ট।" (পৃঃ ৪৫)

এখন শুধু একটু মিলিয়ে নেওয়া দরকার লক্ষ্মণ-চরিত্রের "মানসিক অখণ্ড মূর্তিটি" ঐ 'ব্যাঘ্র' ও 'নক্রে'র দৃষ্টান্তে কী চমৎকার অঙ্কিত হয়েছে! উদ্ধৃত মন্তব্যটিতে যে 'নবীনতা'র উল্লেখ রয়েছে, সে সম্পর্কে পাঠককে একটু জানানো দরকার যে, আলোচ্য লক্ষ্মণ-বর্ণনামূলক উদ্ধৃতির সঙ্গে আরও দুটি উদ্ধৃতি যুক্ত করে লেখক দেখাতে চেয়েছেন,মিলটনের মতোই মধুসূদন প্রতিপদে প্রাচীন সাহিত্যে ব্যবহৃত উপমা স্ব স্ব কাব্যে বহুবার ব্যবহার করলেও সেই পুরাতন বস্তু কবির প্রয়োগ-নৈপুণ্যে নব ভাব ও রসে আস্বাদ্য উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। দৃষ্টান্তের উদ্ধৃতি ও তাদের ব্যাখ্যার আয়োজনের অব্যবহিত ভূমিকায় লিপিবদ্ধ হয়েছে :—"……আস্বাদন করতে গিয়ে মনে হয়—

'নূতন করিয়া লহ আরবার চিরপুরাতন মোরে।
নূতন বিবাহে বাঁধিবে আমায় নবীন জীবন ডোরে'॥

—এ সত্য এখানে মূর্তি পরিগ্রহ করেছে।"

—('কবিমানস'—পৃঃ ৪৪-৪৫)

রবীন্দ্র-উদ্ধৃতির এমন মর্মান্তিক অপপ্রয়োগ আর কোথাও ঘটেছে কিনা সন্দেহ! —'এ সত্য' বলে লেখক যা বুঝেছেন, তা 'সত্য' নয় ; সত্য যা, উদ্ধৃত অংশে তার কোন মূর্তি দেখবার কথা কোনো রবীন্দ্র-বোদ্ধা চিন্তাই করতে পারেন না।

যাই হোক, লক্ষ্মণকে এইভাবে ব্যাঘ্র ও নক্রের সঙ্গে উপমিত করায় হয়তো কোনো আপত্তির কারণ ঘটতো না, কিন্তু কবি কী করে ভুলতে পারলেন যে, এইমাত্র, ঠিক তিন লাইন উপরে ঐ লক্ষ্মণকেই তিনি আরো যে এক জোড়া

উপমানের সাহায্যে বর্ণিত করেছেন, তাদের একটি 'দেব ত্বিষাম্পতি' আর একটি 'বিভাবসু' ?

প্রাচীরে উঠিয়া দোঁহে হেরিলা অদূরে
দেবাকৃতি সৌমিত্রিরে, কুজ্ঝটিকাবৃত
যেন দেব ত্বিষাম্পতি, কিম্বা বিভাবসু
ধূমপুঞ্জে।

অর্থাৎ পর পর দুই গুচ্ছ উপমা, প্রতি গুচ্ছে দুটি করে দৃষ্টান্ত; প্রথম গুচ্ছে 'ত্বিষাম্পতি' ও 'বিভাবসু'র সঙ্গে উপমিত হওয়ায় 'দেবাকৃতি সৌমিত্রির' ব্যক্তিত্বের মহিমা-মর্যাদা রয়েছে সমুন্নত। কিন্তু পরক্ষণেই, অর্থাৎ প্রায় একই নিশ্বাসে কবি আমদানী করলেন 'সুযোগপ্রয়াসী ব্যাঘ্র' ও গোপনে ধাবমান মাংসলোলুপ 'নক্র'-এর উপমা, যাতে উপমেয় ব্যক্তিটির,—যাকে এইমাত্র কবি 'দেবাকৃতি সৌমিত্রি' পরিচয়ে তুলে ধরেছিলেন পরম শ্রদ্ধায়,—ব্যক্তিসত্তা যৎপরোনাস্তি হীনতাগ্রস্ত ও লাঞ্ছিত হলো! কল্পনার এই খেয়ালীপনা অবশ্যই আপত্তিকর। সঙ্গতি সামঞ্জস্যের এই শোচনীয় অভাব যেমন উপমার ঔচিত্য বিনষ্ট করে, তেমনি কবিমানসের কোনো সঠিক ভাষ্যরচনা অসম্ভব করে তোলে।

(১৫) বিভীষণ লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হলেন,—

সুরপতি-সহ
তারক-সূদন যেন শোভিলা দুজনে,
কিম্বা ত্বিষাম্পতি-সহ ইন্দু সুধানিধি। (৩।৪৮৪-৮৬)

কবির বর্ণনা-ভঙ্গি অনুযায়ী এই উপমামালায় বুঝতে হয় (১) বিভীষণ হলেন দেবরাজ ইন্দ্র, আর লক্ষ্মণ হলেন দেব-সেনাপতি কার্তিক, আবার, (২) বিভীষণ হলেন সূর্য, আর লক্ষ্মণ সুধাকর চন্দ্র। প্রথমটি যেমনই হোক, মোটামুটি সচল; দ্বিতীয়টি আপত্তিকর। বীর-বীর্যে তেজস্বী লক্ষ্মণেরই উপযোগী উপমান ত্বিষাম্পতি, সেটি বিভীষণের জন্য বরাদ্দ ক'রে লক্ষ্মণকে শান্তরশ্মি চন্দ্রের সঙ্গে উপমিত করায় ঔচিত্য বজায় থাকে নি। তা ছাড়া, সূর্য ও চন্দ্র একই সঙ্গে চলেছে, কল্পনাটিও যথেষ্ট কৃত্রিম ও অচল। মালোপমার নমুনা প্রচুর পাওয়া যায় মাইকেলের হাতে, কিন্তু কবির স্বভাবগত চপলতার জন্য প্রায়ই ঐ সব নমুনায় সঙ্গতি হয়েছে বিপর্যস্ত, অথবা ঘটেছে নগণ্যের অন্তর্ভুক্তি।

(১৬) শোকের ঝড় বহিল সভাতে !
সুর-সুন্দরীর রূপে শোভিল চৌদিকে
বামাকুল ; মুক্তকেশ মেঘমালা, ঘন
নিশ্বাস প্রলয়-বায়ু ; অশ্রু বারি-ধারা
আসার ; জীমূত-মন্দ্র হাহাকার-রব ! (১।৩৩৪-৩৮)

গভীর ভাবময়তা এখানকার কবিত্বময় প্রথম ছত্রে পরিচয় দেয় মাইকেলের সম্ভাব্য কবি-প্রতিভার। কিন্তু পরবর্তী রূপকমালায় ঐ ব্যঞ্জনাগর্ভ প্রকাশ-সৌন্দর্যকে তথা ঐ প্রতিভাকে আচ্ছন্ন করে প্রকট হয়েছে শুধু একটা কল্পনার কসরৎ। এর মধ্যে 'নিশ্বাস' ও 'হাহাকার' যথাক্রমে 'প্রলয়-বায়ু' ও 'জীমূত-মন্দ্রে'র সঙ্গে উপমিত হওয়ায় মাত্রাবোধ হয়েছে বিপর্যস্ত, ভাবের প্রকাশও হয়েছে নিতান্তই কৃত্রিম।

(১৭) হায় রে, মায়ের প্রাণ, প্রেমাগার ভবে
তুই, ফুলকুল যথা সৌরভ-আগার,
শুক্তি মুকুতার ধাম, মণিময়—খনি ! (৫।৪৫০-৫২)

এখানেও অনেকটা একই ধরণের শৈথিল্য বা অনভিনিবেশ উপমামালা-রচনার শেষের দিকে প্রকটিত। 'প্রেমাগার' 'সৌরভাগার' ও 'মুক্তা'গার রূপে যথাক্রমে 'মায়ের প্রাণ', 'ফুলকুল' ও 'শুক্তি'কে তন্ময়তা ও অবিচ্ছেদ্যতা-সূত্রে যেভাবে সমগোত্রীয় মনে করা যায়, মণি-লাভের সম্ভাবনাযুক্ত 'খনি'কে কখনই সেভাবে নেওয়া যায় না। তাই একই 'মায়ের প্রাণ'-এর তিনটি উপমান-এর মধ্যে 'ফুলকুল' ও 'শুক্তি', এ দুটির যে যথাযোগ্যতা, 'খনি'-র সে দাবী গ্রাহ্য নয়।

(১৮) চতুর্থ সর্গে সীতার পক্ষে সরমা যে কী, তা এক জায়গায় জানানো হয়েছে বড়ো মর্মস্পর্শী ভঙ্গিতে। সরমা 'সীতার কাছে মরুভূমে প্রবাহিণী', তপন-তাপিতার কাছে সুশীতল ছায়া, নির্দয় দেশে মূর্তিমতী দয়া, পঙ্কিল জলে পদ্ম ;—এ পর্যন্ত বেশ হলো ; পরেও আর একটি ভঙ্গি—'দরিদ্রের মহার্ঘ রত্ন', এও সুন্দর ; কিন্তু মাঝখানে বলা হলো—

ভুজঙ্গিনী-রূপী
এ কাল কনক-লঙ্কা-শিরে শিরোমণি ! (৪।৬৭০)

মণি কেবল ফণিনীর শিরোভূষণই নয়, মণিই তার জীবন ; তাই জীবন-বল্লভ বা প্রাণ-প্রিয়কে যে হারিয়েছে তার পরিচয়ে বলা হয়, মণি-হারা ফণিনীর

প্রায়'। ফণী ও মণিতে এই যে সম্পর্ক লঙ্কাপুরী ও সরমাতে কি তদনুরূপ্ কিছু কল্পনা করে চলে? এমন কি, কেবল 'শিরোমণি' অর্থেও তো ভূষণেরই ব্যঞ্জনা? কিন্তু ভুজঙ্গিনী-রূপী যে লঙ্কা, তার ভূষণস্বরূপা হওয়ার মধ্যে কি কিছু মাহাত্ম্য ফুটতে পারে?

(১৯) উপমানের যোগানে কবিকে নানাভাবে বেপরোয়া হতে দেখা যায়। মাত্রা-বোধ-বিসর্জন তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আগেই এর কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে জড়িত কবির যমক-অনুপ্রাস-লুব্ধতা, তাও দেখানো হয়েছে। এখানে লক্ষণীয় উপমায় মাত্রাবোধ-বিসর্জনের মূলে কবির শব্দাড়ম্বর-নেশার দৌরাত্ম্য।—

জ্বর-রোগীর পরিচয়ে—

ঘোর দাহে কভু বা দহিছে,
বাড়বাগ্নিতেজে যথা জলদল পতি।

মশা মারতে কামান-দাগার মতোই এই উপমা-রচনা।

(২০) নায়ক-নায়িকা-জীবনের একটি আনন্দময় মুহূর্তে লঙ্কাপুরীর অভ্যন্তরস্থ পরিবেশ-বর্ণনায় খাঁচার পাখীর কথা এসেছে, পাশাপাশি এসেছে রাজপুরীর শোভাস্বরূপ রচিত কৃত্রিম ফোয়ারার কথা। পাখীরা গান ধরেছে, ফোয়ারায় বেশি করে জল উঠছে। এই শেষোক্ত দৃশ্যটির (ফোয়ারা) প্রসঙ্গে কবি লিখলেন,—

উথলিল উৎস কলকলে,
সুধাংশুর অংশু-স্পর্শে যথা অম্বু-রাশি। (৩।৫৪৭-৪৮)

উপমেয়ের পাশে উপমানের ঘটা-রটা যে কতো হাস্যকর, তা নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে সহজেই ধরা পড়বে। কোথায় কৃত্রিম উৎসের কলকলানি, আর কোথায় সমুদ্রের জোয়ার।

(২১) অবচয়ি ফুলচয়, চলিছে মালিনী
কোথাও, আমোদি পথ ফুল-পরিমলে
উজলি চৌদিক রূপে, ফুলকুলসখী
উষা যথা! (৬।৩৭৮-৮১)

এখানেও লক্ষণীয় উপমান-উপমেয়ে 'আসমান্-জমিন্ ফারাক্',—যার ফলে ঔচিত্যের বাষ্পটুকুও উধাও! লঙ্কার পৌরজীবনে কতোই না মালিনী ফুল-ব্যবসায়ে জীবিকার্জনে ব্যাপৃত। গোয়ালা যোগায় দধিদুগ্ধ (পরবর্তী ছত্র),

মালিনী যোগায় ফুল; সুতরাং মালিনী কোন্ শ্রেণীর মানুষ সহজেই অনুমেয়। কিন্তু কবি মাইকেলের উপমা-মত্ততায় এই তুচ্ছ মালিনী অনায়াসেই হলো 'ঊষা'র সঙ্গে উপমিত। উপমানের আমদানীতে কবি যে কতো অসংযত ও বিচার-বর্জিত, তা ধরা পড়বে এই কবির হাতেই নানা ক্ষেত্রে এই 'ঊষা'রই মহনায় স্থান-নির্দেশে।—

ডাকিছে কূজনে,
হৈমবতী ঊষা তুমি, রূপসি, তোমারে
পাখী-কুল! (৫।৩৭৭-৭৯)

প্রমীলার উদ্দেশে প্রযুক্ত এই উপমান। তা ছাড়া,—

রতনসম্ভবা বিভা নয়ন ধাঁধিয়া,
ধায় অগ্রে, ঊষা যথা, একচক্র রথে
উদেন আদিত্য যবে উদয়-অচলে! (৭.৫৫১-৫৩)

অথবা

চির-রুদ্ধ দ্বার যার নাহি মুক্ত করে
ঊষা,—তপনের দূতী, অরুণ-রমণী! (নূতন বৎসর)

যে—'ঊষা' কবির কল্পলোকে এই ভাবে স্থান পেয়েছে, সে যদি সামান্যা এক পরিচারিকা-জাতীয়া নারীর (মালিনীর) উপমান রূপে অঙ্কিত হয়, তবে কবির উপমা-নির্মাণের খেয়ালীপনায় পরিতাপ জাগে বৈ কি।

(২২) হাতের কাছে যে উপমা পেয়েছেন, বেপরোয়া কবি মাইকেল তাই দিয়েই তখনকার মতো সাজিয়ে গেছেন তাঁর আসর,—সঙ্গতি-সামঞ্জস্যের কোনো তোয়াক্কা রাখেন নি।

রণমদে মত্ত, সাজে রক্ষঃকুলপতি;—
হেমকূট-হেমশৃঙ্গ-সমোজ্জ্বল তেজে
চৌদিকে রথীন্দ্রদল! (৭।৩২৯-৩১)

তাই মাইকেলের উপমা-মণ্ডপে রাক্ষস-রাজ-রাবণ ও তাঁর অধীন যে-কোনো রাক্ষস-সেনাকে একই মূল্য-মানের আসনে আসীন দেখা যায়। স্বয়ং রক্ষ-কুলপতির সর্বপ্রথম পরিচয়ে কবি লিখেছিলেন—

হেমকূট-হৈমশিরে শৃঙ্গবর যথা
তেজঃপুঞ্জ। (১।৩৪-৩৫)

সেই একই উপমান-যোগে রাবণের অনুচরদের ও বর্ণনা অত্যন্ত বিসদৃশ ও অনুচিত হলেও শব্দাড়ম্বরের মোহে কবি সকল ঔচিত্য বিসর্জন দিয়েছেন। মাইকেলের কবি-মানসের এই বে-পরোয়া গঠনের ফলেই তাঁর উপমা-রাজ্যে রামচন্দ্রও ইন্দ্রতুল্য, সামান্য রাক্ষসও ইন্দ্রতুল্য, বানরগণও ইন্দ্রতুল্য!

(২৩) পালিতাম পরম যতনে,

মরুভূমে স্রোতস্বতী তৃষাতুরে যথা,

আপনি সুজলবতী বারিদ-প্রসাদে। (৪।১৪৬-৪৮)

সীতার মুখের কথা, পঞ্চবটী-বনচরদের তিনি কী আদরযত্ন করতেন সেই প্রসঙ্গে। কিন্তু মরুভূমিতে তৃষাতুর ব্যক্তি জলের কাঙাল, পক্ষান্তরে আরণ্য জীব কেউ সীতাদেবীর আদর বা সেবার কাঙাল নয়। তাঁর পালন ছাড়াই ঐ সব বনচর প্রাণী চিরকালই স্বচ্ছন্দবিহারী। ওখানে (মরুভূমিতে) সেবিত ব্যক্তির তৃপ্তিই প্রধান, এখানে (সীতার বনবাস-যাপনে) সেবিকার তৃপ্তিই প্রধান। সুতরাং উপমার যথাযথ প্রয়োগ স্বীকার্য নয়। অধিকন্তু, 'আপনি সুজলবতী' ইত্যাদি অংশটি কবির জবানীতে যদিও চলিত, সীতার নিজমুখের উক্তিতে একেবারেই অচল।

(২৪) আহা মরি, সুবর্ণ-দেউটি

তুলসীর মূলে যেন জ্বলিল, উজলি

দশদিশ! (৩।৯০-৯২)

সীতা-সরমা-সংক্রান্ত মাইকেলের এই বহু-প্রশংসিত উপমাটি সত্যই উচ্চ-প্রশংসাহ। 'কাব্যালংকার ও কবিমানস' গ্রন্থে লেখক এই উপমার 'নিহিতার্থতা'-আবিষ্কারের যে প্রয়াস দেখিয়েছেন তাও প্রশংসনীয় (পৃঃ ১৩২)। যদিও সেখানে সম্ভবতঃ নিহিতার্থ আবিষ্কারের আগ্রহাতিশয্যে আপাতস্পষ্ট অর্থের ব্যাখ্যা সঠিক উদ্‌ঘাটিত হয় নি। খালি উভয়ের 'পূত-শুভ্র চরিত্র' ও 'সমপ্রাণতা', এই দিয়েই লেখক ব্যাখ্যা শেষ করেছেন। এর মধ্যে সমপ্রাণতার প্রসঙ্গ ঠিক এই উপমায় আসে না—। 'সুবর্ণ-প্রদীপ' উপমানে পাত্রের প্রশস্ততা, আরতির প্রশস্ততা, দেহের স্বর্ণকান্তি ইত্যাদি সরমা-পক্ষীয় কবি-মনের কথা উপেক্ষিত হয়েছে।

উপমাটি খুবই সুন্দর। তবে কবি যে এই একই উপমা বরাদ্দ করেছেন 'কুহকিনী মায়া'র জন্যও, এইখানেই আপত্তি।

ধীরে ধীরে রঘুবর চালিলা পশ্চাতে,
স্বর্ণ-দেউটি সম অগ্রে কুহকিনী
উজ্জলি বিকট দেশ। (৮।১৯৯—২০১)

যাকে কবি বারে বারে 'কুহকিনী' বলেছেন, তাকে ও সরমার মতো একজনকে একই উপমানে উপমিত করায় রসবোধ কুণ্ঠিত হয়ে থাকে। এখানে কেবল রূপের উজ্জলতা ছাড়া আর কিছুই বোঝায় না—তাও একটা অতি-প্রাকৃতের বিকট রহস্য জড়ানো রূপ। এবং এর ফলে পূর্ববর্তী দৃষ্টান্তে উপমার যে 'নিহিতার্থ' দেখিয়ে আমরা শিল্পীর প্রশস্তি গাইলাম, তাও কুণ্ঠিত হতে বাধ্য।

(২৫) উপমা-প্রয়োগে মাইকেলের আর এক দুর্বলতা, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও সতর্কতার অভাবে প্রমাদ-পূর্ণ প্রয়োগ।

একাকী জগত-জয়ী ইন্দ্রজিৎ তেজে ;
তা সহ মিলিল আসি প্রমীলা ; মিলিল
বায়ু-সখী অগ্নি-শিখা সে বায়ুর সহ ! (৩।৫৯৪-৯৬)

বায়ু কে, অগ্নিশিখাই বা কে ? কবির ভাষায় ও প্রকাশভঙ্গিতে সুস্পষ্ট, প্রমীলা হলো অগ্নিশিখা, আর মেঘনাদ বায়ু ; কিন্তু এতে উপমার ঔচিত্য চুরমার হয়ে গেছে।

যথা বায়ুসখা সহ দাবানল-গতি
দুর্বার, চলিলা সতী পতির উদ্দেশে। (৩।১৬০-৬১)

এ প্রয়োগটিও, ভ্রান্ত না হলেও সুচারু নয়। কারণ 'বায়ুসখা' শব্দটির কবি-প্রতিষ্ঠা 'অগ্নি' অর্থে ; অথচ সে অর্থে এখানে শব্দটি বিভ্রান্তিকর। 'বায়ুরূপ সখা' এই অর্থে একে গ্রহণ করা ছাড়া উপায় নেই।

(২৬) কিন্তু অগ্নি-শিখা ও পতঙ্গ-চিত্রের এমন সাংঘাতিক অপপ্রয়োগ মাইকেলের মতো শক্তিধর কবির হাতে বিশেষ পরিতাপজনক :—

যথা অগ্নিশিখা দেখি পতঙ্গ-আবলী
ধায় রঙ্গে, চারি দিকে আইল ধাইয়া
পৌর জন ; (৩।৫০৮-১০)

অগ্নিশিখা-দর্শনে পতঙ্গ ধাবিত হয় দগ্ধ হওয়ার জন্য, এখানে কিন্তু কোনো পতঙ্গেরই একটি ডানাও অগ্নিদগ্ধ হলো না! পতঙ্গস্থানীয়া পৌরাঙ্গনাদের শাড়ীর আঁচলের একটি সূত্রও দগ্ধ করার ক্ষমতা হলো না ঐ অগ্নিশিখার, বরং

দেখা যায়, তারা আনন্দে হুলাহুলি ও পুষ্পবৃষ্টিতে মেতে উঠলো! পতঙ্গের ধর্ম যে ঠিক এমন নয়, তা কি কবি জানেন না?

জলন্ত পাবক-শিখা-লোভে তুই কাল-ফাঁদে
উড়িয়া পড়িলি!
পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায়, ধাইলি, অবোধ, হায়!
না দেখিলি, না শুনিলি, এবে রে পরাণ কাঁদে!

এতো তাঁরই লেখা। সেই পতঙ্গ, সেই অগ্নিশিখা, সবই এক, এমন কি ধাবিত হওয়ার 'রঙ্গ'টুকুও রয়েছে অবিকল, অথচ ফলাফল?

কিন্তু এতো বড়ো একটা দূষিত প্রয়োগকেও মাইকেলের উপমাশিল্পের প্রশংসনীয় নিদর্শন রূপে তুলে ধরা হয়েছে 'কাব্যালংকার ও কবিমানস' গ্রন্থে (পৃঃ ৮২)। শুধু তাই নয়, প্রদর্শনের ভূমিকায় লেখক বলেছেন,—"অগ্নিশিখা-মুখে প্রবেশোন্মত্ত পতঙ্গের ধর্মটি গীতা উপনিষদ থেকে আরম্ভ করে ভারতীয় কাব্য মহাকাব্যের সর্বত্রই মোহবশতঃ ধ্বংসোন্মুখ ব্যক্তির চরিত্র-রূপায়ণে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।" মধুসূদনও "অবলীলাক্রমে" অনুরূপ অর্থে ঐ চিত্র তাঁর কাব্যে ব্যবহার করেছেন, এই হলো বক্তব্য। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে প্রমীলাকে দেখবার জন্য যারা ছুটে এসেছিলো, তাদের মধ্যে ঐ "পতঙ্গ ধর্ম" বা "মোহবশত ধ্বংসোন্মুখতা"র পরিচয় যে কোন্ দৃষ্টিশক্তিতে খুঁজে পাওয়া সম্ভব তা সাধারণে বুঝে না।

(২৭) কবিভাষা ও ছন্দের অভিনবত্বের জন্য, আনুষঙ্গিকভাবে রামায়ণ-কাহিনীর মতো বিষয়বস্তু ও উপস্থাপনের রীতি-বৈশিষ্ট্যের জন্যও মাইকেলের রচনা বাঙালীর এতোই জনপ্রিয়তা অর্জন করে যে, ত্রুটি লক্ষ্য করার পরিবর্তে ত্রুটিপূর্ণ রচনারও পৃথক মর্যাদা দেওয়ার আয়োজন হয়ে এসেছে। মোহিতলাল প্রস্তাবিত 'আর্ষপ্রয়োগ' এরই দৃষ্টান্ত। তা ছাড়া, 'মাইকেলী প্রয়োগ' নামেও বিধান দেওয়ার দৃষ্টান্ত সাহিত্য-পরিষৎ-সংস্করণে অনেক দেখা যায়, দেখা যায় আধুনিক বাংলা অভিধানেও। এই প্রসঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত:—

কে ছেঁড়ে পদ্মের পর্ণ? (৪।৮১)

আধুনিক বাংলা আলংকারিকগণের এই মাইকেলী রচনাটি খুবই মনে ধরেছে দেখা যায়। তাই তাঁরা 'কাকু-বক্রোক্তি'র দৃষ্টান্ত হিসাবে প্রথমেই এই রচনাটি তুলে ধরে অপার তৃপ্তি লাভ করেন।

প্রথমত, যদি সত্যই এটি 'আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে?' বা

'মাতা আমি নহি?' জাতীয় বাগভঙ্গিমাত্র হতো, তবে আমরা বলতাম, এই শ্রেণীর বাগ্‌ভঙ্গির মধ্যে ইংরেজী অলংকার Interrogationএর প্রতিরূপ খুঁজে পাওয়া গেলেও, এগুলো বক্রোক্তিও নয়, কাকুও নয়। বাংলায় এগুলো কোনো অলংকারই নয়। কিন্তু প্রয়োগ-ক্ষেত্রটি লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, এটি মাইকেলের রীতিমতো একটি আলংকারিক মন্তব্য, তা সে রূপকই হোক বা নিদর্শনাই হোক।

কে ছেঁড়ে পদ্মের পর্ণ? কেমনে হরিল
ও বরাঙ্গ অলংকার, বুঝিতে না পারি?

সম্ভবত এতেও এই প্রকাশভঙ্গির স্তুতিবাদে অনেকে মুখর হয়ে উঠবেন। কিন্তু 'পদ্মের পর্ণ' নিশ্চয়ই পাপড়িকে বলা হয়েছে; পাপড়ি ছিঁড়লে তো পদ্মের অস্তিত্বই নষ্ট করা হয়। পাপড়ি পদ্মের অলংকার নয়, তার যথাসর্বস্ব। সুতরাং পদ্মের পর্ণ ছিঁড়লে পদ্ম হয় বিকলাঙ্গ। পক্ষান্তরে সীতার অলংকার সেই বরাঙ্গের বাহ্য শোভা মাত্র। বরাঙ্গ যদি হয় পদ্ম, তবে অলংকার কখনই তার পর্ণ হতে পারে না, কারণ পর্ণ পদ্মের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং অংশ। অলংকারের মতো তা হরণযোগ্য নয়। পর্ণচ্ছেদনে পদ্ম হয় ছিন্নভিন্ন। আলোচ্য অংশে সীতা-পদ্ম ঐভাবে ছিন্নভিন্ন হয়েছে,—এ কথা কখনই কবির এখানকার বক্তব্য নয়। সুতরাং প্রয়োগটি যেমন অসমীচীন, তেমনি নিরর্থক।

(২৮) কাব্যালংকার সূত্রে কবিমানসের সন্ধান-লাভের প্রয়াস অন্য কবির ক্ষেত্রে যাই হোক, মাইকেলের ক্ষেত্রে যে বিপজ্জনক ও কার্যত নিরর্থক, পূর্ববর্তী বিস্তারিত আলোচনায় তার বহু প্রমাণ দেওয়া হয়েছে। নিম্নোদ্ধৃত উপমায় কবির স্বদেশপ্রেমের সংকেত সংগ্রহের চেষ্টা হতে পারে।

আসে যথা প্রবাসে প্রবাসী,
স্বদেশ-সঙ্গীত-ধ্বনি শুনি রে উল্লাসে! (২।৩০৪-৫)

যাঁরা প্রসঙ্গের খবর না নিয়ে শুধু মাইকেলী-ভঙ্গির 'যথা-যেমতি'-র মুখে খেয়ালের বশে এঁটে-দেওয়া চিত্র থেকেই কবি-মানসের নির্ভুল পরিচয়-সংগ্রহে অভ্যস্ত, তাঁরা বোধহয় এখানে কবির দেশাত্মবোধের গভীরতায় অভিভূত হয়ে পড়বেন; এবং হয়তো একটা বিজ্ঞ ভাষ্যও জুড়ে দেবেন যে প্রবাসের অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন কবির পক্ষেই স্বদেশ-সংগীতজনিত এমন জীবন্ত অনুভূতির এমন মর্মস্পর্শী প্রকাশ সম্ভব হয়েছে। কিন্তু কোন্ উপলক্ষে কোন্ বিশেষ উল্লাসের

অভিব্যক্তির তাড়নায় কবিমানস এখানে আলোচিত হয়েছে? এটি তো উপমান-অংশ, উপমেয়-চিত্রটি কেমন?—কী রসের?

রতির হাতে মোহিনী মূর্তিতে সেজেছেন ভবানী। এইবার প্রয়োজন মদন-প্রভাব। রসের হাসি হেসে ভবানী রতিকে বললেন, 'ডাক তব প্রাণনাথে।'

অমনি ডাকিলা
(পিককুলেশ্বরী যথা ডাকে ঋতুবরে)
মদনে মদন-বাঞ্ছা। আইলা ধাইয়া
ফুল-ধনুঃ;

মদন-বাঞ্ছার ডাকে মদনের এই ধেয়ে-আসার উপমা দেওয়ার জন্যই কবি এঁকেছেন পূর্বোক্ত প্রবাসীর ধেয়ে আসার চিত্র। উপমার কী ঔচিত্য! স্বদেশ সংগীতজনিত উল্লাস ও রতির আহ্বান-জনিত রতিপতির উল্লাস হলো তুল্যানু-তুল্য! উভয়ের ভাবমণ্ডলের সাদৃশ্য কি আদৌ কল্পনা করা যায়? কিন্তু এই হলো মাইকেলের উপমাসৃষ্টির ভঙ্গিমা এবং উপমায় কবির স্বদেশানুরাগের গোত্র-পরিচয়!

[৭] উপমায় হোমার-মিলটন-ট্যাসো-ভার্জিল-এর পাশাপাশি মাইকেলের স্থান-নির্ণয়ের পর্যালোচনা

(ক) ভূমিকা

উপমা-শিল্পী মধুসূদনের শক্তি ও প্রতিভার বহরের উপর আলোকপাতের উদ্দেশ্যে 'কাব্যালংকার ও কবিমানস' গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে হোমার, মিলটন, ট্যাসো ও ভার্জিল-এর উপমার পাশাপাশি মধুসূদনের উপমা সাজিয়ে বেশ একটি জমকালো আসর রচনা করা হয়েছে। গ্রন্থকারের প্রচেষ্টা সাধু, সন্দেহ নেই। তাঁর উপমা-নির্বাচনের মূলীভূত উদ্দেশ্য ঐ ঐ পাশ্চাত্য মহাকবির ও কবি মধুসূদনের "কল্পনাগত ঐক্য ও সাম্য" (পৃঃ ৫১) "কবিদৃষ্টির সমজাতীয়তা" (পৃঃ ৫৫), কোথাও বা কিছু পার্থক্য দেখানো; আর, সমগ্রভাবে "উপমার সর্বাত্মক চরিত্র সংগঠনের" (পৃঃ ৫৬) কৃতিত্ব প্রতিষ্ঠিত করা।

এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করার আগে উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিত সম্ভাব্য ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে লেখকের নিবেদনটি অবশ্যই মনে রাখতে হয়। তবে ঐ ভূমিকারই অন্যত্র লিপিবদ্ধ হয়েছে, এই পাশ্চাত্য ধারার আলোচনায় শক্তিশালী সহায়কের সহায়তার কথা। তা ছাড়া, গ্রন্থমধ্যে যে বাচন-ভঙ্গিতে মন্তব্যাদি

সন্নিবিষ্ট হয়েছে, তাতে বৈদগ্ধ্য-ভিত্তিক অসংশয়ের দৃঢ়তাই পদে পদে অনুভব করতে হয়। অথচ আলোচনার শুধু 'এখানে-ওখানে-সেখানে' নয় বহু ক্ষেত্রেই যে উদ্ধৃতি-ব্যাখ্যাদি ভ্রম-প্রমাদে কণ্টকিত, এবং তার ফলে এই আসর-সজ্জার উদ্দিষ্ট আবেদন যতোটা বাহ্যত প্রবল, আসলে ততোটা নয়, তার মাত্রাও যেমন কম, চরিত্রও তেমনি পৃথক,—সত্যের খাতিরে এ কথা সুস্পষ্ট হওয়া আবশ্যক। অসাধারণ মেধাবী মধুসূদনের সুবিপুল অধ্যয়ন ও শক্তিশালী সংগ্রহের মুখে প্রাচ্যের ন্যায় পাশ্চাত্য সাহিত্যেরও যে বহু চিত্র-চরিত্র ধরা পড়বে তাঁর কাব্যে, এইটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেই সংগ্রহ ও ব্যবহারের খতিয়ানটি এবং তার ভাষ্য হওয়া চাই নির্ভুল তথ্যনিষ্ঠ। নচেৎ ভ্রান্ত খতিয়ানের ভিত্তিতে ভ্রান্ত ভাষ্যযোগে যে কবি-মহিমার নক্‌শা রচিত হবে, তার উপাদানে ভেজাল থেকে যাবে, এবং সেটা হবে বিভ্রান্তিকর।

এই ভ্রান্তির কয়েকটি নমুনা এখানে দেখানো যেতে পারে।

(খ) মিলটন-মাইকেল

মিলটন ও মধুসূদন, এই দুই কবির কল্পনাগত ঐক্য ও সাম্য দেখানো হয়েছে :—

(ক) From morn to noon he fell···dropt from the Zenith, like a falling star ;············

Paradise Lost, Book I 742 46

দেখিলা সম্মুখে বলী, কুসুম কাননে,
বামাদল, তারাদল ভূপতিত যেন! (মেঘ-৫ম)
(পৃঃ ৫৪-৫৫)

'like a falling star' আর 'তারাদল ভূপতিত', এ দুয়ের মধ্যে সাদৃশ্য কল্পনা করা হয়েছে! একটিতে শোচনীয় পতনের বিভীষিকা, আর একটিতে সৌন্দর্যের মেলা, এতে 'কল্পনার ঐক্য ও সাম্য' যদি 'সুস্পষ্ট' লক্ষিত হয়, তবে অর্থবোধের দৈন্যে পরিত্রাণ করা ছাড়া আর উপায় কি?

(খ) While thus he spoke, the angelic squadron
bright/...and began to hem him round/
With ported spears, *as thick as* when

a field/Of ceres ripe for harvest
waving bends/······the careful ploughman
doubting stands/Lest on the threshing
floor his hopeful sheaves prove chaff.

P. L. Book IV 977-84.

যথা যবে
বারিদ-প্রসাদে পুষ্ট শস্য-কুল বাড়ে
দিন দিন, উচ্চ মঞ্চ গড়ি ক্ষেত্র-পাশে,
তাহার উপরে কৃষী জাগে সাবধানে,
খেদাইয়া মৃগযূথে, ভীষণ মহিষে,
আর তৃণজীবী জীবে, জাগে বীরব্যূহ,
রাক্ষসকুলের ত্রাস, লঙ্কার চৌদিকে। (মেঘ—৩য়)
(পৃ: ২৩)

কী বিভ্রান্ত এই সাদৃশ্য-প্রতিষ্ঠার প্রয়াস, মিলটনের শস্যক্ষেত্রের কল্পনার তাগিদ এসেছে, উদ্যত বর্শার ঘন-সন্নিবেশ বোঝাবার জন্য,—as thick as—এই হলো point of comparison; পক্ষান্তরে মাইকেলের শস্যক্ষেত্রের কল্পনায় শস্যের প্রতি লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য পাহারারত কৃষীর সাবধানে জেগে থাকার প্রতি; কারণ এখানে সেইটাই point of comparison; এর নাম কি "কল্পনাগত ঐক্য ও সাম্য"? ওখানকার 'Careful ploughman' আর এখানকার 'সাবধানে-জাগা-কৃষী' সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র, যেহেতু তাদের মনের গঠনই সম্পূর্ণ পৃথক। প্রসঙ্গত বলতে হয়, মিলটনের কৃষক-চিত্রে সূক্ষ্ম মনের কাজ অনেক বেশি, সুতরাং অধিকতর চিত্তাকর্ষক; শস্য-চিত্রও হৃদয়গ্রাহী; পক্ষান্তরে মধুসূদনের উপমার প্রয়োজনও যেমন মোটা, কৃষক-চিত্রও তেমনি মোটা, শস্যচিত্রেও নেই সূক্ষ্মতার আভাষ।

(গ) Or as a thief, bent to unhoard the cash
Of some rich burgher...fear no assault;
In at the window climbs, or o'er the tiles;
So clomb this grand thief into God's fold;

P. L. Book IV
188-93.

এস শীঘ্র করি !
ফিরিয়া আসিবে দুষ্ট, হায়, মা, যেমতি
তস্কর আইসে ফিরি, ঘোর নিশাকালে,
পুঁতি যথা রত্ন-রাশি রাখে সে গোপনে—
পরধন ! (মেঘ-৪র্থ)
—(পৃঃ ৫১)

কী আজগুবি, ভ্রান্ত সাদৃশ্য-প্রদর্শন ! 'thief' আর 'তস্কর' এই ছাড়া আর কিছুই নেই দুয়ের মধ্যে ঐক্যসূত্র। তস্করকে নিয়ে মিলটনের কল্পনাধৃত যে চিত্র, তার ত্রিসীমানায় আনা চলে না, মাইকেলের তস্কর-চিত্রটি ! ওখানে নির্ভীক, আক্রমণের দুর্ধর্ষ পৌরুষ, তাই grand thief ; আর এখানে হীন চৌর্যোত্তর ভীরুর সন্ত্রস্ত গতিবিধি। কল্পনাগত ঐক্য বা সাম্য অথবা কবি-দৃষ্টির সমজাতীয়তা লক্ষণীয় !

(ঘ) মিলটনের কাব্যে যেই পাওয়া গেল 'like a comet' অমনি মাইকেলের রচনা থেকে 'ধূমকেতু সম' বা 'ধূমকেতু যথা' খুঁজে বার করে উভয়ের দুটি রচনাংশ পাশাপাশি সাজিয়ে উভয়ের কল্পনার ও কবি-প্রকৃতির সমজাতীয়তা ঘোষণা করা হলো।

On the otherside
Incensed with indignation Satan stood
Unterrified, and like a comet burned,
That fires the length of Ophinchus huge
In the Artick sky, and from his horrid hair
Shakes Pestilence and War. P L Book II 706-11

সচকিতে বীরবর দেখিলা সম্মুখে ;—
ভীমতম শূল হস্তে, ধূমকেতু সম
খুল্লতাত বিভীষণে বিভীষণ রণে ! (মেঘ-৬ষ্ঠ)
(পৃঃ ৫০)

কোনো জীবন্ত সাদৃশ্য এখানে নেই, আছে খালি পূর্বোক্ত দুটি কথার সাদৃশ্য। নির্বাচন কালে মনে হয় কেবল like a comet এইটুকুর মধ্যেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা হয়েছে ; মিলটন যে Satan এর বর্ণনায় like a comet বলতে চাননি, বলতে চেয়েছেন (he) burned like a comet, এটা বুঝবার চেষ্টা করা

হয়নি। বিভীষণ যে 'ধূমকেতু সম', সে ধূমকেতুর জলবার এমন কি ধূমায়িত হওয়ারও কোনো লক্ষণ নেই, তার খালি দেখা দেওয়ার কাজ। 'বিভীষণ রণে' এটা একটা উপসর্গের মতো 'বিভীষণ' নামটির সঙ্গে জড়িত হয়েছে মাইকেলের রচনায় (সম্ভবত 'বিভীষণেনারিবিভীষণেন' এই বাল্মীকি-প্রয়োগটি কবির খুব পছন্দসই বলে, যার জন্যে শক্তিশেলাহত লক্ষ্মণের শোকদৃশ্যেও তাঁর এই পরিচয় কবি ছাড়তে পারেননি), নচেৎ মাইকেলের কাব্যে কোথাও বিভীষণের না আছে বিভীষণত্ব, না আছে তাঁর হাতের শূলের ভীমত্ব। আলোচ্য উপমায় মাইকেলের ঈপ্সিত ব্যঞ্জনা হলো ধূমকেতুর মতো আকস্মিক আবির্ভাব, পক্ষান্তরে মিলটনের ধূমকেতুর মধ্যে তার ভয়াবহ বিশ্বদাহী জলন্ত মূর্তি ও তার বীভৎস প্রতিক্রিয়ার উপর প্রশস্ত আলোকপাত ঘটেছে।

শোভিল সে কেতু, শোভে ধূমকেতু যথা
তারাশির। (তিলো—৪র্থ)
(পৃঃ ৫১)

এখানে আবার ধূমকেতু এসেছে দেবকেতু অর্থাৎ এক পতাকার উপমানরূপে। কিন্তু তথাপি পূর্বোক্ত মিলটনীয় উপমারই (যেখানে মহাক্রোধে জলন্ত পৌরুষের মূর্তিস্বরূপ Satan-এর উপমানরূপে জলন্ত ও ধ্বংসলীলায় মত্ত ধূমকেতুর মূর্তি অঙ্কিত হয়েছে) সাদৃশ্যবাহী উপমারূপে একে দেখানো হয়েছে। এবং মন্তব্য করা হয়েছে, "উপরের উপমা ব্যবহারের অন্তরালে কবি মিলটনের যে মানস-মূর্তিটি প্রমূর্ত হয়ে উঠেছে, মধুসূদনের উপমার আড়ালে কবি-প্রকৃতির কতকটা সমজাতীয় আলেখ্যই নিহিত।" অথচ দৃষ্টিবান ব্যক্তিমাত্রেই সুস্পষ্ট দেখতে পাবেন, অন্তত উপরে উদ্ধৃত চার-পাঁচটি দৃষ্টান্তের কোনোটাতেই এই সমজাতীয়তা লক্ষণীয় নয়। এমন কতিপয় দৃষ্টান্ত অবশ্য দুর্লভ নয় যেখানে নিপুণ অনুকরণের মন নিয়ে মধুসূদন মিলটন বা হোমারের উপমার প্রতিরূপ তাঁর কাব্যে দেখাতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু সেটা হলো তাঁর ইনটেলেকচুয়াল নির্মিতির সাফল্য। কবি-প্রকৃতির স্বাভাবিক প্রকাশের ফলেই তাঁর কাব্যে মিলটনের কবি-প্রবণতার সাদৃশ্য ফুটেছে, এটা প্রমাণ করতে যাওয়া খুবই বিপদের কথা। ডাঃ ভট্টাচার্য্য যে ঐ দুঃসাহস দেখাতে গিয়ে বিপদই ডেকে এনেছেন, এতে আর সন্দেহ নেই।

এক জায়গায় তিনি বলেছেন, "মিলটনের প্যারাডাইস্ লষ্ট সম্পর্কে এ মন্তব্য, 'Paradise Lost is an exposition of Milton's science, his

religion, his philosophy, the epitome of his thought on almost every subject which can exercise the mind'.—মধুসূদনের মেঘনাদবধ সম্পর্কেও মোটামুটি সত্য।" (পৃঃ ৪৪)
মিলটন ও তাঁর Paradise Lost সম্পর্কে Dixon এর ঐ অভিমত মহামূল্য এবং অবিসম্বাদিত সত্য; কিন্তু কবি মাইকেলের যখন religion বা philosophy বলে কিছুই নেই,—science এর কথা অবান্তর বললেই হয়,—তখন তাঁর কাব্যে এদের পরিচয় খোঁজা বৃথা, এবং এই শূন্যতার পসরা নিয়ে মিলটনের মতো মহিমান্বিত সমন্বয়ের অধিকারী মহাসত্ত্ব পুরুষের পাশে মাইকেলের মতো শুধু এক intellectual কবি-শিল্পীকে তুল্যানুতুল্যরূপে স্থান দেওয়া বড়োই অসমীচীন। উভয় মহাকাব্যের মান-নির্ণয়ে কোনোক্রমেই সমস্তরীয়তার চিন্তাকে মনে স্থান দেওয়া চলে না।

উপমা ছাড়াও কিছু কিছু রচনাদর্শ তুলে ধরে এই দুই কবির কল্পনাসাম্য বা চিন্তাসাম্য দেখাবার চেষ্টা হয়েছে। মধুসূদনের লঙ্কার রাজসভা বর্ণনার প্রায় সবটুকু ('শত শত পাত্রমিত্র আদি সভাসদ····· দাঁড়ান সে সভাতলে ছত্রধর-রূপে'—১।৩৫-৫২) উদ্ধৃত করা হয়েছে, এবং এই বর্ণনা বিষয়ে কবিকে মিলটনের সমধর্মী ব'লে বোঝাবার জন্য আগেই Paradise Lost Book IV থেকে ইডেন উদ্যানের বর্ণনামূলক দীর্ঘ ২৮ লাইনের একটি রচনাংশ (So on he fares, and to the border comes of Eden······from Media post to Egypt, there fast bound—ll. 131-71) উদ্ধৃত করা হয়েছে। মধ্যবর্তী মন্তব্য হলো,—"মিলটনের ইডেন উদ্যানের বিস্তৃত সমারোহ-পূর্ণ বর্ণনার মত মধুসূদনের লঙ্কার রাজসভা বর্ণনার মধ্যে কবিপ্রযুক্ত উপমার ক্লাসিক ও রোম্যান্টিক চরিত্রটি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।" (পৃঃ ৪৬-৪৮)

কিন্তু নির্বাচনের ভঙ্গি স্বতঃই প্রমাণ করে, মিলটনের রচনার মর্ম-স্বাদ যেমন গবেষকের কাছে থেকে গেছে অনাস্বাদিত, তাঁর কবিদৃষ্টির বহরও রয়ে গেছে সমালোচকের পরিমাপ-শক্তির নাগালের বাইরে। নচেৎ তিনি নিশ্চয়ই বুঝতেন, যে দৃষ্টিতে ও শক্তিতে Iambic Pentametre এর ধীর-বিন্যস্ত গম্ভীর ছন্দলয়যুক্ত অষ্টাধিক ছত্রের প্রশস্ত বহরে একটি sylvan scene-কে a woody theatre of stateliest view করা হয়েছে, সেই দৃষ্টি ও শক্তি মাইকেলের কাছে প্রত্যাশা করা বৃথা। মাইকেলের কল্পনার চুটকী ভঙ্গিতে ও অগভীর দৃষ্টির চঞ্চলতায় কেবলই ছুটোছুটি করা চলে চিত্র থেকে চিত্রে, বড়

জোর, সেই সূত্রে রচনা করা চলে মুহূর্ত-ভোলানো চটকদারী খণ্ড-চিত্র, মালা-গাঁথাও চলে তাদের নিয়ে ক্ষেত্রবিশেষে, কিন্তু কোনো ধ্রুপদী ঢঙের বৃহৎ পরিবেশ-রচনা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। তা ছাড়া, এই রাজসভা-বর্ণনায় কবি-কল্পনার মৌলিকতার দাবীও জোরালো নয় ('কৃত্তিবাসী ঋণের বহর' দ্রষ্টব্য)।

প্যারাডাইস লষ্টের উদ্ধৃতাংশের দ্বিতীয়ার্ধে মৃদুমন্দবায়ু-প্রবাহিত সুগন্ধ-প্রভাবের প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে। প্রসঙ্গ একটিই, কিন্তু দীর্ঘ ষোড়শ পঙ্‌ক্তিব্যাপী চলেছে কবির ক্লাসিক্যাল ঢঙের ধ্রুপদী আলাপ, যা মাইকেলের কবি-প্রকৃতিতে কল্পনাই করা যায় না। তিনি যে ঠিক কোন্ রসের ও কোন্ ঢঙের কারবারী, তার সুস্পষ্ট পরিচয় এই মিলটনী রচনাংশেরই তাঁর মনের উপর নিম্নোক্ত ধারার প্রভাবে :—

মিলটন—"……and whisper whence they stole
Those balmy spoils"—

মাইকেল— "সুগন্ধবহ বহিলা চৌদিকে,
সুস্বনে সবার কাছে কহিলা বিলাসী
কোন্ কোন্ ফুল চুম্বি কি ধন পাইলা।"

অনুকরণের বেলা এইটুকু পরিবর্তন করতে পেরে পুলকিত চিত্তে কবি জানালেন, "Is not the চুম্বন a more romantic way of getting the thing than "stealing ?" মিলটনের প্রসঙ্গটি যে বিশাল পটভূমিকায় উপস্থাপিত, তার একটি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশমাত্র নিয়েই মাইকেলের শিল্প-লীলা। কারণ তিনি বিশালের কারবারী নন, চুট্‌কীর কারবারী ; চুট্‌কীতে চুম্‌কির কাজ ভালোই করেন। stealing এর বদলে 'চুম্বনে'র কল্পনায় চুমকি-বসানোর কায়দা ফুটেছে। কিন্তু এর ফলে 'more romantic' যদি হয়েও থাকে মিলটন-চিত্রের সঙ্গে মাইকেল-চিত্রের জাতিগত পার্থক্য ঘটেছে যথেষ্ট। মিলটনের 'gentle gales' মাইকেলের চুম্বন-বিলাসী নরম-সরম প্রেমিক নয়, তারা শক্তিশালী লুঠেরা ; লুঠের মাল (balmy spoils) অকাতরে বিলোয় পরোপকারার্থ তাদের খেয়ালী পাখার ঝাপটানিতে—যে পাখা লুণ্ঠনকালেই হয়ে গেছে সুগন্ধি, এখন খালি ঝাপটানিতেই কার্যসিদ্ধি। এই যে বলিষ্ঠ ঔদার্যপূর্ণ পৌরুষের কল্পনা, মিলটনের 'gales" চরিত্রের ও চিত্রের এইটাই বৈশিষ্ট্য। এর পাশে মাইকেলের চুম্বন-বিলাসী 'গন্ধবহ' বিজাতীয় চরিত্র, চিত্রও তথৈবচ। কবি-কল্পনা ও কবি-চরিত্রেরও এই ধরণের পার্থক্য মিলটন ও মাইকেলের মধ্যে। প্রসঙ্গত স্মরণ করা

যেতে পারে এই বায়ুপ্রবাহ ও পুষ্পদল-সংক্রান্ত শেলীর একটি খণ্ডচিত্র, যেখানে গোলাপের সৌরভ-লুণ্ঠনকারী 'warm wind's' কে কবি এঁকেছেন "heavy-winged thieves" বলে। এখানেও ঐ মিলটনের মতোই ফুটেছে পৌরুষের ব্যঞ্জনা, বরং আরো দুরন্ত, যদিও চিত্রের সমগ্রতায় আছে এক সুষমার সৌরভ, যা অদৃশ্য স্কাইলার্কের প্রাণ-মাতানো স্বরলহরীর উপমানস্থানীয়। মাইকেল অবশ্যই শেলীর চেয়েও রোমান্টিক হওয়ার দাবী রাখেন না; কিন্তু রোমান্টিক আবেদনের জন্য শেলী 'চুম্বনে'র ভঙ্গি-দেখাবার গরজ বোধ করেননি। তিনি মিলটনের দৃষ্টি-অনুসারী হয়েও অধিকতর রোম্যান্টিক হতে পেরেছেন, যা মাইকেল পারেননি, বা তাঁর মনঃপূত হয়নি। এর কারণ, কবি-দৃষ্টির ও কবিস্বভাবের পার্থক্য।

সুতরাং কেবল উপমা-রচনায় এখানে-ওখানে কিছু কিছু শব্দের বা শব্দ-চিত্রের ভাসা-ভাসা মিল অথবা কচিৎ কোনো সযত্ন-অনুকরণমূলক উপমা-ভঙ্গির সাদৃশ্যের ভিত্তিতে এই দুই কবির তুলনাত্মক ভাষ্য-রচনায় যদি এঁদের চিন্তাসাম্য, কল্পনাসাম্য বা দৃষ্টিসাম্য ঘোষিত হয় তবে সে প্রয়াস হবে শুধু দুঃসাহসিক নয়, বিভ্রান্তিকর ও হঠকারিতার পরিচায়ক। সমালোচকের অবধারণায় দুর্বলতা থাকতেই পারে, কিন্তু সেক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য-ঘোষণার ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া সাজে কি? মাইকেল-প্রশস্তি-ব্রতধারী ডাঃ ভট্টাচার্য্য মাইকেল ও মিলটনের কবিমানসের সমধর্মিতা সম্পর্কে নিঃসংশয় হয়েই লিখেছেন,—"ব্যক্তি-মানসের অতল-স্পর্শ গহন-লোকে নিমজ্জন করে সেই অন্তর্লোকের তত্ত্বরহস্য আবিষ্কারের প্রবৃত্তি-প্রবণতা মিলটনের মত মধুসূদনেরও ছিল না। * * * * ভাবের জগৎ ছেড়ে কাজের জগৎকে নিয়েই এঁদের সাহিত্য।" (পৃঃ ৫৫)

প্রথমেই মনে হয় সমালোচক সম্ভবত ভিন্ন ভাষায় লিখিত অপরের কোনো মন্তব্য বাংলায় তর্জমা করতে গিয়েই এই বিপদ ডেকে এনেছেন। তিনি জানেন না, তিনি কী বলছেন! কারণ, যা বলেছেন, তা মিলটন বা মাইকেল কারও সম্পর্কে সত্য নয়,—কোনো বড়ো কবির পক্ষেই সত্য হতে পারে না। এমন অসংযত মন্তব্যের সমালোচনা নিরর্থক। শুধু এইটুকু, মেঘনাদবধ এর মতো বড়ো কাব্যে ঐ ব্যক্তি-মানসের গূঢ় বার্তা অথবা 'ভাবের জগৎ' এর সন্ধান-লাভে যদি অসুবিধা হয়েও থাকে, বীরাঙ্গনা-কাব্যেও যে সমালোচক হৃদয়-বার্তা বা 'ভাবের জগৎ'-এর কিছুই খুঁজে পাননি, এর চেয়ে পরিতাপের বিষয় আর

কী থাকতে পারে? মিলটনের সাহিত্য সম্পর্কে বোধহয় এই পরামর্শ দেওয়াই সংগত যে, Paradise Lost ছেড়ে সমালোচক যদি একবার Samson Agonistes এর প্রতি মনোযোগী হন, তবে তাঁর ভ্রান্তি-মুক্তি সহজেই ঘটতে পারে।

(গ) হোমার-(ভার্জিল)-মাইকেল

মাইকেল যে হোমারীয় উপমায় উল্লেখযোগ্য নৈপুণ্য দেখিয়েছেন এ প্রস্তাব বহু পূর্বকাল থেকেই স্বীকৃত। কিন্তু ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য দেখাবার অত্যুৎসাহে এবং উভয়ের উদ্ধৃতি-সজ্জায় গ্রন্থের জমক বাড়াবার মোহে এখানেও ডাঃ ভট্টাচার্য্য বিভ্রান্তি এড়াতে পারেন নি। তুল্যানুতুল্য বলে তিনি দেখিয়েছেন,—

Thus like the rage of fire the combat burns;
And now it rises, now it sinks, by turns. —Homer

চলিল অঙ্গনা
আগ্নেয় তরঙ্গ যথা নিবিড় কাননে —মেঘ (৩।৫১২-১৩)
(পৃঃ ২৮)

অথচ এই দুয়ের মধ্যে কোনো প্রকৃত ভাবসাদৃশ্য নেই। উভয় ক্ষেত্রে অগ্নির উল্লেখ থাকলেও তাদের রূপ ও স্বরূপ সবই পৃথক। হোমারে দাবানলের সর্বনাশা প্রবাহ যুদ্ধের সর্বনাশা গতিবেগের উপমান হয়েছে; আর মাইকেলে ঐ দাবানলের খালি রূপটাই নেওয়া হয়েছে নারী-রূপের উপমা দেওয়ার জন্য। হোমারের দৃষ্টান্তে উপমার যে পূর্ণ ঔচিত্য, মাইকেলে তার অভাব। কেবল নারীদলের রূপের বর্ণনায় সর্বধ্বংসী দাবানলের কল্পনা ঔচিত্য-বর্জিত।

উদ্ধৃতির সংখ্যা বাড়িয়ে উভয় কবির উপমা এমনভাবে সাজানো হয়েছে যে আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে হোমার ও মাইকেলের মধ্যে সমালোচক কতোই না ঘনিষ্ঠ মিল আবিষ্কার করেছেন চিত্র-চরিত্র-রচনায়। কেবল হিংস্র পশুর বা ব্যাধের কাজের উল্লেখ ছাড়া, অথবা দাবানল বা প্রলয় জাতীয় একই প্রাকৃতিক ঘটনার উল্লেখ ছাড়া আর কোনো মিল নেই, এমন বহু হোমার-চিত্র ও মাইকেল-চিত্র পাশাপাশি তুলে দেওয়া হয়েছে।

হীন-প্রাণা হরিণীরে রাখিয়া বাঘিনী
নির্ভয়-হৃদয়ে যথা ফেরে দূর বনে!

সীতাকে ফেলে রেখে উৎসব-কৌতুকে মত্ত চেড়ীদের বর্ণনায় মাইকেলের এই

উপমা সম্পর্কে লেখকের মন্তব্যের অংশ বড়োই কৌতুকাবহ :—"রেণেসাঁসের কবি মধুসূদনের বীরভাবের ধ্যানে এ আদর্শটিও মূর্তিলাভ করেছে মনে হয়" (পৃঃ ২১)। চেড়ীর কার্যকলাপের মধ্যে কবির 'বীরভাবের ধ্যান' (!) লক্ষ্য করে লেখক এতোই মুগ্ধ হয়েছেন যে পাশ্চাত্য মহাকবিদের অন্তত তিনটি বীর-ভাবাত্মক চিত্রের (দুটি হোমারের ও একটি ভার্জিলের) সঙ্গে তুলনীয় রূপে এই একই চিত্র তিনবার দেখিয়েছেন অসঙ্কোচে! বলা বাহুল্য, কোনো ক্ষেত্রেই এই চেড়ী-বাঘিনী-চিত্রের পক্ষে ঐ পাশ্চাত্য চিত্রগুলির ভাবসাদৃশ্য জাগাবার ক্ষমতা কল্পনা করা চলে না।

> Trojans and Greeks now gather round the slain;
> The war renews, the warriors bleed again ;
> As o'er their prey rapacious wolves engage,
> Man dies on man, and all is blood and rage.

হোমারের এমন একটি চিত্রের সঙ্গে তুলনীয়রূপে মাইকেলের ঐ চিত্র, একমাত্র বন্য পশুর নাম থাকা ছাড়া, আর কী কারণে আসতে পারে? রক্তক্ষয়ী ভয়াবহ যুদ্ধে লিপ্ত উভয়পক্ষীয় রণবীরগণের নিহতদের দেহ-অধিকার নিয়ে যে তাণ্ডব, তারই উপমায় হোমারের কাব্যে অঙ্কিত হয়েছে শিকার নিয়ে ক্ষুধার্ত নেকড়েদের সংঘর্ষের চিত্র। আর মাইকেলের দৃষ্টান্তে নিরীহ সীতাকে নামেমাত্র পাহারার কাজ ফেলে রেখে চেড়ীদের দূরে উৎসবে মেতে থাকার উপমায় এসেছে হীন-প্রাণা হরিণী নিয়ে খেলা-করা বাঘিনীর খেলা ফেলে রেখে দূরে ঘুরে বেড়ানোর চিত্র। তুল্যানুতুল্যই বটে!

'Then like a ravening lion that many a time' ইত্যাদি দীর্ঘ ন' লাইনের এক উদ্ধৃতিতে ভার্জিলের খাঁটি epic simile-র পাশে এই চেড়ী-বাঘিনী চিত্রের সমাবেশ আরো আপত্তিকর। ভার্জিলে রক্তাক্ত আক্রমণের দুঃসাহসিক করালচিত্র, মাইকেলে নির্ভয় নিশ্চিন্ত বিচরণের, তাও কেবল উপমানে; উপমেয়ে শুধুই ভয়-দেখানোর বিকট ভঙ্গি ছাড়া আর কিছু নেই—যদিও তারই মধ্যে সমালোচক 'রেণেসাঁসের কবি মধুসূদনের বীরভাবের ধ্যান' আবিষ্কার করেছেন। হেকটর আপন সেনাবাহিনীকে শত্রুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে মারমুখী করে তুলছেন,—হোমারের এই চিত্র, এবং রাবণ রথ পরিত্যাগ করে শেলাহত লক্ষ্মণের শবদেহের দিকে ধাবিত হচ্ছেন,—মাইকেলের এই চিত্র লেখকের কাছে তুল্যানুতুল্য বিবেচিত হয়েছে, যেহেতু উভয় ক্ষেত্রেই আছে

কিরাত বা hunter-এর উপমা (পৃঃ ২১-২২),—যদিও উপমান পক্ষীয় শিকারীর গতিবিধি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। এমন কি, মেঘনাদবধের নরক-বৃত্তান্তের অন্তর্ভুক্ত শমন-দূতগণের ভূমণ্ডলে ঘুরে-বেড়ানোর উপমায় মাইকেল যে লিখেছেন, 'ঘোর বনে কিরাত যেমতি মৃগয়ার্থে'—সেই কেবল ঘুরে-বেড়ানো কিরাতের চিত্রও পূর্বোক্ত হোমার-বর্ণিত সিংহ-শিকারী ঝাঁপিয়ে-পড়া কিরাতের দুর্ধর্ষ করাল মূর্তির সমকক্ষ বলে নির্বাচিত হয়েছে (পৃঃ ২১-২২)। এইভাবে দেখা যায়, কেবল সিংহ-ব্যাঘ্র-কিরাতাদির উল্লেখ-সাদৃশ্যে উপমা-চিত্র-সাদৃশ্য প্রমাণিত করার চেষ্টা হয়েছে। চিত্র-চরিত্রের সামগ্রিক আবেদনে কদাচিৎ মিল দেখা যায়।

নিসর্গ আলেখ্য প্রয়োগের বেলাতেও সাদৃশ্য-স্থাপনের অধিকাংশ প্রয়াস নিষ্ফল আড়ম্বর মাত্র। এই পর্যায়ে লেখকের প্রথম নির্বাচিত হোমার-চিত্র ও তত্তুলনীয় মাইকেল-চিত্র নিম্নে প্রদর্শিত হলো।—

As when the winds with raging flames conspire,
And o'er the forests roll the flood of fire,
In blazing heaps the grove's old honours fall,
And one refulgent ruin levels all :
Before Atride's rage so sinks the foes
Whole squadrons vanish, and proud heads below.

—হোমার।

বায়ুদল বহিলা চৌদিকে
বৈশ্বানরশ্বাসরূপে ; জ্বলিল কাননে
দাবাগ্নি ; প্লাবন নাদি গ্রাসিল সহসা
পুরী পল্লী ; ভূকম্পনে পড়িল ভূতলে
অট্টালিকা, তরুরাজী। —(মেঘ—৭।৪০২-৭)

(পৃঃ ২৫)

হোমারের উদ্ধৃতিতে একটিমাত্র প্রাকৃতিক ঘটনা, দাবানল, খাঁটি epic simile-র উপমান-প্রান্ত রচনা করেছে ; মধুসূদনের উদ্ধৃতিতে কোনো উপমার ছন্দাংশ নেই ; এখানে উপমা-সৃষ্টি কবির লক্ষ্যই নয়,—খালি কয়েকটি প্রাকৃতিক বিপর্যয়-চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, যাদের সাজানো সুরু হয়েছে আরো ছ' লাইন আগে থেকে, শেষ হয়েছে আরো খানিক পরে। ঘটনাগুলি সংখ্যায় প্রায় দশটি ; তন্মধ্যে এখানে স্থান পেয়েছে চারটি,—ঝড়, দাবানল, প্লাবন ও ভূমি-

কম্প। সুতরাং ঘটনার ভিড়ের মধ্যে একটি দাবানলের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ ছাড়া, হোমারের উদ্ধৃতাংশের সঙ্গে মাইকেলী উদ্ধৃতির আর কোনো মিলই নেই; অথচ ভঙ্গিটা এমনি যে, বেশ যেন একটা parallel passage দেখানো হলো। তা ছাড়া, হোমারের রচনায় নিসর্গ জগতের প্রলয়ংকর আলেখ্যটি (দাবানল) সত্যই একটি বিশেষ ভাব-পরিবেশনের কাজে প্রযুক্ত; সে ভাব বীরভাবই বটে; কিন্তু মাইকেলের রচনায় তেমন কোনো উদ্দেশ্যে নিসর্গ-চিত্রগুলি প্রযুক্ত নয়। এ অবস্থায় এই দুই রচনাংশের পাশাপাশি উল্লেখ শুধু নিরর্থক নয়, বিভ্রান্তিকরও বটে। অধিকন্তু সূক্ষ্ম সমীক্ষায়, উভয়পক্ষের যুদ্ধোদ্যমসূচক নিনাদের ফলে বজ্রপাত, মেঘের ঘনঘটা, সূর্যের নিমজ্জন, ঝঞ্ঝা, দাবাগ্নি, প্লাবন, ভূকম্পন, গৃহনাশ, বৃক্ষনাশ, জীবনাশ ইত্যাদি (মেঘ—৭।৩৮৮-৪০৭) মাইকেলের অস্বাভাবিক বাড়াবাড়ি বলেই ধরা পড়বে।

Atrides, এর মতো Achilles এরও দুর্ধর্ষ বীরোচিত ক্রুদ্ধ আক্রমণের বর্ণনায় যেখানে আর একবার হোমার দাবানলের বিস্তারিত চিত্র এঁকেছেন, সেখানেও ডাঃ ভট্টাচার্য্য পুনরায় এই একই মাইকেলী ছত্র কয়টি তুলে ধরেছেন (পৃঃ ২৮)। বলা বাহুল্য, পূর্বের মতো একই মন্তব্য এখানেও প্রযোজ্য।

এইভাবে গ্রন্থখানির আলোচ্য পরিচ্ছেদে এমন অনেক উদ্ধৃতির সমাবেশ ঘটানো হয়েছে যা অহেতুক, অসমীচীন, সুতরাং বিভ্রান্তিকর; আর সেই সূত্রে মাইকেলের কবি-প্রতিভার ও কবি-দৃষ্টির এক ফাঁপানো-ফোলানো চেহারা দেখাবারই চেষ্টা হয়েছে। বস্তুত লেখকের এই অতি-প্রশস্তির মনোভঙ্গির ফলে কবি-কৃতির ও কবি-মানসের ভাষ্য-রচনায় বহু ভ্রান্ত মন্তব্যের ভিড় জমে গেছে। এ বিষয়ে প্রচুর দৃষ্টান্ত পূর্বেই দেখানো হয়েছে। কিঞ্চিৎ ভিন্ন ধরণের আরও কিছু দেখানো যেতে পারে। 'হোমার ও মধুসূদন' শিরোনামাযুক্ত আলোচনাটির উদ্যোগ-পর্বে সমালোচক লিখছেন,—

"হোমারের বীরত্বব্যঞ্জক বা বীররসাত্মক কাব্যের সঙ্গে মধুসূদনের * * কাব্যের একটা মৌলিক পার্থক্য এখানে অবশ্যই লক্ষণীয়। * * হোমারের ইলিয়ড, ওডিসি কাব্যের দ্বারা মেঘনাদবধ সৃষ্টিতে মধুসূদন প্রভাবিত বটে, এবং বীররসাত্মক কাব্যস্বরূপে স্থূলতঃ এই বাংলার কবি ও গ্রীক কবির সৃষ্টিতে কিছু কিছু সাদৃশ্য থাকলেও তত্ত্বতঃ এ দুই জাতীয় কাব্যের দৃষ্টি ও আদর্শ একেবারেই বিভিন্ন। গ্রীক সাহিত্যের বীরত্ব আর বাংলার সাহিত্যের বীরত্বের গোত্র-পরিচয় বিজাতীয়।" (পৃঃ ১৮)

'স্থূলতঃ', 'তত্ত্বতঃ' ইত্যাদির বাঁধন দিয়ে যে সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যের কথা বলা হয়েছে তা আসলে ভারতীয় মহাকাব্যের সঙ্গে গ্রীক মহাকাব্যের নয় কি? লেখক নিজেই পরে এক যায়গায় বলেছেন, "গ্রীক এপিকের বীরত্বের আদর্শের সঙ্গে ভারতীয় মহাকাব্যের বীরত্বের আদর্শগত মৌলিক পার্থক্যই এইখানে।" (পৃঃ ৩০)

যদিও এখানে বীরত্বের সঙ্গে 'হৃদয়বত্তার' যোগের কথাটাই স্পষ্ট, তবু পূর্বোক্ত ক্ষেত্রে যে ন্যায়-নীতি-ধর্ম-বোধের সংযোগ-প্রসঙ্গ আনা হয়েছে, তাও অবশ্যই ভারতীয় মহাকাব্য, অর্থাৎ রামায়ণ-মহাভারতেরই বৈশিষ্ট্য। অথচ লেখক এমন ভঙ্গিতে বক্তব্য পেশ করছেন (ঐ পৃঃ ১৮) যেন মেঘনাদবধ কাব্যখানি 'বাংলার কবি'র (অর্থাৎ মাইকেলের) এক মৌলিক সৃষ্টি! এখানকার কাহিনী ও চরিত্র, এখানকার বীরত্ব বা যা কিছু, সবই যে রামায়ণের, এবিষয়ে যেন যথেষ্ট সচেতন থাকার দরকারই নেই, এমন ভঙ্গিতে 'গ্রীক সাহিত্যের বীরত্ব' ও 'বাংলার সাহিত্যে'র (অর্থাৎ মাইকেলের) বীরত্বের গোত্র-ভেদ দেখানো হয়েছে। এ সবই প্রশস্তি-মত্ততার ফল।

আবার এই প্রসঙ্গেই সম্ভবত মূল প্রস্তাবের একটা প্রশস্ত পটভূমিকা রচনা করতে গিয়ে লেখক ভারতীয় মহাকাব্যের কাছেই অপরাধী হয়ে পড়েছেন হোমার সম্বন্ধে মন্তব্য করা হলো,—"হোমারের কাব্যের উপমা বীর-পূজার এই কতকটা অসংস্কৃত আদর্শেরই বাহন। কবি বীরচরিত্রের পশুপ্রবৃত্তি বা পাশবশক্তিকে জাগিয়ে তোলার অনুরোধে সিংহ-ব্যাঘ্র প্রভৃতি দুরন্ত দুর্ধর্ষ চরিত্রের উগ্র ও উদ্ধত রূপেরই স্তুতি করেছেন পদে পদে। সিংহ-ব্যাঘ্রাদি দুর্ধর্ষ প্রাণীর শৌর্য-বীর্যময় চরিত্রই হোমারের উপমা-কল্পনাকে উদ্রিক্ত করেছে।" (পৃঃ ১৯)। সঙ্গে সঙ্গে, যেন গভীরতর সমীক্ষালব্ধ তত্ত্বের মতো, লেখক জানালেন,—"অবশ্য এ যে একান্তই হোমারের কল্পনার স্বাতন্ত্র্য, বা তাঁরই দৃষ্টির বিষমতা, তা নয়। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য নির্বিশেষে সভ্যতা-সংস্কৃতির এই পর্বে বীর চরিত্রের আদর্শই এই।" (পৃঃ ২০)। 'এই পর্ব' বলতে নিশ্চয়ই মহাকাব্যের যুগ বা Age of Epic poetry বুঝতে হবে। Routh এর যে মন্তব্য-ধারা বর্তমান সমালোচকের অবলম্বন, সে সমস্তই Epic Poetry সংক্রান্ত। প্রাচ্যের 'এই পর্বে'র বীর চরিত্রের আদর্শাধার নিঃসন্দেহে রামায়ণ-মহাভারত। কিন্তু ভারতীয় মহাকাব্যের বীর-চরিত্রে ঐ হোমারীয় পশুশক্তি-প্রধান বীরত্বাদর্শ কি সত্যই প্রযোজ্য? সমালোচক কিন্তু এখানেও থামেন নি। বলে চলেছেন,

"এ স্তরের শৌর্য-সৌন্দর্যবোধ দেহের সীমাকে ছাড়িয়ে উঠতে পারে নি। সৌন্দর্য-সম্ভোগ এখানে ভোগে, ত্যাগে নয়; প্রবৃত্তির অবাধ চরিতার্থতায়, সংযমনে, নিয়ন্ত্রণে নয়।" 'প্রাচ্য-পাশ্চাত্য নির্বিশেষে' বলার পর এ সবই যে প্রাচ্য বীর-চরিত্র অর্থাৎ ভারতীয় মহাকাব্যে বর্ণিত বীরচরিত্র সম্পর্কেও প্রযুক্ত হচ্ছে, এ নিশ্চয়ই সমালোচক খেয়াল রেখেছেন। কিন্তু তাঁর এই অসতর্ক বা ভ্রান্ত মন্তব্যের ক্ষমা নেই। তিনি Routh চর্চা করছেন খুব ভাল কথা, তবে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'মহাকাব্য' আর একবার পড়ে দেখলে আরো ভালো হয়।

(৮) মাইকেলের কাব্য সংগ্রহশালাঃ প্রশস্তিমোহের বিকার-বিকৃতি

অতি-প্রশস্তির মোহজনিত দৃষ্টি-বিকার ও মন্তব্যের মধ্যে তৎপ্রভাবের আর এক শ্রেণীর পরিচয়।

কবির চিত্ত ফুল-বন-মধু নিয়ে মধুচক্র রচনার সংকল্প যাঁর, তিনি যে অনেক ক্ষেত্রেই মধুর অপেক্ষায় না থেকে সরাসরি ফুলই তুলে নিয়েছেন রাশি রাশি প্রবল উল্লাসে, আর, তাই দিয়ে গেঁথেছেন তাঁর সাধের নূতন মালা, এ কবি নিজে ভালোই জানেন। জানেন যে, তিনি একজন সুদক্ষ শক্তিশালী সংগ্রাহক। কিন্তু তাঁর সেই সচেতন সংগ্রহমাত্রকে প্রশস্তিবাদীরা দেখাতে চান কবিরই মৌলিক চিন্তা-ভাবনা প্রসূত বস্তুরূপে; মিলটা যেন আকস্মিক, সুতরাং অতীব বিস্ময়কর, এবং মৌলিক সৃষ্টির অভিনন্দনই কবির প্রাপ্য! অর্থাৎ যিনি নিলেন কালিদাস থেকে, অথবা ব্যাস-বাল্মীকি-কৃত্তিবাস-কাশীদাস থেকে, নিলেন উপমাদি অলংকার, নিলেন বাগ্‌ভঙ্গি, মায় ভাষাটি পর্যন্ত, তাঁকে ঐ কারণেই, অর্থাৎ ঐ পূর্বসূরীদের উপমা বাগ্‌ভঙ্গি-ভাষা-ছাঁচের প্রচুর আমদানীর জন্য, বলতে হবে দ্বিতীয় কালিদাস, বা নূতন যুগের নূতন ব্যাস-বাল্মীকি-কৃত্তিবাস! এমন অদ্ভুত প্রস্তাবের ভিত্তি এইখানে যে, সমালোচকের মুগ্ধ ভাষ্য-সূত্রে ও-নেওয়া ঠিক 'নেওয়া' নয়,—ফোটা,—'স্ফূর্ত ও মূর্ত' হওয়া! স্পষ্টবাদী কবি নিজে যদিও জানালেন,

> তুলি সযতনে
> তব কাব্যোদ্যানে ফুল; ইচ্ছা সাজাইতে
> বিবিধ ভূষণে ভাষা; কিন্তু কোথা পাব
> (দীন আমি!) রত্নরাজী, তুমি নাহি দিলে,
> রত্নাকর?

এবং বলা বাহুল্য, কেবল কবিগুরুর কাছে নয়, পূর্বসূরী মহাকবি মাত্রেরই কাছে মাইকেলের কার্যত এই একই প্রার্থনার পরিচয় ফুটেছে তাঁর কাব্যে,—তবু স্তুতিব্রতী সমালোচক তাঁর স্তুতি-মানস-চক্ষে অবলোকন করেছেন নূতন যুগের কবির মধ্যে সেই ক্লাসিক যুগের স্বতঃস্ফূর্ত ভাবোচ্ছ্বাস ও সেই উচ্ছ্বাসের বাঙ্ময় রূপ তাঁর বিচিত্র অলংকরণের মধ্যে! পূর্বসূরীদের অনুকরণ-অনুসরণ সাহিত্য-শিল্পী মাত্রেরই পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু বর্তমান সমালোচককে অধিকতর মুগ্ধ হতে দেখা যায় মাইকেলের সেই সব রচনাংশে যেগুলি হুবহু নকল বা ভাবান্তরিত মাত্র। তিনি নিজেই এর অনেক দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, এখানে আরও কিছু দেখানো যেতে পারে সন্ধানী পাঠকের কৌতুহল-তৃপ্তির উদ্দেশ্যে :—

কালিদাসের-

	বাগর্থাবিবসম্পৃক্তৌ	(রঘু)
মাইকেল—	এক প্রাণ দুই ভাই বাগর্থ যেমতি	(তিলো—৪।৩৮৮)
কালিদাস—	জগদ্‌যোনিরযোনিস্ত্বং জগদন্তো নিরন্তকঃ। জগদাদিরনাদিস্ত্বং জগদীশো নিরীশ্বরঃ ॥	(রঘু)
মাইকেল—	হে বিভো, জগৎযোনি, অযোনি আপনি, জগদন্ত নিরন্তক, জগতের আদি অনাদি।	(তিলো—৩।১৪৯-৫১)
কালিদাস—	অরাবণমরামং বা জগদদ্যেতিনিশ্চিতঃ ॥	(রঘু)
মাইকেল—	অরাবণ, অরাম বা হবে ভব আজি!	(মেঘ)
কালিদাস—	ক্ব সূর্যপ্রভবো বংশঃ ক্ব চাল্পবিষয়া মতিঃ	(রঘু)
মাইকেল—	কোথা ব্রহ্মলোক? কোথা আমি মন্দমতি অকিঞ্চন?	(তিলো—২।১-২)
কালিদাস—	শ্রীবৎস-লক্ষণং বক্ষঃ কৌস্তুভেনেব কৈশবম্	(রঘু)
মাইকেল—	কৌস্তুভরতন যথা মাধবের বুকে	(মেঘ—১।৩১০)
কালিদাস—	বর্হেণেব স্ফুরিতরুচিনা গোপবেশস্য বিষ্ণোঃ	(মেঘদূত)
মাইকেল—	শিখিপুচ্ছচূড়া যেন মাধবের শিরে	(মেঘ—২।১২৮)
কালিদাস—	প্রতাপোঽগ্রে ততঃ শব্দঃ পরাগস্তদনন্তরম্। যযৌ পশ্চাদ্রথাদীতি চতুঃস্কন্ধেব সা চমূঃ ॥	(রঘু—৪।৩০)

মাইকেল— চলিছে প্রতাপ আগে জগত কাঁপায়ে
পশ্চাতে শবদ চলে শ্রবণ বধিরি !
চলিছে পরাগ পরে দৃষ্টিপথ রোধি
ঘন ঘনাকার-রূপে ! (মেঘ—৭।৪৪৩-৪৬)

[এর পূর্ববর্তী ছত্রে 'চতুঃস্কন্ধরূপী' শব্দটি যেমন কালিদাসের উদ্ধৃত শ্লোক থেকেই নেওয়া, তেমনি 'পরাগ' অর্থাৎ ধুলিরাশির বর্ণনায় যে উপমা আনা হয়েছে—'ঘন ঘনাকাররূপে', সেও কালিদাসের উক্ত উদ্ধৃতির পূর্ববর্তী শ্লোকের 'রজোভিঃ' আর 'ঘন-সন্নিভৈঃ' এই দুটি বিচ্ছিন্ন প্রয়োগের যান্ত্রিক অনুকরণে।]

কালিদাস— অসূত সদ্যঃ কুসুমান্যশোকঃ *** পাদেন নাপৈক্ষত সুন্দরীণাং
(কুমার—৩।২৬)

মাইকেল— প্রমদার পাদপদ্মাবশে অশোক
সুখে প্রসূনের হার পরে তরুবর ; (তিলো—১।৪৪১-৪২)

কালিদাস— সুবদনা-বদনাসব-সম্ভৃতস্তদনুবাদি-গুণঃ কুসুমোদগমঃ।
মধুকরৈরকরোন্মধুলোলুপৈর্বকুলমাকুলমায়তপঙ্‌ক্তিভিঃ॥
(রঘু—৯।৩০)

মাইকেল— কামিনীর বিধুমুখ-শীধু-সিক্ত হলে,
বকুল, ব্যাকুল তার মন রঞ্জাইতে,
ফুল-আভরণে ভুষে আপনার বপু (তিলো—১।৪৪৩-৪৫)

কালিদাস— স্নিগ্ধগম্ভীর-নির্ঘোষমেকং স্যন্দমাস্থিতৌ।
প্রাবৃষেণ্যং পয়োবাহং বিদ্যুদৈরাবতাবিব॥ (রঘু—১।৩৬)

মাইকেল— উঠিল অম্বরপথে হৈম ব্যোমযান
মহাবেগে, ঐরাবত সহ সৌদামিনী
বহি পয়োবাহ যথা। (তিলো—২।১৯-২১)

কালিদাস— …নদতি মধুরং চাতকস্তে সগন্ধঃ (পূর্বমেঘ—৯)

মাইকেল— চাতকিনী জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল, (তিলো—১।৩৭৯)

কালিদাস— শ্রেণীভূতাং পরিগণনয়া নির্দিশন্তো বলাকাঃ।
(পূর্বমেঘ—১০)

মাইকেল— বলাকা, মালায়গাঁথা আইলা ত্বরিতে, (তিলো—১।৩৮৪)

কালিদাস— আবির্ভূত-প্রথম-মুকুলা কন্দলীশ্চানুকচ্ছম্।
(পূর্বমেঘ—২১)

মাইকেল— স্থবর্ণ কন্দলী
মাথা তুলি শূন্যপথে চাহিয়া হাসিল।
(তিলো—১।৩৮৬-৮৭)

কালিদাস— (শকুন্তলায় তপোবন-প্রবেশের পূর্বে রাজা দুষ্মন্ত বলছেন,)
শান্তমিদমাশ্রমপদং স্ফুরতি চ বাহুঃ কুতঃ ফলমিহাস্য
অথবা ভবিতব্যানাং দ্বারাণি ভবন্তি সর্বত্র।

মাইকেল— (শর্মিষ্ঠা-সাক্ষাতের পূর্বে রাজা যযাতি বলছেন,)
"আমার দক্ষিণ বাহু স্পন্দন হইতে লাগলো কেন * * *
বলাও যায় না ; ভবিতব্যের দ্বার সর্বত্রই মুক্ত রয়েছে।"

কালিদাস— মোহেনান্তর্বরতনুরিয়ং লক্ষ্যতে মুচ্যমানা।
গঙ্গারোধপতনকলুষা গচ্ছতীব প্রসাদম্॥

[বিক্রমোর্বশী নাটকে মূর্ছাবসানে উর্বশীকে লক্ষ্য করে রাজা পুরুরবা বলছেন, তটভূমি ভগ্ন হলে গঙ্গার প্রবাহ ক্ষণেকের জন্য মলিন হয়ে যেমন অচিরেই পূর্ববৎ নির্মলতা প্রাপ্ত হয়, তেমনি এই বরাঙ্গনার মোহজনিত ক্ষণিক মালিন্য দূর হওয়ায় দেহরুচি পুনরায় নির্মল হয়েছে।]

মাইকেল—(পদ্মাবতী নাটকে মোহাবসানে উন্মীলিতনয়না পদ্মাবতীকে লক্ষ্য করে রাজা ইন্দ্রনীল বলছেন,)

"আহা! ভগবতী জাহ্নবী-দেবী ভগ্নতট-পতনে কিঞ্চিৎকালের নিমিত্তে কলুষা হয়ে, এইরূপেই, আপন নির্মল শ্রী পুনর্বার ধারণ করেন।"

কালিদাস— রতের্গৃহীতানুনয়েন কামং প্রত্যর্পিত-স্বাঙ্গমিবেশ্বরেণ।
(রঘু—৬।২)

মাইকেল— ধরে ছত্র ছত্রধর ; আহা
হরকোপানলে কাম যেন রে না পুড়ি
দাঁড়ান সে সভাতলে— (মেঘ—১।৫০-৫২)

[কোথায় রঘুবংশীয় মহারাজ 'অজ', আর কোথায় 'ছত্রধর' অর্থাৎ ভৃত্য-বিশেষ ; অনুকরণের ঝোঁকে কামদেব-এর উপমান-ব্যবহারে মাইকেলের যথেচ্ছাচার লক্ষণীয়।]

এ ছাড়া,

বাল্মীকি— (মেঘ ও শিখী প্রসঙ্গে)—
ময়ূরকেকাভিরনুপ্রয়াতং —রামায়ণ (বর্ষাবর্ণনম্)

মাইকেল—(মেঘ-নাদ শুনে) নাচিতে লাগিল মত্ত শিখিনী সুখিনী।

(তিলো- -১।৩৮২)

বাল্মীকি— (মেঘ ও বলাকা প্রসঙ্গে)—

বিদ্যুৎপতাকাঃ সবলাকমালাঃ— ঐ

মাইকেল— (ঐ) বলাকা, মালায় গাঁথা, আইলা ত্বরিতে,—

(তিলো—১।৩৮৪)

বাল্মীকি— শান্তরশ্মিরিবাদিত্যো নির্বাণ ইব পাবকঃ।

বভূব স মহাবাহুর্বপাস্তগতজীবিতঃ ॥ (যুদ্ধ—৯০।৮২)

মাইকেল— নির্বাণ পাবক যথা, কিম্বা ত্বিষাম্পতি

শান্তরশ্মি, মহাবল রহিলা ভূতলে। (মেঘ—৬।৬৭০)

বাল্মীকি— ...মেঘস্থ ইব ভাস্করঃ ॥ (যুদ্ধ—৭১।২২)

মাইকেল— আঁধার জগত, মরি, ঘন আবরিলে

দিননাথে! (মেঘ—১।৭৭-৭৮)

বাল্মীকি— প্রদহিষ্যামি সম্প্রাপ্তং শুষ্কেন্ধনমিবানলঃ (যুদ্ধ—৭৮।১২)

মাইকেল— দহিবে বিপক্ষদলে, শুষ্ক তৃণে যথা

দহে বহ্নি, রিপুদমী। (মেঘ—৬।৩৯২)

বাল্মীকি— ত্বং পুনর্জম্বুকঃ সিংহী মামিহেচ্ছসি দুর্লভাম্

(আরণ্য—৪৭।৩৭)

কৃত্তিবাস— শৃগাল হইয়া তোর সিংহে যায় সাধ (সুন্দরা—পৃঃ ২৫২)

মাইকেল—শৃগাল হইয়া, লোভি, লোভিলি সিংহীরে! (মেঘ—৪।৬০৯)

—এই যেখানে গ্রহণের ভঙ্গি, এবং গ্রহণের বহরও সুবিপুল, সেখানে গ্রাহকের সংগ্রহ-শক্তি ও প্রয়োগ-শক্তির অবশ্যই তারিফ করতে হয়, কিন্তু সত্যই কি তাতে কবি-মানসের বা কবির ধ্যানলোকের এমন মৌলিকতার পরিচয় ফোটে যাতে তাঁকে ঐ কালিদাস বা ব্যাস-বাল্মীকি-কৃত্তিবাসের মতোই দৃষ্টিভঙ্গি ও ভাবলোকের অধিকারী বলে মনে করা চলে? 'কাব্যালংকার ও কবিমানস' গ্রন্থের লেখক যে তাঁর পাঠককে তাই মনে করতেই বলেছেন, মন্তব্যের ভঙ্গিতে সেইটাই সুস্পষ্ট। তিনি নিজে বিস্ময়-বিগলিত নেত্রে লক্ষ্য করেছেন মাইকেলের অলংকার জগতে ঐ সেকালের কবিদের চিত্র-চরিত্রের "অবিকল প্রতিচ্ছবি", শুনতে পেয়েছেন মাইকেলের কাব্যের "অঙ্গে প্রত্যঙ্গে তারই অবিকল প্রতিধ্বনি" (পৃঃ ৬২)। তাঁর বিশেষ মন্তব্য,—"লক্ষ্য

করবার বিষয়, উপমা বা অলংকারের শুধু ভাব নয়, ভাষাও সহোদর-ভাবাপন্ন। মুহূর্তের মধ্যে ভুলে যাই আমরা, একাল ও সেকালের সহস্র যোজন ব্যবধান" ইত্যাদি (পৃঃ ঐ)। এই মুগ্ধতার বশেই তিনি সেই প্রাচীন মহাকাব্যের ও 'মধুকাব্যের' অলংকারের 'অদ্বয়' রূপটি (পৃঃ ঐ) দেখাতে সচেষ্ট হয়েছেন।

হ্যাঁ, খুবই লক্ষ্য করবার বিষয় বৈ কি! কবি যদি স্বেচ্ছায় ভাষাও হুবহু নকল করে তৃপ্তি পান, বা ঐ সব পূর্বসূরীদের ব্যবহৃত ছাঁচ ও ভাষা দিয়েই তাঁর নূতন ছন্দের কবিতা-দেহ গড়ে তোলার নেশায় মেতে থাকেন, তবে আর ভাষাগত 'অদ্বয়' মূর্তি দেখা যাবে, তাতে আর আশ্চর্য কি? মাইকেল পূর্ব-বর্তীদের ভাবও নেবেন, ভাষাও নেবেন, সুতরাং একাল-সেকালের সহস্র যোজন ব্যবধান সত্ত্বেও 'অবিকল প্রতিচ্ছবি' দেখা যাবে, শোনা যাবে অবিকল প্রতিধ্বনি, তাতে আর বিস্ময়ের কী আছে? সজ্ঞানে যিনি সংগ্রাহক সেজেছেন, প্রতিভা সত্ত্বেও যিনি তাঁর কাব্যকে করে তুলতে চেয়েছেন সংগ্রহ-শালা, তাঁর সেই কাব্যে অমন মিল দেখে অবাক হওয়ার পরিবর্তে বরং দুঃখই হয়, কেন অতো বড়ো শক্তিধর কবি ভাবে-ভাষায় বচনে-বাচনে চিত্রে-চরিত্রে এমন এদেশ-সেদেশের নমুনা কুড়িয়েই বোঝাই করলেন তাঁর কাব্য? 'ভাষাও সহোদর-ভাবাপন্ন' এই মন্তব্যে ফুটেছে অহেতুক স্তাবকতার পরিচয়, কবিশক্তি বা কবি-মানসের নিরপেক্ষ বিচারের নয়। যেন ঐ 'অদ্বয়'-রূপ কবির সজ্ঞান-সচেতন সৃষ্টি নয়, সে যেন মাইকেলের কাব্যে স্বতঃই 'স্ফূর্ত ও মূর্ত';—মিলটা আকস্মিক। যেটাকে আমরা সংগ্রহ মাত্র বলেছি, আর কেউ হয়তো সেটাকেই বলতে পারেন plagiarism (চুরি), বলেছেনও তো, এবং বলেছেন বঙ্কিমচন্দ্র।* বস্তুত হুবহু গ্রহণে নির্বিচার হলে 'অবিকল প্রতিধ্বনি' বা 'অবিকল প্রতিচ্ছবি' তো আসবেই। সমালোচক লিখেছেন,—"মেঘনাদবধ, বীরাঙ্গনা, তিলোত্তমার উপমাজগতে বিচরণ করতে করতে তার ভাব সৌন্দর্য অনুভব উপলব্ধির সূত্রে ব্যাস-বাল্মীকির উপমাজগতটি অনিবার্যভাবেই ভেসে ওঠে আমাদের মনে···।" (পৃঃ ৮৪)। সজ্ঞান নকলের প্রয়াসে যাদের আবির্ভাব, তাদের 'ভেসে ওঠা'-র কথাটা হাস্যকর! 'মধু কহে ব্রজাঙ্গনে ভণিতার আবৃত্তিসূত্রে ব্রজাঙ্গনা-পাঠকের মনে কবির কোনো বৈষ্ণব-পদকর্তাসুলভ মানসগঠন ভেসে ওঠে কি?

কিন্তু তথাপি 'কাব্যালংকার ও কবিমানস' গ্রন্থের হতভাগ্য পাঠককে গ্রন্থকারের এক অসহিষ্ণু মন্তব্যের টিপ্পনী খেতে হয়। ওই ভেসে-ওঠারই "মাধ্যমে বিজাতীয় শিক্ষার মাইকেল মধুসূদন বা খ্রীষ্টান মধুসূদনের অন্তরে সংস্কারের 'শ্রীমধুসূদন' এবং ব্যাস-বাল্মীকির উত্তরাধিকারী মধুসূদন স্বতঃই আত্মপ্রকাশ করে, মনে হয়, সে কথা এখন অপণ্ডিতেরও সুবোধ্য।" (পৃঃ ৮৪)। 'এখন', অর্থাৎ, সুপণ্ডিত গ্রন্থকারের কৃপায়! প্রচুর পরিশ্রমযোগে লেখক প্রাচ্য মহাকবিদের বহু উদ্ধৃতির সমাবেশ ঘটিয়ে ও তাদেরই সুরে, ভাবে ও ভাষায় মিল বিশিষ্ট মধুসূদনের বহু রচনাংশ পাশাপাশি দেখিয়ে আমাদের অশেষ উপকার সাধন করেছেন, ঠিকই; কিন্তু মধুসূদনের মধ্যে ভারতীয়তা বা বাঙ্গালীত্ব যে তাঁর আগে আর কারও চোখে পড়ে নি, বরং যেন দেশশুদ্ধ লোকই কবি-প্রকৃতিতে ঐ লক্ষণের অস্তিত্বের প্রতিবাদ করে চলেছে, এমন একটি ধারণা তাঁর কেন হলো, বোঝা দুঃসাধ্য। ধারণাটি যে তাঁর বদ্ধমূল, তা তিনি নিজেই সর্বারম্ভে 'নিবেদন'-এ প্রকাশ করেছেন সগৌরবে, আর এই কারণেই সম্ভবত গ্রন্থমধ্যে একাধিক স্থানে বেশ চড়া সুরের টীকা-টিপ্পনী চালানো হয়েছে, যাতে মধুসূদন-সংক্রান্ত যাবতীয় ভ্রান্ত ধারণার মুলোচ্ছেদ হয় অচিরেই! তিনি কোথাও এনেছেন "প্রলাপোক্তি"র কল্পনা (পৃঃ ৭৬), কোথাও আশংকা করেছেন "অপ্রকৃতিস্থতার লক্ষণ" (পৃঃ ৮০), কোথাও "আত্মহত্যার নামান্তর মাত্র" (পৃঃ ১২৪), কোথাও দিব্যচক্ষে দেখতে পেয়েছেন গোটা জাতি আত্মহত্যা করতে চলেছে, তাই পরিত্রাতার ভূমিকায় কঠোর প্রত্যয়দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন—"আজও কবি ও কাব্যের সম্পর্কে এই ভাবের পোষণ, জাতির পক্ষে আত্মহত্যারই পরিচয়" (পৃঃ ১৪৮), আবার কোথাও বা টিপ্পনীকে শাণিততর করে তোলবার জন্য তাঁর নিজের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে লিখেছেন, "বাল-ভাষিত বলে মনে হয় না!" (পৃঃ ১৫৩)। হয়তো এ জাতীয় টীকা-টিপ্পনী প্রাকৃত জনের পক্ষে প্রশান্ত চিত্তেই বরণীয়, তবে, ভাষা-ভাষণের উগ্রতায় আপত্তি নয়, আপত্তি অহেতুকতায়। লেখক যদি তাঁর পূর্বসূরিগণের মধুসূদন-চর্চার মূল্যায়ণে যথেষ্ট সতর্ক হতেন তবে কখনই বলতে পারতেন না, "মধু-প্রতিভার বিমিশ্র চরিত্রের যে অংশটি একান্ত প্রাচ্য বা ভারতীয়, আজও তা অনেকখানি উপেক্ষিত, অনাদৃত বা অস্বীকৃত হয়ে আছে বলে আমার ধারণা" (নিবেদন); অথবা "কবি-প্রতিভার দেশীয় বা প্রাচ্য রূপ আজও একান্ত উপেক্ষিত—" (ঐ); অথবা "তাঁর কাব্যসৃষ্টিতে হোমার,

মিলটন প্রভৃতি পাশ্চাত্য কবি, মহাকবির সঙ্গে সঙ্গে, ব্যাস-বাল্মীকি ও কালিদাসের প্রভাবও যে আদৌ অপ্রচুর নয়, একথা আজ কতকটা আজগুবি কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে !!" (ঐ)। অথচ দেখা যায়, তিনি মধুসূদন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ভালো করে না পড়লেও, মোহিতলাল পড়েছেন, প্রমথ বিশীও পড়েছেন। সুকুমার সেনের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস'ও অপঠিত থাকতে পারে না— ('মধুসূদনের কাব্যগুরু ছিলেন বাল্মীকি, হোমর, ব্যাস, ভার্জিল, কালিদাস, দান্তে, তাসসো এবং মিলটন। * * বাল্মীকি এবং হোমরের প্রভাব সর্বাধিক। * * তথাপি কাব্যটির ভারতীয় রূপ, এমন কি বাঙ্গালী ভাব এতটুকুও ক্ষুণ্ণ হয় নাই।'—ঐ, ২য়, পৃ: ১১১)। একেবারে গোড়াতেই জীবন-চরিতকার যোগীন্দ্রনাথ বসুই তো কবির উপর প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় দেশীয় মহাকবিদের প্রভাবের প্রসঙ্গ দিয়ে, বেশ এক গুচ্ছ উদ্ধৃতিযোগে প্রাচ্য প্রভাবের প্রমাণ দেখিয়ে সুরু করেন আমাদের বাংলা সাহিত্যে মাইকেল-সমালোচনার নমুনা। এ ছাড়া, আরো কতোই না শিক্ষাব্রতী নানা ধরণের পুস্তকে, প্রবন্ধে মধুসূদনের কবি-মানস ও কবি-প্রতিভা নিয়ে কতো বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এঁরা কেউ হয়তো মধুসূদনের প্রাচ্য-পাশ্চাত্য ঋণের এমনিধারা ক্যাটালগ্ তৈরী করেন নি, কিন্তু তাঁর কবি-মানসের ভারতীয়তা, বা কবি-প্রতিভার দেশীয় রূপের মনোজ্ঞ ভাষ্য অনেকেই রচনা করেছেন বিচিত্র কুশলতায়। অন্তত এক মোহিতলালের কথা মনে রেখেই বর্তমান লেখকের পূর্বোক্ত মন্তব্য-বর্ষণ থেকে ক্ষান্ত হওয়া উচিত ছিল। 'যুগন্ধর মধুসূদন' গ্রন্থের লেখক ডাঃ সিতাংশু মৈত্র মোহিতলালের আলোচনাধারা সম্পর্কে আগেই মন্তব্য করেছেন, বাঙালী মধুসূদনের বাঙালীত্ব (তথা ভারতীয়তা) প্রমাণের জন্য অতোখানি উদ্যোগ-আয়োজনের ঘটা একটা বাড়াবাড়ি ছাড়া আর কিছু নয়। মন্তব্যটি যেমনই হোক, কবি-প্রতিভার দেশীয় বা প্রাচ্য রূপের অথবা ভারতীয়তার যে 'উপেক্ষা' বা "অস্বীকৃতি" ডাঃ ভট্টাচার্যকে বিচলিত করেছে, কেবল মোহিতলালের মধুসূদন-চর্চাই ঐ ধারণার অমূলকতা প্রমাণের পক্ষে যথেষ্ট। প্রমথ বিশীর 'মাইকেল মধুসূদন' থেকে—

> "মধুর কাব্য-জীবন এই দুস্তর সমুদ্রের তরঙ্গতাড়িত। তাহার এক পারে ভারতবর্ষ—কবিগুরু বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস, আর অপর পারে হোমার, ভার্জিল, মিলটন ; মধুর কাব্যজীবন এই দুই পারের মধ্যে নিরন্তর পারাপারে নিরত।"

এই মন্তব্য উদ্ধৃত হওয়া সত্ত্বেও (পৃঃ ৬১) যে পূর্বোক্ত "আজগুবি কথা"-র আদৌ কোনো অবসর থাকতে পারে, এইটাই তো আসল "আজগুবি" বলে মনে হয়! প্রচ্ছদপট-সংলগ্ন প্রশংসাপত্রগুলির প্রথমখানিতেই তো ঐ 'আজগুবিত্ব'র স্বপ্ন-ভাঙানো কথা রয়েছে,—'বড় কবির উত্তরাধিকারও বড়। মধুসূদন উত্তম অধিকারী, তাই পাশ্চাত্ত্য এবং প্রাচ্য উভয় দিকের সাহিত্য হইতেই বলিষ্ঠ উত্তরাধিকারের দাবীতে অনেক কিছু গ্রহণ করিয়াছেন।' (শশিভূষণ দাসগুপ্ত)।

কবিচিত্তের ভারতীয়তা প্রমাণের জন্ম অকারণ দিশেহারা 'কাব্যালংকার ও কবিমানস'-এর লেখক যেখানে সেখানে ছড়িয়েছেন অশোভন টিপ্পনীর ছিটেগুলি। মাইকেলের কাব্যে রামায়ণ-মহাভারতাদির মতো প্রাচ্য কাব্যে প্রদর্শিত নমুনা অনুযায়ী দুর্ধর্ষ বীরের প্রলয়ংকর মূর্তি যদি শিবের প্রলয়ংকর মূর্তির উপমায় চিত্রিত হয়ে থাকে, তবে তাতে বিস্ময়েরই বা কী আছে, আর, তার মধ্যে কবিচিত্তের ভারতীয়তা ফুটেছে কি না, এ নিয়ে কেই বা প্রশ্ন তুলছে? কিন্তু সমালোচক মন্তব্য ঝেড়ে দিলেন, "পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে এর অনুসন্ধান-প্রচেষ্টা, অপ্রকৃতিস্থতার লক্ষণ।" (পৃঃ ৮০), লেখকের অকারণ এজাতীয় অসহিষ্ণু মন্তব্যে তিনি নিজেই প্রকৃতিস্থ কি না সন্দেহ হয়! "কবিচিত্তের ভারতীয়তা"—এটা কি একটা অনুসন্ধানের বিষয় হলো? হতো, যদি কবি হতেন অভারতীয়, যদি তিনি মানুষ হতেন ভারত-বহির্ভূত কোনো দেশের মাটিতে। তাছাড়া, ভারতীয় মন তো তাঁর সমগ্র সৃষ্টির গায়ে মাখানো, তার অণু-পরমাণুতে পরিব্যাপ্ত। চতুর্দশপদী কবিতাবলী তো ঐ মনেরই সৃষ্টি। বীরাঙ্গনা-ব্রজাঙ্গনা-তিলোত্তমা,—এক হেকটরবধ ছাড়া আর যা কিছু—সবই তো প্রমাণ করে, কবি-কল্পলোক বিশুদ্ধ ভারতীয় উপাদানে ঠাসা। গবেষকের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে এ বস্তু খুঁজে বেড়াবার কী দরকার? ধর্মান্তরিত হওয়া বা কয়েক মাস প্রবাস-যাপনের ফলে বাঙালী কবি মধুসূদন কি অবাঙালী, অভারতীয় হয়ে যাবেন, না, তা তিনি হতে পারেন?

"বাল-ভাষিত বলে মনে হয় না", (পৃঃ ১৫৩)—সমালোচকের এই যে শাণিত টিপ্পনী, পরবর্তী অধ্যায়ের আলোচনায় তার জবাব মিলবে আশা করি। বর্তমান অধ্যায়ের সমাপ্তি টানার আগে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ অপরিহার্য।

[৯] ভ্রান্ত-রাবণ-ভাষ্য—তথা কাব্য-ভাষ্য

কবিমানসের ও কবিকৃতির নূতন ভাষ্যরচনার উৎসাহে ডাঃ ভট্টাচার্য্য কিছু অদ্ভুত মন্তব্যের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। গ্রন্থের প্রথম দিকে (৪র্থ পরিচ্ছেদে) লিখেছেন, মধুসূদন মেঘনাদবধ কাব্যে 'রামাদিবদাচরিতব্যং ন তু রাবণাদিবৎ' এই আলংকারিক বিধানকে লঙ্ঘন করে 'রাবণাদিবদাচরিতব্যম্' এ আদর্শ-স্থাপনায় ভাবজগতে এক নবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন।" জানি না, সত্যিই মধুসূদন মেঘনাদবধ কাব্যে কোনো আদর্শ স্থাপন করেছেন বা করতে চেয়েছেন কি না। ধরা যাক, চেয়েছেন ; এবং তা হলো রাবণের আদর্শ। কিন্তু তবে ঐ গ্রন্থেরই উপসংহারে যেখানে লেখক সুচিন্তিত সংশ্লেষণসূত্রে সমগ্র মেঘনাদবধ কাব্যপাঠের ফলশ্রুতির নির্ভুল কাঠামোটি বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে তুলে ধরেছেন, এবং ঐ বিষয়ে দুর্বলচিত্ত পাঠকের ভ্রান্তি-অপনোদনে প্রয়াসী হয়েছেন, সেখানে আমরা এ কী শুনি ?

> "পরিশেষে, 'যথা ধর্ম জয় তথা' অথবা 'সত্য যদি ধর্ম, তবে অবশ্যই জিনিব'—সমগ্র কাব্যপাঠের এ ফলশ্রুতি সম্পর্কে পাঠকচিত্ত যদি সংশয়াকুল হয়ে থাকে, তাহলে,
>
> 'বিসর্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে।
> সপ্তদিবানিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে ॥'
>
> কাব্যের এ উপসংহার বৃথাই রচনা করেছেন কবি। এ উক্তির সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গমঞ্চের উপর যখন যবনিকা-পাত হয়, তখন দর্শক 'উজ্জ্বলিত নাট্যশালাসম' লঙ্কাপুরীর একে একে সমস্ত দেউটি নির্বাপণে এই ঘোর বিষাদ অন্ধকারময় দশমী দিবসের রূপ প্রত্যক্ষ ক'রে ব্যথিত ও বিষণ্ণ হয়েও স্বস্তি ও সান্ত্বনা পায়, জীবনের এই সত্য ও শিবময় রূপ দেখে ;—
>
> 'নিজ কর্ম দোষে মজিলা আপনি
> মজাইলা এ লঙ্কাপুরী।'
>
> এই যে সহস্র পৌরুষ ও ব্যক্তিত্বের প্রশস্তি সত্ত্বেও পাপ ও দুর্নীতি, অন্যায় ও অধর্মের শাসন ও তিরস্কার এ কি ভারতীয় জীবন ও ভারতীয় শিল্পের ঘোর অবজ্ঞা, অবমাননা ? ভারতীয় শিল্প ও সাহিত্যে সুন্দরের ধ্যান কি কাব্যের পরিণতিতে সমূলে বিধ্বস্ত ?"
>
> (পৃঃ ১৫৮

পূর্বের 'রাবণাদিবদাচরিতব্যম্ আদর্শ-স্থাপনা'র সঙ্গে এই ফলশ্রুতির কোনো সংগতি আছে কি? অর্থাৎ সমালোচকের অবস্থাটি বড়োই করুণ! তিনি মাইকেলের সৃষ্টির অভিনবত্বও দেখাতে চান, আবার ক্লাসিক রীতির সনাতনত্বও দেখাতে চান। এ চাওয়ায় হয়তো দোষ নেই, কিন্তু তা কি তিনি দেখাতে পেরেছেন? পরিবর্তে দেখা যায়, তিনি এ-কূল ও-কূল দু-কূল হারিয়েছেন। রাবণের আদর্শ স্থাপনাতেই যদি অভিনবত্ব, তবে ধর্মের জয় ও পাপের শাস্তি-বিধানে কাব্যের সামগ্রিক ফলশ্রুতি রচিত হলে ঐ আদর্শের কাঠামো ধূলিসাৎ হয়ে গেল না কি? তবে আর অভিনবত্ব রইলো কোথায়?

তা ছাড়া, কাব্যের ফলশ্রুতিকে অমনভাবে একেবারে গাছের পাকা ফলটির মতো অনায়াসে পেড়ে নিয়ে সংশয়াকুল পাঠকবর্গের চোখের উপর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখাতে গিয়ে লেখক যা করেছেন, তাতে স্পষ্টই ধরা পড়ে, কাব্যের পরিণতির নিহিত সুরটি লেখক ধরতে পারেন নি। তিনি বিজয়ার চিত্রখানি দেখেই বিভোর, মধুসূদনের ভারতীয়তা লক্ষ্য করেই কৃতার্থ। সপ্তদিবানিশি ভোর যে কান্না, তা আর তাঁর কানে বাজলো না, প্রাণে তো দূরের কথা। বাজলে, তাঁকে ভাবতে হতো, এ কার কান্না? কান পেতে শুনলে তিনি শুনতে পেতেন, পাপিষ্ঠ রাবণ নয়, মহাশক্তিধর রাবণের বিরাট হৃদয়ের বিরাট ক্রন্দন, এবং হয়তো তারও অভ্যন্তরে স্বয়ং কবির ক্রন্দন, যিনি এই কাব্যে রাবণেরই ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছেন। সমগ্র কাব্যপাঠের ফলশ্রুতি বলে লেখক যা দাঁড় করিয়েছেন, তাতে মধুসূদনের পণ্ডশ্রমই প্রতিপন্ন হয়েছে। রাবণের সাজানো বাগান শুকিয়ে যাওয়ার হাহাকারের মধ্যে তিনি স্বস্তি ও সান্ত্বনা খুঁজে পেলেন সেই মামুলী কর্মফল-প্রস্তাবটির রকমারি চরিত্রের মুখে যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তিতে। তাই যদি পেতে হয়, তবে তো "পাপ ও দুর্নীতি, অন্যায় ও অধর্মের শাসন ও তিরস্কারে" সেই কৃত্তিবাসী ভঙ্গিরই রোমন্থন ঘটেছে মাইকেলে, এইটুকু তৃপ্তিতে গুটিয়ে নিতে হয় সব কবি-কৃতির মূল্যায়ণ, আর, সপ্ত দিবানিশি লঙ্কার ক্রন্দনে সহানুভূতি দেখানোও অসম্ভব হয়ে পড়ে, যেহেতু পাপীর ক্রন্দনে অপরের অনুকম্পা থাকতে পারে, হৃদয়ের যোগ থাকতে পারে না। কবি রাবণকে 'শাসন ও তিরস্কার' করতেই চেয়েছেন, এই যেখানে লেখকের দৃঢ় বিশ্বাস, সেখানে ঐ রাবণাদিবদাচরিতব্যম্ আদর্শের স্থাপনা কিরূপে সম্ভব হলো? তা ছাড়া, সেখানে ঐ কান্না-ভেজা উপসংহার-রচনার পশ্চাতে কী কবিমানস ফুটতে পারে, তাও পৃথক গবেষণার বস্তু হয়ে পড়ে না কি?

বস্তুতঃ ধর্মের জয়, অধর্মের পরাজয়, কাব্যের এই ফলশ্রুতি দেখিয়ে লেখক বুঝিয়ে দিলেন, তিনি মাইকেলের পরিকল্পনা কিছুই বোঝেন নি। বহু রসজ্ঞ সমালোচক প্রগাঢ় মনস্বিতার বলে মাইকেলের সৃষ্টির যে মৌলিকতা ও অভিনবত্ব উদ্ধার করে দেখিয়েছেন, আর্য রামায়ণের পাপ-পুণ্যের সুরে সুর মিলিয়ে বর্তমান লেখক কবি-দৃষ্টির সেই মৌলিক রূপটি চুরমার করতে চেয়েছেন। তাঁর হাতে মাইকেলের রাবণের অপমৃত্যু ঘটেছে, কাব্যের মূল সুরেও কুসুর বেজে উঠেছে। প্রত্যয়দৃপ্ত ভঙ্গিতে লেখক যেটিকে মূল সুর বলে ঘোষণা করে ঐ সম্পর্কে সংশয়াকুল পাঠক সমাজকে লজ্জিত করতে চেয়েছেন, তার বিরুদ্ধে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের সুস্পষ্ট প্রতিবাদ ও সতর্ক বাণী, অবশ্যই লেখকের অবিদিত নয়। সুতরাং পাঠককে সরাসরি লজ্জিত করার ভঙ্গি না দেখিয়ে যদি তিনি রবীন্দ্র-ব্যাখ্যাত রাবণ ও মাইকেলের কবি-মানস যুক্তিতর্কের দ্বারা খণ্ডন করে দেখাতেন তবে পাঠক সত্যই উপকৃত হ'তো।

"যে ধর্মভীরুতা সর্বদাই কোন্‌টা কতটুকু ভালো ও কতটুকু মন্দ তাহা কেবলই অতি সূক্ষ্মভাবে ওজন করিয়া চলে, তাহার ত্যাগদৈন্য আত্মনিগ্রহ আধুনিক কবির হৃদয়কে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। স্বতঃস্ফূর্ত শক্তির প্রচণ্ড লীলার মধ্যে তিনি আনন্দবোধ করিয়াছেন। * * * যে অটল শক্তি ভয়ংকর সর্বনাশের মাঝখানে বসিয়াও কোন মতেই হার মানিতে চাহিতেছে না—কবি সেই ধর্মবিদ্রোহী মহাদম্ভের পরাভবে সমুদ্রতীরের শ্মশানে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন। যে শক্তি অতি সাবধানে সমস্ত মানিয়া চলে তাহাকে যেন মনে মনে অবজ্ঞা করিয়া, যে শক্তি স্পর্ধাভরে কিছুই মানিতে চায় না, বিদায়কালে কাব্যলক্ষ্মী নিজের অশ্রুসিক্ত মালাখানি তাহারই গলায় পরাইয়া দিল।" ('সাহিত্য', ১৩১৪)। মনে হয় [illegible] এই 'রাবণ'কে তথা এই কবি-মানসকে লেখক ঠিক হজম করতে পারেন নি। এই "অটল শক্তি"কে চিনে নেবার ক্ষমতা না থাকায় তিনি আর রবীন্দ্র-প্রসঙ্গে অথবা ঐ সম্পর্কে স্বাধীন মন্তব্যনিষ্ঠ মোহিতলাল-প্রসঙ্গে না গিয়ে, ভারতীয়তা-প্রতিপাদনের নিষ্কণ্টক পথেই পায়চারি করেছেন, আর অনর্থক এতোই চড়া সুরের নির্দেশ জারি করেছেন যার ফলে মাইকেলের রাবণ-ভাষ্য সম্পর্কে পাঠকের যথেষ্ট বিভ্রান্তি ঘটবার কারণ হয়েছে।

'ধুতুরার মালা যেন ধূর্জটির গলে।'

উপমাশ্রয়ী ভাষ্যকার সমগ্র রাবণ-চরিত্রের মর্মকেন্দ্র খুঁজে পেয়েছেন এই

একটি মাত্র উপমায় এবং এবিষয়ে তিনি দ্বিধাহীন বলেই লিখতে পেরেছেন,— "কবির এই একটি উপমাই এই প্রধান চরিত্রের অন্তঃপুরে প্রবেশের প্রবেশ-পত্র" (পৃঃ ১১৩)। উপমাটি যে মাইকেলের এক অনবদ্য সৃষ্টি তা বলাই বাহুল্য; কিন্তু ডাঃ ভট্টাচার্যের গ্রন্থে দেখা যায়, লেখকের মনগড়া ভঙ্গিতে এর ব্যঞ্জনার অদ্ভুত সম্প্রসারণ ঘটিয়ে একে রাবণ-চরিত্রের নির্ভুল সংকেতবাহী করা হয়েছে। সমগ্র প্রস্তাবটির রূপ :—

> "রাবণ-চরিত্রের বিরাটত্বের এক কোটিতে তার শৌর্য-সংঘাত-মুখর পৌরুষ, অপর কোটিতে তার এই শান্ত স্তব্ধ ও অনুতাপদগ্ধ মানবতা —এ দুয়ের সমবায়েই তার চরিত্রের সমুন্নতি। কবির এই একটি উপমাই এই প্রধান চরিত্রের অন্তঃপুরে প্রবেশের প্রবেশ-পত্র।"

দুই পৃথক 'কোটি' ও তাদের 'সমবায়' অবশ্যই উপমাটিতে প্রবলভাবে দ্যোতিত মনে হয়েছে লেখকের, তাই তিনি এমন প্রত্যয়-দৃঢ় কণ্ঠে 'প্রবেশ-পত্র' বলে রায় দিয়েছেন। কিন্তু 'অনুতাপ-দগ্ধ মানবতা'-র দ্যোতনা উপমান-পক্ষের কোন্ কোটিতে অনুসন্ধেয়,—ধুতুরায় না ধূর্জটিতে? এ অনুসন্ধান কি নিরর্থক নয়? উপমাটি যে পাঠকের ভালো লাগে, সে শুধু শিব ও তাঁর প্রিয় পুষ্প ধুতুরার সমবায়-জনিত এক শিবসুন্দর ভাবলোকের সংকেত জাগে বলে। নচেৎ 'ধুতুরার মালা' চিত্রটি আদৌ সুচারু নয়, কারণ, ধুতুরার গড়ন যাঁরা স্বচক্ষে দেখেছেন, তাঁরা জানেন, এ ফুল মালা গাঁথার পক্ষে আদৌ উপযোগী নয়, চিত্রশিল্পে বা মৃৎশিল্পে তাই একে শিবের কর্ণভূষণ রূপে দেখানো হয়ে থাকে। মাইকেলের কল্পনায় ধুতুরা এসেছে সাদা উড়নির (বিশদ উত্তরি) উপমান রূপে। ঔচিত্যের মাত্রা-বিচারে বলতে হয়, চিত্র সংগতি কিছুই নেই। যা আছে ভাব-সংগতি। সে যাই হোক, এইটিকে অবলম্বন করে ডাঃ ভট্টাচার্য্য রাবণের যে সব বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন, যথা, 'বিষদন্তহীন সর্পের মতই নিস্তেজ', (পৃঃ ১৩০) 'ভিক্ষুক রাবণ, নৈরাশ্য-মথিত' (পৃঃ ১৩১) ইত্যাদি, এবং এইসব নিয়েই ধূর্জটির উপমাটি যে তাঁর এতো 'সুসমঞ্জস' মনে হয়েছে, তাতে প্রশ্ন ওঠে, ধূর্জটির মধ্যে কি কোনো নৈরাশ্য-ব্যর্থতা-ঘটিত নিস্তেজ শান্তভাব আদৌ কল্পনীয়? ধূর্জটির উপমাকে আমরাও বলি সুন্দর, কিন্তু ঐ দৃষ্টিতে নয়, সংহৃতবেগ শক্তিধর সংযম-শান্ত ধূর্জটির মতোই এখানকার রাবণ,—এই জন্য। রাবণের উক্তির মধ্যে 'এই ভিক্ষা মাগে' কথাটি পেয়েই তাকে 'ভিক্ষুক রাবণ' বলে সাধারণ ভিক্ষুকের দলে ফেলে দেওয়া

হয়েছে, কিন্তু ভিক্ষাটি কী? "তিষ্ঠ তুমি সসৈন্যে এ দেশে সপ্তদিন···পুত্রের সৎক্রিয়া রাজা ইচ্ছেন সাধিতে যথাবিধি।" সমালোচক লক্ষ্য করেন নি, কবি তাঁর রাবণকে 'শৌর্যবীর্যহারা' 'বৈরাগ্যগ্রস্ত' 'সন্ন্যাস-ভাবাপন্ন' রূপে দেখাবার কোনো চেষ্টা করেন নি, রাজা-রূপেই দেখিয়েছেন—

বাহিরিলা পদব্রজে রক্ষঃকুল রাজা
রাবণ;

'ভিক্ষা' তার রাজোচিত—বীরোচিত, এ ভিক্ষা ভিক্ষুকের কাঙালপনা নয়, শক্তিমানের ক্ষুব্ধ-বিনয়-ভূষিত প্রস্তাব, যার অপরপ্রান্তে রয়েছে সপ্তদিনান্তে পুনরায় সমরক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হওয়ার অনুচ্চার দৃপ্ত প্রতিশ্রুতি। সুতরাং এ রাবণের স্বরূপ সঠিক ধরা পড়ে নি বর্তমান উপমাশ্রয়ী ভাষ্যকারের চোখে। তিনি ধুতুরার বৈরাগ্যেই দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। তবে অধিকতর আপত্তিকর তাঁর 'অনুতাপ-দগ্ধ' অনুশোচনা-খর্বিত রাবণ-চিত্র। মাইকেলের রাবণে 'উনিশ শতকীয় নবজাগ্রত বাংলার সভ্যতা-সংস্কৃতির পরিচয় সুপরিচ্ছন্ন' (পৃঃ ১৮) দেখবার উৎসাহে তিনি এতোই বিভোর, যে চরিত্রটি সম্পর্কে লিখেছেন 'প্রবৃত্তি-প্রধান উদ্ধত অহংবোধের আড়ালে অপকর্মজনিত অনুতাপ, অনুশোচনা ও আত্মবিশ্লেষণের পরিচয়ও আছে।' দৃষ্টান্ত :—

'কি কুক্ষণে (তোর দুঃখে দুঃখী)
পাবক-শিখা রূপিণী জানকীরে আমি
আনিনু এ হৈম-গেহে?" (১।১০২-৪)—(পৃঃ ১৮)

ভাষ্যকার যে মেঘনাদবধের রাবণকে আদৌ চিনতে পারেন নি, এটা তার আর একটি প্রমাণ। মাইকেলের রাবণ-চরিত্রের কুত্রাপি সাধারণ পাপীর অনুতাপ বা অনুশোচনা নেই। জানকী-হরণ তার পরদার-লালসা-জনিত পাপ নয়; বন্ধনী-মধ্যস্থ 'তোর দুঃখে দুঃখী' উক্তিটির যে কতোখানি গরজ বুঝেছিলেন কবি, তা ভাষ্যকার বুঝবার চেষ্টা করেন নি। বোঝেন নি যে, এরই মধ্যে কবি রাখতে চেয়েছেন তাঁর রাবণ-চরিত্রের বিশিষ্ট সংকেত। সে শক্তিমান ভ্রাতা, ভগিনীর অপমানের প্রতিশোধ নেওয়াই তার লক্ষ্য—সেই "অটল শক্তি"র পরিচয় দিয়ে। সে শুধু 'কুক্ষণ' বলে সেই ক্ষণ-টির উপর দোষারোপ করেছে,—সেই বিধি-বিড়ম্বনার প্রসঙ্গ ছাড়া আর কিছু নয়। মেঘনাদবধের

আছন্ত এই একই রাবণের চিত্র অক্ষুণ্ণ রয়েছে। পাপীর অনুতাপ নয়, বিধি-বিড়ম্বনার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ক্ষোভ, যেমন উল্লিখিত কাব্যের প্রথমাংশে, তেমনি উপসংহারেও :—

কি পাপে লিখিলা
এ পীড়া দারুণ বিধি রাবণের ভালে? (৯।৪০০)

'কি পাপে' বলে যে, প্রতিবাদ জানায়, তার মধ্যে পাপীর অনুশোচনা খোঁজা নিরর্থক। সুতরাং দেখা যায়, এ রাবণ উপমাশ্রয়ী ভাষ্যকারের কাছে রয়ে গেছে অপরিচিত। আর, গ্রন্থকারের এই যে দৃষ্টিবিভ্রম ও বিচারবিভ্রম, এরই ফলে এখানকার অনেক প্রস্তাব, যেমন, উপমায় মধুসূদনের কবি-মানস, তাঁর ভারতীয়তা, তাঁর হিন্দুসংস্কৃতিনিষ্ঠা, দেশাত্মবোধ বা জাতীয়তাবোধ প্রভৃতির অনেক ফাঁপাই বা মেকী ধারণা আলোচ্য গ্রন্থে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

———

পঞ্চম অধ্যায়

মাইকেলের দেশাত্মবোধ বা জাতীয়তাবোধ

[১] বঙ্কিম-বচনের ভ্রান্ত ভাষ্য

পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র ১২৮০ সালের ভাদ্র মাসের বঙ্গদর্শনে সদ্যোমৃত কবি-অগ্রজ মাইকেল মধুসূদন সম্পর্কে যখন লেখেন—

"জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও—তাহাতে
নাম লেখ "শ্রীমধুসূদন।"—

তখন তিনি ভাবতে পারেন নি তাঁর এই উচ্ছ্বাসটুকু অনেক মিথ্যার নিমিত্তের ভাগী হতে পারে। প্রধানত তাঁর ঐ মন্তব্যকেই পুঁজি করে পরবর্তী কালে এবং বিশেষ করে সাম্প্রতিক নানা সাহিত্যিক উদ্যমে 'মাইকেল ও জাতীয়তার জাগরণ' নিয়ে যে বিচিত্র আলোচনার বহর সৃষ্টি হয়েছে, স্বাধীনতাবোধ ও জাতীয় জাগৃতির উদ্‌গাতা রূপে মাইকেলের যে প্রশস্তির ধুম পড়ে গেছে, সেদিকে বঙ্কিমের দৃষ্টি যদি আকৃষ্ট হতো, তবে নিশ্চয়ই তিনি এই কলরব থামাবার জন্য দু'হাত উঁচিয়ে চীৎকার করে বলতেন, "ওহে, তোমরা থামো, থামো, আমি ঠিক ওই কথাই বলিনি, ওই উদ্দেশ্যেও বলিনি! ভালো করে প'ড়ে দেখো আমার গোটা লেখাটা, তা হলেই বুঝবে।" কিন্তু বাঙালী লেখক আমরা, কেবল বাঙালীর মতো আবেগ-পাগলই নই, লেখক সাজবার জন্যও পাগল। লেখক হওয়ার এক সোজা পথ হলো প্রশস্তি-রচনা, আর, 'উপরে' 'কাজ' করা। কাজ মানেই প্রশস্তি, এবং 'উপরে' (যথা—বঙ্কিমের উপরে, মাইকেলের উপরে ইত্যাদি)। এই 'উপরে'-র নেশায় 'ভিতরে' দৃষ্টি-সঞ্চালনের অভ্যাস চলে যাচ্ছে, বুঝি বা দৃষ্টি হচ্ছে পল্লবগ্রাহী। এছাড়া, প্রশস্তি-বুলি কোথাও একবার উচ্চারিত হলে, তার নির্বিচার আবৃত্তিযোগে আপন প্রশস্তি-সাহিত্যকে ফাঁপিয়ে তোলা, এই মহাজন-পন্থাও অনুসৃত হতে দেখা যায় ব্যাপকভাবে। তাই মাইকেলের 'উপরে' এমন অনেক লেখালেখি হয়েছে ও হচ্ছে যার সত্য যাচাই হওয়া বিশেষ দরকার।

যে মাইকেল নিজে কোনোদিন স্বাধীনতা, দেশাত্মবোধ বা জাতীয়তা নিয়ে

কোনো বড়োবহরের চিন্তার বশবর্তী হন নি, যাঁর রচনাবলীর সুপ্রশস্ত ভাণ্ডারে তল্লাসী চালিয়ে মাত্র একটি চতুর্দশ পঙ্‌ক্তির কবিতা "আমরা"-র দু'দণ্ডের জন্য ছাড়া আর কোথাও বিশুদ্ধ দেশাত্মবোধ বা গভীর স্বদেশভাবনার পরিচয় পাওয়া যায় না, তাঁকেই জাতীয় জাগৃতির কবি বলে ঘোষণায় যে এমন দামামা বাজানোর আয়োজন হতে পারে, এর চেয়ে বিস্ময়ের বিষয় আর কী আছে? অপ্রাপ্য প্রশংসায় প্রশংসিতকে লজ্জাই দেওয়া হয়। এমন কিছু কিছু ঘটনা অনেক নাম-করা মানুষের জীবনীতে স্থান পেতেও দেখা যায়; কিন্তু এই দামামা-ধ্বনি মাইকেলের কানে যদি যেতো, তবে সেই নিদারুণ নামের কাঙাল, দুর্দান্ত খ্যাতি-শিকারী মাইকেল মধুসূদনও এই অনুপার্জিত খ্যাতির প্রস্তাবে, বোধ করি, লজ্জায় মরে যেতেন। কিন্তু ভক্ত গবেষক সম্প্রদায়কে নিরস্ত করে কার সাধ্য? তাঁদের হাতে রয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাক্ষরিত লাইসেন্‌স্! সুতরাং তাঁরা ডিটেক্‌টিভ্‌ পুলিশের মতো অনুসন্ধান চালিয়ে মাইকেলের ঐ জাতীয়-চেতনা-গন্ধী কাব্য-ছত্রের টুকরো-টাকরা সংগ্রহের অথবা অলংকার-প্রয়োগের মধ্যে অনুরূপ মানস-স্পন্দন উদ্ধারের কার্যে ব্রতী হয়েছেন। আর বিখ্যাত মেঘনাদ-উক্তির অংশবিশেষ অবলম্বন করে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি গোটা ষষ্ঠ সর্গকেই যে 'বাঙালীর' জীবনবেদ বলে ঘোষণা করেছেন, সে তো এঁদের হাতের 'ট্রাম্প্‌ কার্ড'!

এ বিষয়ে প্রথম বক্তব্য, বঙ্কিমচন্দ্র ঠিক এই লাইসেন্‌সে স্বাক্ষর করেন নি। মাইকেলকে তিনি 'শ্রীমধুসূদন' বলে সম্মানিত করেছেন (যদিও অপরের দ্বারা সম্মানিত হওয়ার অপেক্ষা না করেই কবি স্বয়ং নিজেকে জাহির করে গেছেন 'শ্রীমধুসূদন' বলে), এবং এর মূলে তাঁর শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতা উক্তিটির মধ্যেই স্বপ্রকাশ। বাঙালীজাতির উন্নতির সহায়ক রূপেও তিনি মধুসূদনকে অভিনন্দিত করেছেন। কিন্তু এ সবই কবি হিসাবে, আর, বঙ্কিমের ভাষায়, 'জ্ঞানোন্নতি'-সাধনে বা 'বিদ্যালোচনা'য় উৎসাহী কর্মী হিসাবে। স্বাধীনতা-জাতীয়তার সংবর্ধক হিসাবে মধুসূদনকে তিনি অভিনন্দিত করেন নি। তা যদি করতে চাইতেন, তবে স্পষ্ট করেই তাঁর সে অভিমত ব্যক্ত করতেন, যেমন করেছেন নবীন সেনের ক্ষেত্রে। নবীন সেনের স্বদেশবাৎসল্যের উচ্ছলিত স্রোতকে বঙ্কিম বলেছেন "গৈরিক নিস্রবের ন্যায়"; বলেছেন, "যদি উচ্চৈঃস্বরে রোদন, যদি আন্তরিক মর্মভেদী কাতরোক্তি, যদি ভয়শূন্য তেজোময় সত্যপ্রিয়তা, যদি দুর্বাসাপ্রার্থিত ক্রোধ, দেশবাৎসল্যের লক্ষণ হয়,—তবে সেই দেশবাৎসল্য নবীন

বাবুর, এবং তাহার অনেক লক্ষণ এই কাব্য মধ্যে (পলাশির যুদ্ধ) বিকীর্ণ হইয়াছে।" ('পলাশীর যুদ্ধ' সমালোচনা, বঙ্কিম রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত)

কিন্তু মাইকেলের উদ্দেশে বঙ্কিম যা লিখেছেন, কবি-প্রশস্তিহিসাবে অপর যে কোনো কবির পক্ষে তা ঈর্ষার বস্তু হলেও, তার মধ্যে দেশপ্রেম বা জাতীয় চেতনার কোনো প্রসঙ্গ বা ইঙ্গিত নেই। তিনি বলেছেন, 'জাতীয় উন্নতির' বিভিন্ন 'সোপানে'র মধ্যে 'বিদ্যালোচনা'ও একটি। "বিদ্যালোচনার কারণেই প্রাচীন ভারত উন্নত হইয়াছিল, সেই পথে আবার চল, আবার উন্নত হইবে। কাল প্রসন্ন—ইউরোপ সহায়—সুপবন বহিতেছে দেখিয়া, জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও—তাহাতে নাম লেখ "শ্রীমধুসূদন"। অর্থাৎ ইউরোপীয় সহযোগিতায় বিদ্যাচর্চার পথ প্রশস্ত হতে চলেছে। মধুসূদন সেই পথের এক শক্তিশালী পথিক। বিদ্যাচর্চার সূত্রে তিনি জাতীয় উন্নতির বলিষ্ঠ সহায়ক। বলা বাহুল্য, এখানে পাশ্চাত্যের বিচিত্র সাহিত্যিক ভাবাদর্শের আমদানীতে মধুসূদনের হাতে বাংলা সাহিত্যের যে সমৃদ্ধি সাধিত হয়েছে তারই প্রতি বঙ্কিমের ইঙ্গিত। কেবল উচ্ছ্বাসভরে বাঙালী জাতিকে উৎসাহিত করেছেন জাতীয় পতাকায় মধুসূদনের নাম লিখে রাখতে, যেন বাঙালী ভুলে না যায়, এই পথেও, অর্থাৎ 'জ্ঞানোন্নতি'র পথেও জাতির উন্নতি সাধিত হতে পারে। আলোচ্য মন্তব্যটির অব্যবহিত পূর্ব প্রসঙ্গ লক্ষণীয় :—"চিরকালই কি বাহুবলই একমাত্র বল বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে? মনুষ্যের জ্ঞানোন্নতি কি বৃথায় হইতেছে? দেশভেদে, কালভেদে কি উপায়ান্তর হইবে না?" অতঃপর এসেছে পূর্বোক্ত জ্ঞানচর্চা বা বিদ্যালোচনার কথা। অর্থাৎ মাইকেলকে বঙ্কিম অভিনন্দিত করেছেন একজন intellectual হিসাবে, patriot হিসাবে নয়। আরো লক্ষণীয়, বঙ্কিম একই নিশ্বাসে মধুসূদনের নামটিকে স্মরণীয় বলেছেন আরো অনেকের সঙ্গে,—"স্মরণীয় বাঙালীর অভাব নেই। কুল্লুক ভট্ট, রঘুনন্দন, ...ভারতচন্দ্র.. প্রভৃতি অনেক নাম করিতে পারি। অবনতাবস্থায়ও বঙ্গমাতা রত্নপ্রসবিনী। এই সকল নামের সঙ্গে মধুসূদন নামও বঙ্গদেশে ধন্য হইল।" ('বঙ্গদর্শন' ভাদ্র, ১২৮০, পৃ. ২০৯-১০—'রচনাবলী' ২য় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ')

সুতরাং সতর্ক পাঠকের চোখে অবশ্যই ধরা পড়বে, দেশাত্মবোধ বা স্বাধীনতা-জাতীয়তার আদর্শ, বা ঠিক এই জাতীয় কিছুরই ইঙ্গিত বঙ্কিমের এই মন্তব্যের মধ্যে নেই।

যা নেই, তাকেই যে দামামা বাজিয়ে জাহির করা হয়, এর কারণ বোধহয় ঐ "জাতীয় পতাকা" শব্দটি, যাকে বঙ্কিম উচ্ছ্বাসভরে ব্যবহার করেছেন কেবল বাঙালী জাতির মনীষা-মার্গী উন্নতির সূচক হিসাবে, দেশপ্রেম বা প্রতীকরূপে নয়। Calcutta Review (No. 104, 1871) পত্রিকায় কবি মাইকেল ও তাঁর কাব্য সম্পর্কে বঙ্কিমের যে সমালোচনা বেরিয়েছিলো সেখানেও কুত্রাপি মাইকেলের জাতীয় চেতনা বা দেশাত্মবোধের কোনো প্রসঙ্গই স্থান পায় নি। সুতরাং কবির এই বৈশিষ্ট্য জাহির করবার জন্য স্তুতিপ্রবণতার আতিশয্যে ভক্ত-সমাজ আর যাই করুন, বঙ্কিমের নাম যেন না করেন। মাইকেলকে নিয়ে এক শ্রেণীর ভাববিহ্বল সমালোচনা সে যুগেও দেখা দিয়েছিলো; কেউ কেউ তাঁকে কালিদাসের সমতুল বলে ঘোষণা করেন—যে আবেগের ঢেউ ইদানীং কালের ভক্তমহলে আবার বুঝি জেগে উঠেছে—, কিন্তু ঐ Calcutta Review পত্রিকাতেই ঐ স্তুতি-বিহ্বলতা প্রশমিত করার প্রয়োজন-বোধে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সমালোচনায় ঐ অবিবেচনার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে স্পষ্টাক্ষরে জানিয়ে দেন "তাঁহার (মাইকেলের) রচনায় বিশিষ্ট গুণ আছে, স্বীকার করি; কিন্তু তাহা বলিয়া আমরা মহাকবিদিগের মধ্যে তাঁহাকে আসন প্রদান করিতে প্রস্তুত নহি।" (অনুবাদ—মন্মথনাথ ঘোষ, 'বাঙ্গালা সাহিত্য পৃঃ ৪২)

[২] ষষ্ঠ সর্গের মেঘনাদ-ঘটিত বিভ্রান্তি: সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ও শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য: কাব্যালংকার ও দেশাত্মবোধের নমুনা-বিচার।

দ্বিতীয়ত মেঘনাদবধের ষষ্ঠ সর্গ, এবং তত্রাপি চ মেঘনাদ-বিভীষণ সংবাদ, যত্র স্থান পেয়েছে বিভীষণের উদ্দেশে মেঘনাদের তিরস্কারের তৃতীয় ও শেষ ঝঙ্কার;—

—কোন্ ধর্ম্মমতে, কহ দাসে, শুনি;
জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি,—এ সকলে দিলা
জলাঞ্জলি? শাস্ত্রে বলে, গুণবান যদি
পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি
নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ, পরঃ পরঃ সদা! (৬।৫৮৩-৮৭)

এরই শেষের তিনটি লাইনের দিকে বিশিষ্ট দৃষ্টি রেখে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি বলেছেন, "মেঘনাদবধের ষষ্ঠ সর্গ বাঙালীর জীবন-বেদ হউক।" আর প্রবন্ধটির

অন্যত্র কবির 'দেশবাৎসল্যের' প্রসঙ্গও স্থান পেয়েছে। এর ফলে পরবর্তী কালের সমালোচনায় অনেকেই মাইকেলের স্বদেশভাবনার সাড়ম্বর আবৃত্তি করে চলেছেন। একে বঙ্কিমের উক্তির ভ্রান্ত ভাষ্যের প্রভাব, তার উপর, সমাজ-পতিমহাশয়ের এই সব মন্তব্য, এতে প্রশস্তিবাদী গবেষকগণ যে যথেষ্ট উৎসাহিত হবেন, এটাই স্বাভাবিক। সমাজপতিমহাশয়ও যে যথাযোগ্য সন্ধানী দৃষ্টি প্রয়োগ না করেই অভিমত প্রকাশ করেছেন তা এখনই প্রমাণিত হবে; তবে তিনি কিন্তু কবির 'দেশবাৎসল্য'কে নিয়ন্ত্রিত অর্থেই বুঝে নিতে বলেছেন। বলেছেন, **'স্বদেশী তন্ত্রে শ্রদ্ধাই দেশভক্তি'**। আর আদৌ যে মহাকবি মধুসূদনকে নিয়ে প্রবন্ধ রচনা করতে বসে তাঁকে এই সব কথা ব্যবহার করতে হয়, তার কারণ, তাঁর একটি মূল প্রতিপাদ্য হলো, 'সমবেদনা ও সহানুভূতিই কবির জীবন সার্থক করে; মাইকেল সেই সমবেদনা ও সহাভূতির উৎস ছিলেন', আর সেই কারণেই মাইকেল কবি ও তাঁর কাব্য অমর হতে পেরেছে। অতঃপর, এই সহানুভূতি-সমবেদনার দৃষ্টান্ত হিসাবে প্রবন্ধকার লিখলেন,—
"স্বদেশের ভাষায়, ভাবে তাঁহার—শুধু অনুরাগ নয়—সহানুভূতি ও সমবেদনা ছিল। সেই সহানুভূতি ও সমবেদনার সংগমে দেশবাৎসল্যের স্বর্গীয় কহ্লার সহস্র দলে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল।"

('মহাকবি মধুসূদন'—সমালোচনা-সংগ্রহ—কলিঃ বিঃ বিঃ)

বলা বাহুল্য, এ দেশবাৎসল্য পৃথক জিনিষ, স্বাধীনতা-জাতীয়তাবাদ এখানে নয়। এবং এটাও বলা বাহুল্য, কবি-সমালোচনায় যে ভাব-বিহ্বলতা বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক নিন্দিত হয়, সুরেশচন্দ্র তার হাত থেকে মুক্ত থাকতে পারেন নি। এর প্রমাণ, এদেশ-সেদেশের মহাকবিদের কাছে দত্ত-কবির বিপুল ঋণ সম্পর্কে ও তাঁদের রচনাংশ, তাঁদের ভাব আত্মসাৎ-করণ সম্পর্কে সেই একেবারে গোড়াতেই বঙ্কিমচন্দ্র সকলকে সজাগ করে দেওয়া সত্ত্বেও, আরও অনেকের মতো সুরেশচন্দ্রও মাইকেলের মৌলিকতা যাচাইয়ের কোনো চেষ্টা করেন নি। সেই উচ্ছ্বাস-বিহ্বলতায় ভাসিয়ে দিয়েছেন সমালোচকের দায়িত্ব। ষষ্ঠ সর্গের যে-অংশটির জন্য তিনি মাইকেল মধুসূদনকে বাঙালীর জীবন-বেদের ঋষি-মহিমায় মণ্ডিত করতে চেয়েছেন, যে ক'টি কথা বাঙালীর মনে 'আগ্নেয় অক্ষরে লিখিত থাকা'র প্রস্তাব করেছেন,—যেহেতু কেবল ঐ ভাবেই বাংলায় মধুসূদনের জন্ম সার্থক হতে পারে বলে তাঁর বিশ্বাস,—সে সমস্তই যে হুবহু গৃহীত হয়েছে বাল্মীকির রচনা থেকে, তা তিনি লক্ষ্য করেন নি,—করলে বুঝতেন, ঐ

রচনাংশে মাইকেলের মৌলিকতার কাণাকড়ি দাবীও স্বীকার্য নয়। মেঘনাদের ঐ বিখ্যাত উক্তিটির মধ্যে বাঙালীর জীবন-বেদ-মূল্যই থাকুক, আর জাতীয় জাগৃতির মন্ত্র-শক্তিই থাকুক, তার কৃতিত্ব বা গৌরব যা কিছু সবই বাল্মীকির প্রাপ্য। মাইকেলের আগেই মূল রামায়ণের অনুবাদক স্বনামধন্য মহাকবি কৃত্তিবাসের রচনাতেও স্থান পেয়েছে মেঘনাদের ঐ উক্তির সারাংশ খাঁটি কৃত্তিবাসী ঢঙে ও সুরে, এবং মাইকেলের রচনায় আলোচ্য দৃশ্যের কথোপকথনের নক্সায় এই কৃত্তিবাসানুসৃতি পূর্বেই দেখানো হয়েছে—('কৃত্তিবাসী ঋণের বহর'—৮ম পরিচ্ছেদের শেষাংশ দ্রষ্টব্য)।

সুতরাং এ যুগের প্রশস্তিবাদী সমালোচক যাকে উনিশ শতকীয় নবজাগৃতির মন্ত্র বলে চিহ্নিত করতে চান, সে মন্ত্রের ঋষি মাইকেল ন'ন, আদিকবি বাল্মীকি। প্রাচীন যুগেই তার সৃষ্টি, মধ্যযুগে কৃত্তিবাসের অনুবাদে স্বভাবতই তার পুনরাবৃত্তি, আধুনিক যুগে মাইকেলের কাব্যে আবার তারই যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তি, যাকে বুঝি আক্ষরিক অনুবাদও বলা চলে না, বলতে হয় সংগ্রহ মাত্র। এ অবস্থায় আলোচ্য মেঘনাদ-উক্তির মধ্যে নবযুগের জাগরণী বাণী খুঁজে পাওয়া, বা তারই ভিত্তিতে মাইকেলকে জাগৃতি-মন্ত্রের উদ্গাতার মহিমায় মণ্ডিত করা যে কী পরিহাসকর ব্যাপার তা অবশ্যই অনুমেয়।

কিন্তু তথাপি 'কাব্যালংকার ও কবিমানসে'র গ্রন্থকার আরও কতিপয় দুর্বল উদ্ধৃতির মধ্যে এই রচনাংশটিকেও সাজিয়ে নিয়ে (পৃঃ ১৫২) 'মধুসূদন-চরিত্রে' 'গঠনমূলক, দেশাত্মবোধক, জাতীয় চেতনার উন্মেষমূলক ভাব'-এর প্রতিষ্ঠায়, এবং 'স্বাধীনতা ও জাতীয়তাবাদের আদর্শ স্থাপনেও কবি মধুসূদন যে অন্যতম সার্থক পথিকৃৎ', এর স্বপক্ষে এমনই জোরালো ভাষায় ওকালতি করেছেন যে, তারই ধমকে সাধারণ পাঠকের ত্রস্ত হয়ে ওঠার কথা। অতএব, নিতান্ত প্রাসঙ্গিক বোধে ও বিচার-সৌকর্যার্থ পুনরুক্তি দোষ উপেক্ষা করেই এখানে সংশ্লিষ্ট বাল্মীকি-রচনাংশটি দ্বিতীয়বার উদ্ধৃত করতে হলো।

> ন জ্ঞাতিত্বং ন সৌহার্দং ন জাতিস্তব দুর্মতে।
> প্রমাণং ন চ সৌদর্যং ন ধর্মো ধর্মদূষণ॥
> শোচ্যস্ত্বমপি দুর্বুদ্ধে নিন্দনীয়শ্চ সাধুভিঃ।
> যস্ত্বং স্বজনমুৎসৃজ্য পরভৃত্যত্বমাগতঃ॥

ক্ব চ স্বজনসংবাসঃ ক্ব চ নীচপরাশ্রয়ঃ ॥
গুণবান্ বা পরজনঃ স্বজনো নির্গুণোঽপি বা।
নির্গুণঃ স্বজনঃ শ্রেয়ান্ যঃ পরঃ পর এব সঃ ॥

(যুদ্ধ—৮৭।১১-১৫)

লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, মাইকেলের যে ক'টি ছত্রকে তাঁর জাতীয়তাবোধের অকাট্য অবিস্মরণীয় প্রমাণ বলে আগেকার কোনো কোন সমালোচক মনে করেছেন, এবং বর্তমান গবেষক যা নিয়ে এত বাগাড়ম্বর করেছেন, তার মধ্যে উপরে উদ্ধৃত বাল্মীকি-রচনার বহির্ভূত একটি কথাও নেই। "গুণবান যদি পরজন…পরঃ পরঃ সদা,"—মাইকেলের এই অংশটি উল্লিখিত সর্বশেষ শ্লোকটির যে 'অবিকল প্রতিধ্বনি', এটা বালকেও ধরতে সক্ষম, স্নতরাং এই প্রমাণ-প্রয়োগের বলে বর্তমান গবেষক যে টিপ্পনী কেটেছেন "বাল-ভাষিত বলে মনে হয় না" (পৃঃ ১৫৩), সে টিপ্পনীর শোভনতা ও যৌক্তিকতা স্বধীজনের বিচার্য।'

প্রসঙ্গত বলতে হয়, কাব্যালংকারেই কবিমানসের বিচিত্র মহিমা-প্রদর্শনের উৎসাহে, আলোচ্য গ্রন্থে মাইকেলের দেশাত্মবোধ-"স্বাধীনতা-জাতীয়তাবোধের চেতনার" নিদর্শন রূপে একত্র যে পাঁচটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হয়েছে (পৃঃ ১৫২), তাদের একটিতেও কোনো 'অলংকারে'র মধ্যে মাইকেলের জাতীয়তাবোধ বা দেশাত্মবোধের পরিচয় ফোটে নি। প্রথমটিতে সীতাদেবীর বন্দী-দশা-চেতনা; নিতান্তই ব্যক্তিবিশেষের কথা। যে-কোনো মানুষ দুর্বিপাকবশত অপহৃত আবদ্ধ বা কারারুদ্ধ হলে, সেই অবরোধের জন্য যে দুঃখ প্রকাশ করে, এখানে তাই। কোনো বৃহত্তর ব্যঞ্জনার কল্পনা এখানে হয়তো করা চলতো যদি 'স্বর্ণ-পিঞ্জর' ও 'পিঞ্জরাবদ্ধ পাখী'র রূপকে রামচন্দ্র কর্তৃক আক্রান্ত কনক-লঙ্কার কোনো স্বাধীনতাকামী অধিবাসীর মুখে বন্দী-চেতনার প্রকাশ ঘটতো। কিন্তু এমন কোনো উদ্দেশ্য এখানে কবির পরিকল্পনা-বহির্ভূত। স্নতরাং এ নিতান্তই সীতাদেবীর ব্যক্তিবিশেষের অবরোধ-চেতনা; এর মধ্যে জাতীয় স্বাধীনতার কোনো প্রসঙ্গই আসতে পারে না।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে 'জন্মভূমি-চেতনা' আছে, কিন্তু 'অলংকার'-সূত্রে নয়। দৃষ্টান্তটি পরে বিস্তারিত আলোচনায় গৃহীত হবে। তৃতীয় ও চতুর্থ দুটি সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি। 'তব হৈম-সিংহাসন আশে/যুঝিছে কি দাশরথি? বামন হইয়া/কে চাহে ধরিতে চাঁদে?' (৩য়), অথবা 'এই যে লঙ্কা, হৈমবতী পুরী,/ শোভে তব বক্ষঃস্থলে, হে নীলাম্বুস্বামী,/কৌস্তুভরতন যথা মাধবের বুকে।' (৪র্থ)

—এ দুটির মধ্যে কোথায় যে 'স্বাধীনতা-জাতীয়তাবোধের চেতনা' থাকতে পারে, তা একমাত্র গ্রন্থকারই জানেন। 'কৌস্তুভ' শব্দে, বড় জোর, বক্তা রাবণের একটা মমত্ব প্রকাশ পেয়েছে বলে ধরা যেতে পারে। সৌন্দর্য-বর্ণনায় 'মাধবের বুকে কৌস্তুভে'র প্রসঙ্গ সংস্কৃত সাহিত্যে প্রচুর পাওয়া যায়। পঞ্চমে, অর্থাৎ পূর্বালোচিত মেঘনাদ-উক্তিতে, আর যাই থাক, পরিচ্ছন্ন কোনো অলংকার নেই।

কিন্তু 'উপমা মধুসূদনস্য'-খ্যাতি-মণ্ডিত মেঘনাদবধের একটি বিশিষ্ট উপমা-অলংকারে ঐ স্বদেশ-চেতনা কেমন ফুটেছে দেখানো যাক। দ্বিতীয় সর্গে রতির আহ্বানে রতি-পতি ছুটে এলো।

আইলা ধাইয়া
ফুল-ধনুঃ। আসে যথা প্রবাসে প্রবাসী,
স্বদেশ-সঙ্গীত-ধ্বনি শুনি রে উল্লাসে! (২।৩০৩-৫)

এই হলো উপমায় কবির স্বদেশ-প্রেমের প্রকৃতি! যেমন উপমার ঔচিত্য, তেমনি কবির দেশপ্রেমের কৌলীন্য! স্বদেশ-সংগীত-জনিত উল্লাস এবং মদন-বাঞ্ছার ডাকে মদনের উল্লাস হলো তুল্যানুতুল্য! উভয়ের ভাবমণ্ডলের কি সাদৃশ্য!

'মেঘনাদ-বধে'র মোট ছ'হাজার একানব্বই লাইনের সুবিস্তীর্ণ পরিসরে মাত্র একটি লাইনে ফুটেছে বিশুদ্ধ দেশপ্রেমের ভাবনা,—সমুদ্র-বক্ষে একটি বুদ্‌বুদের মতো,—ঠিক যেমন মাইকেলের সমগ্র কাব্যসৃষ্টির মধ্যে একটিমাত্র চতুর্দশপদী 'আমরা'।

জন্মভূমি রক্ষা হেতু কে ডরে মরিতে?

এই একটি লাইন। যদি মক্ষিকাবৃত্তিতে অনুসন্ধান চালানো যায়, তবে ঐ 'দেশ'-'জন্মভূমি'-বা-'স্বদেশ'-গন্ধী আরো দুটি উক্তি এই কাব্য থেকে নির্বাচিত হতে পারে।

(ক) 'দেশবৈরী নাশি রণে পুত্রবর তব
গেছে চলি স্বর্গপুরে; (১।৩৮০-৮১)

(খ) 'তব জন্মপুরে, তাত, পদার্পণ করে
বনবাসী!' (৬।৫৬২)

প্রথমটিতে একটা দেশপ্রেম-বোধক ভাবের হাওয়া রয়েছে ঠিকই, কিন্তু ঐ বোধের উদ্রেকসাধনে কবির কোনো সচেতন প্রয়াস এখানে নয়। পুত্রহারা

চিত্রাঙ্গদার মর্মন্তুদ বিলাপ ও সুচীমুখ গঞ্জনায় বিচলিত রাবণের মুখে এই যে উক্তি, এ কেবল রক্ষোরাজের আত্মপক্ষ সমর্থনের দুর্বল প্রয়াসের ফল, যে প্রয়াস অচিরেই ভেসে যায় চিত্রাঙ্গদার বিতর্কমূলক কঠোর জবাবে ও রূঢ় ভর্ৎসনায়,—"তবে দেশরিপু/কেন তারে বল, বলি ?" তা ছাড়া, সম্মুখ-সমরে প্রাণ বিসর্জনের ফলে স্বর্গপুরে যাওয়ার কথা কৃত্তিবাসের ঘনিষ্ঠ অনুসরণব্রতী মাইকেল কৃত্তিবাসেই পেয়েছেন প্রচুর ; 'বিপক্ষ সম্মুখে যদি সংগ্রামেতে মরি। দিব্যরথে চড়িয়া যাইব স্বর্গপুরী।' (পৃঃ ৩৫২) ; সুতরাং এর জন্যে কবির কোনো উনিশ শতকীয় প্রেরণার প্রয়োজন হয় নি। দ্বিতীয়টি উদ্ধৃত করার কারণ, সত্যিই যদি মেঘনাদবধের কবির স্বাধীনতা-জাতীয়তার উন্মেষক অভিব্যক্তিতে কাব্য-চরিত্র-গঠনের কোনো লক্ষ্য থাকতো, তবে তাঁর পক্ষে এখানে খুবই স্বাভাবিক ছিলো, 'জন্মপুরে'-র পরিবর্তে 'জন্মভূমে'-শব্দটির ব্যবহার। এ দুয়ের ধ্বনিগত পার্থক্য অবশ্যই কবি বুঝতেন। অনুরূপ দৃষ্টান্ত—

'বাঁধি দিব আনি তাত বিভীষণে
রাজদ্রোহী!' (৫।৪৬৪-৬৫)

কবি খুবই লিখতে পারতেন 'দেশ-দ্রোহী' ? লেখেন নি, যেহেতু 'দেশ-চেতনা' বা 'জন্মভূমি-চেতনা' ফলাও করে দেখানোর কোনো পরিকল্পনা তাঁর ছিলো না।

সুতরাং সেই একটি লাইনই মাত্র রইলো—'জন্মভূমি রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে ?'—মেঘনাদবধের কবি মধুসূদনের দেশাত্মবোধের সাক্ষ্যরূপে। এখন পরিস্থিতিটায় একবার দৃষ্টি দেওয়া যাক।

বীরবাহুর অকালমৃত্যুতে—'মহাশোকে শোকাকুল' রাবণ আপন শোকাবেগ সংবরণ করার প্রয়াসে, তাঁর পুত্র যে বীরোচিত মৃত্যু বরণ করেছে, এই ভাবনার বশবর্তী হতে চান। জন্মভূমির রক্ষাহেতু মরণে কেবল তারাই ভয় পায়, যারা ভীরু মূঢ় ; কিন্তু বীরবাহু যে তাদের দলে নয়, বীরেরই দলে, এতেই রাবণের সান্ত্বনা। অতঃপর কিন্তু ঐ একই ভাবমুহূর্তে দেখা যায়, রাবণের শোকবিহ্বলতা হয়ে রইলো প্রবলতর—"কেমনে ধরিব প্রাণ তোমার বিহনে ;"—এইখানেই ঐ ভাবের সমাপ্তি। চিত্রটি অবশ্যই সু-অঙ্কিত। রাবণের পিতৃ-সত্তার মর্মস্পর্শী আবেদন আমাদের মুগ্ধ করে। কিন্তু যে রচনাংশটির মূল উপজীব্য শোকার্ত পিতৃহৃদয়ের আলেখ্য, সেখানকার কেবল প্রসঙ্গত আবৃত্তি-করা ঐ পিতৃমুখের একটি ছত্র তুলে ধরে কি তাকেই কবি-মানসের এক মহামূল্য সংকেতবাহী

বলে জাহির করা চলে? বলা চলে কি—এরই মধ্যে "নিঃসংশয়ে ব্যক্ত হয়েছে," কবি-রচিত "স্বাধীনতা অর্জনের অমোঘ মন্ত্র", অথবা "বন্দেমাতরম্" মন্ত্রে বঙ্কিমচন্দ্র যেমন দেশমাতৃকার পূজায় জাতির মনকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, মধুসূদন এ মন্ত্রে জাতীয় জীবনের একই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছেন"? স্তুতির নেশায় বা স্তুতিবাদী রচনাভঙ্গিতে লেখক সাজবার নেশায় আমরা এতোই দিশেহারা, যে আতিশয্যের জ্ঞান তো নেইই, অধিকন্তু, স্বাধীন বিচারে অপরে যাতে এই দুর্বলতা ধরতে চেষ্টা না করে সেজন্য ধমক দিতেও ছাড়ি না— "স্বাধীনতা ও জাতীয়তাবাদের আদর্শ স্থাপনেও কবি মধুসূদন যে অন্যতম সার্থক পথিকৃৎ, এ কথাও আদৌ অতিশয়োক্তি বা বাল-ভাবিত বলে মনে হয় না।"(১) সম্পূর্ণ ভ্রান্তিগ্রস্ত হয়েও 'ওস্তাদি' ভঙ্গিতে আক্কেল-দেওয়া ভাষায় বঙ্কিমের দোহাই দিয়ে বলি,—"বাঙালী জাতিসাধারণ না চিনলেও জাতীয়তাবাদী, স্বাধীনতার মন্ত্রদাতা বঙ্কিমের দিব্যদৃষ্টিতে তাই অনেক আগেই ধরা দিয়েছিল মধুসূদনের কবি-প্রকৃতির এই জাতীয় রূপ" (১) একটু চাপান দিয়ে বলি—"জহুরী জহর চেনে"(১); ব্যস, আর সমস্ত মন্তব্য খতম!—সকলেরই মুখ বন্ধ করা হলো,—কে চায় 'অ-জহুরী'র কলঙ্ক কুড়োতে? আসলে জহুরী যে কবি-মাইকেলের ক্ষেত্রে কি ভাবে জহর যাচাই করেছেন, তা এই পরিচ্ছেদের প্রথমেই দেখানো হয়েছে। তুলনামূলকভাবে নবীন সেন সম্পর্কে বঙ্কিমের মন্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে; এবং এটাও ঠিক, যদি রঙ্গলালের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্র আর একটু প্রসন্ন হতেন, তবে তাঁর দৃষ্টিতে—

স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্ব-শৃঙ্খল বলো কে পরিবে পায় হে
কে পরিবে পায়?

এই উদাত্ত আহ্বানের মধ্যে দেশপ্রেম ও জাতীয়-চেতনামূলক কবি-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য হয় তো উপেক্ষিত হতো না। মেঘনাদবধের তিন বৎসর পূর্বে প্রকাশিত পদ্মিনী উপাখ্যানের এই বিখ্যাত অংশটি যে মাইকেলের ঐ একটি ছত্রের স্বগত আবৃত্তির চেয়ে দেশাত্মবোধের প্রকাশে অনেক বেশি শক্তিশালী ও স্বাধীনতাকামীর মুখে বহুল আবৃত্তিতে ধন্য হয়ে আছে, এ কথা সকলেই

(১) 'কাব্যালংকার ও কবিমানস' পৃঃ ১৫৩-৫৪—ডাঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য।

জানেন। অথচ এই পদ্মিনী-উপাখ্যান উপেক্ষা করে মেঘনাদবধের দেশাত্মবোধের জয়গান গাইবেন, এমন জহুরী বঙ্কিম সত্যিই ছিলেন না। অতএব বঙ্কিমের 'দিব্যদৃষ্টির' দোহাই দিয়ে যদি কোনো বিশেষ ভক্তমহল মেঘনাদবধের কবি মাইকেলের দক্ষিণে ও বামে দেশাত্মবোধের পাখা জুড়ে দিয়ে জাতীয়-স্বাধীনতার উচ্চাকাশে জাগৃতি-মন্ত্রের ঋষি-মহিমায় তাঁর বিচরণের ব্যবস্থা করেন, তবে অসত্যবিরোধী যুক্তি-তর্কের ঝড়ে ডানা-ভাঙা পাখীর মতো কবির যে বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী, তার জন্য তাঁরাই দায়ী হবেন।

[৩] জাতীয় জাগৃতির ইতিহাসে মাইকেলের স্থান-নির্ণয়ে চরম ভ্রান্তি :
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় :

কবিমানসের স্বরূপ কী সাক্ষ্য দেয় ?

আরো একটি প্রস্তাবের খণ্ডন আবশ্যক। কোনে কোনো বড়োমহলে এমন একটি ধারণার কথা পাওয়া যায় যে, সেই রেনেসাঁসের যুগের জাতীয় জাগৃতির চেতনা ও ভারতের পরাধীনতার বেদনাই মেঘনাদবধ কাব্যের আবহ-সংগীত রচনা করেছে। সিংহলের সমুদ্রতীরে ওই শত্রুকবলিত লঙ্কাপুরীর স্বাধীনতা-সংগ্রামের মধ্যে কবি পরাধীন ভারতের অনুরূপ সংগ্রামের আদর্শ জাগাতে চেয়েছেন। স্বদেশের পরাধীনতার বেদনাই যেন ঐ কাব্য-কাহিনীতে প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

বলা বাহুল্য, এ জাতীয় ভাষ্যে আমাদের জাতীয় জাগরণের ইতিহাসে 'মেঘনাদবধে'র কবির স্থান 'আনন্দমঠে'র রচয়িতার চেয়েও বুঝি অধিকতর গৌরবময় হয়ে পড়ে। কিন্তু সত্যকে অবিকৃত রাখতে হলে অবশ্যই বলতে হয়, এও সেই সমালোচনায় ভাববিহ্বলতার ফল, যার বিরুদ্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বহুপূর্বেই বাঙালী পাঠককে সতর্ক করে দিয়ে গেছেন। এ জাতীয় ভাষ্যে ভাষ্যকারেরই মহিমা ফোটে, কাব্যের বা কবির মহিমা ফোটানো অসম্ভব। কাব্যের মধ্যে যা নেই, কবি-কল্পনায় যাকে খুঁজে পাওয়া যায় না, এমন একটা মহিমার আরোপে পাণ্ডিত্য বা মননের আভিজাত্য ফুটতে পারে, হয়তো চিন্তাশীল পাঠককে কিছু নূতন চিন্তার খোরাকও দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু সত্য হয় বিড়ম্বিত, যার ফলে বিভ্রান্তির কুয়াসাই সৃষ্টি হয় খালি। মাইকেলের কবি-কল্পনার স্বরূপ-প্রকৃতি এমনই সহজ বিশ্লেষণযোগ্য যে, সেখানে এরূপ কোনো রূপকের বৃহৎ পরিমণ্ডলে পরিভ্রমণের কল্পনার অবসরই নেই। বাইরে থেকে

অমন কৃত্রিম কল্পনা চাপিয়ে দিতে গেলে কবি ও কাব্যকে অজস্র অসংগতির অভিযোগের হাত থেকে বাঁচানো দায় হবে। কবি-প্রতিভা বা কবি-কৃতি যে আদর্শ পরিণতির ঐ মাত্রা স্পর্শ করবার অনেক আগেই মাইকেলের সৃষ্টিতে নেমে আসে অকাল-সমাপ্তি, মনে হয়, এর কোনো প্রতিবাদ নেই। পরিণততর কাব্য-সমালোচনায় অভ্যস্ত একালের সমালোচক অতিরিক্ত প্রত্যাশায় সহজকে দুরূহ, সরলকে জটিল, সামান্যকে অসামান্য করে দেখানোতেই তৃপ্তি পেতে পারেন, কিন্তু তাতে মেঘনাদবধ ও তার কবি, উভয়েরই স্বরূপকে আচ্ছন্ন করে ফেলা হয়, অধিকন্তু অনর্থক নানা অসঙ্গতি-জনিত বিতর্কের অবসর রচনা করা হয়।

পরিস্থিতির স্ফুটতর অবধারণার জন্য এবং মন্তব্যটির সত্যতা প্রমাণের উদ্দেশ্যে এই শ্রেণীর আর একজন বিশিষ্ট সমালোচকের অভিমত এখানে পরীক্ষা করা যেতে পারে। দেখা যাবে, তিনিও সুরেশচন্দ্র সমাজপতির মন্তব্য এবং বঙ্কিম-বচনের ভ্রান্ত ভাষ্যের আলোর পথের পথিক। শিবপ্রসাদ চলেছেন অলংকারের লাল-কাঁকরের পথে—যা কেবল বিশেষের পক্ষেই খোলা, অসিতবাবু(১) চলেছেন সাহিত্যের ইতিহাসের জাতীয় সড়ক ধরে—যে পথ বাদ দিয়ে কারও সাধ্য নেই দূর পাল্লায় পাড়ি দেয়। মধুসূদনকে যুগবিশেষের শ্রেষ্ঠ কবি বলে প্রতিপন্ন করার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যাঁরা তাঁকে প্রায় যুগাবতার করে তুলতে চান, তাঁরা এই শক্তিশালী ইতিহাস-লেখককে তাঁদেরই অনুকূলে মন্তব্য করতে দেখে অবশ্যই খুসী হবেন। কিন্তু যা তথ্যসিদ্ধ নয়, এমন মন্তব্যে ইতিহাসেরই যে নিজস্ব মূল্য কমে যায়, এটাও তো ভাবা দরকার।

'মধুসূদন উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের নবজাগ্রত প্রতীক', এ কথায় আপত্তির কিছু নেই, কিন্তু অমনি 'সাহিত্যে'র সংগে সংগে যদি গোটা বাংলার বা বাঙালীর নবজাগরণ, যাকে জাতীয় জাগরণ বা national awakening বলে, কবিকে তারও প্রতীক করে তোলা হয়, তবে একটু বাড়াবাড়ি হয় বৈ কি। এই বাড়াবাড়ির মোহ এড়াতে না পেরেই বুঝি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-রচনায় প্রবৃত্ত লেখক ভাসিয়ে দিয়েছেন ঐতিহাসিক

সত্যনিষ্ঠাকে। মধুসূদনের ব্যক্তিগত জীবনের দুরন্ত ট্রাজেডি ও অনন্ত আশা-আকাঙ্ক্ষার মর্মন্তুদ সমাধির উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন, কবি যেন "নিজ বক্ষ-পঞ্জরে আগুন জ্বালাইয়া তাহারই আলোকে বাঙালীর ভবিষ্যৎ নিরূপণ করিয়াছেন।"(২)

এই 'বাঙালীর ভবিষ্যৎ' বলতে লেখক কী বুঝিয়েছেন, কী বা তিনি বোঝাতে চান, তা আমাদের মাথায় আসে না। মধুসূদনের সাহিত্যে বাঙালীর ভবিষ্যৎ নিরূপণের প্রয়াস কোথায় কিভাবে যে এতো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তা সত্যই সমীক্ষা-সাপেক্ষ। অবশ্যই মাইকেলের ঐ মহনীয় অবদান, তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্যরূপে পরিচিত 'মেঘনাদবধে'ই অনুসন্ধেয়। ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাই ঐ উদ্দেশ্যে পাঠকমানসকে প্রস্তুত করতে চেয়েছেন মেঘনাদবধ-সম্পর্কে। 'তিলোত্তমা'র সমালোচনা শেষ করেই তিনি লিখেছেন, মধুসূদনের মৌলিক প্রতিভার উল্লেখযোগ্য কোনো বৈশিষ্ট্য এই কাব্যে বিকশিত হতে পারে নি; 'সর্বোপরি মধুসূদন ইহাতে স্বকীয় জীবনদর্শন-গত কোনো অভিনব আদর্শ ফুটাইতে পারেন নাই।' বলা বাহুল্য, এই পরম বাঞ্ছিত আদর্শ যে মেঘনাদবধেই বিকশিত হয়েছে, এইটাই লেখকের প্রতিপাদ্য, এবং এখানে তারই ভূমিকা। মধুসূদনের 'স্বকীয় জীবন-দর্শন' বস্তুটি যে কী, কোথায় এর নিদর্শন, কি করেই বা তা এতো সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো, কিছুই আমরা বুঝি না। শুধু বুঝি, এর সবটাই প্রশস্তিমোহের ফল। প্রশস্তি রচিত হোক মাইকেলের উদ্ভাবনী শক্তির, অমিত্রাক্ষর ছন্দ-প্রবর্তনের বা অন্যান্য সাহিত্যিক ছাঁচ-রচনার অভিনবত্বের। উচ্চ কণ্ঠে ঘোষিত হোক 'এই ছন্দের মৌলিকতা মধুসূদনের সর্ববৃহৎ দান'; কিন্তু অমনি যে সঙ্গে সঙ্গে যুগস্রষ্টার বিচিত্র মহিমা আরোপিত করা হয় ঐ ছান্দসিক প্রতিভার উপর, সেইখানেই আপত্তির কারণ। পয়ারের নিগড়মুক্ত মাইকেলী ছন্দ 'উচ্চৈঃশ্রবার গতিবেগ' প্রাপ্ত হয়েছে, এ মন্তব্য প্রশংসার্হ; কিন্তু যেন 'উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালার জীবন ও বাণীর' উপযুক্ত প্রকাশের কাজেই ঐ ছন্দ ব্যয়িত হয়েছে, এমন মন্তব্যের মধ্যে বাড়াবাড়ি ধরা পড়ে বৈ কি! মধুসূদনের হাতে বাঙালীর উনিশ শতকী রেণেসাঁসীয় 'জীবন ও বাণী' রূপায়িত হয়েছে, এর সত্যই কোনো প্রমাণ নেই। মধুসূদন রেণেসাঁসের কবি ঠিকই, এবং রেণেসাঁসের কতিপয় লক্ষণও তাঁর মধ্যে ফুটেছে, যেমন ফুটেছে ঐ জাগৃতিযুগের প্রত্যেকটি কৃতী বঙ্গসন্তানের কর্মকৃতিতে পৃথক পৃথক ভঙ্গিমায় ও বৈশিষ্ট্যে।

(২) ঐ পৃঃ ১০২

কিন্তু এই যে মধুসূদন ও রেণেসাঁসকে নিয়ে গবেষণার জোয়ার তুলতে গিয়ে মধুসূদন ও তাঁর 'মেঘনাদবধ'কে গোটা রেণেসাঁসেরই মূর্ত প্রতীকরূপে তুলে ধরার প্রয়াস, একে এক কথায় অভিনন্দিত করা চলে না। কারণ, এর দ্বারা যেমন ব্যক্তি-মধুসূদন, তেমনি তাঁর কাব্যের ঘোরতর ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলিকে 'রেণেসাঁসের' নাম-প্রতাপের আচ্ছাদনে অকারণ প্রশ্রয় দেওয়া হয়। এ যেন মাইকেলের অনুকূলে 'রেণেসাঁসে'র নাম ভাঙিয়ে কারবার চালাবার মতো। কিন্তু যে অজস্র লক্ষণ বা উপাদান কোনো মহৎ সৃষ্টি-চরিত্রের পক্ষে ঘোরতর আপত্তিকর, তাদের যদি 'রেণেসাঁসের মূর্ত প্রতীক' বলে চালিয়ে দেওয়া হয়, তবে সেই রেণেসাঁসের স্বরূপ-মহিমার প্রতি সুবিচার করা হয় কি ?

বেশ বোঝা যায়, যে-মূলধন হাতে নিয়ে কারবার চালানো, তার মেকি চেহারাটা ধরা না পড়ায় মোহিতলাল-সমাজপতির মতো ডাঃ ব্যানার্জীরও দৃষ্টিবিভ্রম ঘটেছে। যাকে, উনিশ শতকী রেণেসাঁসীয় 'জীবন ও বাণী' বলা হয়েছে, সে 'জীবন'ও মধুসূদনের হাতের নয়, সে 'বাণী'ও তাঁর নিজস্ব নয়। উভয়ই আদিকবি বাল্মীকির, সুতরাং 'উনিশ শতকী' বলে চিহ্নিত হতে পারে না। জীবন-চিত্রের মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম 'প্রমীলা', যার উল্লেখ, বাল্মীকি বা কৃত্তিবাস, কোথাও নেই। কিন্তু উনিশ শতকীয় বাংলার সেই ক্ষীণ-পরিধির উপর-তলার মনীষা-জাগরণের মধ্যে সমাজস্থ নারী-জাগৃতির কি সত্যিই এমন লক্ষণ ফুটেছিলো যার প্রেরণায় 'প্রমীলা' রচিত হতে পারে? মাইকেলের প্রমীলার মধ্যে কি Andromakhe-Clorinda-র পাশাপাশি মহাভারতের 'প্রমীলা'রও প্রবল প্রকাশ থাকতে পারে না? সুতরাং সেই কবি-চিত্ত-ফুল-বনের 'ফুল'-আহরণের প্রদর্শনী-রচনা ছাড়া তো আর কিছু নয়? এ ছাড়া প্রমীলা-চিত্রটিতে বীররস-আদিরসের উদ্ভট রসায়ন তো আছেই। সুতরাং যাঁরা প্রমীলার মধ্যে সেই উনিশ শতকীয় নারী-জাগৃতির মহিমা প্রতিফলিত দেখতে চান, তাঁদের সেই দেখার কোনো সত্য-বা-তথ্য-ভিত্তি স্বীকার্য নয়।

আর 'বাণী'? তার বনিয়াদের কাঠামো তো সম্পূর্ণ ভ্রান্তিময়। 'মেঘনাদ-বধের ষষ্ঠ সর্গ বাঙালীর জীবন-বেদ হউক'—সমাজপতির এই ইঙ্গিতেরই আলোকে রচিত হয়েছে অসিতবাবুর বৃহত্তর বইয়ের মাইকেল-প্রশস্তি—'ইহাকে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী মানসের জীবন-বেদ বলা যাইতে পারে।' (পৃঃ ১০৭)। তিনি আরো লিখেছেন, 'উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর আকাশস্পর্শী আকাঙ্ক্ষা,

বিরাট জীবনের সমুদ্রসংগীত পান করিবার দুরন্ত অভীপ্সা এবং ঘনায়মান বাধাবিপত্তি ও বিনাশের মধ্যেও অপরাজেয় প্রাণশক্তির দুর্জয় ঐশ্বর্য তদানীন্তন বাংলাদেশের জীবন ও সংস্কৃতিকেই যেন প্রচ্ছন্নভাবে সমর্থন করিয়াছে' (পৃঃ ঐ)। দ্বিতীয় মন্তব্যটিতে মাইকেলের ব্যক্তি-জীবনের যে ইঙ্গিতময় নক্‌সা তুলে ধরা হয়েছে, সেটি প্রশংসনীয়; কিন্তু ওরই মধ্যে তদানীন্তন বাংলার জীবনের প্রতিরূপ অনুসন্ধেয়, এ প্রস্তাব কি যুক্তিসহ? যে 'আকাশস্পর্শী আকাঙ্ক্ষা' মধুসূদনের ছিলো, সেটা কি উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী সমাজেরই ছিলো বলে মনে করা যায়? রামমোহন বা বিদ্যাসাগরের জীবন-দৃষ্টি বা কর্ম-প্রেরণাকে তত্তৎ সমাজ-মানসেরই প্রতিফলন বলে মেনে নিতে, আশাকরি, কেউই সম্মত হবেন না। সুতরাং 'সমাজ-মানসের জীবন-বেদ' রূপে কাব্যকে প্রমাণিত করার জন্য কবির ব্যক্তি-চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের ঐ উল্লেখ নিরর্থক। আরো নিরর্থক এই কারণে যে কাব্যের সঙ্গে ঐ প্রমাণ্য বস্তুর কোনো অনিবার্য সংযোগ বা সংগতি নেই। সমালোচক অবশ্য তাঁর আলোচনার স্থানবিশেষে মধুসূদনের রাবণ-চরিত্র নিয়ে ঐ বাঙালী মানসের স্বরূপ-প্রকাশে চেষ্টিত হয়েছেন। লিখেছেন,

> "বিরাট চরিত্র, অনমনীয় পৌরুষ, দাম্ভিক বীর্য, এবং নিয়তির উপর জয়ী হইবার ব্যর্থ সাধনা রাবণ চরিত্রকে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী মানসের প্রতিনিধিতে পরিণত করিয়াছে।' (পৃঃ ১০৯)

বড়োই অদ্ভুত এই বিশ্লেষণ। প্রথমত, মাইকেলের সৃষ্টির সঙ্গে সেই বাঙালী-মানসের সংযোগ সাধন কবিরই পরিকল্পনা-বহির্ভূত। তাঁর ঐ রাবণ-চিত্রে মূলত রূপায়িত হয়েছে বাল্মীকি-কালিদাসের রাবণ (কৃত্তিবাসের নয়), সঙ্গে একটি আবেদন যুক্ত হয়েছে যা কবির নিজস্ব মৌলিক ভাবনাসঞ্জাত, সম্ভবত গ্রীক প্রভাবের ফলেই। সুতরাং ঐ বাঙালীর জাতীয় মানসের প্রতিনিধিত্ব, ওটি নিছক আরোপিত বৈশিষ্ট্য। তা ছাড়া, ঐ সবই (পূর্বোক্ত 'আকাশস্পর্শী আকাঙ্ক্ষা', 'দুরন্ত অভীপ্সা' বা 'অপরাজেয় প্রাণশক্তি', এবং এখনকার 'বিরাট চরিত্র', 'অনমনীয় পৌরুষ' ইত্যাদি) যদি হয় উনিশ শতকী বাঙালী মানসের বৈশিষ্ট্য,—প্রতিনিধিত্ব বলতে তাই বোঝায়,—তবে তো সে যুগে বাঙালী সমাজ উন্নয়নের এক আদর্শ পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিলো, বলতে হবে।

কিন্তু এটা কি সত্য? কী করে সমালোচক ভুলতে পারলেন মধুসূদনের সেই ইয়ং বেঙ্গল যুগ, কবির ব্যক্তিগত জীবনের আদর্শহীনতা, নীতিহীন

ছন্নছাড়া ভাবালুতা এবং সে যুগের বাঙালী সমাজের সাধারণ অবনমনের কথা—যার সাক্ষ্য বহন করছে এই মাইকেলেরই দু'টি শক্তিশালী রচনা—'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'? বাড়াবাড়ির মোহে এমনভাবে সত্যকে ভাসিয়ে দেওয়া অন্তত ইতিহাস রচয়িতার কাজ নয়। শক্তিশালী কবির প্রশস্তি-রচনা অবশ্যই মহৎ সাহিত্য-প্রয়াস; কিন্তু সে প্রশস্তি হওয়া চাই সত্যনির্ভর। মোহের বশে যদি কেবলই ফাঁপাই প্রশস্তির বড়ো বড়ো বেলুন গড়া হতে থাকে, তবে একদা সেগুলো যখন চুপসে যাবে, তখন অবস্থাটি হবে বড়োই করুণ।

যে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাকে অসিতবাবু নিজে বলেছেন "এই কাব্যের শ্রেষ্ঠ সমালোচনা" (পৃঃ ১১০), তার মধ্যে কোথাও নেই 'জাতীয় জীবন' বা 'বাঙালী সমাজ-মানসে'র প্রতিনিধিত্বের প্রসঙ্গ। স্বামী বিবেকানন্দও তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে 'ছুচ্ছুন্দরী বধ' জাতীয় নিন্দুকের হীন প্রয়াসকে তিরস্কৃত করে 'মেঘনাদবধে'র ন্যায্য মর্যাদাকে তুলে ধরবার জন্য ঐ সব 'জীবন-বেদ'-জাতীয় বুলির গরজ বোধ করেন নি। তিনি একে "বাঙ্গালা ভাষার মুকুটমণি" বলে অভিনন্দিত করেছেন।

রেণেসাঁসের ফল-ফসল বলে মাইকেল ও তাঁর কাব্যকে অবশ্যই আমরা বরণ করে নেবো, কিন্তু কোন জাতীয়তাবোধ বা জাতীয় জীবনের প্রতিনিধিত্বের পর্যায়ে নয়; 'রেণেসাঁসে'র মধ্যে যে 'নূতনে'র ব্যঞ্জনা প্রবলভাবে বর্তমান, বাংলা সাহিত্যে মাইকেলের নামাঙ্কিত বিচিত্র নূতন শাখায় তার বিচিত্র প্রবল প্রকাশই ঐ অভিনন্দনের কারণ। নূতন ছন্দ, নূতন কবিভাষা, সনেটের মতো নূতন জিনিষ, বীরাঙ্গনার মতো সম্পূর্ণ নূতন স্বাদের খণ্ডকাব্য (পত্রকাব্য), লিরিক কবিতার নূতন ঢঙ, নূতন নাটক,—আর এদেরই মধ্যে এদেরই মতো আরো একটি নূতন হিসাবে এক নূতন ছাঁচের মহাকাব্য (epicling) 'মেঘনাদবধ'—'তিলোত্তমায়' যার প্রয়োজনীয় শক্তিপরীক্ষা। সাহিত্যিক সৃষ্টির এই নূতনের ঢেউ—এরই মধ্যে খুঁজে পেতে হবে মাইকেলের রেণেসাঁস-চেতনাকে। কবিও মনে প্রাণে তাই চেয়েছিলেন। দেশাত্মবোধ বা জাতীয়তাবোধের কোনো বৃহত্তর পরিমণ্ডলের মর্মবাণীকে কাব্যায়িত করার কোনো চিন্তাই তাঁর মনে জাগে নি। ভারতের পরাধীনতার বেদনা তাঁর কাব্যে মূর্ত হয়ে উঠুক, কবির এমন কোনো কল্পনা থাকলে মেঘনাদবধ মহাকাব্যের দেহখানি এমন জোড়া-তালিতে গঠিত হতো না, পাওয়া যেতো

তার একটা নিজস্ব নিটোল গঠন ভাবে ও রূপে। শিল্পী স্বয়ং যখন বলে দিচ্ছেন, তাঁর প্রতিমা-রচনার মাল-মশলার রহস্য—'কবির চিত্তফুলবন মধু', বিশেষভাবে 'তুলি তব কাব্যোদ্যানে ফুল', তখন আমাদের স্বকপোলকল্পিত আদর্শের আরোপ ঘটিয়ে কবি ও কাব্যকে অবাঞ্ছিত বিচারের দরবারে টেনে আনা কেন?

কবিমানসের স্বরূপ কী সাক্ষ্য দেয়?

সত্যই যদি মাইকেলের মনে অমন কোনো উদ্দেশ্য থাকতো, তবে তিনি নিজেই তা প্রকাশ করতেন যেমন করেছেন তাঁর সৃষ্টির অন্দরমহলের অনেক খুঁটিনাটি কথা অসংখ্য চিঠিপত্রে। আসলে, এটা একটা আকস্মিক যোগাযোগ যে ঠিক ঐ যুগেই কবি মাইকেলের আবির্ভাব ঘটে এবং তিনি লংকা-সমর-কাহিনীকেই নির্বাচিত করেন 'বীররসে ভাসি মহাগীত' গাইবার বিষয়বস্তুরূপে। কেন এই নির্বাচন, এর উত্তরে যাঁরা কবিরই জাতীয়তার আদর্শবাদের ধুয়া তোলেন, তাঁরা বোঝেন না, সেটি একান্তই তাঁদের উদ্ভাবিত এক মহিমান্বিত প্রস্তাব ছাড়া আর কিছু নয়। আসল উত্তর কবি নিজেই দিয়েছেন এতো বেশি স্পষ্টভাবে তাঁর গ্রন্থ-সম্পর্কিত নানা মন্তব্যে নানাজনের কাছে যে, তার বাইরে আর কোনো নূতন প্রস্তাবের অবসর থাকতে পারে না। লংকা-সমর-কাহিনীকে ইলিয়াডের কাহিনী করে তোলাই (a regular Iliad) ছিল তাঁর লক্ষ্য, এর মাধ্যমে বাঙালীর জীবন-বেদ রচনা করাও নয়, নব-জাগৃতি-যুগের স্বাধীনতা-জাতীয়তার মন্ত্র গাওয়া অথবা বঙ্কিমের ন্যায় 'দেশ-মাতৃকার পূজায় জাতির মনকে উদ্বুদ্ধ করা'ও নয়। এখানে কী তাঁর ambition? উত্তর সুস্পষ্ট,—'It is my ambition to engraft the exquisite graces of the Greek mythology on our own'; কারণ,—ধর্মান্তরিত হলেও এবং হিন্দুধর্মের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হওয়ার কোনো গরজ না বুঝলেও, কাব্যের উপাদানরূপে হিন্দু-পুরাণের প্রতি কবির প্রগাঢ় আকর্ষণ,—I love the grand mythology of our ancestors'.—যদি পরাধীন ভারতের বেদনার গান গাওয়া বা ভারতকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করাই তাঁর লক্ষ্য হতো, তবে কি সেটা তাঁর ambition-এর আওতায় আসতো না? "Muses, before everything, is my motto!"—এ কবির প্রাণখোলা আত্মবিশ্লেষণ। কিন্তু তবু সমালোচকমহল সন্তুষ্ট ন'ন, কোনো

মহত্তর motto না দেখাতে পারলে তাঁদের শান্তি নেই। তাই মেঘনাদবধ ও তার কবিকে স্বাধীনতা-জাতীয়তার আন্দোলনের আসরে নামাবার জন্য এতো পীড়াপীড়ি! ambition বা motto, কোথাও যার নাম গন্ধ নেই অথচ যেটা এতো বড়ো একটা বৈশিষ্ট্য, তাকেই খুঁজে বেড়ানো বড়োই অদ্ভুত ব্যাপার। আর যদি সত্যই ঐ বৈশিষ্ট্য মেঘনাদবধ কাব্যে ফুটে থাকে তবে তো তা ফুটেছে সেই প্রাচীন যুগে মহর্ষি বাল্মীকির হাতেই; কারণ, এখানে-ওখানে কিছু 'exquisite graces of the Greek mythology'-র আরোপের অসার্থক বে-মানান প্রয়াস, বা খুশি-মাফিক সংযোজন-সংকোচন-বা বিকৃতি-সাধন (যথা—তস্করের পন্থায় লক্ষ্মণ-কর্তৃক নিরস্ত্র মেঘনাদের হত্যা) ছাড়া, মাইকেলের হাতে মূল কাহিনীর ছাঁচে বিশেষ কোনোই পরিবর্তন ঘটে নি। অতএব মেঘনাদবধ সম্পর্কে প্রস্তাবিত আবেদনটিকে আগে বাঁচাতে হবে anachronism-এর দায় থেকে, তার পর নির্ণয় করতে হবে শুধু প্রতিধ্বনি রচনার ভিত্তিতে জাতীয়তার উন্মেষ সাধনের কৃতিত্ব-হিসাবে মাইকেলের জন্য কী বরাদ্দ হতে পারে! অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, মহাকবি মাইকেলকে নিয়ে এই জাতীয় অপ্রীতিকর আলোচনার অবতারণা করতে হয়। কিন্তু এর জন্য সম্পূর্ণ দায়ী তাঁরাই, যাঁরা স্তুতিমুগ্ধতার বশে সত্যাসত্য উপেক্ষা করে অপ্রাপ্য মহিমার আরোপে কবি-মাইকেলের ও তাঁর কাব্যের স্বরূপ-প্রকৃতিকে নিজেদের মনগড়া ছাঁচে তুলে ধরে দেখাতে চান। হৃদয় ও মস্তিষ্কের সমস্ত শক্তি উজাড় করে মাইকেল যার সেবায় আত্মনিয়োগ করে ধন্য ও যশস্বী হতে চেয়েছিলেন, যার কল্যাণ ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন ছিল তাঁর জীবনের ধ্যান-জ্ঞান, সে হলো বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, বাংলা দেশ নয়। 'Our Bengali' নিয়েই তাঁর যত কিছু ধ্যান-ধারণা-চিন্তা-ভাবনা, 'Our Bengal' যে কোথাও তাঁর চিন্তা-জগতে মুখ্য স্থান পায় নি, তার প্রমাণ তাঁরই চিঠিপত্রাদি। "Believe me, my dear fellow, Our Bengali is a very beautiful language, it only wants men of genius to polish it up".—সর্বত্রই কবির এই একই কথা, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সেবায় আপন প্রতিভাকে ঢেলে দেওয়া। স্বাদেশিকতার যেটুকু স্পর্শ লেগেছে তাঁর রচনার এখানে-ওখানে, সে নিতান্তই গৌণভাবে কোনো আঙ্গিক বিশেষের পরিচর্যার খাতিরে। মেঘনাদবধে তো এ প্রসঙ্গের স্থানই নেই, এমন কি, চতুর্দশপদীর যে কয়েকটি এই আলোচনার অঙ্গীভূত হতে পারে তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রচনাটি নিয়ে মন্তব্য প্রসঙ্গে যোগীন্দ্রনাথ বসুর মতো

মধুসূদন-পূজারীও কবিকে জাতীয়-জাগৃতির ঋষি-ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্ন দেখেন নি। 'আমরা' কবিতাটির কিয়দংশ উদ্ধৃত করে তিনি লিখেছেন, "এখন যে বাঙ্গালা সাহিত্যে স্বদেশ-ভক্তিমূলক কবিতার প্রাচুর্য লক্ষিত হয়, তাহার উদ্ভব রঙ্গলালের ও তদ্‌পরে মধুসূদনের লিখিত এই সকল (ভারতভূমি ও আমরা) কবিতাতেই হইয়াছিল। কবিবর হেমচন্দ্র ইঁহাদিগের পরবর্তী।" অতি সঙ্গত ও যথাযথ তাঁর এই মন্তব্য থেকে শিক্ষা সংগ্রহ করলে এ যুগের অত্যুৎসাহী গবেষক উপকৃত হবেন। চতুর্দশপদীতে কবিমানসের স্বাদেশিকতার যে পরিচয় ফুটেছে, তা পৃথকভাবে সমালোচ্য। মেঘনাদবধে যে জাতীয়তার উন্মেষ-বিধায়িনী কোনো পরিকল্পনা কবিকে বিব্রত করে নি, অথবা অনুরূপ কোনো প্রেরণায় তিনি বিড়ম্বিত হন নি, এইটাই প্রথম প্রতিপাদ্য। আশা করি, এতক্ষণে এবিষয়ে একমাত্র যাঁরা প্রশস্তিমোহাচ্ছন্ন, তাঁরা ছাড়া আর সকলেরই কাছে এটা যথেষ্ট প্রতিপন্ন হয়েছে। সমসাময়িক মনীষীদের বা কবির বন্ধুবর্গের কারও কোনো লেখালেখির মধ্যে কবিমানসের এই ভাবটির যে কোনো উল্লেখ দেখা যায় না, এর মধ্যেও সত্যের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট।

সত্যটিকে আর একটু অবারিত করে দেখানো যেতে পারে। মাইকেলের মতো প্রকৃতির কবি-মানসের স্বরূপ মাথা ঘামিয়ে উদ্ধার করার অবসর কোথায় যখন তিনি নিজে তাঁর প্রত্যেকটি সৃষ্টির মৌল প্রেরণার কথা জানিয়ে গেছেন অত্যন্ত স্পষ্ট করে? একদিকে তাঁর প্রাণপ্রিয় বাংলা-ভাষার সেবা, আর একদিকে কবিযশ অর্জন, এই দুয়ের বাইরে আর কোনো লক্ষ্যই তাঁর ছিলো না। [এখানে আমরা তাঁর অপরাপর লক্ষ্যগুলিকে অপ্রাসংগিক মনে করি যথা—ইংরাজ (খ্রীষ্টান) রমণীকে বিবাহ, ইংরাজের দেশে গমন, ইউরোপীয় ভাষায় অধিকারলাভ, প্রভূত অর্থোপার্জনে প্রতিপত্তিলাভ ইত্যাদি।] নামী কবি, নামী সাহিত্যস্রষ্টা হওয়ার কামনাই তাঁর জীবনের আদিম কামনা, শ্রেষ্ঠ কামনা। এই কামনাতেই তিনি সাহিত্য-জীবন সুরু করেন ইংরেজি দিয়ে। ইংরেজি ছেড়ে বাংলায় আসার মূলে ঐ একই কামনা। বাংলায় তিনি আদৌ কেন লেখা-লেখির অভ্যাস করবেন, নিজের কাছে এর জবাবে তাঁর যে কৈফিয়ৎ তার সার-কথা ঐ 'নাম'। সকলেই জানেন, মাইকেলের হাতের অমিত্রচ্ছন্দের প্রথম প্রকাশ 'পদ্মাবতী' নাটকে। এই পদ্মাবতী-সংক্রান্ত কবিমানসের অন্তঃপুরের কথা—

"If I can achieve myself a *name* by writing Bengali. I ought to do it." (গৌরদাস বসাককে লিখিত পত্র, ১৯ মার্চ, ১৮৫৯)।

শুধু 'পদ্মাবতী'তে নয়, এই হলো মাইকেলের সমগ্র কবিমানসের হাড়মজ্জার কথা। তিনি নাম চেয়েছেন। বলা বাহুল্য, তার ফলেই আমরা হয়েছি উপকৃত, আমাদের ভাষা ও সাহিত্য হয়েছে অসামান্য সমৃদ্ধির অধিকারী।

'বঙ্গভূমির প্রতি'-কবিতাটিকে অনেকে হয়তো মাইকেলের সুগভীর দেশ-প্রেমের দলিল বলে তুলে ধরবেন। কিন্তু ইংলণ্ড-যাত্রার প্রাক্কালে রচিত এই কবিতার মূল সুর—একটা পাগলের মতো আবেদন (frantic appeal), যেন তাঁর কবি-যশ তাঁর অনুপস্থিতিতে লুপ্ত না হয়,—'ফুটি যেন স্মৃতিজলে' ;—এই ফোটার পরিবর্তে যদি তাঁর অর্জিত যশটুকু মলিন স্তিমিত হতে থাকে, তবে বুঝি তাঁর এত সাধের বিলেত-যাওয়ায় কোনো সুখ থাকবে না। বন্ধুবর রাজনারায়ণকে লিখিত যে চিঠিতে ঐ কবিতা প্রথম স্থান পায়, তাতেই কবি বন্ধুকে জানাচ্ছেন, 'Remember your friend and take care of his *fame*'; এই কথার পরেই ঐ কবিতা,—আর কবিতা শেষ হতেই ভালো করে বুঝিয়ে দিয়েছেন, "Here you are, Old Raja—All that I can say is—"মধুহীন করো না গো তব মনঃ কোকনদে" (জীঃ চঃ পৃঃ ৫২৯)। সুতরাং দেশপ্রেম নয়, যশ-হারানোর আতঙ্কই এর প্রেরণার উৎস। কবির পক্ষে কবি-যশ-কামনা খুবই স্বাভাবিক। কালিদাসও নিজেকে পরিচিত করেছেন 'কবিযশঃপ্রার্থী' বলে। কিন্তু দৈন্য-বিনয়-নম্র সেই ঐকান্তিক প্রার্থনার কী মহিমা!

মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্।
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ ॥

মাইকেল এর যান্ত্রিক অনুকরণ করতে ছাড়েন নি—কোথা আমি মন্দমতি অকিঞ্চন?' 'ভেলায় চড়িয়া কে পারে হইতে পার অপার সাগর?' (তিলোত্তমা)। বাল্মীকি-বন্দনায় (মেঘ-৪র্থ) এই মর্মে দৈন্য-প্রকাশও হয়েছে যথেষ্ট, কিন্তু সে সবই একটা কবি-প্রকাশের ঢঙ। প্রকৃত মনোগঠনে দেখা যায়, প্রত্যেকটি সৃষ্টিতেই এই কবির প্রয়োজন হয়েছে প্রচণ্ড নামের তাগিদ।

'কৃষ্ণকুমারী' সম্পর্কে কেশব গাঙ্গুলীকে লিখিত পত্রে কবিকে বলতে শোনা যায়, 'Should we ever have a national Drama, and that Drama a future historian to commemorate its rise and progress, may he associate my humble name with yours!' (জীঃ চঃ পৃঃ ৪৪০) সেই নামের অভীপ্সা।

আর্টের রকমারি লীলায় বাংলা সাহিত্যকে ভরিয়ে বাহাদুরি দেখাবার নেশাই মাইকেলের নেশা। এ হলো বিশুদ্ধ আর্টিষ্টিক নেশা, এ্যাকাডেমিক্ নেশাও বলা যায়। এই নেশায় বাধা পেলেই তাঁর গোঁসা হতো। যেমন, ঐ কেশব গাঙ্গুলীকে লিখিত আর এক পত্রে প্রহসন দু'খানি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে মাইকেল লিখেছেন,—'Mind you, you all broke my wings once, about the farces; if you play a similar trick this time, I shall forswear Bengali and write books in Hebrew and Chineese'. (জীঃ চঃ পৃঃ ৪৬৯)। নামের জন্যই মাইকেলের সর্বস্বপণ। অবশ্য নাম যে তিনি চেয়েছেন কামের বিনিময়ে, উপযুক্ত সৃষ্টির বিনিময়ে, এটা খুবই সত্য। এর জন্য তাঁর পরিশ্রমের অন্ত নেই, উদ্ভাবনে স্ফূর্তিরও অন্ত নেই। এই যে এখানে কবি ভয় দেখিয়েছেন, বাংলা ছেড়ে তিনি চলে যাবেন অন্য ভাষায়, তা সে হিব্রু হোক, বা চীনাভাষাই হোক, এটি তাঁর মতো এ্যাকাডেমিসিয়ানের পক্ষে শূন্যগর্ভ হুংকার নয়। তবে এই ধরণের মন্তব্য থেকে তাঁর মনোগঠনের যে একটা খাঁটি খবর পাওয়া যায়, তা হলো, বাংলার প্রতি তাঁর দরদ খাঁটি শিল্পীয় দরদ, আর তার মূলে আছে তাঁর শিল্পী হিসাবে খ্যাতিমান হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ, যেহেতু বাংলা তাঁর মাতৃভাষা, আর সে ভাষা প্রভূত উন্নতির সম্ভাবনায় ভরা। এই এ্যাকাডেমিক বা শিল্পীয় দরদকেই প্রশস্তি-ফুৎকার যোগে বাড়িয়ে জাতীয় দরদ বা ন্যাশানাল দরদ বলে ধরলে, আর, তাই থেকে সেটাকে বাঙালীর মুক্তি-আন্দোলনের একটা মহাপুরুষোচিত মহিমার মর্যাদায় তুলে ধরতে গেলে অবশ্যই ভুল হবে। এজাতীয় কোনো মহত্বের অধিকারী যিনি হবেন, তার মুখে কখনও 'I shall forswear Bengali and write books in Hebrew and Chineese' এমন কথা বেরুতে পারে না। যাঁরা ইন্দ্রজিতের হত্যাদৃশ্য রচনার মূলে মধুসূদনের যে সুগভীর আন্তরিক দরদ, সে দরদকে স্বাধীনতা-সংগ্রামী বীরের প্রতি শ্রদ্ধাজনিত বলে মনে করেন এবং তার অকাট্য প্রমাণ হিসাবে দেখাতে চান কবির নিজস্ব উক্তি —"It cost me many a tear to kill him"—তাঁদের লক্ষ্য করতে বলি, 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের নায়িকা কৃষ্ণকুমারীর আত্মহত্যা-দৃশ্য সম্পর্কেও কবি একইভাবে জানিয়েছেন তাঁর মনের কথা:—"I shed tears when poor Kissen Cumari stabbed herself and fell on her bed." উভয় অশ্রুপাতের মূলে একই কবিমানস স্পন্দিত। শুধু তাই নয়, ঐ মেঘনাদবধেই

কবি যে কেবল মেঘনাদের জন্যই অশ্রুপ্লুত হয়েছেন, তা নয়, হয়েছেন প্রমীলার জন্যও, হয়েছেন লক্ষ্মণের জন্যও।—"I can tell you that you have to shed many a tear for the glorious Rakhasas, for poor Lakshana, for poor Promila." (জীঃ চঃ পৃঃ ৪৮৪)। যেখানেই করুণ সংঘটন, সেখানেই করুণরসের দাবীতে কবিচিত্ত বিগলিত। তাই তো সঙ্গে সঙ্গে কবিকে বলতে হয়, "I never thought, I was such a fellow for the pathetic।" সুতরাং সর্বত্রই সেই একই কবিমানস স্পন্দিত, সে হলো দরদী শিল্পী-মানস। ইন্দ্রজিতের ক্ষেত্রে সেখানে কোনো nationalism-এর রং-চড়ানো নিরর্থক।

মাইকেলের সৃষ্টিমাত্রেরই মূলে যে নিজের ভাষার উন্নতিসাধন, সাহিত্যের সম্পদবৃদ্ধির প্রবল অনুরাগ ছিল সক্রিয়, সে কথা বলাই বাহুল্য ; কিন্তু তারও মূলে যে বস্তুটি যুগিয়েছিল দুর্দান্ত প্রেরণা, তা হলো, নামের জন্য প্রচণ্ড উন্মাদনা।

তখন মেঘনাদ চলছে। সঙ্গে চলছে আরো অনেক কিছুর মহড়া। কবি অস্থির-চিত্ত। কারণ সময়াভাব। "I wish to God, I had time. Poetry, the Drama, Criticism, Romance—a man would leave a name behind him, 'above all Greek, above all Roman fame." (জীঃ চঃ পৃঃ ৩১৯)। রাজনারায়ণকে 'সমালোচনা'য় উৎসাহিত করার প্রসঙ্গে কবির অন্তরের এই 'name' and 'fame'-এর উন্মাদনার অভিব্যক্তি।

ঐ পত্রেই আছে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গে ভিতর থেকে ঠেলে-আসা বড়াই-করা উক্তি—অনেকটা প্রাসংগিকতার অভিযোগ অগ্রাহ্য করেই যে, তাঁর স্থান রঙ্গলালের ঊর্ধ্বে:—"He is a touchy fellow, but, I have no doubt, is ready to allow that, as a versifier, I ought to hang my hat a peg or two higher than he." (ঐ পৃঃ ৩১৮)।

মেঘনাদবধ প্রথম সর্গ শেষ করতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই মাইকেলের চাই বাংলার এযুগ-সেযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ-কবি-স্বীকৃতির রাজমুকুট। রাজনারায়ণের অভিমত প্রার্থনা উপলক্ষে কবির মনের কথা,—"Whether you place the brightest laurel-crown on his head (the brightest of all the crowns yet worn in Bengal) or kick out from the holy temple

of fame as an impudent intruder, you will find your humble friend a very submissive dog !" (ঐ পৃঃ ৩৩০) পাঠক, আশা করি, শেষাংশের বিনয়ের ঢঙ দেখে বিভ্রান্ত হবেন না।

নামের অতিরিক্ত উন্মাদনায় মানুষকে যে নেমে যেতে হয় মনস্বিতার উঁচু ধাপ থেকে, সেটা মাইকেল গ্রাহ্য করতেন না। দু'হাতে কুড়িয়ে বেড়িয়েছেন তাঁর প্রশংসার বুলি, আর সেগুলো অপরের কাছে জাহির করে আত্মপ্রশংসায় হয়েছেন নিয়তই স্ফীতবক্ষ। রাজনারায়ণকে লিখিত পত্র :—"Old father John Long is decidedly taken up with Blank Verse. He told Gour the other day ;—'In the course of four or five years Dutt will, if spared, revolutionise the language of your Country !" (ঐ পৃঃ ৪৭৯)

ঐ একই মনের অধিকতর দাম্ভিক প্রতিফলন 'মেঘনাদবধ' সম্বন্ধে :—"The Poem is rising into splendid popularity. Some say it is better than Milton—but that is all bosh—nothing can be better than Milton. Many say it licks Kalidas ; I have no objection to that. I don't think it impossible to equal Virgil, Kalidas and Tasso." মন্তব্যটির নিজস্ব মূল্য যাচাই করার স্থান এখানে নয়। এরই মধ্যে কবিমনের স্বরূপটা, অর্থাৎ তাঁর কাব্যসৃষ্টির লক্ষ্যটা যে ভীষণ স্পষ্ট ও প্রবলভাবে প্রকাশ পেয়েছে, সেইটারই আমাদের প্রয়োজন। নামী কবি হিসাবে তাঁর স্থান-নির্ণয়ের এই উন্মত্ত ব্যাকুলতা জানিয়ে দেয়, নামই তাঁর আদিম ও প্রধান কাম্য। সমসাময়িক বঙ্গলালের চেয়ে কতো ইঞ্চি উপরে তাঁর হ্যাটের আইনসম্মত স্থান, অন্যান্য সমসাময়িকেরা কতো অধম এবং ঘৃণ্য ("the majority of the 'barren ruscals' that write books in these days of literary excitement"—(জীঃ চঃ পৃঃ ৩১০), ভারতচন্দ্র এবং আরো আগেকার বঙ্গকবিগণ তাঁর কাছে কতো অযোগ্য অপদার্থ তুচ্ছ বা হীনরুচি—[(ক) 'I have actually done something that will teach the future poets of Bengal to write in a strain very different from that of the man of Krishnanagar—the father of a very vile school of poetry' (ঐ), (খ) 'I have thrown down the gauntlet, and proudly denounced those,

whom our countrymen have worshipped for years, as impostors, and unworthy of the honours heaped upon them !' (ঐ পৃঃ ৩২৩), (গ) 'It is the vile imagination of poetasters (জয়দেব-বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস প্রমুখ বৈষ্ণব কবি সমাজ !) that has painted her (রাধা) in such colours' (রাজনারায়ণকে পত্র, ১৮৬১, ২৯ আগস্ট)], ভর্জিল-কালিদাস-ট্যাসোর তিনি সমকক্ষ—যদিও মিলটনের স্থান তাঁর উপরে,—এই ভাবে নাম-যশের চুল-চেরা অথচ খামখেয়ালী বিচার নিয়ে যে-কবি এমন বিব্রত, তাঁর কবি-লক্ষ্য যে কী ছিলো, তা কি কারো কাছে অস্পষ্ট থাকতে পারে ? যে মেঘনাদবধের মধ্যে সমালোচকেরা জাতীয় জাগরণমূলক নবযুগের বাণী-প্রচারের মহান কবি-আদর্শ সন্ধান করেন, স্বয়ং কবি সেটাকে অপ্রয়োজনীয় কাগজের মতো অসংকোচে পুড়িয়ে ফেলতে রাজী, যদি লোকে বলে ওটা কবিযশের উপযোগী দামী কাব্য হয় নি,—'I ought to rise higher with each poem. If you think the Meghnad destitute of merit, why ! I shall burn it without a sigh of regret.' (জীঃ চঃ পৃঃ ৩২৩) ।

"How are you, old boy, a Tragedy, a Volume of Odes, and one-half of a real Epic poem ! All in the course of one year ; and that year only half-old ! (জীঃ চঃ পৃঃ ৪৮৯)—এই যে প্রতিভার খেলা-দেখানো, এতেই মাইকেলের কবি-মানসের চরম উল্লাস। এই খেলোয়াড়ী মনের বলেই তিনি সৃষ্টি করেছেন বৈচিত্র্য, যা পেয়ে বাংলা সাহিত্য ধন্য। তাই আমরা বলি, এই লীলা-মানসই মাইকেলের কবি-মানস, এর বাইরে কিছু নয়। সেখানে চোখ দিলেই দেখা যাবে, ঐ খেলা-দেখানোর সঙ্গে সর্বদাই রয়েছে নাম-বাজানোর ও শক্তি-জাহিরের উৎকট দাম্ভিকতা। যেমন, ঐ পত্রেই রয়েছে,—

"I am thinking of blazing out in prose *to reduce to cinders* the impudent pretensious of the "*mob of gentlemen*" who pass for great authors ! Great anthors !! great *fiddle-sticks* !!" (ঐ পৃঃ ৪৮৯)

কী জঘন্য মনোগঠন ! যাঁরা মাইকেলকে বিচিত্র মহৎ-অবদানের স্বর্গীয় উৎসরূপে জাতীয় মহাপুরুষ করে তুলতে চান, মণ্ডিত করতে চান তাঁকে জাতীয়

জাগরণের ঋষি-মহিমায়, তাঁরা লক্ষ করুন, সেই মহাপুরুষের মনোগঠনটি কেমন? কোনো বড়ো শক্তির মধ্যে একটা গর্ব থাকতেই পারে, কিন্তু ঔদ্ধত্যেরও সীমা থাকা উচিত। ডাইনে-বাঁয়ে সাহিত্য সতীর্থদের সকলকে 'Rascal' বলা সমসাময়িক গদ্যলেখকদের অকারণ 'Non-sense' (fiddle-sticks) বলা, জয়দেব-বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসাদি বৈষ্ণব পদকর্তাদের 'Vile poetasters' বলা, অষ্টাদশ শতকের কবি-সম্রাট ভারতচন্দ্রের উদ্দেশে 'the man of Krishnanagar—the father of a very vile school of poetry' বলে ব্যঙ্গ ছিটানো (যদিও ব্যঙ্গকর্তা স্বয়ং আদিরসের জঘন্য মাদকতায় কাব্যের যত্রতত্র আপত্তিকর উৎপাত চালিয়ে গেছেন), অথবা বাংলা সাহিত্যে সমস্ত প্রাচীন কবিদের কাব্যক্ষেত্রে 'ভণ্ড অপদার্থের দল' (impostors, unworthy of honours heaped upon them) বলে স্পর্ধা-নিক্ষেপের মধ্যে কী মহৎ কবি-মানসের বীজ থাকতে পারে? থাকতে পারে বাজিমাৎ-করা খেলোয়াড়ী মনের পরিচয়। খেলার নেশায় মাতাল হয়ে শিল্পী অন্ধ হয়ে পড়ে জীবনের অপরাপর দিকে। মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিতেও ছাড়ে না। মাইকেলের জীবনেতিহাস ঐ অন্ধতারই ইতিহাস। খেলা-সর্বস্ব খেলোয়াড়ের মতোই তিনি আজীবন মদ্যপানে, নারীর নেশায়, অসংযত উচ্ছৃঙ্খল জীবনের নীতি-আদর্শ-হীনতায় নিমজ্জিত থেকে শিল্পচর্চা করে গেছেন। বন্ধু বা প্রেমাস্পদের কাছে হৃদয়বান, কিন্তু হৃদয়খানির উৎস যে মাতাপিতা, বাংলাদেশের ছেলে হয়েও সেই উৎসের প্রতি হৃদয়হীনতা, চরম অশ্রদ্ধা ঐ উচ্ছৃঙ্খল মাতাল-চরিত্রেরই পরিচায়ক। ঋণ-পরিশোধের ক্ষমতা নেই, অথচ ঋণ-গ্রহণে নির্বিকার, এবং এরই পুঞ্জীভূত প্রতিক্রিয়ার বিভীষিকায় শেষ জীবনে শুধু মদ আর মদ! কীটস্ চেয়েছিলেন মদের সাহায্যে নাইটিংগেলের কাছে পালিয়ে যেতে, কিন্তু পারেন নি, মাইকেল ঋণভারগ্রস্ত স্বীয় দুষ্কর্মচেতনাপীড়িত জীবন থেকে পালিয়ে বাঁচেন মদেরই সাহায্যে, কারণ তাঁর মনে হয়েছিলো, আত্মহত্যার ঐটাই সহজ পথ—'This is a process equally sure but less painful' (জী: চ: পৃ: ৬০৩), ভুলের মাশুল তাঁকে দিতে হয়েছে কড়ায়-গণ্ডায়। 'less painful' হয়নি, পানাসক্তি দেহটাকে করেছিলো দুরারোগ্য ব্যাধির আকর। তাই শেষের দিনগুলি কাটে জীয়ন্তে নরকভোগের মতো। এ নরকের তিনিই স্রষ্টা।

এমন একটা নীতি-বল্গাহীন মানুষের কাছে মহৎ চিন্তার প্রত্যাশা? কিন্তু তবু আমরা এই মাইকেলের মধ্যে খুঁজে পেয়েছি জাতীয় মহাপুরুষকে!

চোখের উপর দেখছি "চার্বাকদর্শনের জলাধবক্ষে তাঁহার ভরাডুবি,"(১) কিন্তু তবু দমি না, যুক্তি দেখাই—"মহাপুরুষের ব্যক্তিগত জীবন সর্বদা মহৎ হয় না"(২)। মহত্ত্ব-বর্জিত মহাপুরুষ, বড়োই অদ্ভুত প্রস্তাব! এই মাইকেলের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছি আমরা অবশ্য-তর্পণীয় "জাতীয় পিতৃপুরুষকে"—চৈতন্যদেবের সঙ্গে একই আসনে স্থাপনযোগ্য জাতীয় পিতৃপুরুষ!(৩)—প্রশস্তি মন্ত্রের এমনই যাদুশক্তি!

জীবন ও কাব্যের মধ্যে অমিল থাকতেই পারে। কিন্তু যে মানস-প্রতিফলন কাব্যের মধ্যে অনুসন্ধান করা হয়, তার আদলটা জীবনের মধ্যে খুঁজে পাওয়াই স্বাভাবিক। মাইকেলের চারিত্রিক উচ্ছৃঙ্খলতা তাঁর কাব্যেও প্রকটিত নানা উদ্ভট খেয়ালীপনায়। তাই তো সেখানে সংগতি-সৌষ্ঠবের এত অভাব,—অভাব স্থিতধীর মতো কোনো আদর্শ-রূপায়ণের। এ অবস্থায়, জাতীয় জাগৃতি-চিন্তা বা দেশপ্রেম-চর্চার মতো কোনো চিন্তাধারা মাইকেলের মতো মনোগঠনে কখনোই স্থায়ী হতে পারে না। বড় জোর, ঐ খেলার ছলে খেয়ালের বশে ঐ বিষয়ের একটা মৌহূর্তিক বিদ্যুৎঝলক খেলে যেতে পারে। বস্তুত মাইকেলের কাব্যে আমরা এর বেশি আর কিছুই দেখি না। মূলত দেখি সেখানে অত্যাশ্চর্য সাহিত্যিক লীলা-বিকাশের প্রদর্শনী।

তাই আমরা সর্বান্তঃকরণে অভিনন্দন জানাই মাইকেলকে সেই সাহিত্যের খেলার চ্যাম্পিয়ান রূপে। বিভিন্ন বিভাগের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের প্রাপ্য সব কটি স্বর্ণপদক একত্রে মালা গেঁথে পরিয়ে দিই তাঁর কণ্ঠে, আর—ঐ জয়মাল্যে ভূষিত কবিকে তাঁর খেলাচ্ছলে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের অভাবনীয় সমৃদ্ধি-সাধনের জন্য উচ্ছ্বসিত আনন্দের সঙ্গে অপরিমেয় কৃতজ্ঞতা মিলিয়ে বলি—'সেই ধন্য নরকুলে, লোকে যারে নাহি ভুলে'—কবি, তোমার এই কামনা ব্যর্থ হয় নি। তুমি ধন্য। বাঙালী তোমায় ভোলে নি, ভুলবে না, ভুলতে পারে না। বাঙালীর মনঃকোকনদ মধু-হীন হয় নি, কোনোদিন হবেও না।

কিন্তু এই কবি-বরণ বা শিল্পীবরণকে জাতীয় জাগৃতির ঋষিবরণ বা জাতীয় মহাপুরুষের বরণে রূপান্তরিত করা চলে না।

(৪) 'চতুর্দশপদী-কবিতাবলী'-তে দেশাত্মবোধের সন্ধানে

[আলোচনার এই শাখায় স্থানবিশেষে মৎসম্পাদিত 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' গ্রন্থের কতিপয় অংশ গৃহীত হয়েছে।]

(ক) প্রস্তাবনা

মাইকেলের স্বদেশানুরাগের প্রশ্নটিকে আরো যে একটি আসরে ঘোরালো করে তোলার আয়োজন হয়ে থাকে, তা হলো চতুর্দশপদীর আসর। প্রথমেই বলা আবশ্যক, নিজের দেশের নৈসর্গিক পরিবেশের খুঁটিনাটিকে ভালোবাসা, অথবা পৌরাণিক আখ্যান-উপাখ্যানকে ভালোবাসার মধ্যে যে দেশানুরাগ প্রকাশ পায়, তা যে মাইকেলের মধ্যে ছিল বেশ প্রবল ভাবেই, এতে কোনো সন্দেহ নাই।

তবে এই কবির ক্ষেত্রে বাঙালীর ও হিন্দুর বিচিত্র নিজস্ব সম্পদ বা বৈশিষ্ট্যের প্রতি অনুরাগের ব্যাপারটি নিয়ে এতো বাড়াবাড়ির কারণ, একদিকে কবির ধর্মান্তরগ্রহণ, আর একদিকে ইউরোপে প্রবাস-যাপন। বাঙালী মধুসূদন, হিন্দু মধুসূদন, যে খৃষ্টান হন, অথবা বিলেতে গিয়ে বিলেতী সাহেব হতে চান, এটাই মধুসূদনের এত প্রশস্তি অর্জনের কারণ হয়েছে। নচেৎ বাঙালী হয়ে কবি বাংলাকে ও বাঙালী জীবনকে—তার সংস্কৃতি, তার ঐতিহ্য, তার উৎসব-অনুষ্ঠানাদি—ভালোবাসবেন, এতে আর আশ্চর্য কি? খ্রীষ্টান তিনি হয়েছিলেন, হিন্দুধর্মের প্রতি জাতক্রোধ ও খ্রীষ্টধর্মের মহিমার প্রতি ঐকান্তিক আকর্ষণের জন্য নয়; এর কারণ, যৌবনের উদ্দাম আবেগে তিনি এক অতি প্রবল ইংরাজ নেশা ও ইংরেজী-নেশার বশবর্তী হন। এর ফলেই ঘটে—ইংরাজ নারীর পাণিগ্রহণ, ইংরেজ মহলে ঘনিষ্ঠ মেশামেশি, ইংরাজী সাহিত্যের নিবিড় পাঠ ইত্যাদি। বিলেতে গিয়ে বিলেতী পণ্ডিত-মহলের ঘনিষ্ঠ পরিচয়লাভের উন্মাদনা এবং হোমর, দান্তে, মিল্টন্ জাতীয় শ্রেষ্ঠ পাশ্চাত্য কবিদের সমকক্ষ হওয়ার স্বপ্নও মধুসূদনকে খ্রীষ্টধর্মগ্রহণে প্রবলভাবে অনুপ্রেরিত করে থাকবে। বস্তুতঃ, ধর্মীয় সংস্কার বা মানস-চেতনার দিক দিয়ে মধুসূদন যে মোটামুটি হিন্দুই ছিলেন এমন ধারণা করবার যথেষ্ট কারণ আছে। সুতরাং তাঁর কাব্যে হিন্দু পুরাণ-সংস্কৃতি বা হিন্দু-জীবনের আচার-অনুষ্ঠান, পূজা-পার্বণের প্রতি মমতার পরিচয় দেখে সেই পরিচয়কে বিশেষভাবে দেশপ্রীতি বা দেশাত্মবোধের পরিচয় বলে মনে করার সংগত কারণ নেই। বিলাত-গমন বা প্রবাস-যাপনের জন্য দেশানুরাগ

স্ফুটতর হওয়ার কী কারণ থাকতে পারে? প্রবাসী বাঙালীর পক্ষে স্বদেশ ছেড়ে দূরে থাকতে হওয়ায় বাংলার ও বাঙালীর নানা কথা স্মরণ করে বিচলিত হওয়াই তো স্বাভাবিক? দূরে সরে গেলেই স্মৃতিতে নানাকথা উদিত হবে, এই তো আমাদের মনের ধর্ম, চিন্তাশীল কবিমানসের পক্ষে এটা আরও বেশী স্বাভাবিক। প্রকৃতপক্ষে চতুর্দশপদী কবিতাবলীর অধিকাংশই রচিত হয়েছে স্মৃতিচারণা-সূত্রে। সুদূর ফ্রান্সে অবস্থানকালে কবির মনে পড়েছে বাংলাদেশের শ্রীপঞ্চমীর কথা, আশ্বিন মাসের দুর্গোৎসবের কথা, বিজয়া দশমী, কোজাগর লক্ষ্মীপুজোর কথা, ছোটবেলায় দেখা নিশাকালে নদীতীরে বটবৃক্ষতলে শিবমন্দিরের কথা, অথবা স্বীয় জন্মপল্লী সাগরদাঁড়ির পাশ দিয়ে প্রবাহিত কপোতাক্ষ নদের কথা। সংবেদনশীল কবিমানসের পক্ষে এই তো স্বাভাবিক।

আমরা এমন বলতে চাই না যে, এই স্মৃতি-চারণার কোন বৈশিষ্ট্য নেই, অথবা স্বদেশের প্রকৃতিকে বা স্বজাতির জীবনধারাকে ভালোবাসার জন্য কবির কোন বিশেষ প্রাপ্য নেই। নিসর্গ-প্রীতির মতো স্বদেশীয় জীবন ও সংস্কৃতিকে ভালোবাসা কবি-মাত্রেরই পক্ষে স্বাভাবিক হ'লেও, কাব্যে এই প্রীতি ও অনুরাগের প্রকাশ যেখানেই ঘটে, দরদী পাঠক সেখানেই সশ্রদ্ধচিত্তে কবিকে অভিনন্দিত করেন। এই সশ্রদ্ধ অভিনন্দন মধুসূদনের প্রাপ্য প্রভূত পরিমাণে। কিন্তু আমরা পূর্বেই বলেছি, যে-দেশানুরাগ একটি বৃহত্তর ব্যঞ্জনা বহন করে, যার মধ্যে দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবোধ থাকে প্রবল, ইংরেজীতে যাকে বলে Patriotism বা National spirit, সেই দেশানুরাগ মধুসূদনের মধ্যে কোথাও পরিস্ফুট নয়। এর জন্য যে মানস-গঠন, যে মনন-ধারা, তা মধুসূদনের ছিল না।

মাইকেলের কবিমানস অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, সেখানে কোন গভীর বিষয়ের ভাবনা বেশিক্ষণ স্থান পাওয়ার মত তার গঠন নয়। খাঁটি দেশানুরাগ বা স্বদেশভাবনা একটা গভীর ও গম্ভীর বিষয়। এর প্রতি যদি মাইকেলের কোনো আকর্ষণ থাকতো, তবে তাঁর মত অধ্যয়নানুরাগী মনীষী ভারত-ইতিহাসের কতো মূল্যবান তথ্যই না কাব্যায়িত করতেন। গভীর স্বদেশ-ভাবনা বলতে যা বোঝায়, মাইকেল যদি তার বশবর্তী হতেন, তবে অবশ্যই এই ভারতের জাতীয় জীবন বা রাষ্ট্রীয় জীবনের অজস্র স্মরণীয় ঘটনা বা তৎসংক্রান্ত ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বীর-চরিত্রগুলির অন্তত দু'চারটি নিয়ে তিনি কিছু কাব্যসৃষ্টি

করতেন। শিবাজী বা রাণাপ্রতাপকে নিয়ে, হলদিঘাট, পানিপথ বা পলাশীকে নিয়ে, ঝাঁসীর রাণী বা সিপাহীবিদ্রোহ নিয়ে এত বিপুল বিচিত্র সনেটের আসরে কি একটি চোদ্দ লাইনের কবিতার স্থান হতো না? এমন কি, স্বয়ং নীলদর্পণের ইংরেজী অনুবাদ করে দিলেও, দেখা যায়, কবির নিজস্ব কাব্যলোকে ঐ দর্পণের কোনো প্রতিচ্ছায়া পড়তে পারে নি। কাছাকাছি মানুষের মধ্যে যাঁরা সমাজের হয়ে, জাতির হয়ে সংগ্রাম করেছেন, তাঁদের মধ্যে রামমোহনের মত যুগ-পুরুষের প্রতিও মাইকেলের দৃষ্টি পড়ে নি। এমন কি, বিদ্যাসাগরকে নিয়ে এখানে তিনটি সনেট রচিত হলেও, তাদের একটিতেও বিদ্যাসাগরের বৃহত্তর সমাজ-চিন্তার কোনো প্রসঙ্গই নেই, অথচ করুণরসপ্রবণ যাঁর কবিহৃদয়, সেই মাইকেলের লেখনীমুখে ঐ মহাপুরুষের মহত্ত্বের পরিচয়ে বাল-বিধবার অশ্রুমোচনের একটি ক্ষীণ আভাস সহজেই ফুটতে পারতো। কিন্তু তা যে ফোটে নি তার কারণ মাইকেলের কবি-মানসের গঠনই ভিন্ন ধরণের। তাতে সমাজ-চিন্তা বলে কোনো দিনই কিছু ছিলো না। যেখানে সমাজের জন্য চিন্তা নেই সেখানে কোনো গভীর স্বদেশ-ভাবনা প্রত্যাশা করা বৃথা।

(খ) নির্বাচিত কবিতাগুলির আবেদন বিচার: একটি মাত্র সার্থক নমুনা—'আমরা'

চতুর্দশপদী কবিতাবলীর বিপুল বৈচিত্র্যময় আয়োজনের মধ্যে একটিমাত্র কবিতা খুঁজে পাওয়া যায় যেখানে কবির বিশুদ্ধ দেশাত্মবোধ পেয়েছে অখণ্ড অভিব্যক্তি। কবিতাটির নাম 'আমরা' (৯৩)। এ ছাড়া আরও যে সব কবিতাকে এই প্রসঙ্গে আলোচনার অঙ্গীভূত করা হয়, তাদের মধ্যে আছে পরিচয় (১৪), কপোতাক্ষ নদ (৩৫), কোজাগর লক্ষ্মীপূজা (৫৩), ভারত-ভূমি (৯১) ও সমাপ্তে (১০৩)।

'পরিচয়' কবিতাটির প্রারম্ভিক সুরের মধ্যে দেশানুরাগের জমক আছে, আর আছে ভারতের শ্রেষ্ঠ নদী জাহ্নবী ও শ্রেষ্ঠ পর্বত হিমালয়ের আবেগময় বর্ণনা। সনেটের সংক্ষিপ্ত পরিসরের বিবেচনায় এতেই কবির দেশপ্রীতির পরিচয় যথেষ্ট বৈ কি! কিন্তু উপসংহারে এসেই বুঝতে হয়, এ কবিতার প্রেরণার উৎস দেশপ্রেম নয়। চোদ্দ লাইনের কবিতার সাড়ে তেরো লাইনে কবি যে 'পরিচয়' দিলেন তার মূল উদ্দেশ্য তাঁরই এক প্রণয়িনীর প্রণয়-আকর্ষণে সাফল্যের প্রস্তুতি। "তেঁই প্রেমদাস আমি, ওলো বরাঙ্গনে!" এই উক্তিই তার প্রমাণ। প্রকৃতপক্ষে ১৪নং ও ১৫নং দুটো কবিতা একই মানস-উদ্যোগে

রচিত। প্রথমটি দ্বিতীয়েরই ভূমিকা। "তেঁই প্রেম-দাস আমি, ওলো বরাঙ্গনে" প্রথমটির এই উপসংহার, ও "কে না জানে কবি-কুল প্রেম-দাস ভবে" পরবর্তী কবিতাটির এই আরম্ভ লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়, এই দুটি কবিতারই সম্মিলিত আয়োজন কোনো এক বিদেশিনী প্রণয়িনীর প্রণয়-আকর্ষণের। দ্বিতীয়টির শেষার্ধে "কামের নিকুঞ্জ এই" বলে শুরু করে কবি প্রেয়সী নারীর দেহগত সৌন্দর্য ও তার খুঁটিনাটি বিশ্লেষণে যেভাবে আসর জমিয়েছেন তাতে ভূমিকাস্থানীয় প্রথম কবিতাটির প্রথমদিকে স্বদেশানুরাগের যে একটি সুর বেজেছিলো তা কুণ্ঠিত ও বিকৃত হতে বাধ্য।

'কপোতাক্ষ নদে'র সনেট-খ্যাতির প্রধান কারণ, অনেকের কাছেই, মধুসূদনের দেশপ্রেমের অভিব্যক্তি। এর প্রমাণ-স্বরূপ উদ্ধৃত হয়ে থাকে, "দুগ্ধস্রোতোরূপী তুমি জন্মভূমিস্তনে" এই সুরচিত পংক্তিটি। তাছাড়া, "কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে?" এই ছত্রটিকেও ঐ প্রস্তাবের অনুকূলে নেওয়া হয়। কিন্তু 'কপোতাক্ষ নদে'র এই 'জন্মভূমি', আসলে কবির পল্লীমাতা। স্বীয় জন্মস্থান যে সাগরদাঁড়ি নামক গ্রামখানি, যেখানে বালক-কবির স্পর্শকাতর হৃদয় কতোই না অজানা আবেগে স্পন্দিত হয়েছে, সেই গ্রামকে ঘিরেই প্রবাহিত এই কপোতাক্ষের স্রোতোধারা। স্বীয় জন্মস্থান পল্লীভূমির প্রতি স্বাভাবিক দরদের বশে তাই কবির এমন জীবন্ত অনুভূতি যে, কপোতাক্ষের স্রোতোধারা যেন পল্লীমাতার স্তন্যধারা। তাই ওর প্রতি কবির স্নেহতৃষ্ণার অনুভূতি সত্য, সার্থক ও সজীব। এই অভিব্যক্তির মধ্যে যা প্রকাশ পেয়েছে তাকে Patriotism বা National spirit বলে না, এ হলো জন্মস্থান বা জন্মপল্লী-প্রীতি। কুমুদরঞ্জন, যতীন্দ্রমোহন প্রমুখ পরবর্তী কালের নানাকবির ও পূর্ববর্তী কালের ঈশ্বর গুপ্তের রচনাতেও এই প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। তাছাড়া, শ্রীপঞ্চমী, আশ্বিনমাস, কোজাগর লক্ষ্মীপূজা, বিজয়া-দশমী প্রভৃতির মতো কপোতাক্ষ নদেরও প্রেরণার উৎস সেই একই স্মৃতি-চারণা। জন্মস্থান ও তার পারিপার্শ্বিকের প্রতি অনুরাগ বাঙালী মাত্রেরই স্বভাবগত। মধুসূদন কবিত্বশক্তির অধিকারী, তাই সেই অনুরাগের কাব্যময় প্রকাশ ঘটিয়েছেন এই সব কবিতায়। এর বেশি কিছু নয়। দেশাত্মবোধ বা জাতীয়তাবোধ বলতে যা বোঝায়, তা এখানে নয়। একশত দশটি কবিতায় গঠিত চতুর্দশপদীর বিপুল আসরে একমাত্র 'আমরা' ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যায় না খাঁটি স্বদেশ-প্রেমের বা সেযুগের নব-জাগৃতির সুস্পষ্ট লক্ষণ। সূক্ষ্ম বিচারে 'ভারতভূমি',

'সমাপ্তে' বা 'কোজাগর লক্ষ্মীপূজা'য় কবি-চিন্তা-ধারার অংশবিশেষে ঐ জাতীয় চেতনার যদিও বা কিছু পাওয়া যায়, 'কপোতাক্ষ নদ'-এ তাও নেই—যতোই 'জন্মভূমি'র উল্লেখ থাকুক। এখানকার কবিহৃদয়ের প্রীতি ঐ অতিপ্রিয় জলপ্রবাহ কপোতাক্ষ-কেন্দ্রিক। আলংকারিক প্রয়োগ-নৈপুণ্য দেখাবার জন্যেই এসেছে জন্মভূমি-র প্রসঙ্গ, এবং সে জন্মভূমি, আগেই বলা হয়েছে, কবির ঐ প্রিয় জন্মস্থান কপোতাক্ষ-বিধৌত সাগরদাঁড়ি গ্রাম। কবিহৃদয়ের এই প্রকাশও যে প্রশংসনীয় ও সমাদরযোগ্য, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু কোনো বড়ো বহরের স্বাদেশিকতা এখানে অনুসন্ধেয় নয়। আরো নয়, এই কারণে, অষ্টকের উপসংহারে যে নদ-কে কবি জন্মভূমির স্তনদুগ্ধধারা বা স্নেহধারা বললেন, ষটকে এসে সে হলো 'সখা', এবং তার ওপর ভার দেওয়া হলো সে যেন বাংলাদেশের যে যেখানে আছে, সকলের গলা ধরে বলতে থাকে, মধুসূদন নামে এক কবি বিদেশে থেকেও তার নামে বাংলা ভাষায় একটি কবিতা লিখেছেন। বলা বাহুল্য, এতে কবির নিজের নাম জাহির করার প্রস্তাবটাই প্রবলতর হওয়ায় এ কবিতায় সামগ্রিক আবেদনের কোনো অখণ্ড রূপও ফোটে নি, কোনো উচ্চাঙ্গের আবেদনও দানা বাঁধে নি।

'কোজাগর লক্ষ্মীপূজা'কে মধুসূদনের দেশপ্রেমের নিদর্শনরূপে নির্বাচনের মূলে আছে এই সনেটের একাংশে কবির একটি প্রার্থনা :—"বন্দি এ প্রবাসে এ দাস, এ ভিক্ষা আজি মাগে রাঙাপদে,—থাকো বঙ্গ গৃহে, যথা মানসে, মা, হাসে চিররুচি কোকনদ" ইত্যাদি। কিন্তু আসলে শ্রীপঞ্চমী, বিজয়াদশমীও যা, এটিও তাই। সেই একই কবিমানস, সেই স্মৃতিচারণ, সেই প্রবাসীর স্বদেশীয় উৎসবের দিনগুলির প্রতি ব্যাকুলতা। মধুসূদন কবি, তাই ঐ স্মৃতি ও ব্যাকুলতাকে উপযুক্ত পরিবেশ-চিত্রযোগে কাব্যের আসরে ব্যক্ত করেছেন। 'থাকো বঙ্গগৃহে' বলে যে প্রার্থনা, তা 'এস মা লক্ষ্মী, বসো মা লক্ষ্মী, থাকো মা লক্ষ্মী ঘরে'—এরই সমগোত্রীয়। কবি বিদেশস্থ, তাই 'ঘরে'র স্থলে 'বঙ্গগৃহে'; —এর বেশি কিছু, বৃহৎ কোন স্বদেশ-ভাবনা এখানে আমদানি করবার কোন কারণ নেই। একটু পরেই দেখা যায়, ঐ 'থাকো বঙ্গগৃহে' বাচনভঙ্গীর অবতারণার উদ্দেশ্য—'কেমনভাবে' লক্ষ্মী থাকবেন তা জানাবার প্রসঙ্গে কবির কিছু কলাকৃতি দেখানো। তাই বঙ্গগৃহে লক্ষ্মীর আবাহনের আন্তরিকতা চাপা পড়ে যায় পরপর ছ'টি পণ্ডিতী উপমার আমদানীতে। কলাকৃতিই কবির প্রধান লক্ষ্য, দেশপ্রেম নয়।

'ভারতভূমি'র আলোচনাটি আরও একটু বিপজ্জনক। নাম যার 'ভারতভূমি', এবং সত্যই ভারতভূমির কথা যার বিষয়বস্তু, এমন কবিতায় মাইকেলের স্বদেশানুরাগ কেন গ্রাহ্য হবে না। একথা ঠিকই যে এখানকার বিষয়গত অবলম্বনে ভারতের পরাধীনতার কথাই বড়ো। এর জন্য কবির একটা দুঃখ প্রকাশও আছে, আবার ধিক্কারও আছে। কিন্তু কবিতাপাঠের ফলশ্রুতি বা আবেদনের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে যা পাওয়া যায় তা সত্যই কোনো গভীর দেশানুরাগ নয়। অনুরাগের ছায়ামাত্র অবলম্বনে কায়ারূপে যা এখানে প্রবল, সে হলো মাইকেলী প্রকাশের ঢঙ। মনের মত দুটি রূপক-রচনার উপাদানরূপে নেওয়া হয়েছে ভারতের পরাধীন দশা; এবং একান্ত নিজস্ব ঢঙে দ্বিতীয়টিকে অর্থাৎ 'বরাঙ্গনা'রূপকটিকে শৃঙ্গাররসাত্মক লাম্পট্যসূচক ছাঁচের আকর্ষণে যে ভাবে কবি বিন্যস্ত করেছেন তাতে সেই ঢঙ ও তারই নিজস্ব রস-আবেদন প্রবল হয়ে দেশের পরাধীনতা বা কবির দেশানুরাগের গাম্ভীর্য সব কিছুকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। শেষ পর্যন্ত এই বুঝতে হয় 'ভারতভূমি' ইতালীয় কবির ছাঁচে প্রধানতঃ একটি শিল্পীসুলভ প্রয়াস, স্বদেশানুরাগের প্রেরণা-সম্ভূত নয়।

'সমাপ্তে' মধুসূদনের একটি বিখ্যাত সনেট। আত্মগত সুরের মূর্ছনায় সনেটের গীতিধর্মিতা, এমন বুঝি এই সংকলনের আর কোথাও ফোটে নি। কিন্তু এরই অন্তিম চরণযুগলে কবি সহসা এমন একটি প্রার্থনা জুড়ে দিয়েছেন যাতে অনেকেই এই সনেটটিকে মাইকেলের সুগভীর দেশানুরাগের অমর নিদর্শন বলে মনে করেন।

> "এই বর, হে বরদে, মাগি শেষ বারে,—
> জ্যোতির্ময় কর বঙ্গ—ভারত-রতনে !"

বাহ্যত এই উপসংহারের মহিমা ও মর্যাদা অশেষ। করুণ-রসাপ্লুত কবি-হৃদয়ের আক্ষেপবাণী বাগেদবীর চরণে নিবেদিত হওয়ার পর ঠিক বিদায় মুহূর্তে কবি দেবীর নিকট এই বর প্রার্থনা করলেন, তিনি যেন তাঁর জন্মভূমি বঙ্গদেশকে জ্যোতির্ময় করেন। এতে প্রকাশ পেলো কবির স্বদেশের প্রতি সুগভীর দরদ, এবং বঙ্গভূমিকে ভারতের রত্নস্বরূপ কল্পনা করায় ঐ দরদ আরও সমুচ্চ হয়ে উঠলো।

কিন্তু এখানে অবশ্যই একটি মন্তব্যের অবসর আছে। কবিতাটির সামগ্রিক বিশ্লেষণে স্পষ্টই ধরা পড়বে, অন্তিমে যে মনের প্রকাশ ঘটেছে, স্বভাবতই এই মনের গঠন মাইকেলের ছিল না। এই কবিতার প্রথম দ্বাদশ লাইনের মধ্যেও

কোথাও এর ইঙ্গিতমাত্র ছিল না। যে নিবিড় মন্ময়তার সুরটি এই কবিতায় নিটোল হয়ে উঠলো, তার সঙ্গে এই প্রার্থনার কোন স্বাভাবিক সঙ্গতি নেই। আমরা জানি মধুসূদনের কবি-কল্পনা কথায় কথায় উৎকেন্দ্রিক, চঞ্চল ও বিক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। সেইসব আকস্মিক প্রকাশের মধ্যে কবিমানসের কোনো স্থায়ী পরিচয় নেই। এখানেও এই অন্তিম প্রার্থনাটির আকস্মিকতা আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না। বুঝতে হয়, কবি তাঁর স্বভাব-চাঞ্চল্যের বশে সহসা একটি অভিনব ভঙ্গী দিয়ে কবিতা শেষ করতে ইচ্ছা করেন। ফলে যা লেখনী-মুখে বেরিয়ে এলো, তার বাচ্যার্থ-গৌরব কবিকে সেই উচ্চস্তরে উন্নীত করে, যেখানে মহাপুরুষোচিত ঔদার্যে উন্নতমনা পুরুষ নিজের সম্বন্ধে উদাসীন থেকে কামনা করেন জন্মভূমির শ্রীবৃদ্ধি। বস্তুত এই মহাপুরুষত্বের দাবি মাইকেলের ছিল না। শব্দচালনার কারিগরিতে হঠাৎ এমন খেয়াল এসেছে যে, 'বঙ্গ' হয়েছে 'ভারতরতন', এবং তাকে জ্যোতির্ময় দেখবার কামনাই হয়েছে কবির অকাল-সমাপ্তির ভীষণ নৈরাশ্যের মধ্যে একমাত্র অবলম্বন। যদি সত্যই এমন একটি মহৎ জীবন-লক্ষ্যের প্রেরণা কবিমানসের গভীরে কোথাও থাকতো, তবে তার স্ফুটতর রূপটি সৌষ্ঠব-মণ্ডিত হয়ে অবশ্যই আরও কিছু উল্লেখযোগ্য কাব্যসৃষ্টি করতো। কিন্তু আসলে তা নয়। "বঙ্গ,—ভারতরতন," এই আলঙ্কারিক প্রয়োগে চমকিত হলে, যে কবি লিখেছেন,—

> "কামিনীর কমনীয় কণ্ঠভূষা-হারে
> দ্যুতিমান মধ্যমণি যেমন সুন্দর।
> সেইরূপ সমুদয় অবনী-মাঝারে
> আছে দিব্যস্থান এক অতি মনোহর॥"

তাঁকে দেশপ্রেমিক-সমাজে শ্রেষ্ঠ আসন দিতে হয়। অতএব কবিতাটির অন্তিমে যা পাওয়া যায়, তা যখন কবিহৃদয়ের কোনো স্থায়ী অকৃত্রিম পরিচয় নয়, তখন এই সনেটের রচয়িতা যিনি, তাঁর গভীর দেশপ্রেমের নিদর্শন হিসাবে একে গ্রহণ করা চলে না।

একমাত্র 'আমরা' কবিতাটি এই বিষয়ে এক উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। কবিতাটির ভাবদেহে যে তিনটি তরঙ্গ উঠতে দেখা যায়, সেই তিনটি একই লক্ষ্যে নিবদ্ধ থেকে একটি মূলভাবেরই তিনটি প্রত্যঙ্গ রচনা করেছে এবং চতুর্দশ পঙক্তির গোটা কবিতাটি সেই মূল ভাবটি নিয়েই ব্যাপৃত। ভাবটি যে খাঁটি দেশপ্রেমাত্মক তা বলাই বাহুল্য। এই প্রসঙ্গে আলোচিত অপরাপর

কবিতার মতো এখানে কবির দেশানুরাগ একটা খেয়ালী ভঙ্গী, বা আকস্মিক প্রসঙ্গ অথবা বিক্ষিপ্ত উল্লেখমাত্র নয়। নিবিষ্টচিত্তে কবি এখানে ভারতের পরাধীনতা ও জাতীয় জীবনের দুর্বলতার কথা চিন্তা করেছেন এবং তার হৃতগৌরব ফিরে পাওয়ার জন্য আকুলতা প্রকাশ করেছেন। এখানে তিনটি স্তর-বিন্যাসযোগে কবিতাটি উদ্ধৃত হলো :—

আকাশ-পরশী গিরি দমি গুণ-বলে,
নির্মিল মন্দির যারা সুন্দর ভারতে ;
তাদের সন্তান কি হে আমরা সকলে ?
আমরা,—দুর্বল, ক্ষীণ, কুখ্যাত জগতে,
পরাধীন, হা বিধাতঃ, আবদ্ধ শৃঙ্খলে ?—

এই হ'লো প্রথম স্তর ; এখানে ভারতের প্রাচীন গৌরব সম্পর্কে সচেতনতার পরিচয় দিয়ে বর্তমান রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার জন্য কবি গভীর দুঃখ প্রকাশ করেছেন, এবং জাতীয় জীবনের দুর্বলতার জন্য জাতির হয়ে আত্মধিক্কার ও আত্মগ্লানির সুর জাগিয়েছেন।

কি হেতু নিবিল জ্যোতিঃ মণি, মরকতে,
ফুটিল ধুতুরা ফুল মানসের জলে
নির্গন্ধে ? কে কবে মোরে ? জানিব কি মতে ?
বামন দানব-কুলে, সিংহের ঔরসে
শৃগাল কি পাপে মোরা কে কবে আমারে ?

এই দ্বিতীয় স্তরে কবি জাতীয় অধঃপতনের স্বরূপটি মর্মস্পর্শী করেছেন ; এবং

রে কাল, পূরিবি কি রে পুনঃ নব রসে
রস-শূন্য দেহ তুই ? অমৃত-আসারে
চেতাইবি মৃত-কল্পে ? পুনঃ কি হরষে,
শুক্লকে ভারত-শশী ভাতিবে সংসারে ?

এই তৃতীয় স্তরে কালক্রমে ভারত তার হৃতগৌরব যাতে ফিরে পায় তজ্জন্য আকুলতা প্রকাশ করেছেন।

তবে পূর্বেই বলা হয়েছে, মধুসূদনের এই যে কবিমানস, এই একটি মাত্র কবিতা ছাড়া তাঁর গ্রন্থাবলীর আর কোথাও তাকে এমনভাবে প্রতিফলিত হতে দেখা যায় না। চতুর্দশপদী কবিতাবলীর অনেক রচনাতে স্বদেশের বিচিত্র বস্তু ও বিষয়ের প্রতি কবির যে প্রীতি ও মমতা-বোধের পরিচয় পাওয়া

যায়, তার সঙ্গে 'আমরা' কবিতায় এই মানস-স্পন্দনের পার্থক্য অশেষ। তবে, একথাও ঠিক যে, কবির ঐ প্রীতি ও মমতাবোধও এক জাতীয় দেশানুরাগ বলেই গণ্য। শুধু লক্ষ্য করবার বিষয়, মাইকেলের রচনায় ঐ অনুরাগের গভীরতা বা নিবিড়তা কচিৎ অনুভূত হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বস্তু বা বিষয়গুলির স্মরণ বা উল্লেখমাত্র করেই কবি কাব্যকৃতিতে বা শিল্প-কলা-বিলাসেই মেতে গেছেন। তাই তাঁর কবিমানসে স্বদেশের প্রতি অনুরাগ থাকলেও সে অনুরাগের চাষ ভালো হয় নি, ফসলও ভালো ফলে নি। এ অবস্থায় মাইকেলের স্বদেশানুরাগ নিয়ে বড়ো জোর কয়েকটি মৌহূর্তিক উচ্ছ্বাসের গল্প করা চলে, তার বেশি কিছু নয়। দেশাত্মবোধ-জাতীয়তাবোধের উত্তুঙ্গ শীর্ষে মাইকেলের মতো কবিকে স্থাপনের প্রস্তাব প্রশস্তি-বিহ্বলতার তুরীয় অবস্থাই সূচিত করে।

[৫] মাইকেলের উপেক্ষিত রচনা—
দু'খানি প্রহসন—
'একেই কি বলে সভ্যতা'
ও
'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'

এদের কথা বর্তমান অধ্যায়ের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করার কারণ, এদের মধ্যেই পাওয়া যায় মাইকেলের সেই সমাজচিন্তাশীলতার ক্ষণিক পরিচয়, যার অভাবের কথা পূর্বোক্ত 'প্রস্তাবনা'য় জানানো হয়েছে। বস্তুত, 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসন দুটি যদি মাইকেলের পরিবর্তে আর কারও রচনা হতো,—এমন কারও, যাঁর ব্যক্তি-জীবনে থাকতো না অসংযমের বা খাম-খেয়ালের কলঙ্ক; অথবা যদি মাইকেলের সাহিত্য-কৃতি এতো বৈচিত্র্যের প্রদর্শনী না হয়ে হতো অপেক্ষাকৃত সাধারণ,—যদি বিক্ষিপ্ত হয়ে না যেতো সমালোচকের দৃষ্টি তাঁর সাহিত্যকৃতির এমন নানা দিকে, এবং যদি এদের সম্পর্কে স্বয়ং রচয়িতার মনোভাব ব্যক্ত হতো ভিন্ন ভাষায়, কিম্বা কিছুই ব্যক্ত না হতো,—তবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এদের স্থান-নির্ণয়ে বোধহয় সমীক্ষকগণ আরো সতর্ক হতেন, এবং মাইকেলকেও সমাজচিন্তাশীল মনীষী হিসাবে অনেক উচ্চস্থান দিতে হতো। বৃহত্তর জীবন নিয়ে কোন গভীর মনন-সমীক্ষার যে অভাব মাইকেলের মানসগঠনে—অন্যত্র লক্ষিত হয়, কেবল এই দুটি রচনাতেই তার ব্যতিক্রম। একদিকে 'ইয়ং বেঙ্গল' সমাজ অর্থাৎ ইংরেজি-

নেশাগ্রস্ত অতি-প্রগতিবাদী সে যুগের শিক্ষিত তরুণ সম্প্রদায়, অপরদিকে রক্ষণশীল সনাতনীদের অন্তর্ভুক্ত ঘুণেধরা প্রবীণ দলের ভণ্ডপ্রকৃতির নেতৃ-সম্প্রদায়, দুইয়ের সমবায়ে প্রায় তদানীন্তন গোটা সমাজেরই ব্যাধি-বিকৃতির চিত্র এই দুটি রচনার সংক্ষিপ্ত আয়তনে প্রতিফলিত হয়েছে। এই প্রতিফলন যেমন বিশ্বস্ত, ব্যঙ্গাত্মক রচনার ইঙ্গিত-সংকেতও তেমনি বলিষ্ঠ,—ব্যাধিদুষ্ট সমাজের সংস্কারে ও কল্যাণকারিতায় যার অবদান অসামান্য।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সমাজ-কল্যাণের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাপ্য যে মর্যাদা, তা না পেয়েছে এই দুখানি গ্রন্থ, না পেয়েছেন তাদের রচয়িতা মাইকেল মধুসূদন। এদের আলোচনা হয়ে থাকে কেবল নাটকের একটি শাখা 'প্রহসন' হিসাবে,—যে বিষয়ে দীনবন্ধু মিত্রকেই ওযুগের রাজসম্মান পেতে দেখা যায়। কিন্তু 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' কি সামান্য প্রহসন? এরা কি শুধুই প্রহসন? মনীষা ও প্রতিভা যোগ্য পথে নিয়ন্ত্রিত হলে যে কী অপূর্ব সম্পদ সৃষ্টি করতে পারে, মাইকেলের ক্ষেত্রে চকিতের মতো একবার তারই বিদ্যুদ্বিকাশ ঘটেছিলো এই দু'খানি প্রহসনে। কিন্তু সে ঐ একটি মুহূর্তের খেয়ালে। তাও, খেয়ালটির লক্ষ্য সমাজ-সংস্কার নয়, লক্ষ্য রঙ্গমঞ্চে বাংলা প্রহসনের অভিনেয়তা। বিষয় বা বিষয়গত আবেদন গৌণ, মুখ্য প্রহসনের আর্ট ফলানো। এ কথা একেবারে স্বয়ং লেখকের মনের কথা, তাঁর অন্তরঙ্গদেরও দৃষ্টি ঐ ধারণায় পুরোপুরি নিয়ন্ত্রিত। তাঁরা কেউ মধু'র কাছ থেকে সমাজ-সংস্কার বা দুর্নীতি-অপনোদন-চিন্তা প্রত্যাশা করেন নি, করতে পারেনই না। মঞ্চে অভিনেয় কোনো বাংলা farce মধু'র হাতে হয়তো পাওয়া যেতে পারে কেবল এইটুকুই প্রত্যাশা। সৃজন-বৈচিত্র্যে সিদ্ধহস্ত মধু'রও কেবল ঠিক ঐখানেই গর্ব, ঐ নিয়েই অহমিকা, যে, সাহিত্যিক যে কোনো challenge-এর মুকাবিলা তিনি করবেনই। সমাজকল্যাণ নয়, নাট্যসৃষ্টির বাহাদুরি,—তার জন্য যদি নিজেই নিজেকে ব্যঙ্গ করতে হয়, (যা হয়েছে 'একেই কি বলে সভ্যতায়'), তাতেও তাঁর সংকোচ নেই, সনাতনীরা যদি আহত হন, তাতেও তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি চান যশ, কবিহিসাবে, নাট্যকারহিসাবে, প্রহসন-শিল্পীহিসাবে যশ,—এবং সবই তিনি অর্জন করতে চান বাংলাভাষায়। উপযুক্ত পরিশ্রমে উপযুক্ত সৃষ্টির নমুনা দেখাতে পারা সত্ত্বেও যদি বাধা আসে, তবে তিনি এতোই উত্তেজিত ও দিশেহারা হয়ে পড়েন যে, বাংলা ভাষাকে পরিত্যাগ করে অন্য

যে-কোনো ভাষায়, চাই কি, হিব্রু অথবা চীনার মতো ভাষাতেও পাণ্ডিত্য ফলাবার হুমকি দেখান। প্রহসন দু'খানি কেন মঞ্চস্থ হবে না, এই সম্পর্কে কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত এক পত্রে মাইকেল লিখেছিলেন, 'Mind, you broke my wings once about the farces; if you play a similar trick this time, I shall forswear Bengali and write books in Hebrew or Chineese!' এই হলো মাইকেলের মনোগঠন। রকমারি সাহিত্যিক কৃতিত্ব দেখিয়ে খ্যাতি অর্জন। তাই চমৎকার সমাজ-বিশ্লেষণ ও নিবিড় সমাজ-ভাবনা থাকা সত্ত্বেও প্রহসন দু'খানির কেবল নিপুণ চিত্রণেরই কৃতিত্ব স্বীকৃত হয়েছে গুণগ্রাহী মহলে, লেখকের কোন সমাজ-কল্যাণী মনন বা স্বদেশ-ভাবনার মহত্ত্ব স্বীকৃতি পেলো না। পেলো না, যেহেতু মাইকেলের জীবনের সঙ্গে, প্রকৃতির সঙ্গে, স্বাভাবিক চিন্তা-ভাবনা-ধ্যান-ধারণার সঙ্গে ঐ মনন-ভাবনার কোনো সঙ্গতি নেই। ওটা নিতান্তই একটি আকস্মিক ব্যাপার মধুসূদনের জীবনে। তিনি নিজেও তার কোনো মূল্য দেননি, অপরেও দিতে পারে না।

প্রসঙ্গত স্মরণীয়, বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু প্রহসন দু'খানির মূল্য নির্ণয়ে ওদের জন্য খুব উচ্চস্থানের নির্দেশ দিয়ে গেছেন। তাঁর মতে, দীনবন্ধু-প্রমুখ পরবর্তী সকল প্রহসন-রচয়িতাই মাইকেলের কাছে ঋণী। প্রথমটিকে তিনি বলেছেন, **'বাংলাভাষায় অদ্বিতীয় গ্রন্থ।'** তবে এ সবই সাহিত্যিক বিচার।

মাইকেলের সাহিত্যসৃষ্টির মূল্যায়নে যে গুণানুক্রমিক তালিকা রচিত হয়, তাতে স্বভাবতই প্রহসন দু'খানির নাম থাকে অনেক নীচে। যিনি এতো কিছুর প্রবর্তক, অমিত্রাক্ষর ছন্দ, আধুনিক যুগের মহাকাব্য, বীররসের কাব্যোপযোগী নূতন কবিভাষা, বাংলা সনেট, Heroic Epistles-এর ছাঁচে পত্রকাব্য, প্রথম পাশ্চাত্যধরণের ট্রাজেডি,—এবং সর্বোপরি যিনি মেঘনাদবধ-মহাকাব্যের মহাকবি, তাঁর হাতের দু'খানি প্রহসন, তাও যে নাটিকাদ্বয় শত চেষ্টা সত্ত্বেও সমকালীন রঙ্গমঞ্চে হলো না অভিনীত, পক্ষান্তরে, যাদের মুদ্রা-যন্ত্রের মাধ্যমে অকালে প্রকাশিত করার জন্য রচয়িতাকেই স্বীকার করতে হয়—"and therefore we ought not to have Farces",—সেই প্রহসনের স্থান তো সংকুচিত হবেই। আর ঠিক এই কারণেই, এদের মধ্যে প্রতিফলিত লেখকের যে মানস-ভাবনা তারও সঠিক মর্যাদা দেওয়া যায় না মাইকেলের সামগ্রিক মানস-বিচারে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মেঘনাদবধ কাব্যের অষ্টম সর্গ প্রসঙ্গে

[১] মোহিতলাল ও ডাঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত : 'মেঘনাদবধকাব্যের নৈতিক দৃষ্টি মাইকেলের ট্রাজেডি-তত্ত্বের মূল'—সমীক্ষায় এ প্রস্তাবের অচলতা : রাবণের ট্রাজেডির প্রকৃত স্বরূপ। [২] নরকবর্ণনার পশ্চাতে মাইকেলের 'নূতন দৃষ্টি'—'জীবন-দৃষ্টি'-সন্ধানের নিরর্থকতা। [৩] বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসের উপেক্ষিত নরকচিত্রের প্রভাব। [৪] নরক বর্ণনায় আদিরসের উপদ্রব।

[কথা সাহিত্য' ১৩৭১ কার্তিক (শারদীয়া) সংখ্যায় 'মেঘনাদবধ কাব্যের প্রসঙ্গে' এই শিরোনামে ডাঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় বর্তমান নিবন্ধে পাওয়া যাবে প্রধানত তারই একটা সমালোচনা ও অষ্টম সর্গের প্রাসঙ্গিক সমীক্ষা।]

উক্ত শিরোনামে লিখিত ডাঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের রচনাটির উদ্দেশ্য প্রধানত মেঘনাদবধ কাব্যের অষ্টম সর্গের উপযোগিতা নির্ণয় করা ও প্রসঙ্গত এই সর্গ সম্পর্কে মোহিতলাল মজুমদারের অভিমত খণ্ডন করা। রচনাটি নিঃসন্দেহে আমাদের অনেক চিন্তার খোরাক যুগিয়েছে এবং কাব্যখানির এই বিশিষ্ট সংযোজন সম্পর্কে নূতন মন্তব্যের অবসর ঘটিয়েছে।

যে মোহিতলালের প্রতিবাদেই, মনে হয়, রচয়িতা ঐ প্রবন্ধ-রচনায় উৎসাহিত হন, তাঁর এই অষ্টম সর্গ সম্বন্ধে কয়েকটি বিশেষ কথা হলো, এখানে পাওয়া যায়, মাইকেলের "কেতাবী বিদ্যার পরিচয়, কবি-চিত্ত-ফুল-বন-মধু-আহরণ-পটুতার পরিচয়", এখনে "কল্পনার স্ফূর্তি ঘটে নি", এটা "কাব্যের মূল ঘটনার সঙ্গে সামান্য সূত্রেই যুক্ত। প্রেতপুরী বর্ণনা ঘটনায় যতটা চমকপ্রদ, রসপ্রেরণায় তা তেমনই নিষ্ফল।" দান্তের "হৃদয়স্তম্ভনকারী অপূর্বত্রাসসঞ্চারী কল্পনা"র কণামাত্র মাইকেল আয়ত্ত করতে পারেন নি। "কেবল একটা বহির্গত অভিপ্রায়সিদ্ধি ও একটা নূতন কিছুর সমাবেশ"ই এখানকার লক্ষ্য। সুতরাং এটি একটি দুর্বল সংযোজনা। ('কবি শ্রীমধুসূদন'—পৃঃ ১২৫-২৬)।

ডাঃ দাশগুপ্তের কথা হলো, অভিনব কিছু সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা প্রতিভার লক্ষণ। মাইকেলের অষ্টম সর্গে যে নূতনের সংযোজন সেটা নিছক বিদেশী কাব্যের ভঙ্গি আয়ত্ত করার বিলাসমাত্র নয়। মিলটন, দান্তে বা ভার্জিলের

মত তিনিও একটা "নূতন দৃষ্টির প্রেরণায়" কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হন। তিনি লিখেছেন, "বাঙালী কবির প্রতিভা কোন জীবন-দৃষ্টির প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয় নাই, এমন কথা কেহ বলিবেন না।"

সুতরাং আলোচ্য প্রবন্ধে দেখা যায় লেখকের মূল উদ্দেশ্য দ্বিবিধ, এক মোহিতলালের প্রতিবাদ জানানো, আর এক, মাইকেলের রচনামূলে জীবন-দৃষ্টির প্রেরণা প্রমাণিত করা ও আনুষঙ্গিকভাবে অষ্টম সর্গের গুরুত্বের উপর নবতর আলোকপাত করা। এই সম্পর্কে লেখকের কিছু কিছু মন্তব্য, আমাদের মনে হয়, সমালোচনাসাপেক্ষ।

মোহিতলাল বলেছেন, অষ্টম সর্গ যে দুর্বল তা কবি নিজে বুঝেছিলেন; ডাঃ দাশগুপ্ত এর প্রতিবাদ ক'রে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন, এই "সর্গ সম্বন্ধে কবির নিজের অস্বস্তি ছিল না।" এই বিতর্কের মধ্যে আমরা প্রবেশ করতে চাই না, যেহেতু উভয়েরই মূল অবলম্বন এ বিষয়ে কবির নিজস্ব এমন কয়েকটি চিঠিপত্রের উক্তি, যা ঠিক প্রত্যক্ষভাবে অষ্টম সর্গের গুণাগুণ-বিচারে অসংশয়ে প্রযোজ্য নয়। তা ছাড়া, কেবল কবির উক্তি দিয়েই কাব্যের চূড়ান্ত বিচার করা নিরাপদ বলে মনে হয় না; বিশেষ তো মাইকেলের ক্ষেত্রে দেখা যায় তাঁর অনেক প্রতিজ্ঞা, সংকল্প বা অভিমতের বিরোধিতাই তিনি করেছেন তাঁর রচনায়। সমালোচক তাঁর প্রশস্ত প্রতিবাদের আয়োজনে এমন সব মন্তব্যের আশ্রয় নিয়েছেন, প্রাসঙ্গিকতার দিক দিয়ে বা যৌক্তিকতার বিচারে যেগুলি সমর্থনযোগ্য নয়। এক জায়গায় এসে বলছেন, "এখন প্রশ্ন করিতে পারি মেঘনাদবধ যখন এই কাব্যের মুখ্য বিষয় তখন ষষ্ঠ সর্গের পর সোজা 'সংক্রিয়া' সর্গটি লিখিলেই ত চলিত। অর্থাৎ 'নির্বেদ সর্গ' ও 'প্রেতপুরী সর্গ' উভয় সর্গই তো মূল বিষয়ের বহির্ভূত। কিন্তু মেঘনাদবধ কাব্যে যদি মেঘনাদের মৃত্যু ও সৎকারই দেখানো হইত তাহা হইলে ইহা একটি আখ্যানমূলক কবিতা হইত—মহাকাব্যের মর্যাদা লাভ করিত না।"

কেন যে ডাঃ দাশগুপ্ত এই প্রশ্ন তুলেছেন তা ঠিক বোঝা যায় না। 'নির্বেদ সর্গ' নিয়ে তো মোহিতলালের কোন আপত্তি নেই। তা ছাড়া এখানে যে রাবণই প্রধান চরিত্র, অতএব 'এই কাব্যের ট্র্যাজিডি যে রাবণের ট্র্যাজিডি' এ বিষয়ে তো মোহিতলালই, মনে হয়, সর্বপ্রথম সবিস্তারে আলোচনা করেন আমাদের সমালোচনা-সাহিত্যে। সুতরাং, 'তাহা হইলে দেখিলাম মেঘনাদবধের পর শক্তিশেলের কাহিনী এ কাব্যে অপরিহার্য,'—এই প্রতিপাদনের কী প্রয়োজন

ছিল বোঝা যায় না। কে ঐ অপরিহার্যতা অস্বীকার করেছে? মোহিত-লালের আপত্তি, স্পষ্টত, অষ্টম সর্গের দুর্বলতার বিরুদ্ধে, সপ্তম সর্গের বিরুদ্ধে তো কোন অভিযোগ নেই। অষ্টম সম্পর্কে কেন রামচন্দ্রকে প্রেতপুরে নিয়ে যাওয়া হল, এই প্রশ্ন তুলে ডাঃ দাশগুপ্ত লিখেছেন, "মোহিতলাল মজুমদার বলেন, মাইকেল প্রেতপুর আনিলেন কেন না হোমার, ভার্জিল ও দান্তের কাব্যে প্রেতপুরের বর্ণনা রহিয়াছে।" এই ভাবে বিষয়টির উপস্থাপনে যেন সমালোচক বোঝাতে চান, মাইকেলের এই জাতীয় কোন অনুকরণের প্রয়াস এই প্রেতপুরী-সংযোজনের পশ্চাতে লক্ষণীয় নয়। এটা যেন তাঁর একটা মৌলিক প্রয়াস, শুধু ভার্জিলের ইনিডের সঙ্গে সাদৃশ্য আমাদের চোখে পড়ে; তাই তিনি লিখেছেন,—"অষ্টম সর্গ পড়িতে পড়িতে ভার্জিলের ইনিডের ষষ্ঠ সর্গের কথা মনে আসা স্বাভাবিক," এবং অতঃপর উভয় গ্রন্থের ঐ নরকবর্ণনার মধ্যে বহু ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য উদ্ধৃত করে পাঠককে উপহার দিয়েছেন।

কিন্তু মাইকেলের নিজের কথাই যে সাক্ষ্য দেয়, তিনি সচেতনভাবে ভার্জিলের অনুসরণে এই বৃত্তান্তটির সংযোজনে অগ্রসর হয়েছেন:

রাজনারায়ণকে লিখিত পত্র:—"I have finished the sixth and seventh Books of Meghnad and am working away at the eighth. Mr. Ram is to be conducted through Hell to his father Dasarath, like another Æneas" (জীবনচরিত; পৃ. ৪৮১)। সুতরাং পূর্বোক্ত সমালোচকের ঐ 'মনে আসা স্বাভাবিক'—এ মন্তব্যের সার্থকতা কোথায়? এবং মোহিতলালের মন্তব্যই বা একেবারে ভিত্তিহীন হয় কিসে? বরং ডাঃ দাশগুপ্তর উদ্ধৃত সাদৃশ্যগুলিই আরো জোরালোভাবে প্রমাণ করে মাইকেলের অনুকরণের বহর।

অতঃপর সম্ভবত কবির কোন মহৎ 'জীবনদৃষ্টির প্রেরণা'র প্রমাণ দেওয়ার জন্য ডাঃ দাশগুপ্ত বোঝাতে চেষ্টা করেছেন, 'প্রেতপুরদর্শন'কে একটা 'স্বপ্নমাত্র' বলে মনে করা যেতে পারে। প্রবন্ধের এই অংশে তিনি যে ভাবে সমস্ত ব্যাপারটির একটা মৌলিক ভাষ্য রচনা করেছেন তাতে তাঁর নিজস্ব মনন-গভীরতা অবশ্যই সশ্রদ্ধ প্রশংসার দাবী রাখে। কিন্তু প্রথমত এই ভাষ্যটি নিতান্তই আরোপিত, কবির নিজস্ব পরিকল্পনার সঙ্গে এর যে কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে এমন মনে করার সঙ্গত কারণ নেই। এর প্রশংসা যা কিছু সব ভাষ্যকারের, কবির নয়। দ্বিতীয়তঃ, সমস্তটাই যখন অনুকরণসূত্রে

পাওয়া, তখন স্বপ্ন-ব্যঞ্জনার মহিমা মূল কবিরই প্রাপ্য, অনুকরণকারীর সেখানে নিজস্ব কৃতিত্বের দাবী স্বীকার্য নয়। তৃতীয়ত, স্বপ্নদর্শনতুল্য প্রেতপুর-দর্শনের মধ্যে সমালোচক যে দেখাতে চেয়েছেন রামচন্দ্রের চরম বিচিত্র মানস-প্রতিক্রিয়া, অর্থাৎ 'চরম শোকে মানুষের হৃদয় কি ভাবে মথিত হয়, কত চিন্তা, কত দুঃখ, কত স্নেহ, ভক্তি উথলিয়া উঠে', এখানে কবি তাই ফুটিয়ে তুলেছেন,—এটা বেশ একটা গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্ত বলে মনে হয় না; অন্তত মাইকেলের বর্ণনাভঙ্গির বৈশিষ্ট্যে আমাদের ঐ ধারণা নিরঙ্কুশভাবে গড়ে উঠতে চায় না। ভাষ্যকারের 'থিওরি' হিসাবে এর যাই মূল্য থাকুক কবির নিজস্ব মননের সঙ্গে এর কোন মিল কল্পনা করার প্রয়োজন অনুভূত হয় না। 'শোক-বিহ্বল রামচন্দ্রের হৃদয়ের এই সংবাদ' বলে ভাষ্যকার যে সংবাদের ইঙ্গিত এখানে দিয়েছেন, তা যে আদৌ কবির ঈপ্সিত ছিল, এমন মনে করবার হেতু নেই। হৃদয়-সংবাদের অমন ইঙ্গিতময় প্রকাশের দিকে লক্ষ্য থাকলে কবি "রাজ্য ত্যজি বনবাসে নিবাসিনু যবে, লক্ষ্মণ, কুটীরদ্বারে আইলে যামিনী" ইত্যাদি "বাঁচাও করুণাময় ভিখারী রাঘবে" ইত্যন্ত একটানা এই ৫৯ ল্যাইনব্যাপী বিলাপটি রামের মুখে বসিয়ে তাঁর এত প্রশস্ত শোক-চিত্র অঙ্কন করতেন না। শোকবিহ্বল রামচন্দ্রের একটা হৃদয়-সংবাদ কবি অবশ্যই দিতে চেয়েছেন, তবে সেটা ঐ দীর্ঘ বিলাপেই নিঃশেষিত হয়েছে। এর অতিরিক্ত কিছু ঐখানে আরোপিত করলে অসঙ্গতি টেনে আনা হবে। যেমন, ঘটনাক্রম যেখানে পুরোপুরি দৈব-নিয়ন্ত্রণের অধীন, সেখানে আর স্বপ্নের থিওরি আনার অবসর কোথায়? তাছাড়া, অত বড়ো বহরের কোন রূপকধর্মী পরিকল্পনা মাইকেলের মধ্যে কোন দিনই স্থান পায় নি। তা যদি পেত, তবে সেই দুর্দান্তরকমের আত্মজাহিরকারী মানুষটি তাঁর চিঠিপত্রের কোথাও না কোথাও একথা ব্যক্ত করতে ছাড়তেন না। মধুসূদন তাঁর কাব্যের অজস্র খুঁটিনাটির কথা বন্ধুদের কাছে জানিয়েছেন, কিন্তু গভীর কোন জীবনদৃষ্টির কথা, কোন নীতি-ধর্মের কথা, বা দেশ-কল্যাণ-জাতি-কল্যাণ-মূলক কথা (ভাষা ও সাহিত্য-সেবার কথা স্বতন্ত্র) কোথাও প্রকাশ করেন নি। করেন নি, যেহেতু এমন কিছু তাঁর পরিকল্পনায় আদৌ ছিল না। যা যা ছিল, তা তিনি নিঃশেষে ব্যক্ত করেছেন, আলোচনা করেছেন, বিশ্লেষণ করেছেন। যেমন, চতুর্থ সর্গটি যে 'scarcely connected with the progress of the Fable' এ কবির নিজেরই feeling এবং তাঁর আনন্দ

এইখানে যে "It has silenced the enemies of the Blank Verse. A great victory that, old boy…"। এর বেশি কিছু তাঁর পরিকল্পনার মধ্যে স্থান পায় নি। এ যেমন চতুর্থ সর্গে, অষ্টম সর্গেও তাই। খালি রামায়ণ-ছাড়া কোন নতুন ভঙ্গীতে লক্ষ্মণকে বাঁচাতে হবে (to borrow as little as I can from Valmiki), আর সেই সূত্রে কোন পাশ্চাত্ত্য মডেলে নরকবর্ণনা তাঁর কাব্যের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে (to engraft the exquisite graces of the Greek mythology on our own)। এই যেখানে কবির নিজের study, সেখানে উক্ত সর্গটির সংযোজনমূলে গভীরতর তত্ত্বের অন্বেষণে গবেষণার কৃতিত্ব থাকতে পারে, সত্যের প্রতিষ্ঠা কিছুই হয় না।

ডাঃ দাশগুপ্ত লিখেছেন, "মাইকেল বুঝিয়াছিলেন যে শক্তিশেলের পর হনূমানকে ঋষ্যমূক পর্বতে পাঠাইয়া রামায়ণের ঐ কাহিনীটির পুনরাবৃত্তি করিলে তাঁহার এই **'কাব্যের মূল বিষয়'** পাঠকের সামনে স্পষ্ট হইবে না। তিনি হনুমানের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া রামচন্দ্রের দিকেই পাঠকের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিলেন।"

এখানে প্রশ্ন ওঠে, "কাব্যের মূল বিষয়" বলতে আমাদের কী বুঝতে হবে? আগে তো একবার বলেছেন লেখক, "এই কাব্যের ট্রাজিডি রাবণের ট্রাজিডি।" সুতরাং এই ট্রাজিডিকেই মূল বিষয় মনে করতে হয়। কিন্তু নরকবৃত্তান্তের আমদানীতে ঐ ট্রাজিডির উপর যথেষ্ট আলোকপাত ঘটেছে, "ট্রাজিডি ক্ষুণ্ণ না হয়ে হয়েছে মহৎ এবং গভীর" বলে তিনি যে দাবী করেছেন, তার ভিত্তি যথেষ্ট দৃঢ় বলে মনে হয় না। প্রথম কথা, এটাও সমালোচকের একটা নিজস্ব মন-গড়া ভাষ্য মাত্র—কবির নিজস্ব পরিকল্পনার সঙ্গে এর কোন অনিবার্য যোগ বা সঙ্গতি প্রমাণিত হতে পারে না। কারণ, তেমন কোন পরিকল্পনা থাকলে রাবণের প্রসঙ্গ এখানে স্থান পেতো, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ, যে-কোন ভঙ্গিতে। কিন্তু অষ্টম সর্গের কবি-কল্পলোকের ত্রিসীমানায় রাবণকে খুঁজে পাওয়ার উপায় নেই। দ্বিতীয়ত, যে কর্মফলতত্ত্বের উপর ভাষ্যকার সমস্ত জোর দিয়েছেন,—"মানুষের দুর্ভাগ্য মানুষেরই কৃতকর্মের ফল। রাবণের দুঃখ রাবণের কর্মফল"—সেই চিরপরিচিত চিরপুরাতন অতি-অভ্যস্ত পাপীর দণ্ড-বিধান-মূলক তত্ত্বটি বোঝাবার জন্য এই রামায়ণ-মহাভারতের দেশে নতুন করে কতকগুলো উদ্ভট কল্পনায় গড়া বিভীষিকা-চিত্র ও দুর্নীতিমূলক চিত্রের প্রায় ৫০০ লাইন ব্যাপী এক ফিরিস্তি রচনার কি এতই প্রয়োজন ছিল? রাবণ

যে নিজ কর্মফলে নিজের সর্বনাশে ভেসে যেতে চলেছে, এই সহজ সাদা কথাটি তো খুব স্পষ্ট করেই বেশ কয়েকবার পাঠকের কানে শোনানো হয়েছে। প্রথম সর্গেই চিত্রাঙ্গদার জ্বালাময়ী উক্তি :

"কে কহ, এ কাল-অগ্নি জ্বালিয়াছে আজি
লঙ্কাপুরে ? হায়, নাথ, নিজ কর্মফলে
মজালে রাক্ষসকুলে, মজিলা আপনি !"

পাঠকের কানে ঝাঁ ঝাঁ করে বাজতে থাকে। তা ছাড়া পাই,—

"নিজ কর্ম-দোষে,
মজিছে সবংশে পাপী ..." (রমা/২য় সর্গ/৫০)
'কিন্তু নিজ কর্মফলে মজে দুষ্টমতি।' (শিব/২য় স./৪৩১)
'নিজপাপে মজে হায় রক্ষঃকুলপতি !' (বিভীষণ/৩য় স./৪৬৫)
'কিন্তু নিজদোষে মজে রক্ষঃকুলনিধি' (রমা/৬ষ্ঠ স./২৭৭)
'নিজ কর্মদোষে হায় মজাইলা
এ কনক-লঙ্কা রাজা, মজিলা আপনি !' (বিভীষণ/৬ষ্ঠ স./৫৭২-৩)

এইভাবে 'রাবণের দুঃখ যে রাবণের কর্মফল' এই কথাটি কতবারই না স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং কাহিনীর উদ্দেশ্য-সাধনে কর্মফলের উপর আলোকপাত করার জন্য পৃথক একটি সর্গ রচনার কোন সার্থকতা দেখা যায় না ; এবং অষ্টম সর্গের অন্তর্ভুক্ত নরকদৃশ্যের বিভীষিকা যে রাবণের "দুর্মতি দেখাবার জন্যই" পরিকল্পিত, ঐ তত্ত্বের ভিত্তি স্বীকার্য নয়। কারণ, পূর্বেই বলা হয়েছে, সেক্ষেত্রে রাবণ-প্রসঙ্গ এই সর্গে অবশ্যই স্থান পেতো।

ডাঃ দাশগুপ্ত অষ্টম সর্গের উপযোগিতা প্রতিষ্ঠায় এক জায়গায় বলেছেন, এই সর্গে "মেঘনাদবধ কাব্যের নৈতিক দৃষ্টি পরিস্ফুট হইয়াছে !' কিন্তু যাঁদের অনুকরণে মধুসূদন নরকের দৃশ্য পাপীর শাস্তিভোগ ও ধার্মিকের সুখভোগ এই দুই মূল বিভাগে বিভক্ত করে এঁকেছেন, তাঁদের সকলেরই যে নৈতিক দৃষ্টি সেখানে পরিস্ফুট, এখানেও অনুকরণসূত্রে ঠিক তাই-ই তো ফুটবে, এর মধ্যে আর কৃতিত্বের বা বৈশিষ্ট্যের অবসর কোথায় ? তবে 'কাব্যের নৈতিক দৃষ্টি' যাকে ডাঃ দাশগুপ্ত বলেছেন "মাইকেলের ট্রাজিডি-তত্ত্বের মূল", তার সত্যতায় সন্দেহ প্রকাশ করতে হয়। আর ঠিক এইখানেই, অর্থাৎ মাইকেলের ট্রাজিডি-তত্ত্বের স্বরূপ নির্ণয়ে অথবা মেঘনাদবধে রাবণের যে ট্রাজিডি সে ট্রাজেডি ঠিক কোথায়, এই সম্বন্ধেই সমালোচকের ধারণার সঙ্গে একমত হওয়া যায় না।

কর্মের ফলে রাবণের দুঃখ দেখা দিতে পারে, কিন্তু রাবণের ট্রাজিডি সেখানে নয়। নয় বলেই কবি বারে বারে অপরের মুখে রাবণের কর্মদোষের কথা প্রকাশ করলেও একবারও রাবণের মুখে সে কথা প্রকাশ করেন নি। রাবণের মুখে আছে 'ভাগ্যদোষে'র কথা, 'বিড়ম্বনা'র কথা, কর্মদোষের কথা নয়। কর্মফল-বাদ ও বিধি-বাদ এ দুয়ের মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য আছে। প্রথমটিতে প্রাচ্যধারায় অনুতাপ-বিনীত দুঃখের ব্যাখ্যা, আর দ্বিতীয়টিতে Greek Fatalism বা নিয়তি-নির্বন্ধ, যে উপাদানে খাঁটি গ্রীক ট্রাজিডির ধাতু গঠিত হয়ে থাকে। মধুসূদন যদি রাবণের মধ্যে একটা Greek tragic hero'র পূর্ণাঙ্গ চিত্র না হোক, অন্ততঃ তার একটা আমেজও ফোটাতে না পেরে থাকেন, তবে তাঁর রাবণ-চরিত্র রচনাই নিরর্থক। মধুসূদনের রাবণ বারো-আনা রামায়ণের রাবণ হতে পারে, কিন্তু ষোলো-আনা কখনই নয়। তাই বিধির বিধানের কাছে তার আত্মসমর্পণ নয়, তার বিরুদ্ধে তার ক্ষুব্ধ অভিযোগই শেষ পর্যন্ত শোনা যায়—

"কিন্তু বিধি—বুঝিব কেমনে
তাঁর লীলা? ভাঁড়াইলা সে সুখ আমারে!"

বিধির এই 'ভাঁড়ানো'র কথাই মাইকেলের রাবণের প্রাণের কথা। নবম সর্গে বর্ণিত রাবণের যে চরম দুর্ভাগ্য, তার জন্য যে তার ইহজন্মকৃত কোন কর্ম দায়ী হতে পারে, এটা রাবণের মনে আসে না; তাই তার বিলাপে শোনা যায়—

"পূর্বজন্মফলে
হেরি তোমা দোঁহে আজি এ কাল-আসনে!"

এবং শেষ পর্যন্ত—

"কি পাপে লিখিলা
এ পীড়া দারুণ বিধি রাবণের ভালে?"

এই ক্ষুব্ধ জিজ্ঞাসা রেখেই মাইকেলের রাবণ কাব্য থেকে বিদায় নিয়েছে;—এবং এইখানেই, অর্থাৎ দৃপ্ত পৌরুষ ও অটল শক্তির সঙ্গে বিধি-বিড়ম্বনার যে সংঘর্ষ ও সেই সংঘর্ষ-জনিত যে নিদারুণ যন্ত্রণা, সেইখানেই খুঁজতে হবে রাবণের ট্রাজিডির প্রকৃত-স্বরূপ। এই রাবণকে লক্ষ্য করেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "যে অটল শক্তি ভয়ংকর সর্বনাশের মাঝখানে বসিয়াও কোন মতেই হার মানিতে চাহিতেছে না—কবি সেই ধর্মবিদ্রোহী মহাদম্ভের পরাভবে সমুদ্রতীরের শ্মশানে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন। যে

শক্তি অতি সাবধানে সমস্ত মানিয়া চলে তাহাকে যেন মনে মনে অবজ্ঞা করিয়া, যে শক্তি স্পর্ধাভরে কিছুই মানিতে চায় না, বিদায়কালে কাব্যলক্ষ্মী নিজের অশ্রুসিক্ত মালাখানি তাহারই গলায় পরাইয়া দিল।" ['সাহিত্য' (১৩১৪)] এই অটল শক্তিই রাবণ, এবং মেঘনাদবধে ইহারই বন্দনা গীত হইয়াছে, ধর্মাধর্ম, পাপ-পুণ্যের বিচার ইহার লক্ষ্য নহে।"

সুতরাং এই রাবণের স্বরূপ নির্ণয়ের পক্ষে নিশ্চয়ই ৮ম সর্গের 'নৈতিক দৃষ্টি' কোন মতেই সহায়ক হতে পারে না। ডাঃ দাশগুপ্ত বলেছেন, "রাবণের দুঃখ লইয়া করুণরসের সৃষ্টি করিবার অভিপ্রায়ে যদি কবি রামায়ণের কাহিনীর মূল নৈতিক ভিত্তিটি উড়াইয়া দিতেন তাহা হইলে মেঘনাদবধ কাব্যের মহত্ত্ব ক্ষুণ্ণ হইত।" কাব্যের মহত্ত্ব যে ক্ষুণ্ণ হয় নি তা এতদিনে অবশ্যই সাব্যস্ত হয়ে গেছে, তবে সে মহত্ত্বের বিচারে কী দৃষ্টিভঙ্গি প্রযোজ্য, কী বা সে মহত্ত্বের স্বরূপ, তা নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ ঘটতে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু একথা কখনোই মেনে নেওয়া যায় না যে মাইকেলের হাতে আমরা নীতি-শাসিত রামায়ণের আবহাওয়া থেকে সংগ্রহ করা রাবণেরই বা রাবণ-কাহিনীরই আর একটা সংস্করণমাত্র পেয়েছি। এটা মেনে নিলেই বরং মাইকেলের সৃষ্টির মহত্ত্ব ক্ষুণ্ণ করা হবে।

শেষ কথা, ডাঃ দাশগুপ্ত বুঝিয়েছেন, "মাইকেলের কাব্যে লক্ষ্মণের পুনর্জীবন রামচন্দ্রের পুরুষকারের ফল।" আমরা বলতে বাধ্য যে এটা বড়ই অদ্ভুত শোনায়। কৈলাসে অম্বিকার কাতর অনুনয়ে যার সুরু, মহাদেবের নির্দেশে যার কার্যারম্ভ,ও অঘটন-ঘটন-পটিয়সী মায়াদেবীর নিয়ত পরিচালনায় যেখানে কার্যসিদ্ধি, সেখানে যে সমালোচক রামচন্দ্রের পুরুষকারেষ কী সন্ধান পেলেন তা আমাদের বোধগম্য নয়। শোকবিহ্বল রামচন্দ্রকে রণক্ষেত্র থেকে তুলে নেওয়া হ'লো, মন্ত্রমুগ্ধ যন্ত্রচালিতের মত তাঁকে আমরা প্রায় ছায়ামূর্তিবৎ ঘুরে বেড়াতে দেখলাম, এবং শেষ পর্যন্ত সেই হনুমানেরই পুরুষকারের উপর তাঁকে নির্ভর করতে হ'লো, তবে লক্ষ্মণ পুনর্জীবন লাভ করলো। এর মধ্যে রামের পুরষকারের অবসর যে কোথায় তা কল্পনায় পাওয়া যায় না, বরং তাঁর সমস্ত সত্তাটির একটা জড়ত্ব-বোধই আমাদের পীড়িত করে।

অষ্টম সর্গ সম্বন্ধে এতক্ষণ শুধু ডাঃ দাশগুপ্তের প্রস্তাবেরই আলোচনা করা হ'লো। আমাদের একটি মূল প্রতিপাদ্য যে, প্রশস্তিচন্দনে লিপ্ত বিগ্রহের স্বরূপ

চেনা যায় না, পাওয়া যায় খালি প্রশস্তি-রচনার নব নব ঘটা ও রচয়িতার মনন-বৈচিত্র্য—আর বিগ্রহসম্পর্কে কেবলই ভ্রান্ত ধারণা জমে উঠতে থাকে,—সেটি আর একবার এখানে প্রমাণিত হলো। যাঁর প্রতিবাদে ডাঃ দাশগুপ্তের এই নিবন্ধের অবতারণা সেই মোহিতলালও, মাইকেল সম্বন্ধে বহু মূল্যবান গবেষণা সত্ত্বেও, প্রশস্তি-মত্ততার অভিযোগ এড়াতে পারেন নি; তবে অন্তত এই একটি ক্ষেত্রে, এই অষ্টম সর্গের নিকৃষ্টতা-ঘোষণায়, তিনি খাঁটি সমালোচকের দায়িত্ব পালন করেছেন। এখানে মাইকেলের "কেতাবী বিদ্যার পরিচয়, কবি-চিত্ত-ফুলবন-মধু-আহরণপটুতার পরিচয়,"—এই কথা জানিয়ে সত্য-প্রকাশের সৎসাহস দেখিয়েছেন।

মাইকেলের এই প্রেতপুরী-নক্সার সমালোচনায় এযাবৎ সকলেই শুধু কবির পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকে আহরণ-পটুতা নিয়েই আসর জমিয়ে আসছেন;—ডাঃ দাশগুপ্ত আরো এক ধাপ এগিয়ে গেছেন। তিনি এই নরকবৃত্তান্তের মধ্যে মাইকেলের "নূতন দৃষ্টি—জীবনদৃষ্টির প্রেরণা"র অব্যর্থ প্রমাণ পেয়ে তারই ব্যাখ্যায় পাশ্চাত্য সাহিত্য-বিশেষের (ভার্জিলের ইনিড্) সঙ্গে সাদৃশ্য দেখাতে পেরে ঐ দৃষ্টি মহিমার সশ্রদ্ধ আরতি করেছেন। কিন্তু, সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া স্বতন্ত্র কথা, যমপুরীর একটা নক্সা যে মাইকেল আমাদেরই রামায়ণের মধ্যেই পেয়েছিলেন, ঐ পাশ্চাত্যমুখী দৃষ্টির হিড়িকে সে কথা একবার কারও মনে হলো না, কাউকে মনে করতেও দেওয়া হয় না। মেঘনাদবধের যমপুরী-চিত্রের মধ্যে মোহিতলাল দেখেছেন "একটা নূতন কিছুর সমাবেশ", আর ডাঃ দাশগুপ্ত পেয়েছেন "অভিনব কিছু সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা প্রতিভার লক্ষণ।" অতঃপর আনা হয়েছে নানা পাশ্চাত্য কবির নরক চিত্রের প্রসঙ্গ মাইকেলের নূতন সমাবেশ বা সৃষ্টির মূল্যায়নে। এইভাবে ঐ 'নূতন কিছু' বা 'অভিনব কিছু'-কে এমনভাবে তুলে ধরা হয়েছে যেন রামায়ণে নরক-চিত্রের ছন্দাংশও খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু মাইকেল তাঁর কাব্যে ভার্জিল বা দান্তে যাঁরই অনুকরণ করে থাকুন, তাঁর মতো নিবিড় রামায়ণ-পাঠক রামায়ণেই যে প্রথম পেয়েছিলেন নরক-চিত্রের নক্সা, এ সত্য এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব। নরকের চিত্র আমাদের রামায়ণেই আছে; আছে কৃত্তিবাসে, আছে বাল্মীকিতেও। বাল্মীকির চিত্র সংক্ষিপ্ত, কৃত্তিবাসের বিস্তারিত। সংক্ষিপ্ত হলেও বাল্মীকিতেই আছে কর্মফল-তত্ত্বের ভিত্তিতে পাপীর শাস্তি ও ধার্মিকের সুখভোগ এই দুই ভাগে বিভক্ত নরক-দৃশ্যের বিন্যাস—মাইকেলের রচনায় যার প্রতিরূপ দেখতে পেয়েই ডাঃ দাশগুপ্ত

ঘোষণা করেছেন "মেঘনাদবধ কাব্যের নৈতিক দৃষ্টি পরিস্ফুট হইয়াছে", অর্থাৎ আবিষ্কার করেছেন মাইকেলের নৈতিক দৃষ্টির মহিমা!

সোঽপশ্যৎ স মহাবাহুর্দশগ্রীবস্ততস্ততঃ।
প্রাণিনঃ সুকৃতং চৈব ভুঞ্জানাংশ্চৈব দুষ্কৃতম্॥

(উত্তর—২১।১০)

অতঃপর দুষ্কৃত-ফলভোগী ও সুকৃত-ফলভোগীর দুটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

প্রমোদমানানদ্রাক্ষীদ্রাবণঃ সুকৃতৈঃ স্বকৈঃ॥ (ঐ ১৮)

এবং

ততস্তান্ভিদ্যমানাংশ্চ কর্মভির্দুষ্কৃতৈঃ স্বকৈঃ॥ (ঐ ২১)

এই ভঙ্গিতে দ্বাদশটি সুরচিত চিত্রঘনপিনদ্ধ শ্লোকে বাল্মীকি তুলাদণ্ডে আরোপিত করে দেখিয়েছেন নরকে সুকর্ম-দুষ্কর্মের ফলভোগের পার্থক্য। অতএব ডাঃ দাশগুপ্ত-কথিত "নৈতিক দৃষ্টি" মূলত মহর্ষিরই দৃষ্টি, তদনুকারী মাইকেলের মৌলিকতার কোনো দাবীই স্বীকার্য নয়। বাল্মীকিতেই আছে 'বৈতরণী'র কথা—

'সন্তার্যমাণান্ বৈতরণীং বহুশঃ শোণিতোদকাম্'

তুলনীয় মাইকেলের—

বহিছে পরিখারূপে বৈতরণী নদী
* * * পাপী যারা
সাঁতারিয়া নদী পার হয় দিবানিশি
মহাক্লেশে;

আছে 'রৌরবে'র কথা—

'ভিদ্যমানানধার্মিকান্
রৌরবে ক্ষারনদ্যাং চ ক্ষুরধারাসু চৈব হি॥'

তুলনীয় মাইকেলের—

রৌরব এ হ্রদ নাম, শুন, রঘুমণি,
অগ্নিময়! * *
জ্বলে যাহে প্রেতকুল এ ঘোর নরকে ···।

তা ছাড়া যমদূতের বর্ণনায়—

'যমস্য পুরুষৈরুগ্রৈর্ঘোররূপৈর্ভয়ানকৈঃ'

তুঃ মাইঃ—

'এই যে দেখিছ/বিকট শমনদূত যত'

অথবা,

'ভীষণ মুরতি যমদূত হানে দণ্ড মস্তক প্রদেশে'।

পাপীর দুর্ভোগের বর্ণনায়—

'কৃমিভির্ভক্ষ্যমাণাংশ্চ' এরই প্রতিধ্বনি মাইকেলে—'কাটে কৃমি' বা 'সদা কীট কাটে'। মাইকেল যে বারে বারে পাপীর ভীষণ আর্তনাদের কথা লিখেছেন—'প্রাণী লক্ষ লক্ষ কোটি হাহাকার নাদে কেহ' অথবা 'আর্তনাদে পুরে দেশ পাপী' অথবা 'এ সকল দেশে পাপী ভ্রমে, হাহারবে বিলাপি', তারই নমুনা বাল্মীকিতে—'ক্লিশ্যমানাংশ্চ দেহিনঃ ক্রোশতশ্চ মহানাদং তীব্রনিষ্টনতৎ-পরান্ (নিষ্টন = ক্রূরশব্দ)।' আবার,

শবভূতান্ কৃশান্ দীনান্ বিবর্ণান্মুক্তমূর্ধজান।
মলপঙ্কধরান্ দীনান্ রুক্ষাংশ্চ পরিধাবতঃ।

মহর্ষির এই বর্ণনারই বিচিত্র প্রতিচ্ছবি মাইকেলের বিবরণে বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে আছে।

ধার্মিক বা সুকৃতকারীদের বর্ণনায় মাইকেল যে 'সুরম্য হর্ম্য' 'সুপিককুঞ্জের পঞ্চস্বরে গান' 'অদূরে বাদ্যধ্বনি' 'স্বর্ণসৌধ' 'উথলে চৌদিকে বীণাধ্বনি', 'বহু স্বর্ণ অট্টালিকা', 'হীরকনির্মিত গৃহাবলী' বা পবিত্র উজ্জ্বলতার প্রসঙ্গ এনেছেন, মহর্ষিদত্ত চিত্রে তাদেরও সংকেত লক্ষণীয় :—

কাংশ্চিচ্চ গৃহমুখ্যেষু গীতবাদিত্র-নিঃস্বনৈঃ।
প্রমোদমানানদ্রাক্ষীদ্রাবণঃ সুকৃতৈ স্বকৈঃ॥
সুবর্ণমণিমুক্তাভিঃ প্রমদাভিরলংকৃতান।
ধার্মিকানপরাংস্তত্র দীপ্যমানান্ স্বতেজসা॥

(উত্তর—২১।১৮-২০)

তবে মাইকেলের নরকবর্ণনায় বাল্মীকির চেয়ে কৃত্তিবাসের অনুকরণই অধিকতর লক্ষণীয়। 'কৃত্তিবাসী ঋণের বহর' শীর্ষক ৩য় অধ্যায়ের ৯ম পরিচ্ছেদে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

সুতরাং বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসের বিবরণ এই প্রসঙ্গে গ্রথিত হওয়ার পর মোহিতলালের প্রস্তাবটাই আর একবার সমর্থিত হবে যে, মেঘনাদবধের এই

অংশে যার পরিচয় ফুটেছে, তা নিছক 'কবি-চিত্ত-ফুলবন-মধু আহরণ' ছাড়া আর কিছু নয়। আমরা বলি, 'মধু'ও নয়, শুধুই ফুলে সাজি-ভরানো। সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্রের চোখে এগুলোও ধরা পড়েছিলো Playgiarism বলে। পক্ষান্তরে, ডাঃ দাশগুপ্তের 'নৈতিক দৃষ্টি' 'অভিনব সৃষ্টি', 'নূতন দৃষ্টির প্রেরণা', 'জীবনদৃষ্টির প্রেরণামূলক প্রতিভা' ইত্যাদি সম্বলিত প্রস্তাবটি এই কারণেই সমর্থিত হতে পারে না। নরকদৃশ্যের বিভীষিকা "রাবণের দুর্মতি দেখাবার জন্যই পরিকল্পিত"—ডাঃ দাশগুপ্তের এই প্রস্তাবে আমাদের ভাবতে হয়, তবে কি রামায়ণের নরক-বৃত্তান্ত তাঁর অবিদিত থাকায় তিনি এমন লিখেছেন, না‌কি, রামায়ণের বৃত্তান্ত সম্যক অবগত হয়েও তিনি রামায়ণের দৃষ্টি মাইকেলেরই মৌলিক দৃষ্টি বলে চালাতে চেয়েছেন? রামায়ণেই আছে ঐ রাবণের দুর্মতি দেখাবার পরোক্ষ পরিকল্পনা। বাল্মীকিতে অস্পষ্ট, কৃত্তিবাসে সুস্পষ্ট। উপরের উদ্ধৃতির মধ্যেই দেখা যাবে বাল্মীকির রাবণ দুষ্কৃত-সুকৃত-ফলভোগের দ্রষ্টা। কৃত্তিবাসে আছে রাবণ-হৃদয়ের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ। (এখানে আবার স্মরণীয়, মাইকেলের বর্ণনার ত্রিসীমানায় রাবণ নেই)। তবে প্রসঙ্গত একথাও বলতে হয়, কি বাল্মীকিতে, কি কৃত্তিবাসে, রাবণের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় স্বীয় শক্তিবলে দণ্ড-জর্জরিত পাপীদের মুক্তিদানের যে ভূমিকা দেখা যায়, সেটি যতো না অনুতপ্ত পাপীর, ততো শক্তি-লীলা-বিলাসী শক্তিমানের। অন্তত মহর্ষির চিত্রে এই শক্তিমান রাবণেরই মহিমান্বিত মূর্তি অধিকতর প্রকটিত। যে ভাবেই হোক, রাবণের এই শক্তি-মহিমার দিকটাই আলোকপ্রাপ্ত হয়েছে মাইকেলের রাবণ-চিত্রে—যদিও অষ্টম সর্গের নরক-বর্ণনার মধ্যে রাবণের দূরবর্তী প্রসঙ্গও কবির মনে স্থান পায় নি।

তবে নরকের আলেখ্য-রচনায় একটি বিষয়ে, মনে হয়, মাইকেলের মৌলিকতা অবিসম্বাদিত। নরকে পাপীর দুঃখভোগ ও ধার্মিকের সুখভোগ, এ কল্পনা এদেশ-সেদেশের চিরন্তন কবি-কল্পনা। কিন্তু পাপীর দণ্ডভোগের চিত্র-রচনার অছিলায় নিতান্ত স্থূল আদিরসাত্মক চিত্রের এমন বিপুল প্রদর্শনী খোলার নমুনা বোধহয় আর কোথাও পাওয়া যাবে না। এ বিষয়ে 'মেঘনাদবধ কাব্যে আদিরস' শীর্ষক প্রথম অধ্যায়ের শেষভাগে অষ্টমসর্গীয় আলোচনা দ্রষ্টব্য। কবি যে এখানে আদিরসের ঢালোয়া পরিবেশনের কী কায়দা দেখিয়েছেন, তা উক্ত আলোচনায় দৃষ্টান্তসহ ব্যাখ্যাত হয়েছে। পাঠক অবশ্যই

লক্ষ্য করবেন মোট ৮১২ লাইনে রচিত এই সর্গটির মাত্র ২৫০ লাইনের মতো খাঁটি নরকের বর্ণনা, আর এরই মধ্যে প্রায় একশ' লাইন (৩৯৮—৪৯০) জুড়ে আছে বিচিত্র আদিরসাত্মক প্রসঙ্গ ও জঘন্য কামোদ্দীপক চিত্রের নগ্নতা। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, এই বিস্তীর্ণ কাব্যাংশের ত্রিসীমানায় নরক নেই। কবি-মানস এখানে মাতাল হয়ে উঠেছে আদিরসের নেশায়। নরকের মধ্যে যে প্রমোদোদ্যানসুলভ কামকেলিকুঞ্জ ফুটে উঠ্ছে, সেদিকে কবির খেয়াল নেই!

এই অবস্থায় অষ্টম সর্গে মাইকেলের কোনো "নৈতিক দৃষ্টি"র প্রতিষ্ঠা খুঁজতে যাওয়া যেমন বিড়ম্বনা, "দান্তের হৃদয়স্তম্ভনকারী অপূর্ব-ত্রাস-সঞ্চারী কল্পনার কণামাত্র" না পেয়ে আক্ষেপ করাও তেমনি নিরর্থক।

নরকবর্ণনার বাকী অংশে বাল্মীকি-রামায়ণের প্রভাব আগেই দেখানো হয়েছে, কৃত্তিবাসের ছাঁচের প্রতিরূপও বিশেষ লক্ষণীয়। এ বিষয়ে "কৃত্তিবাসী ঋণের বহর" শীর্ষক তৃতীয় অধ্যায়ের ৯ম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

সপ্তম অধ্যায়

রাবণ ও মেঘনাদ-প্রসঙ্গ

[প্রধানত সমালোচিত:—যোগীন্দ্রনাথ বসু, মোহিতলাল মজুমদার, ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, ডাঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, কবিশেখর কালিদাস রায় ও শ্রীজনার্দন চক্রবর্তী]

[১] সূচনা

বর্তমান গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে 'কৃত্তিবাসী ঋণের বহর' আলোচনার গোড়াতেই বলা হয়েছে, খাঁটি বীর চরিত্র হিসাবে কৃত্তিবাসের মেঘনাদ মাইকেলের মেঘনাদের পাশে আদৌ ম্লান নয়, বরং আরও সুন্দর, যেহেতু আরও সম্পূর্ণ। বলা হয়েছে, মাইকেলেব হাতে মেঘনাদ-চিত্রের পালিশ বা জৌলস হয়তো খুলেছে বেশি, কিন্তু বীরত্বের, পৌরুষের তথা ব্যক্তি চরিত্রের মূল কাঠামো কৃত্তিবাসের রামায়ণেই দৃঢ়তর, প্রশস্ততর। এবং কৃত্তিবাস যেখান থেকে পেয়েছেন এই চরিত্রটি, সেই আর্য রামায়ণেই যোগানো হয়েছে এর যা কিছু মূল্যবান উপাদান। নূতনের প্রশস্তিবাদী এ যুগের সমালোচনায় যেখানে মাইকেলের হাতে নারীপুরুষ সমস্ত রাক্ষস-চরিত্রের তথা রাক্ষস-সমাজের প্রভূত সাংস্কৃতিক সমুন্নতি, শুধু তাই নয়, রাক্ষসকে মানুষ করে তোলার মতো এক নূতন সৃষ্টির প্রস্তাবই সুপ্রতিষ্ঠিত, সেখানে যে বর্তমান প্রস্তাবের চরিত্র প্রতিক্রিয়াশীল বা বিদ্রোহাত্মক বলে গণ্য হবে তা অবশ্যই অনুমেয়। কিন্তু যে সত্য তথ্য-সিদ্ধ, তার বিরুদ্ধে যে-কোনো পণ্ডিতী ওকালতী নিষ্ফল হতে বাধ্য। এ বিষয়ে বোধহয় সর্বপ্রথম দায়ী করতে হয় জীবনচরিতকার যোগীন্দ্রমোহন বসুকে। সেই যে তিনি লাগিয়ে দিলেন, "মেঘনাদবধ সম্বন্ধে নূতন কথা এই যে, ইহার রাক্ষসগণ, রামায়ণের বীভৎসরসের আধার, নরশোণিতপ্রিয় জীব নহেন" (১২শ অধ্যায় পৃঃ ৩৩৫), অথবা "মহর্ষি-প্রণীত রামায়ণে রাক্ষস-পরিবারবর্গের চরিত্র যেরূপভাবে চিত্রিত হইয়াছে, তাহাতে তাঁহাদিগকে পশুপ্রকৃতি জীব ভিন্ন আমাদিগের আর কিছু মনে হয় না। *** সিংহ, ব্যাঘ্র, অথবা ভল্লুকে যে সকল ভাব লক্ষিত হয়, মহর্ষি-প্রণীত রামায়ণের রাক্ষস-রাক্ষসীতে আমরা সেই সকল ভাবই কল্পনা করি" (পৃঃ ৩৮৩),—আর অমনি তারই ভিত্তিতে সুরু হয়ে গেল মেঘনাদ-রাবণাদি-চরিত্রের আলেখ্য-

রচনায় মাইকেলের অভিনবত্ব বা মৌলিকতা-প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের আমদানী। খুবই জোরালো হলো এই উৎসাহ, যেই মোহিতলাল এক জায়গায়(১) মেঘনাদ-রাবণাদি সম্পর্কে উদ্ধৃত করলেন এক কালিদাসীয় বিবৃতি—"উপপ্লবায় লোকানাং ধূমকেতুরিবোত্থিতঃ।" সেই থেকে আমাদের উৎসাহী সমালোচকমহল ধরেই নিলেন, রামায়ণের রাক্ষসচরিত্রগুলি এযাবৎ নিতান্তই রাক্ষসরূপে বর্ণিত হয়েছে, মেঘনাদবধ কাব্যেই সর্বপ্রথম তারা প্রদত্ত হয়েছে মানবিক চরিত্র-বৈশিষ্ট্য, এবং এক উন্নত মার্জিত কৃষ্টি ও সভ্যতা-সংস্কৃতির আলোকে তারা হয়েছে আলোকিত। আনুষঙ্গিকভাবে ধরে নেওয়া হয়েছে, মাইকেলের পূর্বে আর কেউ কখনও ঐ রাক্ষসবংশীয়দের মানুষ বলে ভাবে নি, তাদের কোনো মহত্ত্বের কল্পনাও করে নি। গার্হস্থ্য সম্পর্কের মাধুর্য, প্রজ্ঞাধর্মী মনুষ্যত্ব, দেবারাধনা বা যজ্ঞানুষ্ঠান, খাঁটি বীরোচিত শৌর্য-বীর্য, শাস্ত্রজ্ঞান, আচারজ্ঞান ও উন্নত মর্যাদাবোধ,—এই যে সমস্ত গুণ মাইকেলের রাক্ষস-চরিত্রে নানা আকারে প্রকাশ পেয়েছে, তারই মধ্যে সমালোচক খুঁজে পেয়েছেন চরিত্রায়ণে মাইকেলের নিরংকুশ মৌলিকতার অকাট্য নিদর্শন। কিন্তু সমীক্ষার জবাব কিঞ্চিৎ ভিন্নতন্ত্রীয়।।

[২] রাবণ

(ক) বাল্মীকি-চিত্রের ভ্রান্ত উপস্থাপন

যোগীন্দ্রমোহন বসু যে রামায়ণের রাক্ষসবংশীয়দের সম্পর্কে 'নরশোণিতপ্রিয় জীবমাত্র' বলেছেন, সম্ভবত তার দলিলী প্রমাণ—"দশকোটি সহস্রানি রক্ষসাং কামরূপিণাম্। মাংসশোণিতভক্ষ্যাণাং লঙ্কাপুরনিবাসিনাম্॥" (যুদ্ধ—১৯।১৫) রামচন্দ্রসকাশে বিভীষণের দেওয়া এই বিবরণ। কিন্তু এই কি সেই রাক্ষস সমাজের সমগ্র পরিচয়? এই থেকেই যদি সমস্ত রাক্ষস-চরিত্রের কার্যকলাপ-আচার-আচরণকে "পশু-প্রকৃতির"—"সিংহ-ব্যাঘ্র-ভল্লুকাদির" সহিত অভিন্ন বলেই সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়, তবে মাইকেলের চরিত্রসৃষ্টির মৌলিকতা বা অভিনবত্ব প্রতিষ্ঠার পথ সহজ হয় বটে, কিন্তু আদিকবি বাল্মীকির রামায়ণ রচনা বুঝি পণ্ডশ্রম বলেই গণ্য করতে হয়। বিশ্ববিখ্যাত 'এপিক' এই রামায়ণের যে এপিক-মহিমা তা কেবল রামপক্ষীয় চরিত্রায়ণেই নয়, রাবণ-পক্ষেও তার পরিচয় যে সুপ্রশস্ত, এ প্রস্তাবের উপেক্ষা অবশ্যই প্রতিবাদার্হ। ঐ একই বিভীষণের মুখে

একই লঙ্কাপুরবাসী সম্পর্কে শোনা যায় যে, তারা যুদ্ধে পরাক্রমপ্রকাশে কেবল উৎসাহী নয়, সেক্ষেত্রে তারা প্রশস্ত মনের পরিচয় দিতেও অভ্যস্ত। সুরাসুর-বিজয়ী রাবণ যেন তাদের ঐ বীরোচিত মনের গঠন বিনষ্ট না করেন, এই মর্মে উপদেশ দিতে গিয়েই বিভীষণের এই মন্তব্য :

পরাক্রমোৎসাহমনস্বিনাং চ সুরাসুরাণামপি দুর্জয়েন।
ত্বয়া মনোনন্দন নৈর্ঋতানাং যুদ্ধায় নির্নাশয়িতুং ন যুক্তম্॥

সুন্দর—৫২।২২

পরবর্তী শ্লোকে ঐ বিভীষণের মুখে সাধারণ রাক্ষসের পরিচয়টি অধিকতর লক্ষণীয় :

হিতাশ্চ শূরাশ্চ সমাহিতাশ্চ কুলেষু জাতাশ্চ মহাগুণেষু।
মনস্বিনঃ শস্ত্রভৃতাং বরিষ্ঠাঃ কোপপ্রশস্তাঃ সুভৃতাশ্চ যোধাঃ॥

এর মধ্যে পাওয়া গেল, রক্ষোবাহিনীতে যারা আছে, তারা কোপনস্বভাব বটে, তবে রাবণের প্রদত্ত বেতনে সন্তুষ্ট, তারা বীর, সৎকুলজাত, উচ্চগুণসম্পন্ন, মনস্বী, এবং শস্ত্র-বিশারদ। এরই পাশাপাশি স্মরণীয় পূর্বোক্ত মাংসশোণিতপ্রিয় পরিচয়টি।

খাঁটি 'এপিক'-এর চরিত্র-বিশ্লেষণে যে কতো বিপরীতের সমন্বয়ের ধাক্কা সামলাতে হয়, এখানে তাই আর একবার উদাহৃত হচ্ছে। যাঁরা সমগ্র পরিচয়ের অপরাপর অংশ বা উত্তম অংশ বাদ দিয়ে কেবল অধম অংশ নিয়েই সিদ্ধান্ত রচনা করেন, তাঁরা যে ধাক্কা সামলাতে পারেন নি, তা বলাই বাহুল্য। অধিকন্তু বাল্মীকি-রামায়ণের কেবল লঙ্কাপুরবাসী সাধারণ রাক্ষস নয় রাবণ-মেঘনাদাদিকে নিয়ে গোটা রাক্ষস-জাতি সম্পর্কেই, নারী-পুরুষ-নির্বিশেষে রাক্ষস-বংশীয়মাত্রেরই উদ্দেশে ঐ 'পশুপ্রকৃতি'-র কথা বলা হয়েছে। মোহিতলালও সম্ভবত ঐ একই দৃষ্টিভঙ্গিতে এবং একই মাইকেল-প্রশস্তির প্রেরণায় এনেছেন ঐ 'উপপ্লবায় লোকানাং' এর সূত্র; স্পষ্ট করে বলেছেন, 'আর্য রামায়ণের মেঘনাদ দৃপ্ত পশুবল-সর্বস্ব', পক্ষান্তরে 'মধুসূদনের মেঘনাদে ঐ বল অপর সকল মহৎগুণের সমবায়ে এক অপূর্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে',(১)—যেন সমবায়-সমন্বয়ের কোনো লক্ষণই মহর্ষি-চিত্রে অথবা কৃত্তিবাসী-চিত্রে খুঁজে পাওয়া যায় না! এযুগেরও কতিপয় বিদগ্ধ সমালোচকের মন্তব্যে অনুরূপ সুর লক্ষণীয়। ডাঃ অসিত-

(১) কবি শ্রীমধুসূদন, পৃঃ ৭৮।

কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন,—"কৃত্তিবাসের বর্ণনায় বানরগণ একেবারেই শাখামৃগ, রাক্ষসগণ নরমাংসভোজী বর্বর অনার্য" (২)। সরাসরি বাল্মীকির রাবণ সম্বন্ধেও এই সমালোচকের ধারণা যে 'বর্বরতা'র গণ্ডিতেই আবদ্ধ, তার প্রমাণ, এক জায়গায় তিনি রামায়ণের প্রধান প্রধান চরিত্র বাল্মীকির হাতে কী বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত হয়েছে বোঝাতে গিয়ে "রাবণের বর্বর দম্ভ" ছাড়া আর কিছু খুঁজে পান নি(৩); আর এক জায়গায় মন্তব্য করেছেন, "রাবণকে বাল্মীকি স্বল্পতম রেখাপাতের সাহায্যে জীবন্ত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন: পাপরাশিসদৃশ কৃষ্ণবর্ণ সেই রাক্ষসপতি যেন ভুজঙ্গের ন্যায় নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে"(৪)। জীবন্ত বলার মধ্যে ও প্রশস্তির উচ্ছ্বাসের মধ্যে মহর্ষি-কল্পিত রাবণের স্বরূপ হিসাবে সমালোচকের কী ধারণা গঠিত হয়েছে তা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। কিন্তু যে-অনুবাদটি তিনি গ্রহণ করেছেন সেখানে অনুবাদকের অসতর্কতায় অথবা মুদ্রাকর-প্রমাদে 'মাষরাশি-প্রতীকাশং' হয়েছে 'পাপরাশিসদৃশ' এবং নিতান্ত অজ্ঞতার জন্যই 'কৃষ্ণবর্ণ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। প্রাসঙ্গিক বাল্মীকি-রচনাংশটি হলো—"মাষরাশিপ্রতীকাশং নিঃশ্বসন্তং ভুজঙ্গবৎ। গাঙ্গে মহতি তোয়ান্তে প্রসুপ্তমিব কুঞ্জরম্॥" (সুন্দর ১০।২৮)। শিরোমণি-কৃত টীকায় 'হরিত-নীলবর্ণত্বেন মাষরাশিসদৃশং'। সুতরাং এককথায় ঠিক 'কৃষ্ণবর্ণ' বলা ঐ 'মাষরাশি'র স্থলে 'পাপরাশি' বলার মতোই ভুল। সমালোচক কিন্তু ঐ ভুলের ভিত্তিতেই কৃত্তিবাসকেও এক হাত নিয়েছেন। লিখেছেন,—"ইহার সহিত কৃত্তিবাসের বর্ণনা—

> নীলবর্ণ রাবণ সে পীতবস্ত্রধারী।
> নবজলধর যেন বিদ্যুৎসঞ্চারী॥

পাঠ করিলেই মহাকাব্যের চরিত্রাঙ্কনে কৃত্তিবাসের অপটুতার পরিচয় পাওয়া যাইবে" (পৃঃ ৫৪২-৪৩)। চরিত্রাঙ্কনে মহর্ষির তুলনায় কৃত্তিবাস 'অপটু' হতে পারেন, কিন্তু অনুবাদক হিসাবে তিনি যে এক্ষেত্রে আপত্তিকর অপটুতার পরিচয় দিয়েছেন, অথবা তিনি এই দুই ছত্রে রাবণের যে চিত্র এঁকেছেন তা মহর্ষির রচনায় কোথাও পাওয়া যায় না, তা নয়। পূর্বোক্ত 'মাষরাশির' 'হরিতনীলবর্ণ' থেকেই সুপণ্ডিত কৃত্তিবাস সংগ্রহ করেছেন তাঁর রাবণের দেহবর্ণের নীলত্ব; আর 'পীতবস্ত্রধারী'? এও মহর্ষির কাছ থেকে পাওয়া—

"মহার্হেণ সুসংবীতং পীতেনোত্তরবাসসা" (সুন্দর—১০।২৭); বাকী অংশটুকুও মূলেরই বিশ্বস্ত অনুবাদ, প্রমাণ—"প্রকাশীকৃতসর্বাঙ্গং মেঘং বিদ্যুদ্বর্ণৈরিব" (ঐ।১০।২৯)।

অপর খ্যাতিমান সুপণ্ডিত সমালোচক ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যও যে বাল্মীকির রাবণ ও রাক্ষস-সম্প্রদায় সম্পর্কে অনুরূপ ধারণার বশবর্তী, তার প্রমাণের অভাব নেই। অল্পদিন আগেও, ১৩৭১ সালের 'বেতার জগৎ' শারদীয়া সংখ্যায় 'রামায়ণ' সম্পর্কিত এক প্রবন্ধে তিনি জানিয়েছেন বাল্মীকির রাবণ নিতান্তই 'রাক্ষস, অনাচারী', এবং মহর্ষির সমগ্র পরিকল্পনাই বীভৎস,—"বাল্মীকি রাবণ এবং রাক্ষস সম্প্রদায়ের যে প্রকার অমার্জিত এবং বীভৎস পরিকল্পনা করিয়াছেন..." (পৃঃ ৭২) ইত্যাদি। প্রসঙ্গত এই প্রবন্ধে তিনি মাইকেল প্রশস্তির যে একটুখানি অবসর করে নিয়েছেন, তাও ঐ ধারণারই ভিত্তিতে। যথা—"ঊনবিংশ শতাব্দীতে মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁহার মেঘনাদবধ কাব্যে রাবণ চরিত্রকে তাহার রাক্ষস-সংস্কার হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত করিয়া আর এক অভিনব রূপে উপস্থিত করিয়াছিলেন।" (পৃঃ ঐ)। [অবশ্য মাইকেলের সৃষ্টির নিরংকুশ প্রশস্তি গাওয়া এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়, বিষয়ান্তরে কিঞ্চিৎ সমালোচনাও স্থান পেয়েছে।]

সুপ্রবীণ সাহিত্যিক কবিশেখর কালিদাস রায় যদিও মাইকেল-সমীক্ষায় কিছু কিছু স্বাধীন মন্তব্যের মাধ্যমে তাঁর বিচারের স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছেন, তবু প্রশস্তিমোহ তিনিও এড়াতে পারেন নি। এবং সম্ভবত সেই কারণেই বাল্মীকি-কৃত্তিবাসের সশ্রদ্ধ পাঠক হওয়া সত্ত্বেও রামায়ণের রাবণ ও মেঘনাদ-চরিত্রের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে যথেষ্ট নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে অনুসন্ধানের পথে না গিয়ে প্রচলিত সুরে সুর মিশিয়েই কাজ সেরেছেন, বেশি করে খুঁজেছেন মাইকেল প্রশস্তির রকমারি ধারা-উপধারা। রামায়ণের রাক্ষস চরিত্রগুলি যে মাইকেলের হাতে অভাবনীয় সমুন্নতি-মণ্ডিত সম্পূর্ণ নূতন রূপ প্রাপ্ত হয়েছে, এই প্রস্তাবের প্রতিষ্ঠায় কবিশেখর লিখেছেন,"চরিত্রগুলির জন্মভূমি আর্ষ রামায়ণ হইলেও এইগুলি গ্রীক আদর্শেই লালিত ও পুষ্ট হইয়াছে। * * সমগ্র রাক্ষস-সংসারকেই কবি মানব-সংসারে পরিণত করিয়াছেন এবং কেবল মেঘনাদ নয়, সকল রাক্ষস চরিত্রকেই তিনি মানবিক ধর্মে মণ্ডিত করিয়াছেন। রাক্ষসদের কেহই নরভুক হিংস্র জীব নয়, পিতৃমাতৃভক্ত, স্বদেশবৎসল, স্বজাতিবৎসল, প্রেমিক, সহৃদয় ও

স্নেহপ্রবণ"(১)। অন্যত্র লিখেছেন, "মাইকেলের রাক্ষস-রাক্ষসীরা মানব-মানবী, বাল্মীকির কল্পিত রাক্ষসদের তিনি একটি বীরজাতির মানুষ বলিয়াই গণ্য করিয়াছেন"(২)। অর্থাৎ সেই এক কথা; বাল্মীকির রাবণ প্রভৃতি রাক্ষস চরিত্র 'নরভুক হিংস্র' রাক্ষস মাত্র। 'পশু-প্রকৃতি' সম্পর্কেও সেই এক সুর। "বাল্মীকির রাবণ ধর্মাধর্মবোধহীন আদিম মানবজাতির অতিমানব। পাশবিক বলই আদিম মানবের সর্বশ্রেষ্ঠ বল ও সম্পদ। এই পাশবিক বলের চূড়ান্ত নিদর্শনই রাবণ-চরিত্রে রূপলাভ করিয়াছে। * * মেঘনাদ রাবণেরই আত্মজ, রাবণেরই অংশীভূত। অতএব মেঘনাদ সম্বন্ধে পৃথক কিছুই বলিবার নাই(৩)।

কী করে যে কবিশেখর ভুলে গেলেন রামায়ণের রাবণের তপোবলের কথা, অমরত্বের সাধনা, শিবভক্তির পরাকাষ্ঠা ও রাজধর্ম-ক্ষত্রধর্ম-সংক্রান্ত বিবিধ গুণের অসামান্য নিদর্শন, কী করেই বা তিনি বিস্মৃত হলেন বাল্মীকি-রামায়ণে ও কৃত্তিবাসী রামায়ণে সাড়ম্বরে বর্ণিত মেঘনাদের অপূর্ব চরিত্র-মাহাত্ম্য, তা আমরা বুঝি না। কেবল এই বুঝতে হয়, এ সবই মাইকেল-প্রশস্তির আতিশয্যের ফল। যাঁর প্রশস্তি-মুখে মাইকেলের রাবণের সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং মাইকেলও উন্নীত হয়েছেন মহাপুরুষের স্তরে 'বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি' এই বন্দনার আলোকে (ঐ পৃঃ ১৭৮), তাঁর মন্তব্যে পূজারীসুলভ ভাবোচ্ছ্বাসের ঢেউ ওঠাই স্বাভাবিক; সমালোচনার সত্যনিষ্ঠা সেখানে বিড়ম্বিত হবেই। তাই তো কবিশেখরকে মাইকেল ও তাঁর মেঘনাদবধ সম্পর্কে বলতে শোনা যায়,—"কবির কল্পনার বিরাটত্বও লক্ষ্যের বস্তু। কবির কল্পনা যে জ্যোতিষ্মান রসলোকের সৃষ্টি করিয়াছে—তাহা সম্পূর্ণ শূন্যে। স্বর্ণলঙ্কা সম্পূর্ণ কবি-কল্পনার সৃষ্টি। এই সৃষ্টির জন্য কবির কল্পনাকে বিরাট বলিতেছি না। কবির কল্পনা স্বর্গ, নরক, মর্ত্য, দেবলোক, নরলোক, যক্ষলোক, রক্ষোলোক, সর্বত্র বিদ্যুদ্বেগে বিচরণ করিয়াছে। কবির কল্পজগতে দেব, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব, নর, বানর, সমস্ত এক গোষ্ঠীর মধ্যে স্থান পাইয়াছে। একটি বিরাট ব্রহ্মাণ্ডকে কবির কল্পনা হস্তামলকবৎ ধারণ করিয়াছে।" (ঐ পৃঃ ১৫১)

কী প্রশস্তি-মত্ততা! বাল্মীকি-কৃত্তিবাসকে বিস্মৃতির দ্বীপান্তরে নির্বাসিত করে মাইকেলকেই বসানো হয়েছে আদিকবির আসনে, মূল সৃষ্টির কৃতিত্ব যেন তাঁরই। যেন রামায়ণ মাইকেলরই সৃষ্টি। নচেৎ ঐ কল্পনার বিরাটত্ব যা ব্যাখ্যাত

হয়েছে, তার সমস্তটাই যে মূল রামায়ণে স্বপ্রকাশ, মাইকেল শুধু তারই কয়েকটি ধাপে পা ফেলে চলাফেরা করে গেছেন,—আর খেয়ালীর মতো এখানে-ওখানে এনেছেন গ্রীকপুরাণের ঢঙ মাত্র,—এটা সমালোচক কেন খেয়াল করলেন না? খেয়াল হলেই দেখতেন, মাইকেল বিরাটত্বের কবি নন, ঢঙের কবি। 'স্বর্ণলঙ্কা সম্পূর্ণ কবি-কল্পনার সৃষ্টি'—এটি যে কতো বড়ো মিথ্যা, তার কিছুটা আগেই প্রমাণিত হয়েছে এই গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে কৃত্তিবাস-প্রসঙ্গে। বাকীটুক প্রমাণিত হবে বর্তমান অধ্যায়ে বাল্মীকির আলেখ্যের কতিপয় ইঙ্গিতে। প্রমাণিত হবে, মাইকেলের কল্পনা যা সৃষ্টি করেছে তা "সম্পূর্ণ শূন্যে" নয়, ছাঁচে-ঢালা ভঙ্গিতে, এবং যে স্বর্ণলঙ্কা মাইকেলের হাতে পাওয়া গেছে, তা বাল্মীকির স্বর্ণলঙ্কা-চিত্রের একটি সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র।

(খ) এ যুগের সমালোচনায় কৃত্তিবাসের লাঞ্ছনা—বিশেষত বানরচরিত্র-প্রসঙ্গে

কবিশেখরের মাইকেল-প্রশস্তি-মোহ অধিকতর প্রকট হয়েছে মেঘনাদ-বিভীষণ প্রসঙ্গে। পরে যথাস্থানে এ বিষয়ে আলোচনা করা হবে। তবে কোনো সমালোচক যে কৃত্তিবাস-সম্পর্কে তাচ্ছিল্যপ্রকাশে এতোটা বে-পরোয়া হতে পারেন, এটা আমাদের ধারণা ছিল না। মাইকেল-চিত্রের উৎকর্ষ প্রতিষ্ঠার জন্য কবিশেখর লিখেছেন, "কৃত্তিবাসের রামায়ণ প্রকৃতপক্ষে শিশুরঞ্জন রামায়ণ—ইহাতে উচ্চতর আদর্শের কথা কিছু নাই। কৃত্তিবাসের রুচিও মার্জিত নয়।" (ঐ পৃঃ ১১৯)। বলা বাহুল্য, এ সবই ঐ প্রশস্তি-মোহের ফল।

একটা জিনিষ আমরা পরিতাপের সঙ্গে লক্ষ্য করি, যখন পৃথকভাবে কৃত্তিবাসকে নিয়ে প্রবন্ধ রচনার ডাক পড়ে, তখন তাঁর সৃষ্টির মহত্ত্ব-মাহাত্ম্য-কীর্তনে আমাদের বিদগ্ধ-সমাজ উত্তাল হয়ে ওঠেন, কিন্তু মাইকেল-প্রশস্তির আসরে নেমে ঐ কীর্তনীয়াদের অনেককেই, বোধহয় আসর মাৎ করার সহজ উপায় হিসাবে, কৃত্তিবাসের প্রতি তাচ্ছিল্য-নিক্ষেপে নির্বিচার দেখা যায়। বস্তুর কারবারে মেঘনাদবধের কবিকে যে পনেরো আনাই ধার করে চালাতে হয়েছে আর্য-রামায়ণ থেকে, এইটাকেই যেন চাপা দেওয়ার জন্য এ যুগের অনেকেই মাইকেল-প্রশস্তির আসরে উত্তমর্ণ-স্থানীয় বাল্মীকির যেমন অপব্যাখ্যা করেন, কৃত্তিবাসকেও তেমনি তুচ্ছ করতে প্রয়াসী হন। তাই কৃত্তিবাসের রাক্ষসগণকে "নরমাংসভোজী বর্বর অনার্য" বলার সঙ্গে সঙ্গে বানর-চরিত্র সম্পর্কেও বলা হয়েছে "বানরগণ একেবারেই শাখামৃগ",—"বালি, সুগ্রীব, হনূমানাদি শাখা-

মৃগত্বের ঊর্ধ্বে উঠিতে পারে নাই।"* কিন্তু সত্যই কি তাই? কৃত্তিবাসের বানরদের পরিচয়ে অঙ্গদের মুখে শোনা যায়,—

দেবতার পুত্র তোরা দেব-অবতার। (পৃঃ ৩৪৫)

ঐ অঙ্গদের ভাষণে দেখা যায় বানরসমাজে বীরত্বের আদর্শস্থাপনে উন্মাদনা জাগানোর মহৎ প্রয়াস; সেই প্রসঙ্গে সত্য-পালনে, জ্ঞাতি ও স্বজাতি-প্রীতির চর্চায় এবং বীরখ্যাতি-অর্জনে সকলকে উৎসাহিত করার মধ্যে যে মনুষ্যত্ব ও ক্ষাত্রধর্মের প্রতি শ্রদ্ধার পরিচয় ফুটেছে, তা নিশ্চয়ই অসিতবাবুর দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। যে 'বালি' দিয়ে তিনি তালিকা সুরু করেছেন, সে জাতিতে 'শাখামৃগ' হতে পারে, কিন্তু তার বাহুবল ও তপোবলের যে অসামান্য পরিচয় কৃত্তিবাসে বর্ণিত হয়েছে, তার সম্যক ধারণা গঠিত হওয়ার পরেও কি বলা চলে 'শাখা-মৃগত্বের ঊর্ধ্বে উঠিতে পারে নাই'? 'বালি সম বীর নাই এ তিন ভুবনে',—এ কথা স্বয়ং রাবণকেও স্বীকার করতে হয়েছে। এ ছাড়া—'সন্ধ্যা করে বালিরাজা সাগরের জলে', এবং এক সাগরে নয় চতুঃসমুদ্রে,—'চারি সাগরেতে করি সন্ধ্যাসমাপন', প্রতি ক্ষেত্রেই, 'তপ করে বালিরাজা মুদিত নয়ন'। বাহুবলের সঙ্গে তপোবলের সংযোগে বালিকে দুর্জয় জেনেই সুগ্রীব রামচন্দ্রের মুখের কথায় প্রথমে আশ্বস্ত হতে পারে নি। বালি-বধ-দৃশ্যে অন্যায় যুদ্ধে নিধনের জন্য রামের প্রতি বালির দৃপ্ত পৌরুষভরা অগ্নি-গর্ভ তিরস্কারের যে নক্সা কৃত্তিবাসের লেখনীমুখে অঙ্কিত হয়েছে, তা ঠিক শাখামৃগের মতো মনে হয় কি? বর্তমান গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ের (কৃত্তিবাসী ঋণের বহর) তৃতীয় পরিচ্ছেদে দেখানো হয়েছে কৃত্তিবাস-দত্ত বালি-রামচন্দ্রের বাদানুবাদের ছাঁচটির কী ঘনিষ্ঠ অনুসৃতি স্থান পেয়েছে মাইকেলের ৬ষ্ঠ সর্গের অতি-প্রশংসিত লক্ষ্মণ-মেঘনাদের বাদ-বিতণ্ডার মধ্যে। এই বালির সঙ্গে সংযুক্ত যে তারা-চরিত্রটি, 'শাখামৃগ' বলে উড়িয়ে দেওয়ার আগে, তার প্রতিও সমালোচকের একবার দৃষ্টি দেওয়া উচিত ছিল। তারার বিলাপ, রামচন্দ্রের প্রতি অভিশাপ, বালির অগ্নি-সংস্কারের উদ্দেশ্যে তারা-কর্তৃক বৈশ্বানর-স্তুতি ইত্যাদি চার পৃষ্ঠাব্যাপী (১৯৪-৯৮) আলেখ্যটি ঐ শাখামৃগত্ব-বাদীদের চোখ ফোটাবার পক্ষে যথেষ্ট বলেই মনে হয়।

সুগ্রীব যে স্বয়ং বিশাল একটি কথাসাহিত্যোপম রসঘন উপাখ্যানের কেন্দ্রীয় চরিত্ররূপেই কৃত্তিবাসে অঙ্কিত, মাইকেল প্রশস্তির মোহে তা বুঝি সমালোচক

বিস্মৃত হয়েছেন। নচেৎ তাঁর মতো সাহিত্যরসিকের কোনো রসদৃষ্টির অভাব ঘটেছে এমন মনে হয় না। সুগ্রীবের বহু বিচিত্র পরিচয়ের মধ্যে এখানে একটি মাত্র বেছে নেওয়া যেতে পারে ঐ 'শাখামৃগ'-অপবাদের প্রসঙ্গে। পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণে বানর-সৈন্য প্রেরণ-কালে সুগ্রীব যে সেনাপতিত্বের পরিচয় দিয়েছে, রামচন্দ্র কেবল তাতেই মুগ্ধ নন, ঐ নির্দেশনার মধ্যে অনন্ত বৈচিত্র্য-মণ্ডিত পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক অভিজ্ঞতার যে পরিচয় ফুটেছে তাতে রামচন্দ্রের বিস্ময়ের আর অবধি রইল না। মুখ ফুটে বলতেই হলো,—

সাগর পর্বত দ্বীপ পৃথিবীর অন্ত।
কেমনে জানিলে মিত্র কহ সে বৃত্তান্ত॥ (পৃঃ ২১৬)

আর, তাইতো তাঁর প্রীতিমুগ্ধ স্বীকৃতি :—

অপূর্ব না মানি সূর্য হরে অন্ধকার।
অপূর্ব না মানি আমি সীতার উদ্ধার॥
অপূর্ব না গণি মেঘ বরিষয়ে জল।
তোমারে অপূর্ব মিত্র মানি হে কেবল॥ (পৃঃ ২০৭)

কিন্তু এতৎসত্ত্বেও এযুগের সুধী সমালোচক কৃত্তিবাসের সুগ্রীবকে শাখামৃগত্বের বেড়া ডিঙিয়ে এপারে এক পাও বাড়াতে দিতে নারাজ! অর্থাৎ কৃত্তিবাসের সবই পণ্ডশ্রম।

হনুমানের বেলা সমালোচক যদিও মনে রেখেছেন বাল্মীকির হনুমান 'ষড়ঙ্গবেদবিৎ', কৃত্তিবাস যে ঐ ঋষি-পরিকল্পিত চরিত্রটিকে ভাসিয়ে দিয়েছেন শাখামৃগত্বের মাঝ-দরিয়ায়, এইটাই তাঁর বক্তব্য। হতে পারে, বিচিত্র কর্ম-সম্পাদনের ভারপ্রাপ্ত হনুমানের বিশাল ভূমিকার কোনো কোনো অংশে পাঁচালীকার কৃত্তিবাস হাল্কা সুরের ভাষণ-ভঙ্গির আশ্রয় নিয়েছেন, কিন্তু সমগ্রতায় এই চরিত্রালেখ্য যে নিছক বানরীয় তুচ্ছতায় ভরা, এমন প্রস্তাব শুধু তাঁদের পক্ষেই সম্ভব যাঁরা কৃত্তিবাসকে হেয় প্রতিপন্ন করতে বদ্ধপরিকর। তা ছাড়া, মধ্যযুগের কবিরা যে হাল্কা রসের পরিবেশনে মনোযোগী হতেন সে প্রধানত প্রাকৃতজনের রস-রুচির খাতিরে; কিন্তু ঐ কৌশলে আসরের আকর্ষণ সুদৃঢ় করে নিয়ে তারই মধ্যে যে চরিত্রাদর্শ গড়ে তুলতেন, আমাদের ঐতিহ্য প্রমাণ করে, সেগুলো একেবারে ব্যর্থ হয়ে যায় নি। দাস্য-ভক্তির ও আত্মবিস্মৃত

ভক্ত-বীরের আদর্শও ঐ কৃত্তিবাসী হনূ-চরিত্রের মাধ্যমে দেশময় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। কৃত্তিবাসের দুর্ভাগ্য যে, সেযুগের অশিক্ষিত সমাজ যা দরাজ হৃদয়ে সহজে গ্রহণ করেছিলো, মাথায় করে নিয়েছিলো যে আদর্শকে, এ যুগের সুশিক্ষিত সমাজ সমীক্ষার তীক্ষ্ণ আলোক-সম্পাতে তার তুচ্ছতা-হেয়তা ধরে ফেলেছেন,—নিতান্তই 'বানরীয়' বলে চিহ্নিত করে মানুষকে তার প্রতি বিমুখ করে দিতে চান।

কিন্তু কৃত্তিবাসের হনূমানও যে বানরমাত্র নয় তার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে বিপুল পরিমাণে। বাল্মীকির বেদজ্ঞ হনূমান—

নানৃগ্বেদবিনীতস্য নাযজুর্বেদধারিণঃ।
নাসামবেদবিদুষঃ শক্যমেবং প্রভাষিতুম্॥ (কিষ্কিন্ধ্যা—৩।২৯)

এই স্বরচিত শ্লোকের মাধ্যমে যেভাবে আমাদের কাছে প্রথমেই পরিচিত হন, তেমন কোনো আয়োজন কৃত্তিবাসে না থাকলেও, তাঁর হনূমানও বেদবিদ্যা-বিশারদ ও অলৌকিক ধীশক্তিসম্পন্ন। সেই শক্তিবলে তাঁর শিক্ষাগুরুকেও হতে হয় পরাজিত।

নানা বিদ্যা মল্লযুদ্ধ শিখিল বিস্তর॥
পড়িবারে গেল বীর ভার্গবের স্থানে।
চারিবেদ মল্লযুদ্ধ শিখে চারিদিনে॥ (পৃঃ ১৭৮)

পরম পণ্ডিত বলেই হনূমানের উপর ভার পড়ে ছিন্নপক্ষ সম্পাতির নিকট রামায়ণ-কথনের। "সাতকাণ্ড রামায়ণ হনূমান কয়। সম্পাতি পক্ষীর পাখা হইল উদয়॥" (পৃঃ ২৩০)। অলঙ্ঘ্য সাগর লঙ্ঘন ক'রে হনূমান যে অসাধ্য সাধন করেন, সে নিছক যাদুবলে নয়, নিছক দৈহিক বলেও নয়। বীরত্বের সঙ্গে যুক্ত হয় সাধনার বল। এ সাধনা সর্বাত্মক শক্তিপ্রয়োগের সাধনা। যে শক্তিতে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উদয়-বিলয় ঘটে, সেই শক্তিতে শক্তিমান হয়ে জগতের মহাহিত-সাধনের জন্য আত্মনিয়োগের সাধনা। মহাসাধক হনূমান বুঝি এ বিষয়ে জন্মসিদ্ধ। রামচন্দ্র তাঁর ইষ্টদেবতা। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, মনে-প্রাণে তাঁকে ডাকলে, তাঁর শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করলে এমন শক্তি লাভ করা যায়, যা অসাধ্য-সাধনে সক্ষম। মহেন্দ্র পর্বত থেকে লম্ফদানের পূর্বে তাঁর আত্মপ্রস্তুতির যে চিত্র কীর্তিবাসে অঙ্কিত হয়েছে তা নিছক 'বৃহল্লাঙ্গুল' কোনো এক শাখামৃগের নয়।

সখাদের আলিঙ্গন করে, বন্দনীয় সর্বজনে বন্দনা সেরে নিয়ে, সকলের প্রীতি ও আশীর্বাদে মণ্ডিত, অজস্র পুষ্পমাল্যে ভূষিত হয়ে—

তবে সব কপি স্থানে অনুমতি লয়ে।
বসিলেন হনুমান পূর্বমুখ হয়ে॥
ভক্তিযুক্ত মনে কৈলা দণ্ডবৎ নতি।
গণেশাদি পঞ্চদেব দিকপাল প্রতি॥ (পৃঃ ২৩৭)

শাস্ত্রীয় সংস্কারবিদ্ পাঠক লক্ষ্য করুন, পূর্বাস্য হয়ে পূজায় বসে সংকল্প-পূর্ব আয়োজনটি কেমন শাস্ত্রীয় বিধি-অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হচ্ছে। গণেশাদি পঞ্চ-দেবতা, ইন্দ্রাদি দশদিকপালের পূজায় এই পূজকের কিন্তু পুরোহিতের সাহায্য দরকার হলো না। অতঃপর পরম পিতাকে প্রণাম, লৌকিক মাতা-পিতাকে প্রণাম, যাঁর আজ্ঞায় এই কাজের ভার নিতে হয়েছে সেই শ্রীসুগ্রীব-রাজকে প্রণাম জানানো হলো। মনে মনে "লক্ষ্মণ-জানকী-পদ করিয়া বন্দন। আরম্ভিল রামচন্দ্র করিতে চিন্তন॥" হনুমানের এই 'চিন্তা'র বহরটি যাঁরা চিন্তা করে দেখার দরকার মনে করেন না, তাঁরাই তাঁকে সলাঙ্গুল শাখামৃগ মাত্র ভাবতে পারেন। "চিন্তামাত্রে হৃদয়ে প্রকাশ রঘুবর।"—এইখানেই তো হনুমানের অসামান্যতা, এইখানে তাঁর সকল অলৌকিক শক্তির রহস্য। অতঃপর সুরু হলো বন্দনা—জয় জয় রামচন্দ্র রঘুকুলপতি। কৃপামৃত-পারাবার অগতির গতি॥ তুমি যদি চাহ প্রভু হইয়া সদয়। তবে পিপীলিকা মেরু তুলিতে পারয়॥ পরমাণু দেখিতে পায় যে অন্ধজন। পঙ্গু পারে পারাবার করিতে লঙ্ঘন॥" (পৃঃ ২৩৭)—সেই 'মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্'—এর ছন্দে বাঁধা এই বন্দনা। এ কি ঠিক শাখামৃগ-মাত্রেরই কাছে প্রত্যাশিত?

রাবণের অন্তঃপুরে সীতার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়ে হনুমানকে নিশাকালে নারীমহলে প্রবেশ করতে হয়। কিন্তু "সীতা না দেখিয়া দেখিনু পরদার"—এই পর-স্ত্রী-দর্শনের পাপবোধ জিতেন্দ্রিয় হনুমানকে আত্মগ্লানিতে দগ্ধ করতে থাকে। তাঁর মনে হলো, "কেশ আগে মুণ্ডাইয়া মরিব সাগরে। নিশাকালে পরস্ত্রী দেখিনু ঘরে ঘরে।"—এটাও তাদের কাছে আশা করা যায় না, যারা 'শাখামৃগত্বের ঊর্ধ্বে উঠিতে পারে নাই'। অলমতিবিস্তরেণ। কবিশেখরের প্রস্তাবটিও—"কৃত্তিবাসের রামায়ণ প্রকৃতপক্ষে—শিশুরঞ্জন রামায়ণ—ইহাতে উচ্চতর আদর্শের কথা কিছু নাই; কৃত্তিবাসের রুচিও মার্জিত নয়"; —সত্যই শিরোধার্য কি?

আমাদের বক্তব্য, যে-ভাবে যে-আকারেই হোক, বাল্মীকির রাবণ ও রাক্ষস সম্প্রদায় সম্পর্কে এবং কৃত্তিবাসের হাতের রাক্ষস ও বানর চরিত্রালেখ্য সম্পর্কে এমন একটা ধারণা বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যে বেশ ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, যা যথেষ্ট তথ্যভিত্তিক নয় ; সুতরাং সাহিত্যিক সত্যের খাতিরে তার খণ্ডন হওয়া আবশ্যক। তা ছাড়া, ঐ ভ্রান্ত ধারণার প্রচারে মাইকেল-প্রশস্তির ক্ষেত্র প্রসারিত হতে পারে, কিন্তু ভারতের চিরগৌরব বাল্মীকি-রামায়ণের অপব্যাখ্যা কায়েমী হয়ে থাকবে, মহর্ষির সুমহান পরিকল্পনায় যে বিরাট সমন্বয় স্থান পেয়েছে, তাও হতে থাকবে উপেক্ষিত,—আর সেটি হবে বাংলা সাহিত্যে ও বাঙালীর মধ্যে, অন্যেরা মূলের সঙ্গে সাক্ষাৎ সংযোগ রেখে ঐ প্রমাদের ও ঐ পাপের আওতা থেকে মুক্ত থাকবে। শ্রদ্ধানিষ্ঠ অনুবাদসূত্রে কৃত্তিবাসের চরিত্রায়ণ এমন কি কবিকৃতিও বিশেষ এক সমালোচন-ধারার প্রভাবে অপব্যাখ্যায়, অপবাদে, অথবা উপেক্ষায় সংকুচিত হয়ে থাকছে। মধ্যবর্তী কবি কালিদাস ঠিক এই আলোচ্য বিষয়ে কী আলোকপাত করে গেছেন, তাও থেকে যাচ্ছে চোখের আড়ালে অনেকটা ঐ একই কারণে।

(গ) বাল্মীকির রাবণ ও লঙ্কাপুরী মাইকেল-চিত্রের তুলনায় উজ্জ্বলতর

পূর্বোল্লিখিত মনীষীদের* নানা মন্তব্যে আর্য-রামায়ণের যে-রাবণ অমন অসভ্য বর্বর পশুপ্রকৃতির বীভৎস মূর্তিতে উপস্থাপিত হয়েছে, মহর্ষির হাতে সেই রাবণ কী মূর্তিতে অঙ্কিত হয়েছে, দেখা যাক :—

(ক) অহো রূপমহো ধৈর্যমহো সত্ত্বমহো দ্যুতিঃ।
অহো রাক্ষসরাজস্য সর্বলক্ষণযুক্ততা ॥
যদ্যধর্মো ন বলবান্ স্যাদয়ং রাক্ষসেশ্বরঃ।
স্যাদয়ং সুরলোকস্য সশক্রস্যাপি রক্ষিতা ॥

(সুন্দর—৪৯।১৭-১৮)

মহাপ্রাজ্ঞ মহাশক্তিধর বিচক্ষণ হনুমানের মুখে মহর্ষির এই রাবণ-বর্ণনা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য ;—"ওঃ কী রূপ, কী ধৈর্য, কী মহাসত্ত্বতা, কী বা দ্যুতি! যদি এঁর চরিত্রে অধর্ম প্রবল না হতো, তবে ইনি ইন্দ্রসমেত সমগ্র সুরলোকের রক্ষক হতেন।"

(১) যোগীন্দ্রমোহন বসু (২) মোহিতলাল (৩) আশুতোষ ভট্টাচার্য (৪) কবিশেখর (৫) অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়

(খ) ধর্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ রাজধর্মবিশারদঃ।
পরাবরজ্ঞো ভূতানাং ত্বমেব পরমার্থবিৎ॥
গৃহ্নন্তে যদি রোষেণ ত্বাদৃশোঽপি বিচক্ষণাঃ।
ততঃ শাস্ত্রবিপশ্চিত্ত্বং শ্রম এব হি কেবলম্॥

(সুন্দর—৫২।৭-৮)

তুমি ধর্মজ্ঞ, কার্যজ্ঞ, রাজধর্মবিশারদ; লোকসমাজে উত্তমাধম-জ্ঞানবিশিষ্ট এবং তুমিই একমাত্র পরমার্থতত্ত্বজ্ঞ। তোমার মতো বিচক্ষণ ব্যক্তি যদি ক্রোধের বশবর্তী হও, তবে তোমার শাস্ত্র-পাণ্ডিত্য-সম্পাদন (তিলক-টীকা) পণ্ডশ্রম বলে গণ্য হবে।' রাবণের প্রতি এই উক্তিটি বিভীষণের। সুতরাং শূন্যগর্ভ স্তাবকতা নয়।

(গ) ন ধর্মবাদে ন চ লোকবৃত্তে ন শাস্ত্রবুদ্ধিগ্রহণেষু চাপি।
বিদ্যেত কশ্চিত্তব বীর তুল্যস্ত্বংহ্যুত্তমঃ সর্বসুরাসুরাণাম্॥

(সুন্দর—৫২।১৭)

বিভীষণ রাবণকে বলছেন,—'হে বীর, ধর্মবিচারে বা লোকব্যবহারে বা শাস্ত্র-সম্মত পন্থানিরূপণে তোমার সমকক্ষ কেউ নেই, সমস্ত সুরাসুরের মধ্যে এবিষয়ে তুমিই শ্রেষ্ঠ।'

(ঘ) রাবণ যে কঠোর তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন, তার প্রসঙ্গ বাল্মীকি-রামায়ণে কতোই না ছড়িয়ে আছে। হনুমান বলছেন—

তত্ত্ববান্ দৃষ্টধর্মার্থস্তপঃ কৃতপরিগ্রহঃ।

(সুন্দর—৫১।১৭)

রাবণ নিজে বলছেন ইন্দ্রজিতের গুণ-চর্চায় :—

মমানুরূপং তপসো বলং চ তে······

(ঐ—৪৮।৬)

'তপোবলের দিক দিয়ে তুমি আমারই তুল্য'-ইত্যাদি।

অন্যত্র :—

ময়া বর্ষসহস্রাণি চরিত্বা পরমং তপঃ।
তেষু তেষ্ববকাশেষু স্বয়ংভূঃ পরিতোষিতঃ॥
তস্যৈব তপসো ব্যুষ্ট্যা প্রসাদাচ্চ স্বয়ম্ভুবঃ।
নাসুরেভ্যো ন দেবেভ্যো ভয়ং মম কদাচন॥

(যুদ্ধ—৯২।২৬-২৭)

'আমি সহস্র বর্ষ কঠোর তপস্যা করে স্বয়ম্ভুকে পরিতুষ্ট করেছি ; সেই তপস্যার ফলে এবং স্বয়ম্ভুর প্রসাদে আমি সুরাসুরের অবধ্য হয়েছি।'

(ঙ) সুপার্শ্ব নামক এক মেধাবী সৎস্বভাব অমাত্য রাবণকে বলছেন,—

বেদবিদ্যাব্রতস্নাতঃ স্বকর্মনিরতস্তথা— (যুদ্ধ—৯২।৬০)

[তিলককৃত টীকা :—ধার্মিকত্বাদেবেত্যাহ। বেদবিদ্যাগ্রহাপেক্ষিত ব্রহ্মচর্য-ব্রতপূর্ব বিদ্যাং গৃহীত্বা স্নাতো গুরুকুলাৎ সমাবৃত্তঃ তদনন্তরং দারগ্রহণপূর্বকং নিত্যাগ্নিহোত্রাদিস্বকর্মনিরতঃ।]

'আপনি বেদবিদ্যার্জনযুক্ত ব্রহ্মচর্যপালন যথারীতি সম্পন্ন করে গুরুগৃহ থেকে ফিরে এসে গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশপূর্বক শাস্ত্রসিদ্ধ গার্হস্থ্যধর্মকর্মপালনে প্রবৃত্ত হয়ে আছেন।'

(চ) লাম্পট্য-কলঙ্কিত রাবণ যে এককালে কতো বড়ো জিতেন্দ্রিয় ছিলেন, তারও পরিচয় শোনা যায় রাবণ-বধান্তে বিলাপরতা স্বয়ং মন্দোদরীর মুখে :—

ইন্দ্রিয়াণি পুরা জিত্বা জিতং ত্রিভুবনং ত্বয়া।
স্মরদ্ভিরিব তদ্বৈরমিন্দ্রিয়ৈরেব নির্জিতঃ॥

(যুদ্ধ—১১১।১৫-১৬)

'পূর্বে তুমি ইন্দ্রিয় জয় ক'রে ত্রিভুবনবিজয়ী হয়েছিলে, এখন দেখছি তোমার ইন্দ্রিয়গণই পূর্বশত্রুতার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তোমাকে নির্জিত করেছে।'

এ ছাড়া রাবণের পরিচয় কেবল সাক্ষাৎ রাবণের কথাতেই নয়, সমগ্র লঙ্কাপুরীর কথাতেই তার পরিচয়। কারণ লঙ্কাপুরী রাবণের পুরী। লঙ্কেশ্বর রাবণের ইতিহাস তার সোনার গায়ে মণি-মুক্তা-প্রবালবৎ খোদিত হয়ে আছে অজস্র বৈচিত্র্যে। কেবল রাবণ নয় গোটা রাক্ষস-সমাজের কথা, তাদের রুচি, তাদের ধ্যান-ধারণা, তাদের সংস্কৃতি, তাদের আচার-আচরণের ভালো-মন্দ, সুন্দর-অসুন্দর সব কথাই এখানে স্থান পেয়েছে। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, এখানে অনার্য লক্ষণের সঙ্গে এমন প্রভূত পরিমাণ আর্য-লক্ষণের সমন্বয় ঘটেছে, যা কখনই উপেক্ষণীয় নয়। এবং রাবণ-চরিত্র বা রাক্ষস-চরিত্রের যে-কোনো সমীক্ষা ঐ সমন্বয়ের আলোক ব্যতীত সুসম্পন্ন হতে পারে না। তাই রামায়ণের রাবণ বা রাক্ষসজাতিকে এক কথায় অনার্য বর্বর পশুপ্রকৃতি বা বীভৎসরসাশ্রয়ী বলে রায় দেওয়ার আগে মহর্ষিপ্রদত্ত বিবরণ খুঁটিয়ে দেখা বিশেষ প্রয়োজন।

রাক্ষস-সমাজের শ্রেণীবিশেষের মধ্যে যে ব্যাপকভাবে বেদ চর্চা হতো, যাগযজ্ঞের অনুশীলন হতো এবং সম্পন্ন রাক্ষসদের গার্হস্থ্যজীবনে বেদগান ও

বিবিধ শাস্ত্রোক্ত মাঙ্গলিকের এবং দেব-দেবীপূজার বিশেষ প্রচলন ছিলো, তার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায় বাল্মীকি-রামায়ণে।

(ক) ষড়ঙ্গবেদবিদুষাং ক্রতুপ্রবরযাজিনাম্।
শুশ্রাব ব্রহ্মঘোষান্ স বিরাত্রে ব্রহ্মরক্ষসাম্॥
অথ মঙ্গলবাদিত্রৈঃ শব্দৈঃ শ্রোত্রমনোহরৈঃ।
প্রাবোধ্যত মহাবাহুর্দশগ্রীবো মহাবলঃ॥

(সুন্দর—১৮।২-৩)

প্রভাতে লঙ্কাপুরীর আকাশ বেদগানে মুখরিত। ষড়ঙ্গবেদবিৎ ও যজ্ঞপরিচালনে সুদক্ষ ব্রহ্মরাক্ষসগণের উচ্চকণ্ঠে বেদপাঠ হনুমান শুনতে পেলেন। শ্রুতিমনোহর বিচিত্র মঙ্গলবাদ্যধ্বনিতে সেই মহাবীর মহাবাহু দশাননকে জাগানো হলো।

(খ) শুশ্রাব জপতাং তত্র মন্ত্রান্ রক্ষোগৃহেষু চ।
স্বাধ্যায়নিরতাংশ্চৈব যাতুধানান্ দদর্শ সঃ॥
রাবণস্তবসংযুক্তান্ গর্জতো রাক্ষসানপি।
রাজমার্গং সমাবৃত্য স্থিতং রক্ষোগণং মহৎ॥

(সুন্দর—৪।১৩-১৪)

হনুমান শুনতে পেলেন, রাক্ষসদের ঘরে ঘরে বেদমন্ত্রপাঠ হচ্ছে ('মন্ত্রান'—তিলকটীকা-'বেদমন্ত্রান্')। আর দেখলেন, রাজপথে সমবেতভাবে দাঁড়িয়ে বেদপাঠপরায়ণ (স্বাধ্যায়নিরত) বিরাট রাক্ষসের দল বেদগানের সঙ্গে মিলিয়ে উচ্চৈঃস্বরে রাবণের স্তবগান করছে।

(গ) ভেরীমৃদঙ্গাভিরুতং শঙ্খঘোষবিনাদিতম্।
নিত্যার্চিতং পর্বসুতং পূজিতং রাক্ষসৈঃ সদা॥

(সুন্দর—৬।১২)

(রাবণ-ভবনের আশেপাশে) সমস্ত রাক্ষসগৃহে নিত্য ভেরী, মৃদঙ্গ ও শঙ্খধ্বনি-সহ নিয়মিতভাবে স্ব-স্ব কুলদেবতার পূজা হয়ে থাকে ('পর্বসুতং' তিলকটীকা—'স্বপূজনীয়দেবতাকম্')।

(ঘ) রাবণের বাসভবনের অনন্ত ঐশ্বর্য সমারোহের বর্ণনার মধ্যেই পাওয়া যায়—

ধীরনিষ্ঠিতকর্মাঙ্গং গৃহং ভূতপতেরিব। (সুন্দর—৬।৩৯)

(তিলকটীকা: 'কর্মান্তং' ইতি পঠিত্বা ধীরৈ র্নিষ্ঠিতস্থানুষ্ঠিতস্য কর্মণস্ত-পোরূপস্য অন্তং ফলরূপমিত্যর্থমাহ। ভূতপতের্মহেশ্বরস্য যক্ষেশ্বরস্য বা।]

অর্থাৎ স্থিরচিত্তে অনুষ্ঠিত যজ্ঞাদি কর্মের দ্বারা পবিত্র যে গৃহের অঙ্গ।

(ঙ) গৃহাণি নানাবসুরাজিতানি দেবাসুরৈশ্চাপি সুপূজিতানি।
সর্বৈশ্চ দোষৈঃ পরিবর্জিতানি কপির্দদর্শ স্ববলার্জিতানি ॥

(ঐ—৭।৩)

দ্বিতীয় পংক্তির 'সর্বদোষমুক্ত' পরিচয়টির মধ্যে মহর্ষি যে ইঙ্গিত রাখতে চেয়েছেন, সেটা যে গৃহাধিপতি রাবণের গার্হস্থ্য পবিত্রতার অনুকূলেই, তা বলা বাহুল্য।

(চ) রাবণকে সীতা-প্রত্যর্পণমূলক সৎপরামর্শ দেওয়ার জন্য ধর্মাত্মা বিভীষণ রাবণের নিজালয়ে গিয়েই শুনতে পেলেন,—

পুণ্যান্ পুণ্যাহঘোষাংশ্চ বেদবিদ্ভিরুদাহৃতান্।
শুশ্রাব সুমহাতেজা ভ্রাতুর্বিজয়সংশ্রিতান্ ॥

এবং দেখলেন,—

পূজিতান দধিপাত্রৈশ্চ সর্পিভিঃ সুমনোক্ষতৈঃ।
মন্ত্রবেদবিদো বিপ্রান্ দদর্শ স মহাবলঃ ॥ (ঐ—১০।৮৯)

'মহাতেজা বিভীষণ শুনতে পেলেন ভ্রাতার বিজয়-কামনায় বেদজ্ঞ রাক্ষসবৃন্দের বিধিমত পুণ্যাহবাচনে সেই রাজভবন মুখরিত হচ্ছে। আর দেখলেন বেদমন্ত্রাভিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে দধি, দুগ্ধ-পুষ্পাক্ষতের উপচারে পূজা করা হয়েছে।'

মহর্ষি-প্রদত্ত রাক্ষস-সমাজ-জীবনের এই চিত্র নিতান্তই অনার্য বীভৎস-রসাশ্রয়ী পশুপ্রকৃতির জীব-মাত্রের নয় বলেই আমাদের বিশ্বাস—যদিও মাইকেল-প্রশস্তি-ব্রতধারী অনেককেই দেখা যায় আর্য রামায়ণের রাক্ষসদের সম্পর্কে ঐ মন্তব্যই জাহির করতে।

(ছ) বৈদেহীকে লংকায় আনয়নের ফলে রাজ্যে যে সব দুর্লক্ষণ দেখা দেয়, তার বিবরণ দিতে গিয়ে বিভীষণের মুখে প্রথমেই মহর্ষি জানিয়েছেন,—

সস্ফুলিঙ্গঃ সধূমার্চিঃ সধূমকলুষোদয়ঃ।
মন্ত্রসংঘহুতোঽপ্যগ্নি র্ন সম্যগভিবর্ধতে ॥ (ঐ—১০।১৫)

'হোমকার্য বিঘ্নিত হচ্ছে। মন্ত্রের দ্বারা আহুত হওয়া সত্ত্বেও হোমের অগ্নি ভাল করে জ্বলে না, ধূম আর স্ফুলিঙ্গ হয়।'

অগ্নিষ্টৈষগ্নিশালাসু তথা ব্রহ্মস্থলীষু চ।
সরীসৃপাণি দৃশ্যন্তে হব্যেষু চ পিপীলিকাঃ ॥ (ঐ—১৬)

'মহানস প্রভৃতিতে, অগ্নিহোত্র ভবনে এবং ব্রহ্মস্থলীতে (বেদাধ্যয়ন-স্থানে) সরীসৃপ এবং হব্যদ্রব্যে পিপীলিকা দেখা যাচ্ছে।'

এখানে পুনরায় স্মরণ করা যেতে পারে পূর্বোক্ত বিচিত্র বিবরণযুক্ত যে সমাজ, তার কেন্দ্রীয় পুরুষ লঙ্কেশ্বর রাবণ। সুতরাং এ সমস্ত তথ্যই নিঃসন্দেহে রাবণ-চরিত্রের উপর কিছু না কিছু আলোকপাত করছে। ঐ চরিত্রের অনার্যত্ব, পাপ, বা অধর্ম যা বিবৃত হয়েছে, তার সঙ্গে এই আর্যত্ব-ব্যঞ্জক মূল্যবান বৈশিষ্ট্যগুলির সমন্বয়েই রচিত হওয়া উচিত সমগ্র রাবণ-চরিত্রের কাঠামো।

প্রসঙ্গত, পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের আগ্রহ জাগে স্বামী বিবেকানন্দের একটি মন্তব্যের প্রতি। রামায়ণ আর্যজাতি কর্তৃক অনার্য-বিজয়ের উপাখ্যান, এই পণ্ডিতী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে তিনি বলেছেন, "থামকা আহম্মকির দরকারটা কী? আর রামায়ণ পড়া তো হয় নি,—খামকা এক বৃহৎ গল্প রামায়ণের উপর কেন বানাচ্ছ? রামায়ণ কিনা আর্যদের দক্ষিণী বুনো বিজয়!! বটে—রামচন্দ্র আর্য রাজা, সুসভ্য, লড়ছেন কার সঙ্গে? লঙ্কার রাবণ রাজার সঙ্গে। সে রাবণ, রামায়ণ পড়ে দেখ, ছিলেন রামচন্দ্রের দেশের চেয়ে সভ্যতায় বড় বই কম নয়। লঙ্কার সভ্যতা অযোধ্যার চেয়ে বেশী ছিল বরং, কম তো নয়ই।"—(প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—উদ্বোধন, পৃঃ ১১০)

মাইকেল-প্রশস্তির নেশায় সেই যোগীন্দ্রমোহন বসু থেকে আজও পর্যন্ত রামায়ণের রাবণ ও রাক্ষস-সমাজের নিরংকুশ বর্বরতা ও পশুপ্রকৃতির ঘোষণায় চলেছে প্রচুর সাহিত্যিক মেহনত। চলেছে স্বামীজির মন্তব্যকে ঠেলে রেখেই। কারণ এর মুখোমুখি হওয়া বেশ শক্ত ব্যাপার।

রামায়ণের রাবণকে এক কথায় অনার্য পশুপ্রকৃতির বলে রায় দেওয়ার আগে একবার দেখা উচিত ঐ রাবণেরই মনস্বিতা ও নীতিজ্ঞানের পরিচয় দেওয়ার জন্য মহর্ষির প্রয়াস কী সুপ্রশস্ত। লঙ্কাপুরী শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত। রাজার পক্ষে এখন উচিত বিজ্ঞ উপদেষ্টাদের মতামত নিয়ে চলা। তাই রাজসভায় সকলকে ডেকে রাবণ বলছেন,—

কিং করিষ্যামি ভদ্রং বঃ কিং বো যুক্তমনন্তরম্।
উচ্যতাং নঃ সমর্থং যৎ কৃতং চ সুকৃতং ভবেৎ॥
মন্ত্রমূলং চ বিজয়ং প্রবদন্তি মনস্বিনঃ।
তস্মাদ্বৈ রোচয়ে মন্ত্রং রামং প্রতি মহাবলাঃ।

(যুদ্ধ—৬।৪-৫)

'তোমাদের সকলের মঙ্গলকর হয় এমন কী আমি করতে পারি, তোমাদেরই বা কী কর্তব্য, কী ব্যবস্থা আমরা করতে সক্ষম, এবং কোন্ ব্যবস্থাই বা আমাদের পক্ষে শ্লাঘনীয়, তোমরা আমায় বলো। মনস্বী ব্যক্তিরা বলেন, জয়লাভ নির্ভর করে উপযুক্ত মন্ত্রণার উপর, সুতরাং রামের প্রতি আমার কর্তব্য সম্পর্কে তোমাদের মহাবল মন্ত্রণা লাভ করতে আমি ইচ্ছা করি।'

সুবিজ্ঞ ধীরবুদ্ধি রাজনীতিকের মতো এই প্রস্তাবনার পরেই রাবণ তাঁর সভাসদগণের কাছে উত্তম-মধ্যম-অধম ভেদে তিনি শ্রেণীর কর্মী পুরুষের ও তিন শ্রেণীর মন্ত্রণার দোষগুণ ব্যাখ্যা করছেন। প্রথমে পুরুষের কথা,—

বিবিধাঃ পুরুষা লোকে উত্তমাধমমধ্যমাঃ।
তেষাং তু সমবেতানাং গুণদোষৌ বদাম্যহম্॥
মন্ত্রাস্ত্রিভির্হি সংযুক্তঃ সমর্থৈর্মন্ত্রনির্ণয়ে।
মিত্রৈর্বাপি সমানার্থৈর্বান্ধবৈরপি বাধিকৈঃ॥
সহিতো মন্ত্রয়িত্বা যঃ কর্মারম্ভান্ প্রবর্তয়েৎ।
দৈবে চ কুরুতে যত্নং তমাহুঃ পুরুষোত্তমম্॥
একোঽর্থং বিমৃশেদেকো ধর্মং প্রকুরুতে মনঃ।
একঃ কার্যাণি কুরুতে তমাহুর্মধ্যমং নরম্॥
গুণদোষৌ ন নিশ্চিত্য ত্যক্ত্বা দৈবব্যপাশ্রয়ম্।
করিষ্যামীতি যঃ কার্যমুপেক্ষেৎ স নরাধমঃ॥

(যুদ্ধ—৬।৬-১০)

উত্তম মধ্যম ও অধম জগতে তিন শ্রেণীর পুরুষ আছেন। তাঁদের বিচারবুদ্ধির তারতম্য বলছি। মন্ত্রনির্ণয়ে সমর্থ উত্তমাধম-মধ্যম তিন শ্রেণীর মন্ত্রণাদাতার— তারা মিত্র, সমাভাবাপন্ন বা বান্ধব যাই হোক না, সকলের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যিনি কর্মারম্ভ করতে পারেন এবং দৈবের প্রতি শ্রদ্ধাবান হয়ে কাজ করেন, তিনি উত্তম শ্রেণীর পুরুষ। যিনি ধর্মপথে থেকে একাই কর্তব্যাকর্তব্য বিচার করেন এবং একাই কর্মারম্ভ করেন, তিনি মধ্যম শ্রেণীর পুরুষ। আর যিনি দোষগুণ বিচার না করে, দৈবকে উপেক্ষা করে যথেচ্ছ পন্থা অবলম্বন করবো, এইভাবে কর্তব্যবিচারকে উপেক্ষা করেন, তিনি অধম শ্রেণীর পুরুষ। তার পর মন্ত্রণার কথা—

একমত্যমুপাগম্য শাস্ত্রদৃষ্টেন চক্ষুষা।
মন্ত্রিণো যত্র নিরতাস্তমাহুর্মন্ত্রমুত্তমম্॥

বহ্বীরপি মতীর্গত্বা মন্ত্রিণামর্থনির্ণয়ঃ।
পুনর্যত্রৈকতাং প্রাপ্তঃ স মন্ত্রো মধ্যমঃ স্মৃতঃ॥
অন্যোন্যমতিমাস্থায় যত্র সংপ্রতিভাষ্যতে।
ন চৈকমত্যে শ্রেয়োঽস্তি মন্ত্রঃ সোঽধম উচ্যতে॥

(ঐ—৬।১০-১৩)

যেখানে নীতিশাস্ত্র পরিচালিত দৃষ্টিতে মন্ত্রীরা সকলে একমত হয়ে মন্ত্রণা দেয়, সেই হলো সর্বোত্তম মন্ত্রণা। যেখানে প্রথমে মতভেদ ঘটে পরে মতৈক্য হয়, সে হলো মধ্যম। আর যদি সকলেই পৃথক মতে চলতে থাকে, তাহলে পরিশেষে মতৈক্য ঘটলেও সে মন্ত্রণা শ্রেয়স্কর হয় না, সে হলো অধম জাতীয়।

রামায়ণের রাবণের যে হৃদয় বলে সত্যই কিছু ছিলো, তাঁর কাছে ভ্রাতৃ-বাৎসল্য, পুত্রবাৎসল্য, পত্নীবাৎসল্য বা স্নেহ-দয়া-মায়া-মমতা প্রভৃতি একেবারে নিরর্থক ছিলো না, এও যেন আজ প্রমাণের বিষয় হয়েছে। কারণ আর কিছু নয়, মাইকেলের রাবণের মধ্যে হৃদয়ধর্মের পরিচয় কিঞ্চিৎ বেশীমাত্রায় করুণভাবে ফুটতে দেখে মুগ্ধ সমালোচকমহল ঐ বিষয়ে মাইকেলের মৌলিকতা নিরংকুশ ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে প্রায় এক বাক্যে ঘোষণা করে আসছেন, মহর্ষির রাবণে নিছক রাক্ষসবৃত্তি ও পশুভাব ছাড়া আর কিছুই ছিলো না। কিন্তু সত্যই কি তাই?

কুম্ভকর্ণের মৃত্যুতে রাবণ-হৃদয়ের আর্তি মহর্ষি প্রকাশ করেছেন শ্লোকের পর শ্লোকে। 'শ্রুত্বা বিনিহতং সংখ্যে কুম্ভকর্ণং মহাবলম্। রাবণঃ শোকসন্তপ্তো মুমোহ চ পপাত চ॥' দুর্জয় শক্তির অধিকারী বিরাট পুরুষ রাবণ শোকাবেগ সংবরণ করতে না পেরে মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন। অতঃপর মূর্ছাভঙ্গে বিলাপের তরঙ্গে ভাসতে থাকেন।

হা বীর রিপুদর্পঘ্ন কুম্ভকর্ণ মহাবল।
ত্বং মাং বিহায় বৈ দৈবাৎ যাতোঽসি যমসাদনম্॥

* * *

রাজ্যেন নাস্তি মে কার্যং কিং করিষ্যামি সীতয়া।
কুম্ভকর্ণবিহীনস্য জীবিতে নাস্তি মে মতিঃ॥
যদ্যহং ভ্রাতৃহন্তারং ন হন্মি যুধি রাঘবম্।
নমু মে মরণং শ্রেয়ো ন চেদং ব্যর্থজীবিতম্॥

অদ্যৈব তং গমিষ্যামি দেশং যাত্রানুজো মম।
নহি ভ্রাতৄন্ সমুৎসৃজ্য ক্ষণং জীবিতুমুৎসহে॥

(যুদ্ধ—৬৮।১০,১৩-১৫)

'হে শত্রুদর্পহারী মহাবলশালী বীর কুম্ভকর্ণ! আজ আমার কী দুর্ভাগ্য যে তুমি সহসা আমাকে ছেড়ে যমপুরীতে প্রস্থান করলে। কুম্ভকর্ণ-বিহীন হয়ে আমার রাজ্যেও প্রয়োজন নেই, জীবনেও প্রয়োজন নেই, সীতাকে নিয়েই বা কী করবো? যদি আজই যুদ্ধে আমি আমার ভ্রাতৃহন্তা রাঘবকে বিনাশ করতে না পারি তবে এই ব্যর্থজীবন ধারণ করা অপেক্ষা মৃত্যুই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ। আজই আমি সেখানে যেতে চাই যেখানে আমার ছোট ভাই গেছে। স্নেহাস্পদ ভ্রাতৃগণকে হারিয়ে আমি এক মুহূর্তও বেঁচে থাকতে চাই না।'

সুতরাং দেখা যায়, যে-সীতার জন্য রাবণ গায়ে মেখেছেন অনপনেয় কলঙ্ক, ভ্রাতৃস্নেহের করুণ বন্যায় মুহূর্তের জন্য সেই সীতাসক্তি ভেসে যাওয়ার উপক্রম। তা ছাড়া, এই একই মুহূর্তে শত্রুপক্ষগত যে বিভীষণ, তাঁর উদ্দেশেও রাবণ-হৃদয় ক্ষণেকের জন্য উদ্বেলিত হয়ে ওঠে, অনুতাপে ভরে যায় তাঁর চিত্ত,—

তদিদং মামনুপ্রাপ্তং বিভীষণবচঃ শুভম্।
যদজ্ঞানান্ময়া তস্য ন গৃহীতং মহাত্মনঃ॥ (যুদ্ধ—৬৮.২১)

'আমি অজ্ঞানবশে মহাত্মা বিভীষণের হিতবাক্য অগ্রাহ্য করেছিলাম, তাই এই দুঃখ পাচ্ছি।'

প্রিয়তম পুত্র ইন্দ্রজিৎ ছাড়াও দেবান্তক, নরান্তক, ত্রিশিরা, অতিকায় প্রভৃতি পুত্রেরা যখনই যুদ্ধযাত্রায় উদ্যোগী হয়েছে, তখনই রাবণের স্নেহময় পিতৃহৃদয়ের আলোড়ন জানাতে ভোলেন নি আদিকবি বাল্মীকি। যাত্রাকালে রাবণ তাদের দিয়েছেন সস্নেহ আলিঙ্গন, তারাও পিতাকে প্রদক্ষিণ করে যাত্রা-মঙ্গল সম্পন্ন করে যাত্রা করেছে। তবে ইন্দ্রজিতের বেলায় রাবণের শুধু পিতৃস্নেহ নয়, সেই একই সঙ্গে তাঁর রাজধর্ম ও ক্ষত্রধর্মবোধের সমন্বয়ে গোটা রাবণ-চরিত্রের এমন একটি মহনীয় পরিচয় ফুটেছে, যার প্রতি উপেক্ষা মহর্ষির রাবণ-চিত্র-বিচারে অমার্জনীয় অপরাধ। রাবণের পিতৃহৃদয় স্ফীত হয়ে উঠেছে উপযুক্ত পুত্রের গুণাবলী ব্যাখ্যানে, অথচ সেই পুত্রকেই ভয়াবহ সর্বনাশা যুদ্ধে পাঠাতে হবে। স্নেহার্ত পিতৃহৃদয় কখনই এটা চায় না, মন তাঁর কিছুতেই সায় দেয় না। কিন্তু ক্ষত্রধর্ম অবহেলিত হওয়া উচিত নয়, রাজধর্মও পালিত হওয়া আবশ্যক। তাই আমরা প্রথমে শুনি,—

'ত্বমস্ত্রবিৎ শস্ত্রভৃতাং বরিষ্ঠঃ সুরাসুরাণামপি শোকদাতা।'

(সুন্দর—৪৮।২)

ইত্যাদি ; তুনি,—

ভুজবীর্যাভিগুপ্তশ্চ তপসা চাভিরক্ষিতঃ।
দেশকাল-প্রধানশ্চ ত্বমেব মতিসত্তমঃ॥ (ঐ—৪)

ইত্যাদি ; এবং,

ন ত্বাং সমাসাদ্য রণাবমর্দে।
মনঃ শ্রমং গচ্ছতি নিশ্চিতার্থম্॥ (ঐ—৬)

অর্থাৎ, তোমার মতো অস্ত্রশস্ত্রবিশারদ সুরাসুরজয়ী স্বীয় বাহুবলে ও তপোবলে সুরক্ষিত মহামতি পুত্র লাভ করে যে কোনো মহারণসংকটে জয় বিষয়ে আমার মনে কোনো খেদ বা সংশয় থাকতে পারে না। কিন্তু পরক্ষণেই—

ন খল্বিয়ং মতিশ্রেষ্ঠ যস্ত্বাং সং প্রেষয়াম্যহম্। (ঐ—১৩)

'হে মতিশ্রেষ্ঠ, তোমার মতো প্রাণপ্রিয় পুত্রকে এমন সংকটের মধ্যে পাঠাতে আমার মন চায় না, পাঠানো উচিত নয়।'

অথচ যে পাঠাতে হচ্ছে, তার কারণ—

'ইয়ং চ রাজধর্মাণাং ক্ষত্রস্য চ মতির্মতা।' (ঐ)

'রাজধর্ম ও ক্ষত্রিয়ধর্ম উভয়ের দাবীতে এরূপ ব্যবস্থা শাস্ত্রসম্মত।'

নানাশাস্ত্রেষু সংগ্রামে বৈশারদ্যমরিন্দম।
অবশ্যমেব বোদ্ধব্যং কাম্যশ্চ বিজয়ো রণে। (ঐ—১৪)

'রণে বিজয়লাভ যারই কাম্য, হে অরিন্দম, তার পক্ষে ধর্মনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি নানা শাস্ত্রে যেমন বিশারদ হওয়া বাঞ্ছনীয়, তেমনি সংগ্রামে বিশারদ হওয়ার উপযোগী কলাকৌশল ও অভিজ্ঞতাও বাঞ্ছনীয়।' (তিলক-টীকার অনুসরণে)।

রাবণের মধ্যে উচ্চাঙ্গের ক্ষাত্রধর্মের প্রকাশ স্বয়ং রামচন্দ্রকর্তৃক প্রশংসিত হয়েছে। রাবণের পতনদৃশ্যে রাম বলছেন,—

নায়ং বিনষ্টো নিশ্চেষ্টঃ সমরে চণ্ডবিক্রমঃ।
অত্যুন্নতমহোৎসাহঃ পতিতোঽয়মশঙ্কিতঃ॥
নৈবং বিনষ্টাঃ শোচ্যন্তে ক্ষত্রধর্মব্যবস্থিতাঃ।
বৃদ্ধিমাশংসমানা যে নিপতন্তি রণাজিরে॥

(যুদ্ধ—১০৯।১৪-১৫)

'এই মহাবীর নিশ্চেষ্ট হয়ে নিহত হন নি। ইনি নিঃশঙ্ক মহোৎসাহী যোদ্ধা, ক্ষত্রিয়ধর্ম পালন করে রণক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছেন। সুতরাং এঁর জন্য শোক করা উচিত নয়।'

দুঃখের বিষয় রাবণের এই ক্ষাত্রমাহাত্ম্যও সাম্প্রতিক বাংলা সমালোচনায় উপেক্ষিত হয়ে রয়েছে,—সেখানে শুধুই অনার্য রাক্ষসের পশুত্ব দিয়ে রাবণ-চিত্র মসীলিপ্ত।

যাঁদের ধারণা রাবণের রাজসভার বর্ণনা বা লঙ্কাপুরীর বর্ণনার মধ্যে মাইকেল রাক্ষসবংশের ও রক্ষোরাজ রাবণের উন্নততর কৃষ্টির বিস্ময়কর পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছেন—যার সমকক্ষ আর্যরামায়ণে কিছুই নেই—তাঁদের ভ্রান্তি পরিতাপজনক। আসলে বাল্মীকির রচনায় এর চেয়ে সহস্রগুণে সমুন্নত পরিচয় রয়েছে ভুরি ভুরি মূল রামায়ণের বিপুল পরিসরে; এবং যা কিছু মাইকেলের লেখনীতে আমরা পাই তার পনেরো আনাই সেখান থেকে ধার-করা, অনেক ক্ষেত্রে যান্ত্রিক অনুবাদ মাত্র, আর, তারও তৈরী রূপটি মাইকেল অনায়াসে পেয়েছেন কৃত্তিবাসের দরাজ ভাণ্ডার থেকে ('কৃত্তিবাসী ঋণের বহর' দ্রষ্টব্য)। মূল রামায়ণে সুন্দরকাণ্ডের ২য় থেকে ১১শ সর্গ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ পরিসরে ঐ পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে অপূর্ব কাব্য-সৌন্দর্য-যোগে। বস্তুত মাইকেলের বহু-প্রশংসিত রাবণ ও তাঁর রাজসভা-বর্ণনের কৃতিত্ব ঠিক কী জাতীয়, তার সুস্পষ্ট ধারণা করতে হলে মূল রামায়ণে ও কৃত্তিবাসী সংস্করণে ঐ সম্পর্কে কী পাওয়া যায়, সেটা দেখা দরকার। তিনটি চিত্র মিলিয়ে পড়লেই ধরা পড়বে, মাইকেলের কল্পনাগত নিজস্বতা প্রায় কিছুই নেই। কিঞ্চিৎ নূতন ধরণের উপমা-প্রয়োগ ছাড়া, প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বাল্মীকি বা কৃত্তিবাস থেকে নেওয়া। [উপমাতে 'ছত্রধর'-এর বেলা মাইকেল কালিদাসের 'রঘু'-৬৷২ থেকে সংগৃহীত 'কামং প্রত্যর্পিতস্বাঙ্গমিবেশ্বরেণ' উপমানটির যে কী অপব্যবহার করেছেন তা দেখানো হয়েছে 'উপমা মধুসূদনস্য' অধ্যায়ে।] তা ছাড়া, বিশেষ উল্লেখ্য, রাজসভায় সমাসীন রাবণ-চিত্রের সমগ্রতায় যে মাহাত্ম্য মূল রামায়ণে ফুটেছে, দুই পূর্বসূরীর কাছ থেকে সমস্ত উপাদান নেওয়া সত্ত্বেও মাইকেলের হাতে তা ফোটেনি।

স্বয়ং রাবণের বর্ণনায়,—মাইকেলের একটিমাত্র কথা,—'হেমকূট-হৈমশিরে শৃঙ্গবর যথা তেজঃপুঞ্জ,' অর্থাৎ বিশাল স্বর্ণদীপ্তিময় দেহ। বাল্মীকি রাবণের জন্য উপমান নিয়েছেন 'শৃঙ্গবর' নয়, 'মন্দর পর্বত'; বলা বাহুল্য, সার্থকতর উপমান। তা ছাড়া লিখেছেন, রাবণ মুক্তাজালসমন্বিত মুকুট ও হীরকাদি

মহার্হ মণিসমন্বিত স্বর্ণাভরণ ধারণ করে সভায় বসে আছেন। তাঁর দেহ রক্ত-চন্দন-চর্চিত, পরিধানে মহার্ঘ ক্ষৌমবসন। আর,

নীলাঞ্জনচয়প্রখ্যং হারেণোরসি রাজতা।
পূর্ণচন্দ্রাভবক্ত্রেণ সবালার্কমিবাম্বুদম্ ॥
*   *   *
উপোপবিষ্টং রক্ষোভিশ্চতুর্ভির্বলদর্পিতম্।
কৃতস্নং পরিবৃতং লোকং চতুর্ভিরিব সাগরৈঃ ॥
মন্ত্রিভির্মন্ত্রতত্ত্বজ্ঞৈরন্যৈশ্চ শুভদর্শিভিঃ।
আশ্বাস্যমানং সচিবৈঃ সুরৈরিব সুরেশ্বরম্ ॥
(সুন্দর—৪৯।৭,১২-১৩)

দেহের বর্ণ পুঞ্জীভূত নীলাঞ্জন তুল্য, বক্ষদেশ হারের দ্বারা সুশোভিত, মুখমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় আভাবিশিষ্ট হওয়ায়, রাবণকে নবোদিত তরুণ সূর্যসহ বিশাল একখণ্ড মেঘের ন্যায় দেখাচ্ছে। চারিদিকে বসে আছেন মহাবলদর্পিত চার জন শক্তিধর রাক্ষস মন্ত্রী, তাতে রাবণকে মনে হচ্ছে যেন চতুঃসমুদ্রের দ্বারা পরিবৃত গোটা ভূমণ্ডলের মহিমামণ্ডিত। চারিদিকে তাঁকে ঘিরে আছেন যেমন মন্ত্রতত্ত্ববিশারদ মন্ত্রিদল, তেমনি শুভদর্শী সচিবদল, সকলেই বিজয় ও শ্রীবৃদ্ধি সম্পর্কে আশ্বাস দিচ্ছেন, তার ফলে রাবণের শোভা হয়েছে দেবগণ-বেষ্টিত দেবরাজ ইন্দ্রের মতো।

এমতাবস্থায় রাবণকে দেখেই হনুমানের মনে হয়েছিলো, 'অহো রূপমহো ধৈর্যমহো সত্ত্বমহোদ্যুতিঃ। অহো রাক্ষসরাজস্য সর্বলক্ষণযুক্ততা ॥' বলা বাহুল্য, এই রাবণ-মহিমার এক চতুর্থাংশও ফোটে নি মাইকেলের অতি-প্রশংসিত চিত্রে।

লঙ্কাপুরীর বর্ণনা সম্বন্ধেও ঐ একই মন্তব্য। কী ঐশ্বর্য-সমারোহে, কী রুচি-সুষমায় লঙ্কাপুরীর চিত্রকে মাইকেল মূল রামায়ণের চেয়ে উন্নত করা তো দূরের কথা, তার সমকক্ষও করতে পারেন নি। যাঁরা মাইকেলের লেখনীতে

'এ স্বর্ণ-লঙ্কা, দেবেন্দ্র-বাঞ্ছিত,
অতুল ভবমণ্ডলে',

অথবা,

'চারিদিকে শোভিল কাঞ্চন-
সৌধ-কিরীটিনী লঙ্কা—মনোহরা পুরী!
হেম-হর্ম্য সারি সারি'

ইত্যাদি পেয়ে বিগলিত-চিত্তে মনে করেন, নূতন যুগের কবির হাতে রাক্ষস-পুরীর এ এক অভিনব দরদী রূপ, তাঁরা ভুলে গেছেন সেই অতি প্রাচীন যুগে বসে আদি কবি বাল্মীকিই দিয়ে গেছেন এই লঙ্কাপুরীর অধিকতর মূল্যবান ও দরদীচিত্র। তাঁর চোখেও লঙ্কা অমরাবতীতুল্য', —'দদর্শ লঙ্কামমরাবতীমিব' (সুন্দর—১।২০২),'মহীতলে স্বর্গমিব প্রকীর্ণং' (ঐ—৭।৬); এ ছাড়া তো রয়েছে সুদীর্ঘ অপরূপ বর্ণনা। এখানে দু' এক টুকরো নমুনা দেওয়া যেতে পারে।

(ক) কাঞ্চনেনাবৃতাং রম্যাং প্রকারেণ মহাপুরীম্।
গৃহৈশ্চ গিরিসংকাশৈঃ শরদাম্বুদসংনিভৈঃ ॥
পাণ্ডুরাভিঃ প্রতোলীভিরুচ্চাভিরভিসংবৃতাম্।
অট্টালক শতাকীর্ণাং পতাকাধ্বজ শোভিতাম্ ॥
তোরণৈঃ কাঞ্চনৈর্দিব্যৈর্লতাপঙ্ক্তিবিরাজিতৈঃ।
দদর্শ হনূমান্ লঙ্কাং দেবো দেবপুরীমিব ॥ (ঐ—২।১৬-১৮)

[প্রতোলী = রথ; প্রাচীর তোরণ ইত্যাদির কাঞ্চনময়তায় স্বর্ণবর্ণ, গৃহাবলীর শরৎকালীন মেঘের শুভ্রতা, রথাবলীর জ্যোৎস্নার আভা ও এতৎসহ বিবিধ পতাকাধ্বজের বর্ণালী, এদের সমবায়ে যে বর্ণসমারোহ ও ভাব-সমাবেশ রচিত হয়েছে, তা লক্ষণীয়, আর বিশেষ লক্ষণীয় 'দেবপুরীমিব' শব্দটি, যার ব্যঞ্জনা শুচিশুভ্রসুষমা-মণ্ডিত।]

(খ) সপাণ্ডুরাবিদ্ধ বিমান-মালিনীং
মহার্হ-জাম্বুনদজালতোরণাম্।
যশস্বিনীং রাবণবাহুপালিতাং
ক্ষপাচরৈ র্ভীমবলৈঃ সুপালিতাম্ ॥ (ঐ—২।৫৩)

[তিলক-টীকা: পাণ্ডুরা = সুধাধবলা; আবিদ্ধা = পরস্পর সংবিদ্ধা; বিমানানাং = সপ্তভূমিকপ্রাসাদানাং, মালা = সমূহং; যশস্বিনীং = স্বকীয় যশোবর্ধিকাং।]

যে লঙ্কাপুরীতে হনুমান প্রবেশ করলেন, সে কেমন পুরী? সু-উচ্চ প্রাসাদ-মালায় শোভিত, প্রাসাদগুলি সুধা-ধবলা, এবং সেগুলি ঘন-সন্নিবিষ্ট; পুরীর তোরণগুলি মহামূল্য স্বর্ণজালে শোভিত; লঙ্কাপুরী তার স্বকীয় যশ নিয়তই বাড়িয়ে চলছে; লঙ্কেশ্বর রাবণ আপন বাহুবলে এ রাজ্য পালন করে থাকেন এবং মহাবলশালী রাক্ষস-সৈন্যের সহায়তায় এই রাজপুরী সুশাসিত বলেই খ্যাত।

এখানে লক্ষণীয়, এই একটি শ্লোকে লঙ্কার সৌন্দর্য ও মহিমা এবং রাবণের রাজ্যশাসন-মহিমা যুগপৎ ব্যক্ত হয়েছে পরম শ্রদ্ধায়।

(গ) কতো বিচিত্র উপচারে ও বিচিত্র ভঙ্গিতেই না রাবণ পুরীর গৃহ-পরিবেশ সাজিয়ে তোলা হয়েছে।

> নিযুজ্যমানাশ্চ গজাঃ সুহস্তাঃ
> সকেসরাশ্চোৎপলপত্রহস্তাঃ।
> বভূব দেবী চ কৃতা সুহস্তা
> লক্ষ্মীস্তথা পদ্মিনি পদ্মহস্তা॥

'সাজাবার জন্যে পদ্মপূর্ণ সরোবর রচনা করা হয়েছে, তার মধ্যে লক্ষ্মীদেবীর মূর্তি করা হয়েছে, যিনি সুন্দর হাতে ধরে আছেন প্রস্ফুটিত পদ্ম, তাঁর চারপাশে হস্তিগণ সুশোভন শুণ্ডের সাহায্যে রাশি রাশি কেশরযুক্ত, পদ্মের পাপড়ি দিয়ে ঐ দেবীর অভিষেকে নিযুক্ত রয়েছে।'—এই যে অলংকরণ-সমারোহ, যার মধ্যে শোভনশুণ্ডে বিধৃত পদ্ম-পত্রের অঞ্জলিবিশিষ্ট হস্তী এবং পদ্মবনবিহারিণী পদ্ম-হস্তা দেবী লক্ষ্মীর মূর্তি-রচনা স্থান পেয়েছে,—এর পিছনে সেই রাক্ষস-সমাজ ও সমাজপতি রাবণের যে রুচির শুভ্রতা ও সুষমা, সেটা অবশ্যই লক্ষণীয়।

দৃষ্টান্ত বাড়ানো নিষ্প্রয়োজন। শুধু এইটাই বক্তব্য যে, আর্ষ রামায়ণের রাবণ ও রাক্ষস সমাজ সম্পর্কে যে নিছক বর্বরতা-পাশবিকতার ধারণা জাহির করা হয়ে থাকে, তা তথ্যসিদ্ধ নয়, এবং এ প্রস্তাবও গ্রাহ্য নয় যে সভ্য, মার্জিত রুচিবিশিষ্ট রাক্ষস-জীবনের আলেখ্য-রচনায় মাইকেল কোনরূপ মৌলিকতা বা অভিনবত্বের পরিচয় দিয়েছেন। মেঘনাদবধকাব্যে রাক্ষস-সমাজে দেবদেবী-পূজা, যাগযজ্ঞানুষ্ঠান, বেদপাঠ, শাস্ত্রীয় রীতিতে অন্ত্যেষ্টি সম্পাদন ইত্যাদির মধ্যে যে আর্যসংস্কারের ইঙ্গিত ফুটেছে, তার মধ্যে কবির মৌলিকতার দাবী তো কিছুই নেই, বরং আর্য রামায়ণে ঐ বৈশিষ্ট্যের যে উজ্জ্বলতর প্রশস্ততর পরিচয় আছে, তারই একটা ক্ষীণ প্রতিধ্বনি মাত্র কবি শোনাতে সক্ষম হয়েছেন। গার্হস্থ্য জীবনের কোমলতার চিত্রে হয়তো মাইকেল কিঞ্চিৎ ভারী চাপের তুলিকা সঞ্চালন করেছেন, তবে মূল রামায়ণে যে ঐ গার্হস্থ্য জীবনের সৌন্দর্য-মাধুর্যের অভাব আছে, তা নয়। সামাজিক বিজ্ঞতা বা কর্তব্য-চেতনার পরিচয়ও যথেষ্ট।

(ঘ) কালিদাসের রাবণ : পৌরুষ-মহিমায় মাইকেল-চিত্রের অধিকতর উজ্জ্বলতা বা মৌলিকতা স্বীকার্য নয়।

রাবণ-চরিত্রের সমুন্নতি-বিধানে মাইকেলের মৌলিকতায় মুগ্ধ হওয়ার আগে আরো যাঁদের হাতের রাবণ-চিত্রের খবর নেওয়া আবশ্যক, তাঁদের মধ্যে কালিদাস অন্যতম। মোহিতলাল রাবণ-মেঘনাদাদি সম্পর্কে যে কালিদাসীয় বুলি (উপপ্লবায় লোকানাং ধূমকেতুরিবোত্থিতঃ) আবৃত্তি করে গেছেন, সেই কালিদাসের হাতের রাবণ-চিত্র কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত আবেদন বহন করে, এবং কৃত্তিবাসের আগেই ভারতের আরও একজন কবি যে রাবণের মহত্ত্বব্যঞ্জক চরিত্রালেখ্য সশ্রদ্ধ দরদী ভঙ্গিতে রচনা করেছিলেন—সুতরাং এ বিষয়ে মাইকেলের মৌলিকতার দাবী স্বীকার্য নয়—তার প্রমাণ অতীব উজ্জ্বল।

রঘুবংশের ৪র্থ সর্গে সর্বপ্রথম যে রাবণের প্রসঙ্গটি পাওয়া যায় সেটি রামচন্দ্রের প্রপিতামহ মহারাজ রঘুর দিগ্বিজয়-বর্ণন উপলক্ষে—নিতান্তই নগণ্য প্রাসঙ্গিকতায়। হিমাচলে বিজয়-কীর্তি স্থাপিত হলে রঘু যে আর কৈলাস-পর্বতের দিকে গেলেন না, এইটুকুই খালি বক্তব্য। কিন্তু ঐ কৈলাসের সঙ্গে যে মহাবীর রাবণের বীরত্ব জড়িয়ে আছে এটা কবি কালিদাসের কল্পলোককে প্রবলভাবে অধিকার করে থাকতে দেখা যায়। তাই

'পৌলস্ত্যতুলিতস্যাদ্রেঃ' (রঘু—৪।৮০)

বলেই কৈলাসের পরিচয় দেন। অর্থাৎ এ হলো সেই কৈলাস, যে বিরাট পর্বত রাবণের বাহুবলে উৎক্ষিপ্ত হয়েছিলো, সঙ্গে সঙ্গে ব্যঞ্জনায় রয়ে গেল ঐ ঘটনার সঙ্গে জড়িত রাবণের কঠোর সাধনায় শিবের অনুগ্রহলাভের উপাখ্যান, রাবণ-চরিত্রের একটি উল্লেখযোগ্য মাহাত্ম্য। বীরত্ব ও তপশ্চর্যার সংযোগে রাবণ-চরিত্রের এই স্মরণীয় বৈশিষ্ট্যের উপর আলোকপাতে কালিদাস যে কতো যত্নবান ছিলেন তার আরো পরিচয় মেলে দ্বাদশ সর্গের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ঠিক একই বস্তুর পুনরুল্লেখে—

'রামস্তুলিতকৈলাসমরাতিং বহ্বমন্যত।'

(রঘু—১২।৮৯)

রামের এই ভেবেই আনন্দ যে তিনি আজ তাঁকেই পেয়েছেন প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে যিনি কৈলাস পর্বত উত্তোলিত করেছিলেন।

কালিদাসের কাব্যে রাম-রাবণের সংঘর্ষের একেবারে সূচনাতেই যে-ভাবে রাবণকে রঙ্গমঞ্চে আনা হয়েছে, রাবণের মনঃসমীক্ষায় কবি যে দৃষ্টির বশবর্তী হয়েছেন, তা রাবণ-ভাষ্যকার মাত্রেরই প্রণিধানযোগ্য।

নিগ্রহাৎ স্বসুরাপ্তানাং বধাচ্চ ধনদানুজঃ।
রামেণ নিহিতং মেনে পদং দশসু মূর্দ্ধসু ॥

(রঘু—১২।৫২)

কালিদাসের এই বর্ণনায় রাবণের যে মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে তাতে রক্ষোরাজের সীতাহরণরূপ দুষ্কার্যের নূতন ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। লাম্পট্য বা পরদারাসক্তি নয়, শক্তিমান পুরুষের আত্মসম্মান আহত হওয়ার প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়াই রাবণ কর্তৃক সীতার অপহরণের মূল কারণ। অসামান্য পুরুষ বলেই না তিনি দশটি মাথার অধিকারী, কিন্তু স্বীয় ভগ্নী সূর্পণখার নিগ্রহে ও খরদূষণাদি স্বজনবর্গের নিধনে তাঁর মনে হয়েছে, যেন রামের ঐ কার্যের দ্বারা তাঁরই নিজস্ব বিরাট পৌরুষ ও উত্তুঙ্গ আত্মসম্ভ্রমকে লাঞ্ছিত করা হয়েছে, যেন রামচন্দ্র রাবণের দশ দশটি মাথায় একই সঙ্গে পদাঘাত করার স্পর্ধা দেখিয়েছেন। তাই আহত পৌরুষের ও লাঞ্ছিত সম্ভ্রমের সমুচিত প্রতিফল দেওয়ার জন্য রাবণ সীতাহরণকার্যে ব্যাপৃত হন।

রঘুবংশে কালিদাসের হাতে রাবণ-চরিত্রের যতটুকু চিত্রিত হয়েছে তাতে, পরদারলোভী দানবের হীনতা অথবা পাপিষ্ঠের পাপপ্রবণতা ও ঘৃণ্যতা ফোটাবার কোনো চেষ্টাই নেই, বরং তাঁর শক্তিমত্তা ও বীরত্বের উপর যথেষ্ট আলোকপাত ঘটেছে।

মেঘনাদবধের রাবণ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে "অটল শক্তি"র রূপকল্প রচনা করেছেন, তার উপাদান তিনি মাইকেলের হাতে তেমন পেয়েছেন বলে মনে হয় না যেমন পেয়েছেন এই কালিদাসের হাতের রাবণ-চিত্রে এবং তাঁরই নিজস্ব রাবণ-ভাষ্য থেকে। কারণ, মাইকেলের রাবণের প্রায় বারো-আনা সেই রামায়ণেরই রাবণ। তাঁর সীতাহরণের যে ব্যাখ্যা

কি কুক্ষণে (তোর দুঃখে দুঃখী)
পাবকশিখারূপিণী জানকীরে আমি
আনিনু এ হৈম গেহে ?

এর মধ্যে যেটুকু পৌরুষের আমেজ ফুটেছে, 'কুক্ষণের' উপর দোষারোপে তা একেবারেই নিস্তেজ। 'পাবকশিখারূপিণী' নিয়ে আমাদের সমালোচনায়

যতোই মাথা ঘামানো হোক ওটি 'শিখামিব বিভাবসোঃ'—বারে বারে ব্যবহৃত (সুন্দর—১৫।২০,৩২ ইঃ) বাল্মীকির এই প্রয়োগটির বঙ্গানুবাদমাত্র, এবং কবির চিত্ত-ফুল-বন থেকে, 'মধু' নয়, সোজাসুজি 'ফুল' সংগ্রহ করে, 'মধুচক্র' রচনা নয়, সাজি-ভরানোর কৃতিত্বের নমুনা মাত্র। এরই দৃষ্টান্তে মেঘনাদবধের কাব্য-ভূমি এমনই কণ্টকিত যে যথেষ্ট সৃজনী শক্তি ও বিরাট প্রতিভার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও কবির মৌলিক সৃষ্টির সৌন্দর্য হয়েছে যথেষ্ট অনুসন্ধানেরবিষয়।

অটল শক্তি বা অনবনমিত পৌরুষ যদি বলতে হয় তবে সে কালিদাসের রাবণ। রাবণের পরিচয় সেখানে মাইকেলের মতো 'নৈকষেয়' বা নিকষা দিয়ে নয়; 'পৌলস্ত্য'ই সর্বাধিক ব্যবহৃত কখনও বা 'ধনদানুজ'। দুয়ের মধ্যে পার্থক্য যথেষ্ট। আর্য-অনার্যের সংমিশ্রণে, ঋষি ও দানবের যুগ্মপ্রভাবে অর্থাৎ এক বিরাট সমন্বয়ের উৎসমুখে রাবণের উৎপত্তি। তাই তাঁর পৌরুষের অনার্য পরিচয় কিছু ফুটতেই পারে কিন্তু অপর পরিচয় যেটি আছে তাও তো অবহেলিত হওয়া উচিত নয়, কারণ সেই মহত্ত্বের জোরেই রাবণ হতে পেরেছেন রামচন্দ্রের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী। কালিদাসের বিজ্ঞ বিশ্লেষণে এটি ধরা পড়েছিলো বলেই তাঁর কবি-মানসে প্রশস্ত স্থান লাভ করেছিলো রাবণের পিতৃপরিচয় যা মহৎ পৌরুষের দৃপ্ততার যথাযোগ্য উৎস। 'নিকষা' দানব-কন্যা। এই যে মাতৃকুল, এ ছিল ছলা-কলা-বৈশারদ্যে ও নানা হীনতায় ভরা। রাবণের মধ্যে তার পরিচয়ও একেবারে কালিদাসের দৃষ্টি এড়ায় নি। অচিরেই আমরা সে প্রসঙ্গে আসছি। এখানে কালিদাসের 'পৌলস্ত্য' ও মাইকেলের 'নৈকষেয়' নিয়ে আরো দুটি কথা এসে যায়। 'জনম তব কোন্ মহাকুলে?'—ভঙ্গিটাকে এইভাবে শাণিত করে নিয়ে মাইকেল যখন শুধু 'নিকষা'-কেই তুলে ধরেন ঐ 'মহাকুলত্ব' জাহির করার উদ্দেশ্যে,—যথা 'নিকষা সতী তোমার জননী'—তখন, নিতান্ত মাইকেল-ভক্তিতে চোখ-কান বোঁজানো থাকে বলে রক্ষা,—নচেৎ কিন্তু হাস্যোদ্রেক হওয়ারই কথা। কোথাকার কে 'নিকষা', তাকে নিয়ে এতো বুক-ফোলানো? একবার নয়, হাজার বার? গ্রন্থমধ্যে রাবণের পরিচয়ে 'নৈকষেয়' শুনতে শুনতে আমরা ক্লান্ত, এমন কি বিভীষণের বেলাতেও একবার 'কি আশ্চর্য, নৈকষেয়' শুনতে হয়। কিন্তু বংশ-পরিচয়ে পিতৃকুল ছেড়ে মাতৃকুলে যাওয়া কেন? তাও যেখানে পিতৃকুলে রয়েছেন বিশ্ববিশ্রুত বিশ্ববন্দিত ঋষিকুল,—পিতা বিশ্রবা মুনি, পিতামহ সপ্তর্ষির অন্যতম মহামুনি পুলস্ত্য?

সম্ভবত আমাদের সমালোচকমহল এখানে বিজ্ঞহাস্যযোগে সমুচিত জবাব নিয়ে তৈরী হচ্ছেন। তাঁদের হাতে রয়েছে মস্ত গবেষণালব্ধ বস্তু। বলবেন, এরই মধ্যে খুঁজে পেতে হবে মাতৃভক্ত মধুসূদনকে। 'নিকষা সতী', 'নৈকষেয়' 'নিকষা-নন্দন'—এই যে মাতৃপরিচয়েই নায়কের পরিচয়ের প্রশস্ততা-বিধান, এর মধ্যে পাওয়া যায় কবির নিজস্ব মাতৃস্মরণের অনুশীলন। মেঘনাদবধ কাব্যের রাবণের মধ্যে স্বয়ং মধুসূদনেরই প্রচ্ছন্ন আত্মপ্রকাশ; তাই কবির নিজস্ব মাতৃমুগ্ধতা রাবণের এই মাতৃপরিচয়ের মধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে।

তাই যদি হয়ও, তবু এই যে কবির আপন পরিচয়ে রাবণ-পরিচয়, কোনও বিখ্যাত এপিক চরিত্রের রূপায়ণে এ পদ্ধতি কতোটা সঙ্গত, এর ফলে চরিত্রটির প্রাপ্য মর্যাদা ঠিক বজায় থেকেছে কি না,—'নৈকষেয়' ও 'পৌলস্ত্য,' এ দুয়ের কোন্‌টিতে রাবণের পরিচয় অধিকতর গৌরবজনক হতে পারে, এগুলি ধীর বিবেচনা-সাপেক্ষ। অপরপক্ষ হয়তো বলবেন, মাতৃভক্ত মধুসূদনের ঐ ভক্তি-চর্চার সুযোগ জীবনে সুলভ হয় নি, তাই ঐ হৃদ্‌গত আক্ষেপ কবি মিটিয়েছেন এই পরোক্ষ মাতৃভাবের চর্চায়। কিন্তু যিনি আপন অসংযত তরুণী-রূপ-তৃষ্ণার তাড়নায় মাতাকে রূঢ়তম আঘাত দিতে কুণ্ঠিত হন নি, এবং আপন খেয়ালের উন্মত্ততায় নিজের অন্য সব কিছুর সঙ্গে মাতাকেও ত্যাগ করতে দ্বিধা করেন নি, তাঁর মাতৃভক্তির মহিমা-ঘোষণায় গগন বিদীর্ণ করা শোভা পায় না। আর সাহিত্যিক সৃষ্টির বিচারে এই ধরণের কোনো মেকি ভাবালুতার দোহাই দিয়ে শিল্পীর দুর্বলতা চাপা দেওয়াও উচিত নয়।

তা ছাড়া, মাইকেল পিতৃভক্তও বা কম কিসে? সাহিত্যাচার্য শ্রীজনার্দন চক্রবর্তী সম্প্রতি প্রমাণ করেছেন কবির এই চারিত্রিক মহত্ব। শুধু তাই নয়, কবির পিতৃ-তর্পণের অসামান্য নিষ্ঠায় মুগ্ধ হয়ে তিনি মাইকেলকে "জাতীয় পিতৃপুরুষের" বেদীতে বসিয়ে গোটা জাতির হয়ে নিজে সর্বাগ্রে তর্পণ করেছেন তাঁর "পিতৄন্ নমস্তে" শীর্ষক রচনায় (বেতার জগৎ, শারদীয়, ১৯৭১)।

যিনি আজীবন পিতৃদ্রোহিতার পরিচয় দিয়ে পিতার সামাজিক সত্তাকে করে রেখেছিলেন আমরণ লাঞ্ছনা-কণ্টকিত, 'আত্মবিলাপে'র মধ্যে যিনি প্রেম, যৌবন, অর্থ, যশ ইত্যাদি নানা বিষয়ে বিলাপ করলেও মাতাপিতার মনে শেলাঘাত হানার জন্য কোনো অনুতাপের প্রয়োজন বোধ করেন নি,—পাশ্চাত্য কবি-রীতির আরো একটি ছাঁচ-রচনার (Epitaph) সুযোগ নেওয়া

ও নাম জাহির করার উদ্দেশ্যে স্মৃতি-ফলকে আত্ম-পরিচয়দানের খসড়ায় তিনি কেবল মাতা ও পিতার নাম দুটি উল্লেখ করেছেন বলে তাঁর পিতৃ-তর্পণের মহিমায় যে কিসে এতো মুগ্ধতা আসতে পারে, তা অবশ্য আমাদের বোধগম্য নয়। তবে অমন পিতৃভক্তই যদি তিনি হন, তবে তো কবির প্রাণপ্রিয় নায়ক-চরিত্র যে রাবণ, যাঁর মধ্যে স্বয়ং মাইকেলেরই আত্মপ্রকাশ ঘটেছে বলে ধরা হয়ে থাকে, তাঁর পিতৃ-পরিচয়ের মধ্যে কবির নিজস্ব পিতৃস্মৃতির অনুশীলনই ছিলো প্রত্যাশিত। কিন্তু কার্যত আমরা যা দেখি, তা বড়ো অদ্ভুত। সাক্ষাৎ পিতৃস্মরণ না হোক, রাবণের পিতৃকুলের প্রতিভূস্বরূপ পিতামহ পুলস্ত্যকে স্মরণ করা হয়েছে মোট তিনবার ('নিকষা'-স্মরণ অন্যূন ১০ বার); কিন্তু প্রতিক্ষেত্রেই নায়কের পাপ ও অন্যায়ের পটভূমিকায়! কেবল সেখানেই রাবণ 'পৌলস্ত্য' বা 'পৌলস্তেয়' যেখানে আছে তার শাস্তি বা তার পাপের দরুণ অপরের শাস্তির কথা। যথা—

(১) মরিবে পৌলস্ত্য যথোচিত শাস্তি পাই (৪র্থ—৫৯১)

(২) তব কুলবধূ, রাখে বাঁধি পৌলস্তেয় ? না শাস্তি
সংগ্রামে······ (৮ম—৩৭)

(৩) এ শাস্তির হেতু হায়, পৌলস্ত্য দুর্মতি, (৮ম—৩৭৫)

বিজ্ঞ পাঠক সহজেই বুঝবেন। পর্যাপ্ত ঘৃণা ও ধিক্কারের পরিবেশেই এই পিতৃ-স্মরণ সম্পন্ন হয়েছে। কোনো খাঁটি পিতৃভক্ত সন্তানের লক্ষণ কি এটা?

আমাদের কিন্তু মনে হয়, মাইকেলের হাতের এই 'নিকষা-পুলস্ত্য'-শব্দ-ব্যবহারের পশ্চাতে কবির কোনোরূপ মাতৃ-পিতৃ-ভাব অনুসন্ধেয় নয়। যে শক্তি এই শব্দ দ্বয়ের বিসদৃশ প্রয়োগ নিয়ন্ত্রিত করেছে, তা হলো কবির অনুপ্রাস বা নিছক শব্দ-ধ্বনি-মুগ্ধতা। 'নিকষা সতী' তোমার জননী' (৬।৫২৩), 'নিকষা সতী-বৃদ্ধ পিতামহী' (৬।৬৭৮), 'শোকাকুল নৈকষেয়' (১।৭৬), 'শৈব-কুলোত্তম নৈকষেয়' (২।১৬৯), 'নিকষা-নন্দন,শূরসিংহ' (১।৪১৭), 'পরম ভকত মম নিকষা-নন্দন' (২।৪৩০), 'নৈকষেয় শূরে' (৯।৪১৮)—ইত্যাদি প্রতিক্ষেত্রেই অনুপ্রাসই প্রলুব্ধ করেছে কবিকে শব্দটির বহুল ব্যবহারে। অনুরূপভাবে, পূর্বোক্ত তিনটি দৃষ্টান্তেই 'পৌলস্ত্য' বা 'পৌলস্তেয়' এসেছে 'শাস্তি'র সঙ্গে জোড় মেলাতে বা শব্দ-ধ্বনির কোরাস গাইতে—তাতে ব্যঞ্জনায় আসরে 'পুলস্ত্য' বেচারার যে-দশাই ঘটুক না কেন। এতো বড়ো শিল্পীর এই দুর্বলতা

পরিতাপজনক। ডাঃ শিশিরকুমার দাস (১) বা আচার্য জনার্দন চক্রবর্তীর (২) মতো যাঁরা মাইকেলের পদরচনা-শব্দযোজনা অথবা শব্দব্রহ্ম-সাধনার প্রশস্তিতে আত্মহারা তাঁদের দৃষ্টি এখানে আর একবার আকর্ষণ করি।

কালিদাসের হাতের 'পৌলস্ত্য' শব্দ ভিত্তিতে ব্যবহৃত। রঘুবংশের কবির কল্পনায় রাবণ এক মহাশক্তিধর মহিমান্বিত পুরুষ। 'পৌলস্ত্য' বা 'ধনদানুজ' ঐ শক্তি ও মহিমারই স্মারক। যাঁদের ধারণা রাবণ ও রাক্ষসসমাজের প্রতি কোনোরূপ দরদী বা সম্ভ্রম-সূচক দৃষ্টি মাইকেলই সর্বপ্রথম দেখিয়েছেন, তাঁদের সেই শোচনীয় ভ্রান্তি আরো একবার প্রকট হবে কালিদাসীয় চিত্র-বিশ্লেষণে। সমান শ্রদ্ধায় এই কবি উল্লেখ করেন রাম ও রাবণ উভয় পক্ষের যুদ্ধোদ্যম, উভয় পক্ষের জয়-বিজয়ের আলোড়ন।

রণঃ প্রববৃতে তত্র ভীমঃ প্লবগ-রক্ষসাম্।
দিগ্‌বিজৃম্ভিত-কাকুৎস্থ-পৌলস্ত্য-জয়ঘোষণঃ॥ (রঘু—১২।৭২)

'লঙ্কায় কপি-রাক্ষসগণের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ সুরু হলো; কখনো রামের, কখনো রাবণের জয়-ঘোষণায় চারিদিক আলোড়িত মুখরিত হতে থাকলো।'

লক্ষ্মণকে শক্তিশেলে নির্জিত করার কাহিনী বর্ণনায় কালিদাস যখন বলেন—

ততো বিভেদ পৌলস্ত্যঃ শক্ত্যা বক্ষসি লক্ষ্মণম্,

তখন 'পৌলস্ত্য' পরিচয়ের সংযোগে সমগ্র প্রকাশটি শক্তিমত্তার যে ধ্বনি-পরিমণ্ডল লাভ করে, তা অবশ্যই লক্ষণীয়, আর ঠিক এই প্রকাশ-মহিমার অধিকতর মহনীয় এবং এই ধ্বনি-পরিমণ্ডলের সমৃদ্ধতর রূপ পরিস্ফুট হয়েছে নিম্নোক্ত শ্লোকে—

নির্যযাবথ পৌলস্ত্যঃ পুনর্যুদ্ধায় মন্দিরাৎ।
অরাবণমরামং বা জগদদ্যেতি নিশ্চিতঃ॥ (ঐ—১২।৮৩)

মেঘনাদবধ-পাঠকের নিশ্চয় মনে পড়বে, মাইকেল তাঁর রাবণের মুখে কালিদাসের কথাগুলি হুবহু বসিয়ে দিয়েছেন। রচনাটি আসলে বাল্মীকির, তবে সেখানে উচ্চারিত হয়েছে রামচন্দ্রের মুখে। রামের কথা রাবণের মুখে বসিয়ে কালিদাস কেবল একটা রচনার স্বাতন্ত্র্য নয়, রাবণের প্রতি দৃষ্টির যে সম্ভ্রমসূচক অভিনবত্বের পরিচয় দিয়েছেন, মাইকেল-প্রশস্তির ধূমে তা আচ্ছন্ন হতে দেওয়া

(১) 'মধুসূদনের কবি-মানস' (দাস)—"শব্দ ও প্রতি" (২) "অনুভব ও শব্দব্রহ্মের আশ্চর্য সাযুজ্য"—"পিতৃন্ নমস্তে" বেতার জগৎ (শারদীয়া) '৭১।

চলে না। মাইকেলের কৃতিত্ব এখানে শুধুই পরের মুখের বুলি আবৃত্তি করার। সেই আবৃত্তির ধমকে তাঁর রাবণকে নূতন বলে দেখবার কোনো কারণ নেই।

তবে কালিদাসের হাতে রাবণ-চিত্রের সমুন্নতি বিশেষ লক্ষণীয় নিম্নোদ্ধৃত অংশে, বিশেষ লক্ষণীয় রাবণ সম্পর্কে কালিদাসের কবিমানসও :—

অন্যোন্যদর্শন-প্রাপ্ত বিক্রমাবসরং চিরাৎ।
রামরাবণয়োর্যুদ্ধং চরিতার্থমিবাভবৎ ॥
ভুজমূর্দ্ধোরুবাহুল্যাদেকোঽপি ধনদানুজঃ।
দদৃশে হ্যযথাপূর্ব্বো মাতৃবংশ ইবস্থিতঃ ॥
জেতারং লোকপালানাং স্বমুখৈরর্চ্চিতেশ্বরম্।
রামস্তুলিত কৈলাসমরাতিং বহ্বমন্যত ॥ (রঘু—১২।৮৭-৮৯)

'বহুকাল পরে, রাম এবং রাবণ—উভয়েই আপন আপন উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী পেয়েছেন, স্ব স্ব বিক্রম-প্রকাশের এমন অবসর ইতিপূর্বে আর ঘটে নি। এতদিনে রাম-রাবণের যুদ্ধ যেন সার্থক হলো ॥

রাবণ এখন একাই যুদ্ধ করছেন। কিন্তু বাহু, মস্তক ও উরুদেশের বাহুল্যনিবন্ধন একক হলেও, দশাননকে রাক্ষস-পরিবৃত বলে মনে হতে লাগলো। রাবণের মাতৃকুল রাক্ষসজাতি; আজ সত্যই মনে হচ্ছে, লঙ্কেশ্বর যেন সেই মাতৃকুলে অবস্থিত হয়ে যুদ্ধ চালাচ্ছেন, অর্থাৎ রাক্ষসকুলের মায়াবিদ্যার প্রকৃত অধিকারী হয়ে সেই বিদ্যাবলে নিজেকে একাই একশ করে দেখিয়ে কার্য সিদ্ধ করছেন ॥

যিনি ইন্দ্রাদি দিকপালগণের বিজেতা, যিনি স্বহস্তে নিজের মুণ্ডচ্ছেদন-পূর্বক ত্রিপুরারিচরণে অর্পণ করে তাঁকে প্রসন্ন করেছিলেন এবং যিনি বিশাল কৈলাস পর্বত বাহুবলে উৎক্ষিপ্ত করেছিলেন, সেই শৌর্যবীর্য-সত্ত্ব-সম্পন্ন বীরোত্তম রাবণকে আজ অরাতি অর্থাৎ প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে পেয়ে বীরকেশরী রামের আর শ্লাঘার সীমা ছিলো না ॥'

মোহিতলালের উদ্ধৃতি 'উপপ্লবায় লোকানাং' ইত্যাদির মধ্যে যে জঘন্য বিভীষিকার ইঙ্গিত, যেটি কালিদাসের হাতে ছিলো তারকাসুরের জন্য বরাদ্দ (কুমার—২।৩২), তার সঙ্গে এই রাবণ-কথা-বর্ণনের কোনোরূপ সুর-সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় কি? এখানে কালিদাসের কবি-মানসে বীর-চরিত্র হিসাবে রাম ও রাবণ তুল্যানুতুল্য। পাপানুষ্ঠান সত্ত্বেও রাবণ কিসের জোরে রামের উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ার মর্যাদা পেলেন, তা বোঝাবার জন্য কবির কী সযত্ন প্রয়াস!

ইন্দ্রাদি দিকপাল-জয়ের মধ্যে রাবণের দিগ্‌বিজয়ী মহত্ত্ব ও কৈলাস পর্বত উত্তোলনের মধ্যে তাঁর বিস্ময়কর শক্তিমত্তার সঙ্গে আরো যে বিশেষ গুণটি যুক্ত হয়েছে, তাতে বুঝতে হয় রাবণ ছিলেন একাধারে যতো বড়ো বীর, ততো বড়োই সাধক, আর সেই সাধনার সফলতায় তাঁর আত্মপ্রত্যয় অখণ্ড ছিল বলেই তিনি আপন হাতে আপন মুণ্ড ছিন্ন করে দেবতার চরণে অর্পণ করতে দ্বিধা করেন নি। রামায়ণের পাপীচরিত্র দুর্ধর্ষ রাক্ষস যোদ্ধার মধ্যে এমন সব অসামান্য গুণের সমাবেশ লক্ষ্য করা এবং তাদের সমন্বয়ে চিত্রটিকে এমন মহনীয় করে তোলার পশ্চাতে কালিদাসের যে কবিমানসের পরিচয় ফুটেছে, তার সঠিক ধারণা গঠিত হলে, মনে হয় মেঘনাদবধের রাবণালেখ্য-সমীক্ষায় মাইকেলের মৌলিকতায় মুগ্ধ হওয়ার অবসর সংকুচিত হতে বাধ্য।

উপরোক্ত শ্লোকত্রয়ের দ্বিতীয়ের অন্তর্ভুক্ত 'মাতৃবংশ ইব স্থিতঃ' অংশটিতে এই কথাই পরিষ্কার যে, কালিদাস রাবণকে রাক্ষস বলেই ধরেন নি, ধরেছেন ক্ষত্র বীর বলে। কেবল মাতৃবংশের প্রভাব, অর্থাৎ রাক্ষসসুলভ মায়াজাল বিস্তার প্রভৃতি তাঁর কার্যকলাপে মাঝে মাঝে প্রকাশ পেতো। অথবা বলতে হয়, কেবলমাত্র দিশাহারা পরিস্থিতিতেই রাবণ-চরিত্রে অনার্য-পন্থাবলম্বন রূপ যে সাময়িক অবনমন ঘটতো, তার মূলে ছিলো তার মাতৃকুলের প্রভাব, অন্যথা রাবণ ছিলেন এক সুমহান ক্ষত্র বীরপুরুষ। এই দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই কালিদাসের রাবণ-পরিচিতি 'পৌলস্ত্য' 'ধনদানুজ' জাতীয় শব্দে পিতৃপক্ষ ছাড়া কখনও 'নিকষা'-জাতীয় হীন মাতৃপক্ষ অবলম্বন করে নি। এর পাশাপাশি মাইকেলের রাবণ-পরিচিতি পুনরায় স্মরণীয়।

অতি সংক্ষিপ্ত পরিসরে কালিদাস রাবণের যতটুকু পরিচয় কাব্যস্থ করেছেন, তার মধ্যে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি একভাবেই বজায় থেকেছে। যুদ্ধ যখন তুমুল চলেছে, তখন কবির বর্ণনায় রাম-রাবণের সেই একই সমকক্ষতার সুর।

> বচসৈব তয়োর্বাক্যমস্ত্রমস্ত্রেণ নিঘ্নতোঃ
> অন্যোন্য-জয়-সংরম্ভো ববৃধে বাদিনোরিব॥
> বিক্রমব্যতিহারেণ সামান্যাভূদ্দ্বয়োরপি।
> জয়শ্রীরন্তরা বেদির্মত্তবারণয়োরিব॥ (ঐ—১২।৯২-৯৩)

'রাম ও রাবণ পরস্পর বাক্যের দ্বারা বাক্যের এবং অস্ত্রের দ্বারা অস্ত্রের প্রতিরোধ করতে লাগলেন, এবং তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত তার্কিকদ্বয়ের ন্যায় তাঁদের উভয়েরই বিজয়স্পৃহা ক্রোধের সঙ্গে বর্ধিত হতে থাকলো॥'

'এবারের চিত্রখানি যুদ্ধে প্রবৃত্ত দুই মত্তমাতঙ্গের। তাদের মধ্যে আছে একটি মৃত্তিকানির্মিত বেদি। যে জয়ী হবে সেই অধিকার করবে। কিন্তু তুল্যবিক্রমশালী হলে ঐ বেদি কারও অধিকারে আসে না। এখানে যুধ্যমান সমবিক্রমশালী বীরদ্বয় রাম-রাবণের মধ্যে বিজয়লক্ষ্মীর ঐ বেদির দশা ঘটেছে॥' এইভাবে মহাকবি কালিদাসের রাবণ-ভাবনায় দেখা যায় উন্নত বীর-মহিমা-মণ্ডিত পুরুষের প্রাপ্য যথাযোগ্য সম্ভ্রমের কখনও অভাব ঘটে নি। এমন কি রাবণ-বধান্তেও কবি যেন রাবণের মহিমাজ্ঞাপনে সতর্ক; তাই, দেব-সারথি মাতলির বিদায়-দৃশ্যটি অঙ্কনে তাঁর এতো ঘটা। সহস্র-অশ্বচালিত যে ইন্দ্ররথ স্বর্গে ফিরে চললো, সেই রথের পুরোভাগে যে পতাকা, সেটি রাবণের নামাঙ্কিত শরজালে চিহ্নিত হওয়ায় অপূর্ব শোভায় মণ্ডিত হলো। যথা—

নামাঙ্ক-রাবণ-শরাঙ্কিত-কেতু-যষ্টিমূর্ধং
রথং হরি-সহস্র-যুজং নিনায়॥ (১০৩)

এখানকার কবিদৃষ্টিকে ক্ষণেকের জন্য ঐ রাবণ-মহিমাজ্ঞাপক পতাকায় নিবদ্ধ থাকতেই দেখা যায়।

সুতরাং মাইকেলের কাব্যে রাক্ষসের প্রতি দরদ ও রাবণ-চরিত্রে অনার্যের পরিবর্তে আর্যলক্ষণ দেখেই তাঁর দৃষ্টির মৌলিকতা বা সৃষ্টির অভিনবত্ব জাহির করা চলে না, যেহেতু মূল রামায়ণে ও কৃত্তিবাসী অনুবাদে ঐ সব কিছুরই নমুনা সুপ্রচুর; তা ছাড়া, মধ্যবর্তী কবি কালিদাসের হাতেও রাবণ-চিত্রের যথেষ্ট সমুন্নতি অপূর্ব কাব্যদক্ষতায় অঙ্কিত হয়েছে। এ যাবৎ যাঁরা মাইকেল-প্রশস্তির নেশায় সাধারণের কাছে ক্রমাগতই প্রচার করে এসেছেন রামায়ণের রাবণের নিরংকুশ বর্বরতা এবং চক্ষু মুদ্রিত করেই উড্ডীন রেখেছেন মাইকেলের দৃষ্টি ও সৃষ্টির নিরংকুশ মৌলিকতার জয়-ধ্বজা, তাঁরা বাল্মীকি-কৃত্তিবাসের সঙ্গে সঙ্গে কালিদাসের কাছেও অপরাধী।

(ঙ) মাইকেলের রাবণের বৈশিষ্ট্য

তবে, একথা অবশ্যই স্বীকার্য, নিরংকুশ মৌলিকতায় আপত্তি থাকতে পারে, হতে পারে মাইকেলের রাবণের বারো-আনাই রামায়ণের রাবণ, তবু এ রাবণ হুবহু সেই কৃত্তিবাসী রামায়ণের পাপ-চেতনাক্লিষ্ট অনুতাপ-বিনীত ভক্তাবতার রাবণ নয়। বাল্মীকি ও কালিদাসের যোগানো রাবণ-চরিত্রের পৌরুষ-বীর্যের দৃঢ়তা নিয়ে এ যুগের কবি যে একটি বিষয়ে ঐ চরিত্রে কিঞ্চিৎ অভিনবত্বের

সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছেন, তা হলো দৈবের প্রতি নিষ্ফল আক্রোশে-ভরা নিয়তি-লাঞ্ছিত, বিরাট পুরুষের ট্রাজেডি-দীর্ণ মূর্তি-রচনা। রামায়ণের রাবণের মত এখানকার রাবণের মুখেও আছে পদে পদে বিধির বিপাকের কথা, কিন্তু সেই বিধি-বিধানের কাছে অসহায় আত্মসমর্পণের পরিবর্তে এখানে শোনা যায় দৃপ্ত পৌরুষ-ভরা ক্ষুব্ধ অভিযোগ। ঘোরতর পাপজনিত অনুতাপের পরিবর্তে এখানে শোনা যায় অভিযোগ—'কি পাপ দেখিয়া মোর, রে দারুণ বিধি, হরিলি এ ধন তুই?' এ যেমন কাব্যের স্বরুতে (১।৮৭), তেমনি সমাপ্তিমুখেও সেই একই স্বর 'কি পাপে লিখিলা এ পীড়া দারুণ বিধি রাবণের ভালে?' (৯।৪০০)। এই যে রাবণ-চিত্র, এর মধ্যে রামায়ণের ঝড়ে-ভাঙা রাবণের আভাস থাকলেও, এ অবিকল সে-রাবণ নয়।

এর মধ্যে পুরুষকার ও দৈবের লড়াইয়ে বিধ্বস্ত ক্ষুব্ধ আক্রোশে ভরা বিশুদ্ধ ট্রাজেডি-নায়কের আবেদনযুক্ত যে বীর-চরিত্রের ব্যঞ্জনা ফুটেছে, সেইখানেই রাবণ-চরিত্রের আলেখ্য-রচনায় মাইকেলের স্বকীয়তা ও শক্তির পরিচয়। [এই গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে 'ভ্রান্ত রাবণ-ভাষ্য' উপশিরোনামযুক্ত শেষ (৯ম) পরিচ্ছেদে, এবং ষষ্ঠ অধ্যায়েও মাইকেলের রাবণের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আরো কিছু আলোচনা করা হয়েছে।]

[৩] মেঘনাদ

(ক) মাইকেলের মেঘনাদ-সৃষ্টির ভিত্তি-শৈথিল্য

এই গ্রন্থের অন্যত্র দেখানো হয়েছে আদিরসের কথায় মাইকেলের লেখনী কিরূপ সৃষ্টি-চাঞ্চল্যে মেতে ওঠে (প্রথম অধ্যায়) এবং শৃঙ্গাররসাত্মক সৃষ্টিতে তাঁর কাব্যোৎকর্ষের কতো সাবলীল স্ফুরণ ঘটে (ষষ্ঠ অধ্যায়), যার আরো বিশিষ্ট পরিচয় মাইকেলের চতুর্দশপদীর এক গুচ্ছ উৎকৃষ্ট সনেটে।[১] কবির এই মানস-প্রবণতার ফলে মেঘনাদবধ কাব্যের কয়েকটি স্থলে মেঘনাদের যে প্রেমিক-চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, অথবা প্রমীলা-প্রসঙ্গে মেঘনাদ-চরিত্রের যে প্রণয়-মধুর আবেদন রচিত হয়েছে, কেবল সেখানেই এই চরিত্রসৃষ্টিতে মাইকেলের নিরংকুশ মৌলিকতা। নব নব আঙ্গিক-সমাবেশের সুযোগ নিয়ে শিল্প-চাতুর্যের অধিকারী কবি ঐ সব কাব্যাংশে এমন নিপুণভাবে আসর জমিয়েছেন যে সেই রসাবেশে পাঠকচিত্তে মেঘনাদ-চরিত্রটি সহজেই হয়ে উঠেছে অধিকতর

আকর্ষণীয়। রামায়ণে প্রমীলাও নেই, মেঘনাদের প্রণয়ী-জীবনেরও কোনো স্থান সেখানে নেই। সুতরাং মাইকেলের এই উদ্ভাবন ও সংযোজন নিয়ে রামায়ণের সঙ্গে কোনো তুলনামূলক আলোচনার প্রশ্ন ওঠে না। আর, এটাও ঠিক মাইকেলের মেঘনাদ-চিত্র যে এতো প্রশস্তি-বন্দিত, তার স্তুতিবাদে আমাদের সমালোচনা-সাহিত্য যে এতো মুখর, তার মূলে এই প্রণয়-মাধুর্যের বিষয়টি বড়জোর একটা ক্ষীণ শক্তি যুগিয়েছে মাত্র। যেখান থেকে এসেছে ঐ প্রশস্তির প্রথম প্রশস্ত প্রেরণা, এসেছে তাতে বলিষ্ঠ বেগ ও প্রচণ্ড আবেগ, তা হলো ষষ্ঠ সর্গ। মেঘনাদের মুখের সেই বক্তৃতা, যার মাহাত্ম্য-নির্ণয়ে কেউ বলেছেন গোটা ষষ্ঠ সর্গই "বাঙালীর জীবনবেদ", বাঙালীর তথা ভারত-বাসীর জীবনের 'লাখ কথার এক কথা'[২] —কেউ পেয়েছেন তার মধ্যে "মেঘনাদবধের কবিকে জাতীয় কবিরূপে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের" অনিবার্য তাগিদ, যেহেতু ঐ কাব্যাংশ কবি মধুসূদনের "স্বাধীনতা-জাতীয়তাবোধের চেতনায়" ভরপুর, তা ছাড়া, পেয়েছেন তাতে "নীতি ও ধর্মকে কেন্দ্র করে জীবনের সৃষ্টি করা, চিন্তা ও চেতনাকে জাগ্রত করার" দিকে লক্ষণীয় কবিপ্রয়াস[৩]; আর সাধারণভাবে যার মধ্যে হয়তো অনেকেই খুঁজে পেয়েছেন উনবিংশ শতকের বাংলার জাতীয় নবজাগৃতির উদ্‌গাতা মাইকেলকে। অথচ আলোচ্য বক্তৃতাংশের একবর্ণও যে মাইকেলের নিজের রচনা নয়, হুবহু বাল্মীকি-রচনারই ছাপতোলা, তৃতীয় অধ্যায়ের অষ্টম পরিচ্ছেদে তা বিশদভাবে দেখানো হয়েছে। কিন্তু এ এক তাজ্জব ব্যাপার যে, মোহিতলালের মতো পণ্ডিত ব্যক্তিও ঐ রচনার মৌলিকতায় মুগ্ধ হয়েছেন। মুগ্ধ হয়েছেন ঐ অংশের মেঘনাদ-মহিমায়, মুগ্ধ হয়েছেন মাইকেলের কবি-মানসের অভিব্যক্তিতে। অংশটি তাঁর 'কল্পনা ও কবিমানস' শীর্ষক অধ্যায়ে উদ্ধৃত করবার মুখে তিনি মন্তব্য করেছেন,—"ক্ষোভে, ক্রোধে, লজ্জায় মেঘনাদ ইহার উত্তরে যাহা বলিল, তাহা যেন কবির নিজেরই কথা—"। এই 'যেন'-টা কি সমালোচকের আত্মপ্রবঞ্চনা? তিনি কি সত্যই বাল্মীকি-রামায়ণের মেঘনাদ-বধ-বৃত্তান্তমূলক অংশটির সাক্ষাৎ পরিচয় সংগ্রহের সুযোগ পান নি, না কি, জেনে শুনেও ঐ নকল করা অংশকেই চালিয়ে দিতে চেয়েছেন "কবির নিজেরই কথা" বলে? অবশ্য 'কবি শ্রীমধুসূদন' গ্রন্থের এই অধ্যায়ের আলোচ্য স্থলে মাইকেলের কল্পনা ও কবি-মানসের এক মহনীয় ভাষ্য-রচনায় প্রবৃত্ত হয়ে ঐভাবে নকল-করা

(২) সুরেশচন্দ্র সমাজপতি (৩) শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

অংশকে মোহিতলাল জোর করে 'কবির নিজেরই কথা' বলে চাপিয়ে দেওয়ার আগে বিভীষণের বিরূপ ভাষ্য-রচনায় যে বৈদগ্ধ্য-শাণিত প্রবল উৎসাহের পরিচয় দিয়েছেন (এই গ্রন্থের 'বিভীষণ-প্রসঙ্গে' সমালোচিত), তাতে পর পর এমন দুটি প্রয়াসের মধ্যে এই কথাই স্পষ্ট ধরা পড়ে যে সমালোচকের মানসগঠন দত্ত-কবির অনুকূলে নিতান্তই পক্ষপাতদুষ্ট।

কবিশেখর আবার আরো এক ধাপ এগিয়ে গেছেন। তিনি লক্ষ্য করেছেন ঐ বাল্মীকি-রচনার নকল। 'গুণবান বা পরজনঃ' ইত্যাদি শ্লোকটি সাজিয়েও দিয়েছেন 'শাস্ত্রে বলে গুণবান যদি পরজন···পরঃ পরঃ সদা' অংশটির পাশাপাশি, কিন্তু মন্তব্যের বেলা লিখেছেন "(মাইকেলের) মেঘনাদের মুখের কথাগুলির সহিত বাল্মীকির রামায়ণের মেঘনাদের উক্তির মিল আছে।" (বঃ সাঃ পঃ ১ম, পৃঃ ১৫৫)। কী আপত্তিকর এই বাগভঙ্গি! 'উক্তির মিল আছে', যেন মিলটা আকস্মিক। সজ্ঞানকৃত অনুবাদ বা সংকলন যেখানে—তাও কি শুধু ঐ ক'টি কথা, আরো বহু বহু,—সেখানে ঐ 'মিল আছে' বলা চলে কি? কিন্তু এহো বাহ্য। সেই যোগীন্দ্রমোহনের সুরে সুর মিলিয়ে কবিশেখর বলেছেন "বাল্মীকির মেঘনাদ সুসভ্য মানুষ নহেন, রাক্ষস" (পৃঃ ১১৬); এবং কেবল বলা নয়, প্রভূত অধ্যয়নের পরিচয়বাহী বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঐ সিদ্ধান্তকে সুচিন্তিত অভিমতরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন নানা উদ্ধৃতি ও ব্যাখ্যাযোগে। মাইকেলের মেঘনাদ যে সম্পূর্ণ নূতন মেঘনাদ, এ তাঁর মতে (অবশ্য আরো অনেকেরই মতে) 'বলা বাহুল্য'। কারণ, "বাল্মীকির মেঘনাদকে তিনি (মাইকেল) নিজের ভাব-কল্পনায় নূতন করিয়া গড়িয়া লইয়াছেন" (পৃঃ ১৫৭)। অর্থাৎ অসভ্য রাক্ষস হয়েছে সুসভ্য মানুষ। দৃষ্টান্তের বেলা কিন্তু বাল্মীকির মেঘনাদের সেই চিত্রকে দেখানো হয়েছে, যার অংশবিশেষ কেটে নিয়ে মাইকেল জুড়ে দিয়েছেন তাঁর মেঘনাদের চিত্রে। এই জোড়া-তালি সত্ত্বেও কি করে 'অসভ্য রাক্ষস' 'সুসভ্য মানুষ' হতে পারে, এই প্রশ্নকে ধামা-চাপা দেওয়ার জন্যই কি বাল্মীকির মূল রচনা উদ্ধৃত করার পরিবর্তে কবিশেখর তাঁর নিজস্ব বঙ্গানুবাদ দিয়ে কার্য সিদ্ধ করতে চেয়েছেন? কারণ, যদি অসভ্যতার কোনো ইঙ্গিত ঐ অংশে ফুটে থাকে তবে তা ঐ অনুবাদের ভাষার মধ্যে। অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা আবশ্যক :—

"রে নির্বোধ, তুই এইস্থানে জন্মিয়া বৃদ্ধ হইয়াছিস। তুই আমার পিতার সাক্ষাৎ ভ্রাতা, বল্ এখানে পিতৃব্য হইয়া কিরূপে ভ্রাতৃপুত্রের অনিষ্টাচরণ করিবি।

* * তুই যখন আত্মীয়স্বজনকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যের দাসত্ব গ্রহণ করিয়াছিস, তখন তুই অতিমাত্র শোচনীয় ও সাধুজনের নিন্দনীয় সন্দেহ নাই। * * পর যদি গুণবান হয়, এবং স্বজন যদি নির্গুণ হয় তাহা হইলে ঐ নির্গুণ স্বজন পর অপেক্ষা শ্রেয়, পর সে পরই। (মধুসূদন এই অংশের আক্ষরিক অনুবাদই করিয়াছেন, "শাস্ত্রে বলে গুণবান যদি পরজন গুণহীন স্বজন তথাপি নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ পরঃ পরঃ সদা।)"

'ইহ ত্বং জাতসংবৃদ্ধঃ' (যুদ্ধ—৮৭/১১-১৭) ইত্যাদি সাতটি শ্লোকের (পাঁচটি এই গ্রন্থের ৩য় অধ্যায়ের ৮ম পরিচ্ছেদে এবং ৫ম অধ্যায়েও উদ্ধৃত) অনুবাদে এরূপ 'তুই'-'তুই' ভঙ্গিতে ও তদনুরূপ 'করেছিস' 'হয়েছিস'-জাতীয় তুচ্ছতা-ব্যঞ্জক ক্রিয়াপদ-যোগে মেঘনাদকে দিয়ে কথা বলিয়ে কবিশেখর তাঁর পরিকল্পিত বর্বরতার দলিল-রচনায় যে আয়াস স্বীকার করেছেন, তাতে মাইকেল-প্রশস্তিবাদীরা খুসী হতে পারেন, কিন্তু মহর্ষির কাছে কবিশেখরের অপরাধ নিঃসন্দেহে হয়েছে অমার্জনীয়। রাজশেখর বসুও এই অংশের অনুবাদ করেছেন, কিন্তু কোন অর্থ-বিকার সেখানে প্রশ্রয় পায় নি। নিরপেক্ষ স্থিতধী-পাঠক মূল রচনাটি দেখুন, এবং 'ত্বং'-এর অনুবাদে যখন 'তুই'-বসাবার কোনো বাধ্যতা নেই, তখন অন্তত 'তুমি' ও তদুপযোগী ক্রিয়াপদ-যোগে অনুবাদটি সংশোধিত করে নিন, তা হলেই বুঝবেন কবিশেখরের ঐ প্রতিপাদনের অসারতা, বুঝবেন প্রশস্তিমোহে সমালোচক কী দৃষ্টি বিকার ও সৃষ্টিবিকারের বশবর্তী হয়েছেন। ঐ বিকৃত অনুবাদটি সুরু হওয়ার ঠিক আগেই তাঁর কলমে বেরিয়েছে,—মেঘনাদ "অসভ্য রাক্ষসের মতো গর্জন করে উঠলো।" সুতরাং সমালোচকের প্রতি আস্থাবান ও শ্রদ্ধাবান সকলের মনকেই তৈরী করা হলো, যেন উদ্ধৃত অনুবাদ-বস্তুটি 'অসভ্য রাক্ষসের গর্জন' বলেই গৃহীত হয়। কিন্তু উক্ত শ্লোক-সপ্তকের মধ্যে মহর্ষি মেঘনাদ-চরিত্রের যে মূল্যবান সংকেতগুলি তুলে ধরেছেন, তা যদি 'অসভ্য রাক্ষসে'র মতো হয়, তবে মাইকেলের 'সুসভ্য মানুষ' মেঘনাদের অস্তিত্ব কোথায়? "শাস্ত্রে বলে গুণবান যদি পরজন" ইত্যাদি সুসভ্যতার যে অকাট্য পরিচয়, তা তো ঐ অসভ্য রাক্ষসের গর্জনেরই যান্ত্রিক প্রতিধ্বনি মাত্র! 'নির্বোধ'-বলা, আর 'দুর্মতি' (গতি যার নীচ সহ নীচ সে দুর্মতি)—বলার মধ্যে কি এতোই পার্থক্য যে প্রথমটি বর্বরোচিত, আর পরেরটি সুসভ্যতাসূচক?

বস্তুত মাইকেলের সৃষ্টির মাহাত্ম্য-কীর্তনের জন্য নিতান্ত দুর্বল ভিত্তিতে এই

যে মৌলিকতা-ঘোষণার প্রয়াস এবং তারই প্রতিক্রিয়ায় কে কতো বাল্মীকি-কৃত্তিবাসকে উড়িয়ে দিতে সক্ষম তার পণ্ডিতী প্রতিযোগিতা, এটা বাংলা সাহিত্যে একটা ভীষণ উপদ্রবের মতো মাতামাতি করে চলেছে। মাইকেলের মেঘনাদবধ কাব্য আমাদের সাহিত্যে এক মহামূল্য সঞ্চয়। এই অমর সঞ্চয়ে এ সাহিত্য চিরকালের মতো ধন্য। বাঙালী পাঠক এর সাহিত্যিক আস্বাদনের মূল্য কখনই খর্বিত হতে দেবে না। কিন্তু গবেষণার নামে পূর্বোক্ত পণ্ডিতী প্রয়াসগুলি ঐ আস্বাদনের বাঞ্ছিত পরিমণ্ডলে উপদ্রবের সৃষ্টি করে চলেছে। বাল্মীকি-কৃত্তিবাসের প্রতি এই উপলক্ষে অকারণ উপেক্ষা-অবজ্ঞার প্ররোচনাও, শুধু অসহ্য নয়, বাংলা সাহিত্যের পক্ষে অকল্যাণকর।

নচেৎ মেঘনাদবধ কাব্যের মেঘনাদ যে একটি মনোজ্ঞ চরিত্রালেখ্য এ বিষয়ে কোথাও দ্বিমত থাকতে পারে না। বিচিত্র উদ্ভাবন-সংযোজনে সুদক্ষ শিল্পী মাইকেল ঐ চিত্রে নিজস্ব ভঙ্গিতে যে রমণীয়তা সম্পাদন করেছেন তাও রসিক পাঠকের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছে। কিন্তু তাই বলে, এই মেঘনাদের মধ্যে মাইকেল এমন কোনো মহত্ব ফোটাতে সক্ষম হয়েছেন যা রামায়ণে নেই, অথবা রামায়ণের মেঘনাদের চেয়ে মাইকেলের মেঘনাদ মহত্তর সৃষ্টি, এ কথা স্বীকার্য নয়। নূতন ভঙ্গিতে এ মেঘনাদের অবশ্যই একটা নূতন আবেদন রচিত হয়েছে, ঠিক যেমন হয় রঙ্গমঞ্চে সাজানো-গোজানো শেখানো-পড়ানো কোনো শিল্পী-চরিত্রের। বলা বাহুল্য, এই নূতনত্ব-বিধানের সাহিত্যিক মূল্য সামান্য নয়। আর নূতনত্ব, মাইকেলের মেঘনাদ-আলেখ্যে একটা গভীর করুণরসের সঞ্চার। নচেৎ রামায়ণের বীর মেঘনাদ-চরিত্রের পাশে মাইকেলের মেঘনাদ যথেষ্ট অনুজ্জ্বল। মহর্ষি-অঙ্কিত চরিত্রের বৃহত্বও এখানে নেই, মহত্বও সম্যক উদ্ঘাটিত হতে পারে নি। এমন কি কৃত্তিবাসের হাতে এই বৃহত্ব ও মহত্বের যে পরিচয় ফুটেছে, মাইকেলের সংক্ষিপ্ত খতিয়ানে তাও ফুটতে পারে নি।

(খ) মাইকেলের মেঘনাদ-চিত্রের রূপরেখা

মেঘনাদবধ কাব্যে সর্বসাকুল্যে মেঘনাদের যে পরিচয় স্থান পেয়েছে, তার ধারাবাহিক রূপরেখা তুলে ধরা যাক।

প্রথম পরিচিতি প্রমোদ-কাননে বিহার-রত প্রণয়ী-রূপে। মোহিতলালের দাবী-করা মেঘনাদের নিত্য-বিশেষণ 'দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস' দু-দুবার বরাদ্দ হয়ে গেল সাধারণ রাক্ষস-সৈন্যের পরিচয়ে প্রথম সর্গেই, এবং তার পরে বরাদ্দ হয়েছে

আরো অন্যের জন্য, কিন্তু ৬ষ্ঠ-সর্গের আগে ঐ মহিমান্বিত পরিচয় মেঘনাদের কপালে জুটলো না। প্রথম সর্গে প্রমদা-বেষ্টিত মেঘনাদের কুঞ্জলীলা দিয়েই কবি তাঁর নায়কের চিত্র উদ্ঘাটিত করেছেন। বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদে বিচলিত হওয়ায় ঐ প্রমোদ-বিহারে অন্তরায় ঘটলো। বীরের মতোই মেঘনাদ প্রস্তুত হলো বটে রাক্ষসরাজ-সমীপে যাওয়ার জন্য, কিন্তু 'প্রাণসখে' বলে হাত দুটি ধরে প্রমীলা এসে দাঁড়াতে, আসন্ন বিরহ-চেতনায় কোলে দাঁড়িয়ে হলো সংক্ষিপ্ত এক দফা প্রণয়-আকুতির বিনিময় এবং প্রণয়বন্ধন তাদের কেউ খুলতে পারবে না, এই আশ্বাস দিয়ে বিধুমুখীর কাছ থেকে সে বিদায় নিলো। পিতার কাছে বীরত্বের কিঞ্চিৎ আস্ফালন ও যুদ্ধে যাওয়ার সংকল্প নিবেদনের পর সম্পন্ন হলো সেনাপতি-পদে বরণ।

দ্বিতীয় পরিচিতি পুনরায় প্রণয়ী-ভূমিকায় তৃতীয় সর্গের শেষের দিকে। প্রণয়িনীর সঙ্গে রঙ্গ-রসের আলাপে ও অভাবিত মিলনের আনন্দ-নীরে নায়ক ভাসমান। "মনমথে না পারি জিনিতে" বিধুমুখী এসে বাসর-যাপনের উপযোগী প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নিখুঁত সাজসজ্জায় শোভিত হলে, মধুময় পরিবেশে নায়ক তার সঙ্গে মিলিত হলো।

কুঞ্জমিলনের পর যেমন কুঞ্জভঙ্গ, এখানেও তাই। তৃতীয় বারও নায়ককে দেখা যায় সেই প্রণয়ী-ভূমিকায়। পঞ্চম সর্গের শেষভাগে। কুসুমশয়নে নিশি-যাপনের পর অসংবৃত-বসনা (পং ৩৮৯-৯০) পার্শ্ববর্তিনীকে মধুর প্রেমার্দ্র স্বরে নায়ক আদরে সোহাগে জাগিয়ে তুলছে। এর পর মাতার কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার পালা; কিন্তু তার আগে-পিছে নায়ক-নায়িকার যুগল-বিহার-কাহিনী। আগে রাজকীয় সমারোহে সেজেগুজে যাওয়া, পরিচারিকা ত্রিজটা যতোই পরিবারস্থ সকলের খবর রাখুক, তার মারফৎ ঘোষণা যে, "পুত্র-পুত্রবধূ লঙ্কেশ্বরীর দুয়ারে দাঁড়ায়ে,"—সেইখানেই যুগলে দাঁড়িয়ে যুগলের রূপ-গুণ-কীর্তন-শ্রবণ (কনসার্টযোগে গায়িকা দলের গাওয়া ঐ কীর্তন,—যেন যাত্রাদলের রাধাকৃষ্ণ, চারপাশে সখীদের গান)। মধ্যে মাতার কাছে বিদায়গ্রহণ। পরে আরও একদফা নায়ক-নায়িকার যোগাযোগ। পরিবেশ কুঞ্জ-কাননবৎ। 'কুসুম-বিবৃত পথে' পশ্চাতে নূপুর-ধ্বনি। প্রণয়ীর বাহুপাশে আবদ্ধা হলো ইন্দীবরাননা প্রণয়িনী। স্বল্প আলাপের পর করুণ শেষ-বিদায়-দৃশ্য। কবির কল্পলোকে তখন নায়ক-নায়িকা দুলছে রতি-রতিপতির প্রতিমায়। সেই মাধুর্য ও সেই কারুণ্য (পং ৫৬৭-৭৬)।

এর পর শেষ দৃশ্য—৬ষ্ঠ সর্গ। লক্ষ্মীপূজার আয়োজনে যজ্ঞার্থে সমাসীন ধ্যানমগ্ন মেঘনাদ। এই পূজার আসনে বসিয়েই ত্রিভুবনজয়ী মহাবীর মেঘনাদ-চরিত্রের যতো কিছু শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দেওয়ার পরিকল্পনা আমাদের নূতন যুগের কবির। বলা বাহুল্য, সবই হবে বক্তৃতার মাধ্যমে, যার শ্রেষ্ঠাংশ অবশ্য বাল্মীকির কাছ থেকে ধার করা। কেবল একটি বিষয়ে কবিকে মৌলিকতা বা উদ্ভাবনী শক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাতে হবে। বীররসের কাব্যের মধ্যমণি দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস বীরসিংহ মেঘনাদকে দিয়ে এমন বীরের মতো কোষা-নিক্ষেপের কায়দা দেখাতে হবে যাতে জগতে ধন্য ধন্য পড়ে যায়! কোষা-খানি অবশ্য গণ্ডারের শিং দিয়ে বেশ ভারি-সারি মজবুত করে গড়া। কিন্তু লক্ষ্মণের মতো রণবীর আত্মরক্ষার উপযোগী অদ্ভুত দৈবশক্তিসম্পন্ন বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রে মণ্ডিত হয়েও, বিশেষত 'দেবাদেশে রণে আমি আহ্বানি রে তোরে' এবং 'উলঙ্গিলা অসি ভৈরবে' ইত্যাদিতে যুদ্ধং দেহি ভঙ্গিতে রীতিমত প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও কেন যে অন্তত ঢালখানা একটুখানি উঁচিয়ে ঐ কোষার আঘাত থেকে মাথাটা বাঁচাতে পারলেন না, এ আমাদের মাথায় আসে না। যে ভাবে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত লক্ষ্মণ দাঁড়িয়ে মার খেলেন, তাতে তাঁর অবস্থা হলো সেই পালোয়ান সিং এর মতো—"এক হাতমে ঢাল থা, ঔর হাত্‌মে তরোয়াল থা, দো হাত্‌মে জোড়া থা, হাম ক্যা করেঙ্গে!" তা ছাড়া, কোষাটা, আমরা জানি, জলে ভর্তি ছিলো, তার মধ্যে একটা কোষীও ছিলো। মেঘনাদ কি সবশুদ্ধই ছুড়লো, না কি জল ফেলে দিয়ে কোষাটাকে বেশ জুতসই করে ধরে তাক্ করে ছুড়েছিলো? এ প্রশ্ন এইজন্যে যে, সেক্ষেত্রে, যতোই কবি "চক্ষের নিমিষে" বলুন, লক্ষ্মণ তো প্রতিপক্ষের ঐ যুযুৎসু ভঙ্গি লক্ষ্য করে আত্মরক্ষার যথেষ্ট সময় পেয়েছিলেন। আর যদিও আহত হলেন, তাঁর মতো বীরের পক্ষে মাত্র একটি কোষার আঘাতে ভূতলশায়ী হওয়া কি সম্ভব? যদিও হন, তাতে কি তাঁর পক্ষে অতো দীর্ঘ সময় হতচেতন হয়ে থাকা আদৌ বিশ্বাস্য? কিন্তু বিশ্বাস্য হোক না হোক, কবির বিশেষ প্রয়োজন এই ফাঁকটুকু। কারণ এই ফাঁকে তিনি নায়কের মুখে পিতৃব্যের প্রতি তিরস্কার-বর্ষণের কায়দা দেখাবেন। এইজন্যে কবির সাজুনি অনেক। যথা, সর্বক্ষণই তাঁর নায়ক একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকেছে সামনের মূর্তিটির দিকে, তার একটুও এপাশ-ওপাশ চোখ ফেরাবার উপায় নেই। এমন কি যখন আগন্তুককে সে ঘরের দরজা দেখাচ্ছে—"এখনও দেখ রুদ্ধ দ্বার!"—তখন তার নিজের সে দরজার দিকে তাকানো নিষেধ!

কারণ, তা হ'লেই চোখে পড়ে যাবে খুল্লতাত বিভীষণ, আর সব বুঝি মাটি হয়ে যাবে! তিরস্কারের উপযুক্ত অবসর পাওয়া যাবে না। সেইজন্য লক্ষ্মণকে অজ্ঞান করে ফেলতেই হবে, তা সে কোষার আঘাতে হলেই বা। আমাদের অবশ্য কোষার কোষাত্ব মনে রাখা উচিত নয়, কারণ কবি নিজেই ভুলে গেছেন তাঁর ব্যবস্থিত ঐ শস্ত্রটির স্বরূপ। নিক্ষিপ্ত হওয়ার পূর্বে সেটি ছিলো কোষা, কিন্তু পরমুহূর্তেই সেটি হয়েছে 'ভীম প্রহরণ',—

পড়িলা ভূতলে বলী ভীম প্রহরণে,—।

তা না হয় পড়ুন, কিন্তু মায়াদেবী কী করছিলেন? সম্ভবত মাইকেলের কাছে তিনি মোটা ঘুষ খেয়েছিলেন, নচেৎ যিনি অঘটন-ঘটন-পটীয়সী বলেই কবির খেয়ালে দৈবপক্ষের স্পেশ্যাল এজেণ্টরূপে এসেছেন এখানে অঘটন ঘটাতে, একটু পরেই যাঁকে আমরা দেখি মেঘনাদের নিক্ষিপ্ত সমস্ত আঘাত মশা-তাড়ানোর ভঙ্গিতে লক্ষ্মণ থেকে দূরে ঠেলে রাখতে, তিনি ঠিক ঐ 'ভীম প্রহরণের' আঘাতের বেলা নিষ্ক্রিয় হয়ে রইলেন কেন? তাঁর সঙ্গে কবির অবশ্যই এই চুক্তি হয়ে থাকবে "তুমি, দেবি, কোষা-ছোড়ার মুহূর্তটায় একটুখানি থতিয়ে যেয়ো, তারপরই লেগে যেয়ো নার্সিং-এর কাজে; কিন্তু দেখো, যেন খুব তাড়াতাড়ি লক্ষ্মণের জ্ঞান ফিরে না আসে। সেই ফাঁকে আমার নায়ক-চরিত্র-বিকাশের কাজ আমি হাসিল করবো। আর, মেঘনাদকেও আমি কিন্তু তোমার দোহাই দিয়ে অসহায় করে ফেলবো। লক্ষ্মণ অবশ্যই মেঘনাদকে হত্যা করবে, কিন্তু, দোহাই তোমার, লক্ষ্মণকে এমন একটু instruction দিতে ভুলো না, সে যেন তরোয়ালটা চালাবার সময় ঢালখানাও একবার একটু ঘোরায়; তাহলে আমি পাঠককে বোঝাতে পারবো, ঢালের আলো-ঝলসানিতে মেঘনাদের চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ায় সে আর কিছুই করতে পারে নি; আর ভালো করে বলে দিয়ো, যেন তরোয়ালটা (কবি অবশ্য একই সঙ্গে 'অসি' ও 'খড়্গ' উভয় অস্ত্রের নাম করেছেন—'নিষ্কোষিলা অসি, কিন্তু 'খড়্গাঘাতে পড়িলা ভূতলে') এমনভাবে চালানো হয়, যাতে আঘাতোত্তর সুদীর্ঘ বক্তৃতার কোনো অসুবিধা না হয়!"

এখানে আমাদের আবার মনে পড়ে দুই প্রখ্যাত সাহিত্যিকের দুটি গুরুতর টিপ্পনী। একটি কবিশেখর কালিদাস রায়ের, অপরটি মোহিতলাল মজুমদারের। কবিশেখর তাঁর মাইকেল-প্রসঙ্গের একাংশে মাইকেল ও কৃত্তিবাসের তুলনামূলক সমীক্ষায় বলেছেন, "কৃত্তিবাসের রামায়ণ প্রকৃতপক্ষে শিশুরঞ্জন রামায়ণ;"

(পৃঃ ১১৯); এর জবাবে আমরা বলতে চাই, তাই যদি হয়, তবে মাইকেলের এই মেঘনাদবধ-চিত্রখানি ঐ 'শিশুরঞ্জন'-এর উন্নত সংস্করণ। কারণ এখানে কবি সেয়ানা শিশুদের ভোলাতে চেয়েছেন! মাথাখাটানো অনেক আজগুবি জুড়ে দিয়ে সমস্তটার উপর কবি নূতন ছন্দের ও মণ্ডন-কলাসমৃদ্ধ শব্দধ্বনিময় ভাষণ-গাম্ভীর্যের এমন ভারী বোলার টেনে দিয়েছেন যে, তারই তলায় ঐ শিশু-ভোগ্য আজগুবিগুলি চাপা পড়ে গেছে। উপরের বিশ্লেষণে তাদেরই স্বরূপ-পরিচয়ের সংকেত মিলবে আশা করি।

মোহিতলালের টিপ্পনী হলো আর্যরামায়ণের নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সম্পর্কে। "মধুসূদনের মেঘনাদ এত ছোট নয়" (পৃঃ ৮০)—এই ভঙ্গিতে বাল্মীকির মেঘনাদকে মধুসূদনের তুলনায় হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য সমালোচক নিকুম্ভিলা যজ্ঞকে "একরূপ যাদু বা মায়াঘটিত প্রক্রিয়া" (পৃঃ ঐ) বলেছেন। এ বিষয়ে, এই প্রবন্ধেরই অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনায় সমালোচকের ধারণা যে ভ্রান্ত, তা প্রমাণ করা হয়েছে। এখানে বক্তব্য, মায়াঘটিত প্রক্রিয়ার আমদানীতেই যেন মোহিতলাল বাল্মীকি-চিত্রের তুচ্ছতা দেখাবার মস্ত সুযোগ পেয়েছেন। কিন্তু মাইকেলের হাতে কী দেখা যায়? ওখানে যদি হয়, 'মায়া ঘটিত', এখানে সশরীরে বর্তমান মায়ার দৌরাত্ম্য কি একটুও চোখে পড়ছে না? রামায়ণের নিকুম্ভিলার সুবিশাল বহরের মধ্যে 'তামসী মায়া'র একটা স্থান আছে ঠিকই, কিন্তু সেটি তপস্যা-লভ্য বিদ্যা বিশেষ। আর মাইকেলের আমদানীকৃত মায়া এক উদ্ভট দৈব উপসর্গ বিশেষ। অথচ এঁরই কৃপায় মধুসূদনের মেঘনাদ হয়েছে এতো বড়ো। কারণ বড়ো হওয়ার একমাত্র পথ যখন যজ্ঞালয়ে নিরস্ত্র অবস্থায় নিহত হওয়ার কারুণ্যের দোহাই দিয়ে, তখন রুদ্ধদ্বার যজ্ঞাগারে নিহন্তাকে নিয়ে যাওয়া ও কারুণ্য-জাগানো পরিবেশ-সৃষ্টির জন্য মায়ার মায়া তো অপরিহার্য।

যাই হোক, মাইকেলের হাতের মেঘনাদ-চিত্রের এই হলো স্বরূপ-পরিচিতি। বাকী রইলো কতিপয় সুরচিত বক্তৃতা, যার মধ্যে বাল্মীকি-ঋণ বাদ দিলেও বাকী অংশ অবশ্যই প্রশংসার দাবী রাখে। কিন্তু কেবল বক্তৃতায় খাঁটি বীরচরিত্রের প্রশস্ত আলেখ্য রচিত হতে পারে না। বড় জোর তার কিছু আন্তর মহত্বের ও সুষমার পরিচয় ফুটতে পারে। ষষ্ঠ সর্গের পূর্ববর্তী মেঘনাদ-পরিচিতির সর্বত্রই কবির হাতে কোন্ রসের প্রাধান্য ঘটেছে, তা রসজ্ঞ পাঠকমাত্রই বুঝবেন। রামায়ণের সর্বশ্রেষ্ঠ

রক্ষোবীরকে নূতন মহাকাব্যের নায়করূপে গ্রহণ করে কবি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কেবলই তার প্রেমিকরূপ বা কমনীয় রূপটাই বড়ো করে দেখিয়ে চললেন। অবশেষে শেষ দৃশ্যে এসে হয়তো কবি স্থির করেছিলেন পূর্বের দুর্বলতা সংশোধন করে খাঁটি বীরচরিত্রের একটা উজ্জ্বল নমুনা তুলে ধরবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, মূল কাহিনীর অতিরিক্ত বিকৃতি ঘটিয়ে অভিনব সৃষ্টির নেশা প্রবল হওয়ায়, বিশেষত পূজার আসনেই বীরের প্রতিষ্ঠা দেখাবার উদ্ভট খেয়ালের বশবর্তী হওয়ায়, এমনই সব আজগুবির সমাবেশ ঘটে গেছে যে, সেই বাঞ্ছিত নমুনা আর রূপায়িত হলো না। বীররসের কাব্যসৃষ্টির মতো বীর নায়ক-চরিত্র-সৃষ্টিও ভেসে গেছে করুণরসে।

(গ) বাল্মীকির মেঘনাদ-চিত্রের রূপরেখা

এখন দেখা যাক আর্য-রামায়ণে প্রদত্ত মেঘনাদের চিত্র ও চরিত্রের রূপরেখাটি কেমন। আমাদের সমালোচকেরা দল বেঁধে ঘোষণা করেছেন, রামায়ণের মেঘনাদের 'পশুবল'-সর্বস্বতার কথা। ঘোষণা করেছেন, সমস্ত রাক্ষস চরিত্র, সুতরাং মেঘনাদও, অসভ্য বর্বর রাক্ষস মাত্র। কিন্তু বাল্মীকির সযত্ন-অঙ্কিত মেঘনাদ-চিত্রে দেখা যায়, সে এক মহিমান্বিত ক্ষত্র-বীরের আদর্শ। এ যুগের সমালোচক তার সুরাসুরজয়ী অমিত পরাক্রমকে 'পশুবল' বলে চিহ্নিত করার অত্যুৎসাহে ভুলেই গেছেন লক্ষ্য করতে যে, ঐ পরাক্রম তাকে আয়ত্ত করতে হয়েছে সুকঠোর তপস্যায়। মাইকেল যেই তাঁর নূতন ছন্দের দোলায় দুলিয়ে আবৃত্তি করলেন,—"ভ্রাতৃপুত্র বাসববিজয়ী"—অথবা "দেব-দৈত্য-নর-রণে স্বচক্ষে দেখেছ, রক্ষঃশ্রেষ্ঠ, পরাক্রম দাসের"—অমনি এযুগের প্রশস্তি-বাদীদের এমনই মাথাটা ঘুরে গেল যে, ঐ 'বাসব-বিজয়' বা 'পরাক্রম'-কে, বুঝি কোনো অচিন্ত্যসূত্রে, মাইকেলেরই নিজস্ব উদ্ভাবন বলে ধরে নিলেন, ঐ বিজয় বা পরাক্রমের কাহিনী যে মূল রামায়ণেই বর্ণিত হয়েছে, তা যেন মনে করতেই চাইলেন না। নচেৎ সেই একই মেঘনাদের একই বিজয়-পরাক্রমের ক্ষেত্রে মাইকেলের বেলা পশুবলের প্রসঙ্গ এলো না, এলো না অনার্য-বর্বরের প্রসঙ্গ, আর বাল্মীকির বেলাতেই বা এলো কেন? তা ছাড়া, রামায়ণে বর্ণিত মেঘনাদের বল-বিক্রম সবই যে তপোবলে অর্জিত এটি কি কেউ লক্ষ্য করেন নি? কি করে সম্ভব হলো ইন্দ্রজিতের ঐ বাসব-বিজয়? এর উত্তর মাইকেলে নেই, আছে আর্যরামায়ণে। মাইকেল শুধু তৈরী ফসল নিয়েই কারবার

করেছেন ; তৈরীর কাহিনী রামায়ণে। সেই কাহিনীতেই আছে ইন্দ্রজিতের চরিত্রের আসল পরিচয়।

নিকুম্ভিলা-চিত্র: বাল্মীকি ও মাইকেল
(মোহিতলাল-ভাষ্যের প্রতিবাদ)

নিকুম্ভিলা-যজ্ঞালয়ে ইষ্টদেবের পূজায় সমাসীন মেঘনাদের 'তপে নিমগ্ন' রূপ মাইকেল কোথায় পেলেন? একি তাঁর নিজস্ব রচনা? এরই মধ্যে কি খুঁজে পেতে হবে রামায়ণের 'পশুবলদৃপ্ত' রাক্ষস মেঘনাদের অভিনব মার্জিত উন্নত সংস্করণ? নিকুম্ভিলায় অগ্নির উপাসনা বাল্মীকি-দত্ত মেঘনাদ-আলেখ্যেরই অন্যতম আঙ্গিক। এর মধ্যে মাইকেলের নিজস্ব কিছুই নেই, সুতরাং মার্জিত সংস্কৃত রূপায়ণের কোনো প্রশ্নই আসে না। বরং এইটাই মন্তব্য যে, মাইকেলের কাব্যে যজ্ঞব্রতী মেঘনাদের ও তার যাজ্ঞিক পরিবেশের এক বিকৃত চিত্রই অঙ্কিত হয়েছে, আর সেই সঙ্গে গোটা পরিমণ্ডলে আর্য-রামায়ণের ধ্রুপদী রাগের পরিবর্তে ঘটেছে ঠুংরীর সুরারোপ। অগ্নিহোত্রীকে সাজানো হয়েছে লক্ষ্মী-পূজার সাজে। মাইকেল ভুলেই গেছেন এটা যজ্ঞের আয়োজন, হোমকুণ্ড যার কেন্দ্রীয় বস্তু,—উপচারাদি হবে তারই অনুরূপ। হবির্বহের পূজায় যে ঘৃতের চাই প্রশস্ত যোগান, মাইকেলের চিত্রে সেই ঘৃতের স্থান শুধু কয়েকটি দীপালোক-রচনায়। আর যেখানে থাকবার কথা হব্যঘৃত, সেখানে রাখা হয়েছে প্রচুর 'কলুষনাশিনী' জাহ্নবী-বারি—যেন গঙ্গা-জলের আহুতিতেই উঠবে হোমশিখা! যেখানে কোষা-কোষীর স্থান গৌণ, মুখ্য আজ্যস্থলী-সংলগ্ন স্রুক-স্রুবের, সেখানে বেশ মজবুত করে গণ্ডারের শিং দিয়ে গড়া (হতে পারে সেটা পবিত্র) ভারী কোষা আনা হয়েছে—কারণ হোমের কাজে লাগুক না লাগুক, পরে ঐটার আঘাতে লক্ষ্মণকে ঘায়েল করা চলবে! হোমের কাজে ঘণ্টা বাজাবার এমন কি অবসর মিলবে তা না ভেবেই কবি আদর করে তাঁর মেঘনাদের পাশে সোনার ঘণ্টা সাজিয়ে দিয়েছেন! এই সব সংস্কারের মধ্যেই কি এ যুগের মাইকেল-ভক্ত-সমাজ খুঁজে পেয়েছেন এই কবির হাতের মেঘনাদের সুসংস্কৃত রূপ?

মহর্ষির নিকুম্ভিলা-চিত্রে অগ্নিহোত্রীর আসনে উপবিষ্ট মেঘনাদের মূর্তি অগ্নি-প্রতিম। শাস্ত্রসম্মত পবিত্র মন্ত্রাদির বিধিবৎ আবৃত্তিযোগে সেই সংযত পুরুষ হোমকার্যে রত :—

ততস্তু হুতভোক্তারং হুতভুক্‌সদৃশপ্রভঃ।
জুহুবে রাক্ষসশ্রেষ্ঠো বিধিবন্মন্ত্রসত্তমৈঃ॥ (যুদ্ধ—৭৩।১৮)

স্বভাবত তাঁর উপচার-সজ্জায় প্রথম স্থান ঘৃতের। অন্যান্য বিবরণ,—

স হবির্লাজসৎকারৈর্মাল্যগন্ধপুরস্কৃতৈঃ।
জুহুবে পাবকং তত্র রাক্ষসেন্দ্রঃ প্রতাপবান॥
শস্ত্রাণি শরপত্রাণি সমিধোঽথ বিভীতকাঃ।
লোহিতানি চ বাসাংসি স্রুবং কার্ষ্ণায়সং তথা॥ (ঐ—১৯-২০)

অতঃপর অগ্নিদেব প্রীত হয়ে দক্ষিণাবর্ত-শিখায় হবি গ্রহণ করেন, আর তখন হোতা অভীষ্ট লাভ করেন,—

সোঽস্ত্রমাহারয়ামাস ব্রাহ্মমস্ত্রবিশারদঃ।
ধনুশ্চাত্মরথং চৈব সর্বং তত্রাভ্যমন্ত্রয়ৎ॥ (ঐ—২৪)

সমগ্র প্রক্রিয়ায় দেখা গেল মন্ত্রশক্তি ও বিধিবদ্ধ সংস্কারের প্রাধান্য। উপচারের মধ্যে রয়েছে হবি লাজ মাল্য গন্ধদ্রব্য সমিধ শরপত্র লোহিত বসন লৌহময় স্রুব ইত্যাদি। মধ্যে কৃষ্ণছাগ উৎসর্গ, পূর্ণাহুতি। খাঁটি শক্তিপূজার শাক্ত আয়োজন। মাইকেল এই শাক্ত আড়ম্বর অন্যত্র বেশ দরদ দিয়েই সাজিয়েছেন তাঁর কাব্যে,—কিন্তু এখানে তাঁর নায়ককে সাজিয়েছেন পরম শৈব বা বৈষ্ণব করে, শুধু নামাবলী পরাতে ভুল হয়ে গেছে! রামায়ণের মেঘনাদ ব্রাহ্মমন্ত্র-বিশারদ, তাই তিনি যজ্ঞসম্পন্ন হলেই তাঁর ধনু, রথ প্রভৃতি সমস্ত যুদ্ধোপকরণ মন্ত্রসিদ্ধ করে নেন (পূর্বোক্ত ২৪ নং শ্লোক)।

কেউ যেন এই থেকে না মনে করেন, তবে বুঝি বাল্মীকির মেঘনাদ একান্তই দৈব-নির্ভর? পরবর্তী বৃত্তান্তে জানা যাবে ব্রহ্মার কাছ থেকে তার অমরত্ব আদায়ের রহস্য;—'তপসা' নয়, 'বিক্রমেণ'। কিন্তু তাই বলে মেঘনাদ দুর্বিনীত নয়। বিজ্ঞতা ও প্রবীণতা তাকে শিখিয়েছে, উভয় শক্তির সমন্বয়ই কাম্য। তাই ভয়ঙ্কর উত্তেজনার মুহূর্তে পিতৃসমীপে যখন তার কঠোর প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করে তখনও তার মুখে শোনা যায়:—

ইমাং প্রতিজ্ঞাং শৃণু শক্রশত্রোঃ সুনিশ্চিতাং পৌরুষদৈবযুক্তাম্‌।
অদ্যৈব রামং সহ লক্ষ্মণেন সংতর্পয়িষ্যামি শরৈরমোঘৈঃ॥
অদ্যেন্দ্রবৈবস্বতবিষ্ণুরুদ্র সাধ্যাশ্চ বৈশ্বানরচন্দ্রসূর্যাঃ।
দ্রক্ষ্যন্তু মে বিক্রমমপ্রমেয়ং বিষ্ণোরিবোগ্রং বলিযজ্ঞবাটে॥

(যুদ্ধ—৭৩।৬-৭)

শোকবিহ্বল পিতাকে সান্ত্বনা দিয়ে মেঘনাদ বলছে, আপনার পুত্র ইন্দ্রজয়ী। পুরুষকার ও দৈবের উপর নির্ভর করে আমার এই কঠিন প্রতিজ্ঞা শুনুন। আজই আমি রাম-লক্ষ্মণকে অব্যর্থ শরে বিনাশ করবো। ইন্দ্র, যম, বিষ্ণু, রুদ্র, দ্বাদশ গণদেবতা (সাধ্যাঃ), অগ্নি, চন্দ্র, সূর্যাদি দেবগণ আজ যজ্ঞভূমিতে (অর্থাৎ রণস্থলে) অবশ্যই দেখতে পাবেন আমার বিক্রমের উগ্রতা বিষ্ণুর সঙ্গে তুলনীয় কি না!

মাইকেল যে একটি গৎ গেয়ে গেছেন,

দেব-বলে বলী
তবু অবহেলা মূঢ় করিস সতত
দেবকুলে!

যেন রামায়ণের মেঘনাদ ঐ প্রকৃতির বশবর্তী ব'লে সত্যই ঐ ভাবে তিরস্কৃত হয়েছে, অথবা হওয়ার যোগ্য,—এ যে কতো বড়ো মিথ্যা, তার প্রমাণ এই মহর্ষি-দত্ত বিবরণ। মেঘনাদের প্রতিজ্ঞা 'পৌরুষদৈবযুক্তা'। আর্যরামায়ণে লক্ষ্মণের তিরস্কারের শাণিত অংশ হলো—

তস্করাচরিতো মার্গো নৈষ বীর-নিষেবিতঃ—

যেটি কুৎসিত খেয়ালের বশে বেপরোয়া কবি অন্যায়ভাবে চাপিয়ে দিয়েছেন লক্ষ্মণের ঘাড়ে কবিগুরু বাল্মীকির মহৎ সৃষ্টিতে অনার্য উপদ্রবের অপরাধে অপরাধী হয়ে। এবং এরই জন্য এযুগের কবিগুরুর হাতে মাইকেলকে সইতে হয়েছে শাণিত সমালোচনার আঘাত—"নিরস্ত্র ইন্দ্রজিতকে হীন ক্ষুদ্রতস্করের ন্যায় রামলক্ষ্মণ বধ করিলেন, ইহা মহাকাব্যের বিষয়বস্তু হইতে পারে না।"(১) এতো কাণ্ড মাইকেল করেছেন মেঘনাদকে বড়ো করবার জন্য। কিন্তু রামায়ণের মেঘনাদ যথেষ্টই বড়ো। মাইকেলের খেয়ালী উদ্দেশ্যমূলক কাহিনী-বিকৃতি সত্ত্বেও তাঁর মেঘনাদ বীর-চরিত্রের মহিমার দিক দিয়ে রামায়ণের মেঘনাদের সমীপবর্তী হতে পারে নি। মহর্ষি এই চরিত্র-মহিমার প্রতি নিত্য-সচেতন বলেই এর আলেখ্য-নির্মাণে তাঁর মমতা ও শ্রদ্ধা অপরিসীম। পদে পদেই আদিকবি মেঘনাদের বিশেষণে এনেছেন 'মহাত্মা', 'মনস্বী' 'পাবকদীপ্ততেজা' 'ত্রিদশেন্দ্রারিঃ' 'বাসবনির্জেতা', প্রভৃতি অজস্র মহিমাজ্ঞাপক পদাবলী। এই মমতা-শ্রদ্ধার একটি বিশেষ পরিচয়

(১) রবীন্দ্রনাথ—ভারতী, ১২৮৯, ভাদ্র।

যুদ্ধাভিযানে প্রস্তুত ইন্দ্রজিতের বর্ণনায়। বীরত্বপূর্ণ প্রতিজ্ঞায় ভগ্নহৃদয় পিতাকে আশ্বস্ত ও হর্ষোৎফুল্ল করা হ'লে, সেই বীরপুত্র বীরপিতার মহাশক্তিগর্ভ আশীর্বাদ প্রাপ্ত হলো। 'রাক্ষসাধিপতিঃ শ্রীমান্‌রাবণঃ পুত্রমব্রবীৎ॥ ত্বমপ্রতিরথঃ পুত্র ত্বয়া বৈ বাসবো জিতঃ। কিং পুনর্মানুষং ঘৃণ্যং নিহনিষ্যসি রাঘবম্॥ তথোক্তো রাক্ষসেন্দ্রেণ প্রত্যগৃহ্ণান্মহাশিষঃ॥' পিতার আশীর্বাদপ্রাপ্ত সেই মহাবীর লঙ্কা-পুরীর জীবনস্বরূপ। তাই মহর্ষি লিখেছেন—

ততস্ত্বিন্দ্রজিতা লঙ্কা সূর্যপ্রতিমতেজসা।
ররাজাপ্রতিবীর্যেণ দ্যৌরিবার্কেণ ভাস্বতা॥

(যুদ্ধ—৭৩।১৬)

সূর্যপ্রতিম তেজে প্রদীপ্ত-মূর্তি অপ্রতিবীর্য ইন্দ্রজিতকে বক্ষে ধারণ করে লঙ্কার শোভা হয়েছে সূর্যকিরণপ্রদীপ্ত আকাশের মতো।

এই যে-কবির দৃষ্টিভঙ্গি, মেঘনাদ-চরিত্রটি যে তাঁর কল্পলোকে বর্বর রাক্ষস-চরিত্র বলে ঘৃণ্য হয়ে ছিলো, এমন মনে করা চলে কি? পাঠক লক্ষ্য করুন, বীরের বীরত্ববর্ণনায় বাল্মীকির চোখে মেঘনাদ ও লক্ষ্মণ তুল্যাহ্নতুল্য। জাতিতে একজন নর, একজন রাক্ষস; কিন্তু বীরত্বে, তেজস্বিতায়, যুদ্ধবিক্রমে ও বীরোচিত মাহাত্ম্যে যখন তারা সমতুল, তখন কেবল রাক্ষস জাতীয় বলে মেঘনাদকে তুচ্ছ করার কোনো প্রচেষ্টাই নেই। সিংহের উপমায় দুজনে মিলে মিশে কবির হাতে "নর-রাক্ষসসিংহয়োঃ" সৃষ্টি করেছে বীর-সিংহের এক অপরূপ যুগল-মূর্তি, যেখানে উভয়েই "মহাত্মানৌ"।

স বভূব মহাভীমো নররাক্ষসসিংহয়োঃ।
বিমর্দস্তমুলো যুদ্ধে পরস্পরজয়ৈষিণোঃ॥
বিক্রান্তৌ বলসম্পন্নাবুভৌ বিক্রমশালিনৌ।
উভৌ পরম দুর্জয়াবতুল্যবলতেজসৌ॥
যুযুধাতে তদা বীরৌ গ্রহাবিব নভোগতৌ।
বলবৃত্রাবিব হি তৌ যুধি বৈ দুষ্প্রধর্ষণৌ॥
যুযুধাতে মহাত্মানৌ তদা কেশরিণাবিব।
বহূনবসৃজন্তৌ হি মার্গণৌঘানবস্থিতৌ॥
নররাক্ষসমুখ্যৌ তৌ প্রহৃষ্টাবভ্যযুধ্যতাম্॥

(যুদ্ধ—৮৮।৩৩-৩৬)

লক্ষ্মণ ও মেঘনাদ, নরসিংহ ও রাক্ষসসিংহ, পরস্পর বিজয়াকাঙ্ক্ষী এই দুই বীরসিংহের যুদ্ধে মহাভয়ঙ্কর তুমুল সংঘর্ষের সৃষ্টি হলো।৩৩

পরস্পর যুধ্যমান এই দুই যোদ্ধা বল-বিক্রম-তেজস্বিতায় তুল্যামূতুল্য, উভয়েই পরমদুর্জয়।৩৪

একই আকাশের দুটি সমতেজ গ্রহের মতো ঐ দুই বীর যুদ্ধ করে চলেছেন, ইন্দ্র ও বৃত্রের মতো উভয়েই যুদ্ধে দুর্ধর্ষ।৩৫

পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী দুই বীরই মহাত্মা, তাঁদের যুদ্ধ যেন দুই কেশরীর যুদ্ধ; একজন নরমুখ্য, আর একজন রাক্ষসমুখ্য; দুই সমাজের দুই বীরশ্রেষ্ঠ অসংখ্য শরবর্ষণের কৃতিত্বে প্রহৃষ্টচিত্তে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন।৩৬

[টীকা: বলবৃত্রৌ—বল=ইন্দ্র; মার্গণৌঘান=শরসমূহান (শিরোমণি)]

এই তুল্যতাজ্ঞাপক পরিচিতি আর্যরামায়ণে সুদীর্ঘ। উত্তমাধম বিচারের দিকে না গিয়ে মহর্ষি বীরচরিত্রের ও বীরত্বের সশ্রদ্ধ আলেখ্য রচনা করেছেন। শরবর্ষণের ছবি এঁকেছেন দুই বৃহৎ মেঘখণ্ডের বারিবর্ষণের রূপকে "শরৌঘবর্ষেণ বলাহকাবিব", বীরদ্বয়কে একবার বল-বৃত্র বলে সাধ মেটে নি, তাই উপসংহারে এনেছেন শম্বর ও ইন্দ্রের চিত্র "মহাহবে শম্বরবাসবাবিব"। এই তুল্যতাব্যঞ্জক দৃষ্টির পাশাপাশি স্মরণীয় এযুগের প্রশস্তি-বন্দিত দত্তকবির দারুণ অসমচিত্রে নায়কের বীর-চরিত্রস্ফুটনের প্রয়াস, এবং সেই দুর্বলতা চাপা দেওয়ার জন্য প্রশস্তিবাদীদের উদ্ভট ভাষ্যরচনায় অদ্ভুত উদ্যম।

এ বিষয়ে মোহিতলালই সর্বপেক্ষা বলিষ্ঠ লেখনীধারী। না জানি কোন্ অলিখিত আইনের বলে মাইকেল-ভাষ্যরচনায় তিনি পেয়েছেন আইন-প্রণয়নের ক্ষমতা। তাঁর আইনে, তাই, দেখা যায়, মেঘনাদকে যে হত্যা করবে তাকে তস্কর ও কাপুরুষের কলঙ্ক মাখতেই হবে। মাইকেল নাকি "নিরুপায় হইয়াই লক্ষ্মণকে এমন কলঙ্কের ভাগী করিয়াছেন" (পৃঃ ৭৯)। অথচ এটা নাকি "তাঁহারই (কবির) কল্পিত চরিত্রের সম্পূর্ণ বিরোধী—সে বিষয়ে কবিও পূর্ণ সজ্ঞান।" অর্থাৎ তাঁর ইঙ্গিত কবির একটা অন্তর্দ্বন্দ্বের দিকে। অতঃপর সমালোচক মন্তব্য করেছেন, মেঘনাদ যখন স্বর্গ-মর্ত-বিজয়ী, তখন তাহাকে "লক্ষ্মণ মারিবে কেমন করিয়া?" এই অকাট্য যুক্তি প্রয়োগের সময় বুঝি ঐ বলিষ্ঠ ভাষ্যকার রামায়ণে যেরূপে ঐ স্বর্গ-মর্ত-জয়ী বীরের নিধন ঘটানো হয়েছে, ব্যক্তিগত বা সংক্রামিত অশ্রদ্ধায় তার যৌক্তিকতা মানেন নি, পাঠকের চোখেও ঐ বিষয়ে একটা ঠুলি পরিয়ে রাখতে চেয়েছেন। ঠুলি-পরা পাঠককে

মোহিতলালের কাছ থেকে শুনতে হয়,—"বাল্মীকির রামায়ণে ইন্দ্রজিৎ দুর্জয় হইলেও অজেয় নয়"। পাঠকের যেন প্রশ্ন তোলবার অধিকার নেই—"অজেয় ইন্দ্রজিৎ" মাইকেলই বা কোথায় পেলেন? তিনিও তো রামায়ণের সেই ইন্দ্রজিৎ নিয়ে কাহিনী সাজিয়েছেন যার নিধন একমাত্র তখনই সম্ভব, যখন তার নিকুম্ভিলা যজ্ঞ থাকবে অসম্পূর্ণ? পাঠককে আরো শুনতে হয়, "নিকুম্ভিলা যজ্ঞ নামক একরূপ যাদু ও মায়াঘটিত প্রক্রিয়ার দ্বারাই সে (রামায়ণের ইন্দ্রজিৎ) বার বার অজেয় হইয়া উঠে। মধুসূদনের মেঘনাদ এত ছোট নয়; সে তাহার নিজ শক্তিতেই দুর্জয়—নিকুম্ভিলা যজ্ঞ করিতে তাহার অনিচ্ছা নাই, কিন্তু সে কেবল পিতামাতার আদেশ ও কুলধর্মের অনুরোধে।" (পৃঃ ৮০)

এখানে প্রথম মন্তব্য, নিকুম্ভিলা যজ্ঞের স্বরূপটি হয় মোহিতলাল আর্ষরামায়ণ থেকে সংগ্রহের চেষ্টাই করেন নি, না হয়, সব জেনেও তার অপব্যাখ্যা চাপিয়ে দিতে চান বাঙালী পাঠকের উপর। একটি বিরাট যজ্ঞকে যাদু বলে উড়িয়ে দিয়ে মোহিতলাল মহর্ষি বাল্মীকির সুপ্রতিষ্ঠিত মহাকাব্যের গুরুত্বপূর্ণ আঙ্গিকের প্রতি অকারণ তুচ্ছতাপ্রদর্শনের স্পর্ধা দেখিয়েছেন। তাঁর মতো পণ্ডিত ব্যক্তির অবশ্যই জানার কথা ছিলো যে, কেবল কোনো সাময়িক যুদ্ধোপলক্ষেই মেঘনাদ ঐ যজ্ঞে ব্রতী হতো না, তার জীবনের প্রস্তুতিপর্বে সুদীর্ঘকাল ধরে, হয়তো দ্বাদশ অথবা চতুর্দশ বৎসর অথবা ততোধিক কাল যাবৎ, ব্রহ্মচর্যাদিযোগে চলেছিলো নিকুম্ভিলায় যজ্ঞের পর যজ্ঞের অনুষ্ঠান। অগ্নিই তার প্রধান উপাস্য দেবতা হলেও, মাহেশ্বর তপস্যাতেও সে সিদ্ধিলাভ করে ঐ নিকুম্ভিলাতেই। তা ছাড়া, বহু শাস্ত্রীয় বিধি-বিহিত যাজ্ঞিক অনুষ্ঠানে ইন্দ্রজিৎ আদর্শ ক্ষত্রসুলভ বৃহৎ ও মহৎ জীবনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করে নিকুম্ভিলা যজ্ঞভূমিতে। সুতরাং নিকুম্ভিলা তার জীবনের সঙ্গে চিরকালের মতো জড়িত ব্রাহ্মণের গায়ত্রী-সেবার মতো। (আনুষ্ঠানিক তথ্যের বিবৃতি পরে দ্রষ্টব্য)। মোহিতলাল যে লিখেছেন 'মধুসূদনের মেঘনাদ এত ছোট নয়',—ছোট হওয়ার জন্য রামায়ণের মেঘনাদ নিকুম্ভিলা-যজ্ঞ করে নি, করেছিলো এতোই বড়ো হওয়ার জন্য—এবং বড়োই সে হয়েছিলো—যে তার মতো চরিত্রবান, গুণবান, তপোবলে ও বাহুবলে সমশক্তিমান, দেব-দৈত্য-নরজয়ী প্রকাণ্ড পুরুষের কর্মকৃতিতে মুগ্ধ হয়ে দেবাদিদেব মহাদেব ও পিতামহ ব্রহ্মা বরদানে অপার তৃপ্তিলাভ করেন, এবং তারই চরিত্রমাহাত্ম্য-কীর্তনে উত্তরকাণ্ডের অর্ধাংশ মুখরিত, স্বয়ং রামচন্দ্রকেও বিস্মিত হতে হয় মহামুনি অগস্ত্যের সেই চরিত্র-কীর্তনে। রামায়ণে মেঘনাদকে যে

সত্যই ছোট করা হয় নি, একথা আমাদের উচ্চ-বিদগ্ধমহলেও কেন সুস্পষ্ট নয়, এইটাই ভাববার বিষয়।

মোহিতলালের আর এক জবরদস্তি প্রস্তাব, "নিকুম্ভিলা যজ্ঞ করিতে তাহার (মাইকেলের মেঘনাদের) অনিচ্ছা নাই, কিন্তু সে কেবল পিতামাতার আদেশ ও কুলধর্মের অনুরোধে।" এখানে মাইকেলের conscience-keeper-এর ভূমিকায় মোহিতলাল যে বাহাদুরি দেখিয়েছেন, তাতে স্বয়ং মাইকেলেরই বিস্মিত হওয়ার কথা! কোথায় পেলেন মোহিতলাল মেঘনাদের ঐ মনের খবর? প্রথম সর্গে সর্বপ্রথম আমরা নিকুম্ভিলার প্রসঙ্গ শুনি পিতা রাবণের মুখে, ঠিকই—

> তবে যদি একান্ত সমরে
> ইচ্ছা তব, বৎস, আগে পূজ ইষ্টদেবে,—
> নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সাঙ্গ কর, বীরমণি!
> সেনাপতি-পদে আমি বরিনু তোমারে।

কিন্তু এতেই কি বুঝতে হবে, নিকুম্ভিলা-যজ্ঞ বা ইষ্টদেব-পূজার প্রতি পুত্রের স্বাভাবিক অনীহা লক্ষ্য করেই রাবণ এই 'আদেশ' জারি করেছেন? 'কুলধর্মের অনুরোধ' বলতেই বা ভাষ্যকার কী বোঝাতে চান? নিকুম্ভিলা-যজ্ঞ মেঘনাদের একান্ত নিজস্ব সাধন। রাক্ষসকুলের সকলেই কি নিকুম্ভিলা-যজ্ঞ করে যুদ্ধে যেতো? ইষ্টদেব-পূজা কুলধর্ম হতে পারে। তবে কি মোহিতলালের প্রতিপাদ্য, ইষ্টদেবতা বলে কিছু মেনে চলার স্বাভাবিক তাগিদ মেঘনাদের মতো বীরের ছিলো না, সে শুধু "শোভনতার" খাতিরে ঐ পূজার আয়োজন করতো? সম্ভবত তাই। কারণ, পরেই তিনি সে কথা বলেছেন। কিন্তু তাতেই কি ঐ চরিত্রে দম্ভদুষ্ট পশুবলেরই চূড়ান্ত উগ্ররূপ আরো প্রকট হয়ে ওঠে না? "নিজশক্তিতেই দুর্জয়" রামায়ণের মেঘনাদও; কিন্তু আত্মিক বল সেখানে উপেক্ষিত নয়; আর যেখানেই আত্মিক বল, সেখানেই আত্মদেবতা—ইষ্টদেবতা। মোহিতলালের ভাষ্য নিতে হলে, কেবল উদ্ধত দেহ-বলেই বলীয়ান হয় মাইকেলের মেঘনাদ। সম্ভবত কবি নিজেও এটা চান নি।

আসলে পূর্বোক্ত ক্ষেত্রে রাবণের উক্তি কোনো আদেশ জারি নয়, স্বধর্ম-পরায়ণ পুত্র আপন কর্তব্য পালন করবে জেনেও, স্নেহাধিক্যে শুধু সে-কথা একবার মনে করিয়ে দেওয়া। কবিও সেই মন নিয়ে রাবণের মুখে ঐ কথা বসিয়েছেন।

মাতা মন্দোদরীর মুখে নিকুম্ভিলার কথা কোথাও নেই। তিনি রাক্ষস-কুল-রক্ষণ বিরূপাক্ষের কাছে পুত্রের জন্য তাঁর নিজস্ব প্রার্থনা জানিয়েছেন। সুতরাং "কেবল পিতামাতার আদেশে,"—এ কথা মানা চললো না। চলতো, যদি নায়কের নিজের মুখে কোথাও সেটা প্রকাশ পেতো। কিন্তু পরিবর্তে আমরা দেখি,—যেটাই স্বাভাবিক,—স্বধর্মপালনে মেঘনাদের নিজস্ব গভীর পবিত্র আবেগ। পঞ্চম সর্গে তার মুখে শোনা যায়,—

চল, প্রিয়, এবে
বিদায় হইব নমি জননীর পদে!
পরে যথাবিধি পূজি দেব বৈশ্বানরে,—

ইত্যাদি ; এর মধ্যে আদেশ-অনুরোধের বাষ্পও নেই, থাকার কথাও নয়। ঐ একই সর্গে আতঙ্কাকুল মাতাকে আশ্বস্ত করবার জন্য মেঘনাদ নিজেই বলছে,—

পূজি ইষ্টদেবে,
দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষস-দলে পশিব সমরে।

এখানেও নেই কোনো আদেশ-নির্দেশের ক্ষীণতম ইঙ্গিত। কেনই বা থাকবে? আদেশ বা সম্মতি সে চেয়েছে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য, নিকুম্ভিলায় ইষ্টপূজার জন্য নয়,—সেটা সম্পূর্ণ তারই নিজস্ব ব্যাপার।

সুতরাং দেখা গেল, প্রশস্তিমোহে মধুসূদনের মেঘনাদকে অতিরিক্ত বড়ো করতে গিয়ে মোহিতলাল যা করেছেন তা অনর্থক গোলমালের সামিল। কবির ঈপ্সিত বলে সেটাকে প্রমাণ করার কোনো উপায় নেই ; এ সমস্যা তিনি জড়িয়েছেন, মাইকেল-অঙ্কিত লক্ষ্মণের কাপুরুষ-চিত্রের সমর্থনে ;—জোর গলায় উপসংহার টেনেছেন,—"অতএব লক্ষ্মণকে কাপুরুষের মত কাজ করিতেই হইবে" (পৃঃ ৮০)। তাঁর ঐ গলার জোর ও ওকালতির দাপট যে একেবারে ব্যর্থ হয় নি, তার প্রমাণ, কবিশেখর কালিদাস রায় প্রমুখ অধিকাংশ এযুগের সমালোচকই মেনে নিয়েছেন তাঁর ঐ প্রস্তাব। "বলা বাহুল্য, বাল্মীকির মেঘনাদকে তিনি নিজের ভাব-কল্পনায় নূতন করিয়া গড়িয়া লইয়াছেন। এজন্য মেঘনাদ-চরিত্রে যেমন রঙ চড়াইতে হইয়াছে—তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীদের চরিত্রকে সেই অনুপাতে নিষ্প্রভ ও ম্লান করিতে হইয়াছে। মাইকেলের নিজস্ব কাব্যপ্রেরণার চাহিদাতেই চরিত্রগুলির রূপান্তর ঘটিয়াছে।"

(কালিদাস রায়—বঃ সাঃ পঃ ১ম, পৃঃ ১৫৭)। কিন্তু মোহিতলালের ব্যাখ্যায় মাইকেলের মেঘনাদও বড়ো হয় নি, লক্ষ্মণ-চিত্রও সমর্থিত হয় নি। কবির 'নিজস্ব কাব্যপ্রেরণার চাহিদা'য় কোনো আদর্শের স্থান নেই,—আছে শুধু একটা নূতনত্ব বিধান, নূতন ভঙ্গিতে উপস্থাপন। তার জন্য মূল কাহিনীর যে-কোনো খেয়ালী বিকৃতি-সাধনে কবি কুণ্ঠাবোধ করেন নি, বরং উল্লসিত হয়েছেন। এর ফলে গোটা কাব্যদেহে যে অজস্র অসংগতি এসে জুটেছে, তা স্বীকার করতেই হবে। অন্যত্র তাদের বহু দৃষ্টান্ত দেখানো হয়েছে, এখানকার লক্ষ্মণ-চিত্রও তাদেরই অন্যতম।

যে নিকুম্ভিলার উপর মোহিতলাল গুরুত্বপূর্ণ টীকা রচনা করেছেন, তার শুধু একটা কৃত্রিম পোষাকীরূপই মাইকেল দেখিয়েছেন। আসল নিকুম্ভিলা-সাধনার যে মেঘনাদ, সে মাইকেলের হেম-ঘণ্টা-হেম-পাত্রাদি সহযোগে পূজা-বিলাসী মাল্য-চন্দন-শোভিত মেঘনাদ নয়। সে মেঘনাদ কৃষ্ণাজিন কমণ্ডলু, শিখা ও দণ্ড ধারণ ক'রে যজ্ঞসম্পাদনে আত্মনিয়োগ করেছে। যজ্ঞে দীক্ষিত বলে তাকে এমনই কঠোর মৌন পালন করতে হয় যে বিপন্ন পিতা লংকেশ্বর রাবণের ডাকেও সে সাড়া দেয় না। মহাতপা উশান (শুক্রাচার্য) তার ঐ মহাযজ্ঞের পরিচালক। মাইকেল যাকে কেবল যুদ্ধার্থে অগ্নি-পূজক রূপে দেখিয়েছেন, রামায়ণের মেঘনাদ তার চেয়ে অনেক বড়ো চরিত্র। যজ্ঞাচার্য উশানের মুখেই শোনা যায়, ইন্দ্রজিৎ অগ্নিষ্টোম অশ্বমেধ রাজসূয় গোমেধ বৈষ্ণব প্রভৃতি সপ্তযজ্ঞ সম্পন্ন করেছে, দুঃসাধ্য মাহেশ্বর যজ্ঞ করে পশুপতির নিকট বর লাভ করেছে ; এবং যা কিছু তার অলৌকিক শক্তি সবই তপোবলে অর্জন করতে হয়েছে। সেখানেও মেঘনাদের ইষ্টদেবতা অগ্নি। তবে কেবল অগ্নি-পূজাই নয়, জীবনে অগ্নিকে ইষ্টদেবতারূপে গ্রহণ করে অগ্নি-মন্ত্রে দীক্ষিত কর্ম-জীবনে প্রবেশের আগেই তাকে সুদীর্ঘ তপস্যায় সারা জীবনের আত্মপ্রস্তুতি সম্পন্ন করতে হয়েছে। মহর্ষির হাতের চিত্রখানি এইরূপ :—

> ততো যূপশতাকীর্ণং সৌম্যচৈত্যোপশোভিতম্।
> দদর্শ বিষ্টিতং যজ্ঞং শ্রিয়া সংপ্রজ্বলন্নিব ॥ (উত্তর—২৫।৩)

'শত শত যূপ-সম্বলিত সুন্দর চৈত্যরাজিতে শোভিত সেই যজ্ঞশালা। রাবণ দূর থেকে দেখলেন ঐ যজ্ঞস্থলের শ্রী চারিদিকে জল্ জল্ করছে।' বর্ণনার ভঙ্গিতে মহর্ষির শ্রদ্ধা ও মমতা লক্ষণীয়।

ততঃ কৃষ্ণাজিনধরং কমণ্ডলুশিখাধ্বজম্।
দদর্শ স্বসুতং তত্র মেঘনাদং ভয়াবহম্॥ (ঐ—৪)

অতুল রাজৈশ্বর্যের অধিকারী যে যুবরাজ তার পক্ষে ঐ কৃষ্ণাজিন-দণ্ড-কমণ্ডলু-শিখা-ধারণে সূচিত ব্রহ্মচর্য-পালনের যে কঠোরতা, তাতেই মেঘনাদ হয়েছে ভয়াবহ-দর্শন।

অগ্নিষ্টোমোঽশ্বমেধশ্চ যজ্ঞো বহুসুবর্ণকঃ।
রাজসূয়স্তথা যজ্ঞো গোমেধো বৈষ্ণবস্তথা॥
মাহেশ্বরে প্রবৃত্তে তু যজ্ঞে পুংভিঃ সুদুর্লভে।
বরাংস্তে লব্ধবান্ পুত্রঃ সাক্ষাৎপশুপতেরিহ॥ (ঐ—৮।৯)

মহর্ষি-দত্ত ইন্দ্রজিতের এই আলেখ্যে উৎসাহিত হয়ে কৃত্তিবাস তাঁর নিজস্ব দরদী ভঙ্গিতে রচনা করেছেন অগ্নিহোত্রী মেঘনাদের তপশ্চর্যার গান লোকায়ত আসরের উপযোগী ক'রে। ব্রহ্মচর্যের উপর আলোকপাতের উদ্দেশ্যেই লিখেছেন,—

অনাহারে যজ্ঞশালে রাত্রিদিন থাকে।
দ্বাদশ বৎসর স্ত্রীর মুখ নাহি দেখে॥ (পৃঃ ৫৬৬)

আবার যজ্ঞ-সমাপ্তির পরই দশাননের স্বর্গবিজয়ের অভিযানে সহযোগী হওয়ার কথায় লিখেছেন,—

চৌদ্দ বৎসর অনাহারে আছে মেঘনাদ।
মধুপান করিয়া ঘুচিল অবসাদ॥
অন্তঃপুরে নাহি যায় সে চৌদ্দ বৎসর।
প্রকাশ না করে লাজে রাজার গোচর॥
নারী-সম্ভাষণে পুত্র নাহি গেল লাজে।
যজ্ঞস্থল হৈতে বীর যুঝিবারে সাজে॥ (পৃঃ ঐ)

এই সুকঠিন তপঃসিদ্ধ প্রস্তুতির বলে সেই যাত্রাতেই ইন্দ্রজিৎ হয় দেব-দৈত্য-রণ-জয়ী এবং বাসববিজয়ী। ইন্দ্রকে পরাজিত ও বন্দী করে সে নিয়ে আসে লংকায়। স্বয়ং ব্রহ্মা দেবগণ-পরিবৃত হয়ে আসেন ইন্দ্রের মুক্তির জন্য। প্রীত হয়ে তিনি জানান,—

অহোঽস্য বিক্রমৌদার্যং তব তুল্যোঽধিকোঽপি বা।
(উত্তর—৩০।৩)

রাবণকে সম্বোধন করে বলছেন, তোমার পুত্র মেঘনাদের মহোন্নত বিক্রম আমাদের বিস্মিত করেছে, একে তোমার তুল্য না বলে তোমার চেয়েও বড়ো বীর বলতে হয়।

আর তখনই হলো মেঘনাদের নামকরণ 'ইন্দ্রজিৎ' ব্রহ্মার মুখে :—

জগতীন্দ্রজিদিত্যেব পরিখ্যাতো ভবিষ্যতি। (ঐ—৫)

ইন্দ্রের মুক্তির বিনিময়ে কী বর চাও, ব্রহ্মার এই প্রশ্নের উত্তরে মেঘনাদ অমরত্ব চেয়েছিলো, কিন্তু 'নাস্তি সর্বামরত্বং হি কস্যচিৎপ্রাণিনোভুবি'—ব্রহ্মা এ কথা জানালে, যে ভিন্নপন্থায় সে অমরত্বের প্রার্থনা জানালো, তা সত্যই স্মরণীয়। ইষ্টদেবতা অগ্নির পূজা-জপ-হোম অসমাপ্ত রেখে যুদ্ধে গেলেই তার বিনাশের সম্ভাবনা থাকবে, অন্যথা নয়, এই চুক্তিতে ব্রহ্মাকে সম্মত করার সময় সে একথাও নিবেদন করলো—

সর্বো হি তপসা দেব বৃণোত্যমরতাং পুমান্।
বিক্রমেণ ময়া ত্বেতদমরত্বং প্রবর্তিতম্॥ (ঐ—২৫)

লোকে কেবল তপস্যার দ্বারাই অমরত্বের বর-প্রার্থনা করে, আমার অমরত্বের বরলাভ হবে কেবল তপোবলে নয়, বিক্রমের বলে (পরাক্রমে ইন্দ্র-বিজয়ের বলে)। এখন আমাকে এই বর যদি না দেন তবে ইন্দ্রকে মুক্তি দেওয়া হবে না।—শিরোমণি-টীকা : 'এতেন বরপ্রাপ্তিমন্তরা ইন্দ্রমোক্ষো ন ভবিতেতি ধ্বনিতম্'।

এই হলো সেই 'পরাক্রম' যার কথা মাইকেলের মেঘনাদের মুখে শোনা যায়—"দেব-দৈত্য-নর-রণে স্বচক্ষে দেখেছ পরাক্রম দাসের—" ; কিন্তু সেখানে শুধুই মুখের কথা, শুধুই বক্তৃতা, কেবল তৈরী ফসলের কারবার ; তৈরীর বৃত্তান্ত জানতে হলে, আসল আলেখ্যটি পেতে হলে আসতে হবে আর্য-রামায়ণের এইখানে, দেখে মুগ্ধ হতে হবে সত্যই কী বীরোচিত প্রার্থনা! কী বীর-চরিত্রের মাহাত্ম্য! চরিত্র-গঠনেরই বা কী তপস্যা!

এই ইন্দ্রজিতেরই বর্ণনায় মহর্ষি লিখেছেন,—

ত্বমস্ত্রবিৎশস্ত্রভৃতাং বরিষ্ঠঃ সুরাসুরাণামপি শোকদাতা।
সুরেষু সেন্দ্রেষু চ দৃষ্টকর্মা পিতামহারাধনসংঞ্চিতাস্ত্রঃ॥

(সুন্দর—৪৮।২)

ভুজবীর্যাভিগুপ্তশ্চ তপসা চাভিরক্ষিতঃ।
দেশকালপ্রধানশ্চ ত্বমেব মতিসত্তমঃ॥ (ঐ—৪)

রাবণ স্বীয় পুত্রকে বলছেন, তুমি অস্ত্রবিশারদগণের শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্র সমেত সমস্ত সুরাসুরকে তুমি নির্জিত করেছো, পিতামহ ব্রহ্মার কাছে তুমি ব্রহ্মাস্ত্র লাভ করেছো। তুমি নিজ ভুজবলে ও তপোবলে সুরক্ষিত, দেশকালজ্ঞ ও বুদ্ধিমান।

মহর্ষির মেঘনাদ যতো বড়ো বীর, ততো বড়ো ধ্যানী, আর ঠিক ততো বড়োই মন্ত্রসাধনার অধিকারী।

ততস্তু লক্ষ্যে স বিহন্যমানে
শরেষমোঘেষু চ সংপতৎসু।
জগাম চিন্তাং মহতীং মহাত্মা
সমাধিসংযোগসমাহিতাত্মা ॥ (সুন্দর—৪৮।৩৪)

মেঘনাদ-চরিত্রের এতোখানি শ্রদ্ধা-মাহাত্ম্য-জ্ঞাপক পরিচিতি মাইকেলের কাব্যে কোথাও নেই। অমোঘ শরনিক্ষেপসত্ত্বেও হনুমানের শরীর অক্ষত রয়েছে লক্ষ্য করে মেঘনাদ মহা চিন্তায় পড়লেন। এবং সেই মহাত্মা (ইন্দ্রজিৎ) তখন ধ্যানবলে স্বরূপ জানবার জন্য সমাহিতচিত্ত হলেন।

[তিলক-টীকা :—সমাধিসংযোগেন (ধ্যানকারণেন তৎস্বরূপজ্ঞানায়) সমাহিতাত্মা (একাগ্রচিত্তঃ)]

আর্য-রামায়ণের মেঘনাদকে যাঁরা দলবেঁধে ঘোষণা করেছেন পশুবলসর্বস্ব, অনার্য বর্বর বীভৎসরসাশ্রয়ী রাক্ষস বলে, তাঁরা লক্ষ্য করুন, মহর্ষি স্বয়ং তাকে সমাধিসংযোগ-সমাহিতাত্মা হতে দেখে তাকে শ্রদ্ধাভরে মহাত্মা বলে পরিচিত করেছেন।

স বদ্ধস্তেন বল্কেন বিমুক্তোঽস্ত্রেণ বীর্যবান।
অস্ত্রবন্ধঃ স চান্যং হি ন বন্ধমনুবর্ততে ॥ (ঐ—৪৮।৪৮)

মেঘনাদ-চরিত্রের আর এক দিক। তার মন্ত্রসাধনার কথা। হনুমানের প্রতি ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করা হয়েছে। মন্ত্রপূত অস্ত্র। কিন্তু এটাও মেঘনাদের অজানা নয় যে, ব্রহ্মার বরে হনুমান অমর। কেবল বন্ধনের জন্য সে অস্ত্র প্রয়োগ করেছিলো। কিন্তু নির্বোধ রাক্ষসগণ মেঘনাদের সমস্ত কাজকে নিরর্থক করে দিলো। তারা মন্ত্রের মহিমা না বুঝে রজ্জু-বল্কলাদি দিয়ে হনুকে বন্ধন করলো। এর ফলে হনুমান পূর্বের অস্ত্র-ঘটিত বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে গেলেন। কারণ মন্ত্র-চালিত ব্রহ্মাস্ত্রের উপর অন্য অস্ত্র প্রয়োগ করলে ফল হয় বিপরীত ;—এটাও ইন্দ্রজিতের সুবিদিত। তাই তার এই আক্ষেপ।

[তিলক-টীকা :—"অস্ত্রবন্ধো মন্ত্রবন্ধোঽন্যং বন্ধং নানুবর্ততে, ইতরবন্ধেন সহ ন তিষ্ঠতি, তস্মিন্ সতি মন্ত্রবন্ধো নশ্যতীত্যর্থঃ।"]
সুতরাং মহর্ষিদত্ত এই বিবরণ পরিচয় দেয় কতো বড়ো মন্ত্রসাধনার অধিকারী ছিলো আর্যরামায়ণের মেঘনাদ। এই মেঘনাদেরই বিভীষণের উদ্দেশে যে প্রজ্ঞাদৃপ্ত ভাষণ পূর্বালোচিত শ্লোকসপ্তকে (যুদ্ধ—৮৭।১১-১৭) স্থান পেয়েছে, তার অংশবিশেষ হুবহু আত্মসাৎ করে মেঘনাদবধ কাব্য হয়েছে 'নূতন যুগের বাঙালীর জীবনবেদ'! মৌলিক মহৎসৃষ্টির অকুণ্ঠ প্রশংসাধন্য মাইকেলের মেঘনাদের যে সর্বশেষ বর্ণনা, যার জন্য সকল মহলেই ধন্য ধন্য,—

নির্বাণ পাবক যথা, কিম্বা ত্বিষাম্পতি
শান্তরশ্মি মহাবল রহিলা ভূতলে—

তাও মাইকেলের নয়, মহর্ষি বাল্মীকিরই হৃদয়োৎসারিত মেঘনাদ-বার্তা, যথা—

শান্তরশ্মিরিবাদিত্যো নির্বাণ ইব পাবকঃ।
বভূব স মহাবাহুর্বপাস্তগতজীবিতঃ ॥ (যুদ্ধ—৯০।৮২)

কিন্তু দুর্ভাগ্য ঐ মেঘনাদের, দুর্ভাগ্য মহর্ষি বাল্মীকিরও যে, রামায়ণের মেঘনাদ আমাদের বাংলা সাহিত্যের সমালোচক-মহলে পশুপ্রকৃতি অসভ্য বর্বর রাক্ষস বলেই গণ্য হলো!

শক্তিমান কবির প্রশস্তি সাহিত্যে পরম বাঞ্ছিত বস্তু। কিন্তু সে প্রশস্তি সত্যনিষ্ঠ হওয়া আবশ্যক। যে সাহিত্যিক নির্মিতির গুণে মাইকেলের মেঘনাদ-আলেখ্য হয়েছে উপভোগ্য, তার জয়গান অব্যাহত থাকুক, অবসান হোক ঐ সব মিথ্যার, যার ভিড় জমে গেছে সেই গানের আসরকে অযথা জমকালো করার উন্মাদনায়। মাইকেলের মেঘনাদ-কেন্দ্রিক মৌলিকতার বন্দনায় অসতর্ক উচ্ছ্বাস একেবারে অচল। কারণ সৃষ্টি তাঁর পদে পদেই ত্রুটি-কণ্টকিত। এক তো মূলের ঘোরতর বিকৃতি, তার উপর কল্পনার খেয়ালীপনা ও তজ্জনিত অসঙ্গতি, এ ছাড়া অপহরণ-সংকলন তো আছেই, আছে বাল্মীকি থেকে, আছে কৃত্তিবাস থেকে। অথচ রচিত ছবিখানি সত্যই আকর্ষণীয়। সাহিত্যের দরবারে এই আকর্ষণের দরদী মূল্যায়ন চলুক শিল্পের দিক দিয়ে। শিল্প-জহুরীরা ব্যাপৃত থাকুন জহর-যাচাইয়ের নৈপুণ্য-প্রদর্শনে। কিন্তু ঐ মেঘনাদ-চিত্র-চরিত্রের উপর মৌলিক মহৎ সৃষ্টির কোনো উচ্চতর মহিমা-আরোপের চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র।

অষ্টম অধ্যায়

বিভীষণ-প্রসঙ্গ

[১] মাইকেল ও মোহিতলাল

অশ্বত্থামা বলির্ব্যাসো হনূমাংশ্চ বিভীষণঃ।
কৃপঃ পরশুরামশ্চ সপ্তৈতে চিরজীবিনঃ ॥

এই আপ্তবচনে চিরজীবী-মহিমায় পূজিত সাতটি নামের পঞ্চমে যাঁকে পাওয়া যায়, আর্য-রামায়ণের সেই মহাত্মা বিভীষণ নূতন যুগের মহাকবির কাছে পেয়েছেন নূতন খেতাব—"The scoundrel Bibhisan"—নারকীয় শয়তান! এক যুগন্ধর কবি মনীষীর হাতে ভারতের চিরগর্ব রামায়ণ-মহাকাব্যের এই বিখ্যাত চরিত্রটির এ এক অপূর্ব ভাগ্যই বটে! এই জঘন্য শয়তানকে যিনি তাঁর মহাকাব্যে ধর্মাত্মা মহাপুরুষ বলে তুলে ধরেছেন, কি জানি, হয়তো সেই কবি আজ বেঁচে থাকলে তাঁকে সর্বসমক্ষে নাক-কান ম'লতে হতো! কারণ কেবল যে মাইকেলই চরিত্রটির যথেচ্ছ বিকৃতি-সাধনে মত্ত হয়েছেন এবং তার অবশ্যপ্রাপ্য শাস্তিস্বরূপ তার উদ্দেশে অমন বেপরোয়া মন্তব্যের চাবুক চালিয়েছেন, তাই নয়, তাঁর অকুণ্ঠ সমর্থনে ছুটে এসেছেন অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ সমালোচক। এঁদের মধ্যে যিনি সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী তিনি হলেন রবীন্দ্রোত্তর যুগের অদ্বিতীয় সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার। আমরা তাঁরই বৈদগ্ধ্য-খচিত মন্তব্যের বিশ্লেষণযোগে এই প্রবন্ধ সুরু করতে চাই।

রাম ও বিভীষণ, ধার্মিক চরিত্র হিসাবে এই দুয়ের সূক্ষ্মবিচারপ্রসঙ্গে মোহিতলাল লিখেছেন,—"রাম ধার্মিক হইলেও দুর্বল, বিভীষণ ন্যায়নিষ্ঠ হইলেও মনুষ্যত্বহীন, তাহার আত্মীয়বাৎসল্য নাই, সে ধার্মিকতার অভিমানে মানুষের সহজ ধর্মকে বর্জন করিয়াছে। রাম-রাবণের যুদ্ধে তাহার যে অবস্থা, কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধে ভীষ্মেরও সেই অবস্থা।" ('কবি শ্রীমধুসূদন', পৃঃ ৬২)

এই পর্যন্ত পড়া হলে, পাঠক ভাবতে পারেন, তা হলে আর বিভীষণের কী অমর্যাদা করা হয়েছে; ভীষ্মের সমপর্যায়ের মানুষ তো সত্যই মহিমান্বিত। কিন্তু মোহিতলালের বলা শেষ হয় নি; স্বল্প বিরতির পরই এসেছে এক বৃহৎ

'কিন্তু' ;—"কিন্তু উভয়ের ধার্মিকতায় কি প্রভেদ! ধর্মহীন যে মনুষ্যত্ব ও মনুষ্যত্বহীন যে ধর্ম—কবি এই উভয়ের মধ্যে একটি স্পষ্ট ভেদ-রেখা টানিয়াছেন, এবং মনুষ্যত্বকে এমন কি, নীতিজ্ঞানহীন সহজ মানব-ধর্মকে আর সকল ধর্মের উপরে স্থান দিয়াছেন। যে মানুষ সহজ মনুষ্যধর্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে, তাহার ন্যায়নিষ্ঠাও বিশুদ্ধ ধর্মপ্রবৃত্তি নয়। এই মনুষ্যত্ববোধই শ্রেষ্ঠ আত্মমর্যাদাবোধ —ভীষ্মের তাহা ছিল বলিয়াই, তাঁহার ধার্মিকতা এত বড়। বিভীষণের ধার্মিকতা যে খাঁটি নয়, কবি তাহার নিজের কথাতেই তাহার প্রমাণ দিয়াছেন। সে স্বপ্নে শুনিয়াছে, রক্ষঃকুলরাজলক্ষ্মী তাহাকে বলিতেছেন—'হায়! মত্ত মদে/ ভাই তোর, বিভীষণ! এ পাপ-সংসারে/কি সাধে করি রে বাস,/কলুষদ্বেষিণী/ আমি ?....../কিন্তু তোর পূর্ব কর্মফলে/সুপ্রসন্ন তোর প্রতি অমর, পাইবি/শূন্য রাজসিংহাসন, ছত্রদণ্ড সহ,/তুই! রক্ষঃকুল-নাথ-পদে আমি তোরে/করি অভিষেক আজি, বিধির বিধানে....../রে ভাবি কর্বুররাজ।' এ যেন ম্যাক্‌-বেথের কানে ডাইনীদের পাপ-মন্ত্র! আবার যখন নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে মেঘনাদের অনুযোগের উত্তরে—'মহামন্ত্রবলে যথা নম্রশিরঃ ফণী,/মলিন-বদন লাজে, উত্তরিলা রথী/রাবণ-অনুজ, লক্ষ্যি রাবণ-আত্মজে,—/'নহি দোষী আমি, বৎস! বৃথা ভর্ৎস মোরে তুমি......পরদোষে কে চাহে মজিতে ?'—তখনও তাহার ধর্মবুদ্ধির কারণ বুঝিতে বিলম্ব হয় না। ক্ষোভে, ক্রোধে, লজ্জায় মেঘনাদ ইহার উত্তরে যাহা বলিল, তাহা যেন কবির নিজেরই কথা—'কোন্‌ ধর্মমতে, কহ দাসে, শুনি,/জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি... /গতি যার নীচ সহ, নীচ সে দুর্মতি।" (ঐ, পৃঃ ৬২-৬৩)।

এখানে দেখা যায়, ভাষ্যকারের ভূমিকায় লেখনী হাতে পেয়ে, মাইকেল যাকে scoundrel বলে হুঙ্কার ছেড়েছেন, মোহিতলাল তাকেই 'ডাইনী-মন্ত্রচালিত ম্যাকবেথ' বলার সুযোগ করে নিয়ে সূত্র ও ভাষ্যের মণি-কাঞ্চন যোগ ঘটিয়েছেন। অর্থাৎ বাল্মীকির মহামতি বিভীষণের এখন চোরের মা'র খাওয়ার পালা। যার যেভাবে খুসি মারুক, চোরকে নীরবে সহ্য করতে হবে। তবু চোরের ভাগ্য ভালো, প্রথম মার সে খেয়েছে (আর, বুঝি, সেটাই মোক্ষম,) যার তার হাতে নয়, স্বয়ং শ্রীমধুসূদন! 'নমি আমি, কবি-গুরু, তব পদাম্বুজে, বাল্মীকি!'—'তব অনুগামী দাস'—'তব পদ-চিহ্ন ধ্যান করি

জে, বাল্মীকি!'—'তব অনুগামী দাস'—'তব পদ-চিহ্ন ধ্যান করি

দিবানিশি'—'হে পিতঃ'—'কৃপা, প্রভু; কর অকিঞ্চনে'—ইত্যাদি বন্দনা-ভঙ্গির ভক্তি-নম্রতার সঙ্গে ঐ 'প্রভু'-রচিত ধর্মাত্মা মহামতি বিভীষণের উদ্দেশে 'স্কাউনড্রেল' বলে হুঙ্কার-ছাড়ার সঙ্গতি লক্ষ্য করে বুঝি আমাদের সমালোচক মহল নিতান্তই মুগ্ধ! তবে ধর্মাত্মাকে শয়তান করার জন্য শ্রীমধুসূদনের উদ্ভাবনী শক্তির কসরৎ সত্যই তারিফ করবার মতো। প্রথমত, কবিগুরুর মূল কাহিনীর উপর মিথ্যার অত্যাচার চালিয়ে নিরস্ত্র মেঘনাদের হত্যাদৃশ্য রচনা করেছেন, লক্ষ্মণকে তস্কররূপে প্রবেশ করিয়ে বিভীষণকে করেছেন তস্কর-সহায়ক। দ্বিতীয় উদ্ভাবন বিভীষণের স্বপ্ন-দেখা। স্বপ্ন-দেখানো এই আর্টিষ্টের একটা ব্যাধি-বিশেষ। বিভীষণ, লক্ষ্মণ, সীতা, কৃষ্ণকুমারী,—তাঁর হাতে পড়ে সকলকেই স্বপ্ন দেখতে হয়েছে। বিভীষণের ক্ষেত্রে স্বপ্নেই অভিষেক সম্পন্ন করে কবি অবশ্যই ঘটনাক্রমে নূতনত্ব দেখাতে সক্ষম হয়েছেন,—যদিও সেইটাই যে এই চরিত্রের অভিনব ভাষ্যরচনায় মূল্যবান উপাদানরূপে ব্যবহৃত হতে পারে, তা হয়তো কবি নিজেই ভেবে দেখেন নি। তৃতীয়ত, মূল রামায়ণে বিভীষণের প্রতি মেঘনাদের তিরস্কারেরই অংশবিশেষ যদিও মধুসূদন তাঁর মেঘনাদের মুখে হুবহু বসিয়ে দিয়ে এযুগের সমালোচকের কাছে বাহবা নিয়েছেন, তবু ঐ বসানোর মুহূর্তটা দিয়েছেন পালটিয়ে। রামায়ণে আছে পরস্পরের প্রথম দর্শনে, আর এখানে সেটা সকলের শেষে; এবং তার পরই বিভীষণের মুখ চেপে ধরা হয়েছে যাতে তার মুখে রামায়ণের মতো একটা উপযুক্ত জবাব মেঘনাদকে না শুনতে হয়, যাতে মহর্ষি-নির্দিষ্ট তার খুল্লতাত-মহিমা ও ব্যক্তি-মহিমার এক কণাও না খুঁজে পাওয়া যায়, যাতে শাস্ত্র-নীতি-ধর্ম-বিরোধী কাজের জন্য ধিক্কৃত বিভীষণের 'মলিন-বদন লাজে'-রূপটি পাঠকের চোখে হতে পারে দীর্ঘস্থায়ী। ওদিকে এই ভ্রাতৃপুত্র-হত্যায় সহযোগী হওয়ার জন্য গোড়াতেই বিভীষণের মধ্যে করুণ অন্তর্দ্বন্দ্বের যে ছবি দেখিয়েছেন বাল্মীকি,—কৃপাপ্রার্থী 'অনুগামী দাস' কবি শ্রীমধুসূদন সেটি একেবারে মুছে ফেলেছেন; পরিবর্তে, হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন হওয়ার পর বিভীষণকে দিয়ে যাত্রা-প্যাটার্নে একটা শোকের বক্তৃতা করিয়েছেন। কবি-মুখের 'স্কাউনড্রেল'-এর আলোয় ঐ শোকের মধ্যে কুম্ভীরাশ্রুই লক্ষ্য করতে হয়! সবই কি বাল্মীকি-বন্দনায় ঐকান্তিক বিনম্রতার প্রতিক্রিয়া?

বিস্তৃত সমীক্ষায় আমরা পরে আসছি, উপস্থিত মোহিতলালের মন্তব্যই আলোচিত হোক। যেটা অবলম্বন করে তিনি বিভীষণের মধ্যে ডাইনী-

চালিত ম্যাক্‌বেথের প্রতিরূপ খুঁজে পেয়েছেন, এবং যেটার মধ্যে তিনি বিভীষণের ধার্মিকতায় ভেজালের অকাট্য প্রমাণ পেয়ে খুসী হয়েছেন, বিভীষণের সেই স্বপ্ন-দেখাটা যখন রামায়ণের বিভীষণের নয়, তখন ঐ 'ডাইনী-প্রভাবিত-ম্যাকবেথ' বা 'ভণ্ড-ধার্মিক' যা কিছু সবই মাইকেলের বিভীষণ। অথচ সমালোচন-ভঙ্গিতে সাধারণ পাঠককে মনে করতে হয় যেন এইটাই বিভীষণের আসল রূপ। মোহিতলাল লিখেছেন, 'বিভীষণের ধার্মিকতা যে খাঁটি নয়, কবি তাঁহার নিজের কথাতেই তাহার প্রমাণ দিয়েছেন'; 'নিজের কথাটি' যখন কবিরই স্বকপোলকল্পিত, মেকি বিভীষণের মেকি উক্তি, তখন প্রমাণটাও কি মেকি হয়ে যায় না? একটা মেকি দিয়ে আসলের বিচার সেরে দেওয়া কবির পক্ষেও সাধু নয়, তাঁর সমর্থক সমালোচকের পক্ষেও নয়।

অতঃপর বিভীষণের বিরুদ্ধে মোহিতলালের 'মনুষ্যত্বহীন ধর্মে'র অভিযোগ। কবি মধুসূদন যে বিভীষণ-চিত্র রচনার মধ্যে ধর্মহীন মনুষ্যত্ব ও মনুষ্যত্বহীন ধর্মের ভেদরেখা টেনে মনুষ্যত্বকে ধর্মের উপরে স্থান দিতে চেয়েছেন, এমন প্রস্তাবের মধ্যে শুধু সমালোচকেরই মনন ও চিন্তাশীলতার পরিচয় ফুটেছে। মাইকেলের কোনো আদর্শ-রচনায় বালাই ছিলো না। যে আদর্শের বুলি তিনি তাঁর মেঘনাদকে দিয়ে আবৃত্তি করিয়েছেন, যার সম্বন্ধে প্রশস্তিমুগ্ধ মোহিতলালের উচ্ছ্বসিত মন্তব্য—"তাহা যেন কবির নিজেরই কথা",—তার একবর্ণও মাইকেলের নিজের রচনা নয় (পূর্বে একাধিক বার প্রদর্শিত)। সে না হয়, না হোক। কিন্তু মূল প্রস্তাবটাও কি অভ্রান্ত? 'নীতিজ্ঞান-হীন সহজ মানবধর্ম'কে সকলের উপরে স্থান দেওয়া কি উচ্চাঙ্গের মনুষ্যত্বের পরিচায়ক? 'সহজ মনুষ্যধর্ম' বলতেই বা মোহিতলাল কী বোঝাতে চান? সম্ভবত 'আত্মীয়বাৎসল্য'। 'বিভীষণের আত্মীয়বাৎসল্য নাই', এ কথা ঘোষণা করবার সময় কেবলই কি ভ্রাতৃপুত্রের দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে, না পুত্র তরণী-সেনের কথাও মনে ছিলো? মাইকেল খণ্ড বিভীষণ, বিকৃত বিভীষণকে দেখাতে পারেন,—রামায়ণের গোটা বিভীষণ, আসল বিভীষণের কাহিনী তো মোহিতলালের জানা ছিলো। 'আত্মীয়' হিসাবেও ভ্রাতৃপুত্রের স্থান অবশ্যই পুত্রের আগে নয়? ন্যায়ের জন্য, ধর্মের জন্য যারা প্রাণপ্রিয় আপনজনকেও বিসর্জন দিতে পারে, তারা মনুষ্যত্বহীন, এ সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য নয়। আমাদের জিজ্ঞাসা, মোহিতলালী ফরমূলায় রবীন্দ্রনাথের গান্ধারী চরিত্রটির স্থান কোথায় নির্দিষ্ট হবে? সেখানে বোধহয় ধৃতরাষ্ট্র বজায় রেখেছেন 'ধর্মহীন মনুষ্যত্ব',

আর, গান্ধারী যার পরিচয় দিয়েছেন, তাঁকে বলতে হয় 'মনুষ্যত্বহীন ধর্ম'? কিন্তু কোন্ চরিত্রটি অধিকতর শ্রদ্ধেয়? পাপ, দম্ভ, ঔদ্ধত্যের প্রশ্রয় দিয়ে ভ্রাতৃপক্ষ সমর্থন করলেই কি বিভীষণের পক্ষে 'মানুষের সহজ ধর্মে'র জয়ধ্বজা উড্ডীন করা হতো? বস্তুত মাইকেলের মেঘনাদবধ কাব্যে এবং তার অন্ধ-প্রশস্তিবাদী সমালোচনায় রামায়ণের যে বিচিত্র সৃষ্টির আপত্তিকর বিকৃতি ঘটানো হয়েছে, বিভীষণ তারই একটি শোচনীয় নমুনা।

অনেকে মাইকেলের এই বিভীষণের মধ্যে যুগ-প্রয়োজনসিদ্ধির মূল্যবান ইঙ্গিত লক্ষ্য করেছেন, এবং সে ইঙ্গিত যে কবির সচেতন প্রয়াসের ফল, তাও মন্তব্য করতে ছাড়েন নি। কিন্তু যদি মূল রামায়ণে ও কৃত্তিবাসী রচনায় ঐ একই বিভীষণচেতনা একই ভাবে দেখা দিয়ে থাকে, তবে আর মাইকেলের যুগচেতনার বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় হয় কিসে? যদি যুগানুকূল আবেদন এখানে কিছু পাওয়া গিয়ে থাকে তবে, প্রথমত, সেটা নিতান্তই আকস্মিক যোগাযোগের ফল; দ্বিতীয়ত রামায়ণ-মহাভারতের মতো কালজয়ী সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য যে, তাদের মধ্যে স্থান পেয়েছে সকল যুগের প্রয়োজনসিদ্ধির উপযোগী বিচিত্র উপাদান। বিভীষণ-চরিত্রের যে দুটি বিষয়ের উপর মাইকেলের রচনায় আলোকপাত ঘটেছে, তার একটি হলো স্বজনদ্রোহিতা, আর একটি তার 'ঘর-সন্ধানী' প্রকৃতি। এই দুটি কথাই কৃত্তিবাসী রামায়ণে বহুবার রকমারি ভঙ্গিতে উল্লেখিত হয়েছে। এদেশের সাধারণ পাঠক আর্যরামায়ণের প্রতি শ্রদ্ধাবান হয়েও বিভীষণকে "ঘর-শত্রু বিভীষণ" বলে মাইকেলের অনেক আগে চিনে নিয়েছে। বিভীষণের এই গালাগালিটা সমাজে কায়েমী হওয়ার জন্য মেঘনাদ-বধের অপেক্ষায় থাকে নি। যেমন ভাবেই হোক, রামায়ণ-পাঠের ফলশ্রুতি-রূপেই বিভীষণ-চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য সাধারণ মানুষ সংগ্রহ করেছে। মাইকেল বিভীষণের এই পরিচয়কে আর একবার পরিচিত করেছেন মাত্র। তবে রামায়ণে এই বিভীষণের আরো যে বিচিত্র পরিচয় আছে, তার কোনো প্রসঙ্গ এখানে না থাকায়, মাইকেল সেই সমগ্রতায় বিধৃত বিভীষণকে আমাদের ভুলিয়ে দিতে চেয়েছেন।

[২] বিভীষণ চির-উপেক্ষিত

নূতন যুগের কবির হাতে রামায়ণের উপর নূতন আলোকপাতের এই যে প্রয়াস, এতে উপেক্ষিত অবজ্ঞাত বিভীষণ চরিত্রটির একেবারে উপেক্ষা-

অবজ্ঞার অতলে তলিয়ে যাওয়ার পথটাই সুগম হয়েছে। বস্তুত, রামায়ণের বিভীষণ তাঁর ন্যায্য প্রাপ্য থেকে চিরবঞ্চিত। মাইকেলের প্রসঙ্গ বাদ দিয়েও বলা যেতে পারে বিভীষণের প্রতি ঠিক সুবিচার করা হয় নি। রামায়ণে তাঁকে যে role-টা দেওয়া হয়েছে তার কর্ম-বিশ্লেষণও যেমন হয় নি, মর্ম-ব্যঞ্জনাও তেমনি থেকেছে অনুদ্‌ঘাটিত। বিভীষণ 'ঘর-শত্রু' এই অপবাদই বড়ো হয়ে রইলো, কিন্তু কিসের জন্য তাঁর এই শত্রুতা? এটি শত্রুতা না বলিদান? কেমন করে আমরা ভুলতে পারলাম তরণী-সেন-উপাখ্যান? বিভীষণের মধ্যে যে পিতৃস্নেহ বা পত্নীপ্রেম ছিল না, অথবা ছিল না ভ্রাতৃপ্রেম, জ্ঞাতিপ্রেম ও স্বজাতিপ্রীতি—একি কেউ বলতে পারেন? এই সর্বপ্রকার প্রেম-প্রীতি অটুট অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যেই না তিনি গিয়েছিলেন রাবণের প্রতিবাদ করতে। অথচ সেই বিরাট প্রেম-প্রীতির অমূল্য সঞ্চয় ও সম্পদ তিনি বিসর্জন দিলেন কেন? ধর্ম, ন্যায় ও নীতির জন্যই তো বটে। জগতে ধর্মের জন্য, ন্যায়-নীতির জন্য বিভীষণের মতো ত্যাগ স্বীকার করেছে কে? সর্বগুণসম্পন্ন পিতৃবৎসল আপন হৃৎপিণ্ডতুল্য পুত্রকে চোখের উপর এমনভাবে ন্যায়ধর্মের যূপকাষ্ঠে মহাভারতের দানবীর কর্ণ ছাড়া আর কে বলি দিতে পেরেছে? যে সরমাকে মাইকেল এত যত্ন করে অঙ্কিত করেছেন সীতা-চরিত্রের ঠিক পাশাপাশি, যার ভাব-প্রতিমার আরতিতে কবি গেয়ে উঠেছেন, "আহা মরি, সুবর্ণ-দেউটি/ তুলসীর মূলে যেন জ্বলিল, উজলি দশ দিশ", তারই জীবনসর্বস্ব বিভীষণের মধ্যে অমন নারীরত্নরূপা প্রিয়তমা পত্নীর জন্য প্রেমের অজস্র বুদ্‌বুদ্ অন্তরের অন্তস্তলে নিয়ত উত্থান-পতনে কতই না আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, তা কি অনুমান করা যায় না? কিন্তু সে সমস্ত উপেক্ষা করে যিনি সর্বত্যাগী হ'লেন ন্যায়ের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে, জগৎ তাঁকে মনে রাখলো শুধুই ঘর-শত্রু রূপে! দম্ভের মূর্ত বিগ্রহ রাবণের মতো দুর্ধর্ষ রাক্ষসরাজের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অন্যায়কে অন্যায় ও পাপকে পাপ বলে যে ঘোষণা করলো, তার পৌরুষের দৃঢ়তা ও মহত্ব হলো উপেক্ষিত, লোকে শুধু মনে রাখলো—বিভীষণ ধর্মভীরু। একবারও মনে হলো না, এখনও মনে হয় না, বিভীষণের **স্বভাবের মধ্যেই উজ্জীবিত ছিল** এ যুগের কবিমুখে উচ্চারিত মহামন্ত্র

অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে,
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।

তর্ক উঠেছে, বিভীষণ যদি সত্যাশ্রয়ী ও ধর্মাশ্রয়ী, তবে তিনি তো পাপাচারী

ভ্রাতাকে পরিত্যাগ করে পৃথকভাবে অবস্থান করলেই পারতেন। একের অপরাধে তিনি নির্দোষ জ্ঞাতিবন্ধুস্বজনবর্গের এবং জন্মভূমির সর্বনাশ ঘটালেন কেন? কিন্তু এটি শুধুই তর্কের জন্য তর্কমাত্র। পাপ ও অন্যায়-পক্ষ থেকে দূরে সরে থাকাই কি শ্রেষ্ঠ কর্তব্য, পাপ বা অন্যায়ের প্রতিকার কি কর্তব্য নয়? বরং প্রথমটি দুর্বলের কাজ, দ্বিতীয়টি শক্তিমানের। বিভীষণের সাহায্য না পেলে রামের পক্ষে সীতার উদ্ধার-সাধন সম্ভব হতো না। তাহ'লে যাঁরা বিভীষণের স্বজাতিদ্রোহিতায় এতোই মারমুখী, তাঁদের মতে কি সীতা-উদ্ধার না হওয়াই ছিল বাঞ্ছনীয়? বিভীষণের ভূমিকার চরম নিন্দায় আগুন ছুটিয়ে দেওয়া প্রকারান্তরে কি রাবণের পরদারহরণের প্রশ্রয় দেওয়া নয়? ন্যায়-নীতির শিরে পদাঘাত করে যে রাবণ তাঁর স্বর্ণ-লঙ্কার দরদে গদগদ হয়ে উঠ্‌লেন, বিভীষণের চূড়ান্ত নিন্দায় সেই পদাঘাতের প্রতি কী মনোভাব ব্যক্ত হয় আমরা কি ভেবে দেখেছি?

রামায়ণ এই ভেবে দেখার সুযোগ হয়তো একেবারে নষ্ট করে নি, কিন্তু মেঘনাদবধ কাব্য সে পথে কায়েমীভাবে কাঁটা দিতে চেয়েছে।

[৩] বিভীষণ কি মীরজাফর?

বিদেশী বিজাতীয় কোন শত্রুর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে দেশের স্বাধীনতা যে বিপন্ন করে, সে মীরজাফর হতে পারে, বিভীষণ নয়। মীরজাফরের ষড়যন্ত্র নিছক স্বার্থ-প্রণোদিত সয়তানি, আর, সে ষড়যন্ত্র যার সঙ্গে, সে পররাজ্যলোভী সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ। বিভীষণের ভূমিকায় ষড়যন্ত্রের বাহ্য লক্ষণ থাকলেও, সয়তানি নেই, বরং আছে সর্বস্ব হারাবার শহীদী মনোভাব। সে ভূমিকায় আছে বিনাশ, আছে সর্বনাশ; কিন্তু সে সর্বনাশ বিভীষণের অশ্রুপ্লাবিত। পাপ, অন্যায় অধর্মের বিরুদ্ধে জেহাদী জীবনবরণের ফলে বিভীষণের ভূমিকাটি যুগপৎ নির্মম-কঠোর এবং অশ্রু-ঝরা। আপন পুত্রের জীবনের বিনিময়ে, আপন পরিবারের সুখশান্তির বিনিময়ে, দেশের স্বাধীনতার বিনিময়েও যিনি ন্যায়-নীতি-ধর্মের মর্যাদাকে তুলে ধরতে চেয়েছেন, তাঁর জন্য কি বিশ্বমানবসমাজে কোথাও কোনো স্থান থাকবে না? তা ছাড়া, মীরজাফরী-বৃত্তিতে বিদেশী শত্রু পররাজ্যলোভী, কিন্তু রামায়ণের এই বৃত্তান্ত থেকে যাঁকে বিদেশী শত্রুর ভূমিকায় দেখানো হয়, সেই রামচন্দ্র কি রাজ্যলোভী না সাম্রাজ্যবাদী? লঙ্কার স্বাধীনতা-হরণের লক্ষ্য নিয়েই কি তিনি

বিভীষণের মিত্রতা অর্জন করতে সচেষ্ট হন? এই সত্যটির প্রতিধ্বনি মাইকেলরই চিত্রাঙ্গদার মুখে :—"কিসের কারণে,/কোন্ লোভে, কহ, রাজা, এসেছে এ দেশে/রাঘব? ***তব হৈমসিংহাসন-আশে/যুঝিছে কি দাশরথি? **/কে, কহ, এ কাল-অগ্নি জ্বালিয়াছে আজি/লংকাপুরে? হায়, নাথ, নিজ কর্মফলে/মজালে রাক্ষসকুলে মজিলা আপনি!"—এই অকাট্য সত্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিভীষণ-ভূমিকার পুনর্বিচার হতে পারে সহজেই। লংকাপুরী ও রাক্ষসকুল উভয়েরই প্রকৃত শত্রু রাবণ স্বয়ং, রামচন্দ্রও নয়, বিভীষণও নয়। বিশ্ববিধানকে অগ্রাহ্য করে রাবণ যে অন্যায় করেছে, তার প্রতিকার ও শাস্তি অনিবার্য। বিভীষণ ঐ বিশ্ববিধানেরই একটি অস্ত্রস্বরূপ। অতএব বিভীষণকে মীরজাফর-পর্যায়ে কখনই আনা চলে না।

[৪] কৃত্তিবাসের বিভীষণ : অন্তঃপুরের কথা : বিশ্ববিধানের অস্ত্র : মোহিতলালী অত্যাচার

কিন্তু নিষ্কণ্টক সিংহাসন-প্রাপ্তির প্রলোভন কি তাঁর ছিলো না? মাইকেল তাঁর বিভীষণকে দিয়ে স্বপ্ন দেখিয়ে হয়তো ইঙ্গিতে জানিয়েছেন এরই সমর্থন। তবে মোহিতলালী ভাষ্যে ঐ ইঙ্গিতের শাণিত রূপের চেহারাটি দেখে চমকে উঠতে হয়। হয়তো সমালোচনায় মাইকেলকে ফুটিয়ে তোলার এ এক অত্যাশ্চর্য প্রতিভার পরিচয়! কবির কাছে যে 'Scoundrel', কাব্যের গাঁথুনীতে তার স্বরূপটি প্রচ্ছন্ন দেখে পূজাব্রতী ভাষ্যকার ব্যাকুল গবেষণায় আবিষ্কার করেছেন ঐ স্বপ্নটুকু, আর অমনি শক্তিশালী মননের বলে বিভীষণের মধ্যে উদ্ধার করেছেন লেডি-ম্যাক্‌বেথী খলতা! প্রশস্তিমোহাচ্ছন্ন মাইকেল-ভক্তসমাজ সম্ভবত মোহিতলালের এই মূল্যবান ভাষ্যে পুলকিত হবেন, তবে নিরপেক্ষ কুতূহলী পাঠককে এই বিষয়টি সম্পর্কে একবার কৃত্তিবাসী বিভীষণের খবর নিতে অনুরোধ করি। বিভীষণের রামপক্ষে যোগদানের প্রথম পর্বটি কৃত্তিবাসী রামায়ণের সুন্দরাকাণ্ডে যেখানে সূক্ষ্ম ধারা-উপধারায় বিশ্লেষিত হয়েছে, সেই বিশ্লেষণের আলোকে, আশা করি, যে-কোনো স্থিতধী পাঠক বিভীষণ-চরিত্রের ঐ ঘোষিত দুর্বলতা-জনিত দ্বিধা সহজেই কাটিয়ে উঠতে পারবেন। এখানে একটু আগেই যে বিশ্ববিধানের কথা বলা হ'লো, দেখা যাবে, সেইটাই ওখানে শিবের মুখের ব্যাখ্যায় কতো বাস্তব-যুক্তি-সম্মত, কতো সহজ উপলব্ধিযোগ্য হয়েছে। কৃত্তিবাসের বিভীষণ রাবণের পদাঘাতে লাঞ্ছিত

এবং উদ্যত খড়্গের আঘাত থেকে প্রহস্তের হস্তক্ষেপে রক্ষাপ্রাপ্ত, সুতরাং লঙ্কাপুরী পরিত্যাগে কৃতসংকল্প। কিন্তু যাওয়ার আগে বিষণ্ণ-চিত্তে বলেন,

একমাত্র খেদ এই রহি গেল মনে।
সমুদয় কুল গেল তোমার দূষণে॥

(সুন্দর, পৃঃ ২৭৪)

রাবণ অধিকতর উত্তেজিত। হিতকথায় কান দেওয়ার পরিবর্তে জ্ঞাতি-শত্রু অবিলম্বে দূর হোক বলে গর্জন করে উঠলেন। বিভীষণ বললেন,—

প্রিয়বাদী জন রাজা সর্বত্র সুলভ।
অপ্রিয় পথ্যের বক্তা শ্রোতাও দুর্লভ॥

*   *   *

যার মৃত্যু উপস্থিত সেই লঙ্কাপতি।
না শুনে না দেখে বন্ধুবাক্য অরুন্ধতী॥
এ লাগি করিনু আমি তোমারে বর্জন।
জ্বলিত গৃহকে যেন ত্যজে বিজ্ঞজন॥ (ঐ, পৃঃ ২৭৫)

সভাত্যাগের পূর্বে জ্যেষ্ঠভ্রাতার চরণ-বন্দনে তাঁর ভুল হয় নি। এর পর, মাতৃ-সকাশে ঘটনার নিবেদন, তাঁর অনুমতি নিয়ে, পদধূলিগ্রহণ, তৎপরে ভার্যা সরমার সন্ধান। মিষ্টভাষে বিভীষণ সরমাকে বুঝিয়ে দিলেন তাঁদের কর্তব্যাকর্তব্য। সরমাকে জানকী-সেবার নির্দেশ-দানের পর লঙ্কাপুরীর বহির্দ্বারে পদার্পণ করেই অনুগামীদের কাছে মেলে ধরলেন তাঁর উদ্বিগ্ন চিত্তের আলোড়ন। সীতাদেবীর মুক্তি, অধর্মের প্রতিবিধান, অবশ্যই তাঁর লক্ষ্য, আর সেজন্য রামচন্দ্রের সহায়তা করাও তাঁর কর্তব্য। কিন্তু এই যে অগ্রজকে উপেক্ষা করে তিনি যাবেন রামের কাছে, এটা বিজ্ঞের কাছে না হোক, অজ্ঞের কাছে অন্যায় বলে মনে হতে পারে। 'করিলাম আমিহ অগ্রজে উপেক্ষণ॥ তাহে যদি রাম কাছে করিহে গমন। বিগান করিবে যাবতীয় অজ্ঞজন॥ অতএব মনে করি এবে না যাইব। রাবণ-বিনাশ পরে প্রস্থান করিব॥' (ঐ, পৃঃ ২৭৫)। সুতরাং দেখা যায়, বিভীষণ প্রথমে পাপ-পক্ষ বলে রাবণকে শুধু ছেড়ে থাকতেই চেয়েছিলেন। 'এক্ষণে থাকিয়া কোন নির্জন কাননে' তিনি অপেক্ষা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বিভীষণ কেবল ধার্মিক নন, তিনি চিন্তাশীল, তিনি লোকহিতব্রতী, সমাজকল্যাণকামী এবং কর্তব্যকর্মে উদ্যোগী। তাই নিশ্চিন্ত

থাকতে পারলেন না। Passive হয়ে থাকা তাঁর মনে হয়েছিলো পাপের পরোক্ষ প্রশ্রয়দান এবং দুর্বলের সিদ্ধান্ত। আবার active হতে গেলেই কলঙ্ক মাখতে হবে। এই সংকটে পড়ে তিনি তাঁদের সর্বাগ্রজ কুবেরের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করেন।

যক্ষপতি কুবের ও বিশ্বপতি মহেশ্বর, পরস্পর সুহৃদ সম্পর্ক। সর্বজ্ঞ মহাদেব বিভীষণের সংকট-পরিস্থিতি উপলব্ধি করে পূর্বাহ্নেই সখা কুবেরের সঙ্গে এসে মিলিত হন। সেই দুই পূজ্যের মিলিত দরবারে বিভীষণ নিবেদন করেন তাঁর সংকটের কথা। শিবের পরামর্শ অনুযায়ী কুবের অগ্রজের ভূমিকায় নির্দেশ দেন, বিভীষণ যেন সকল দ্বিধা বর্জন করে এখনই রামচন্দ্রের সঙ্গে মিলিত হন। এবং পরিণামে রাম বিভীষণকেই যে রাজ্যভার দেবেন, তাও গ্রহণ করতে পরামর্শ দেন। কিন্তু ধর্মাত্মা বিভীষণের বিজ্ঞতায় বিষয়টি গভীরতর বিশ্লেষণের বস্তু হয়ে ওঠে। তাই,—

কুবেরের মুখে শুনি এতেক বচন।
অধোমুখ হইয়া ভাবেন বিভীষণ॥ (ঐ পৃঃ ২৭৮)

সিদ্ধান্ত ত্বরান্বিত করার জন্য শিব অগ্রসর হয়ে তাঁকে বলেন, অগ্রজের বচন পালন করাই তাঁর কর্তব্য। তদুত্তরে বিভীষণ জানান, অধর্মের প্রতিবিধানের কঠিন সংকল্প তাঁকে বাধ্য করেছে গৃহত্যাগ ও স্বজনবান্ধবত্যাগের নিষ্ঠুরতা দেখাতে। কিন্তু মনের মধ্যে অশেষ দ্বিধা-দ্বন্দ্বের আনাগোনা :—

আমি যদি রাম-কাছে যাই এইক্ষণ।
করিবেক সব লোক আমার নিন্দন॥
কহিবেক রাবণের বিপদ দেখিয়া।
বিভীষণ তারে ছাড়ি গেল দুষ্ট হৈয়া॥
তাহে পুনঃ যদি মোরে রাজ্য দেন রাম।
তবে দোষ ঘুষিবেক সংসারে অনুপাম॥
বলিবে সকলে বিভীষণ রাজ্যলোভে।
বধিলেক সবান্ধবে অগ্রজে অক্ষোভে॥
অতএব এক্ষণে যাইতে নহে মন।
পরেতে করিব যে করিবে আজ্ঞাপন॥ (ঐ পৃঃ ২৭৮)

[এখানে একবার মাইকেলের Scoundrel ও বিশেষভাবে মোহিতলালের লেডি-ম্যাকবেথ-ছাপ-লাগানো বিভীষণ স্মরণ করা পরামর্শসিদ্ধ।]

কিন্তু এদিকে বিশ্ববিধানের হাল ধরেছেন স্বয়ং বিশ্বেশ্বর। তাই তিনি যুক্তি দিয়ে বুঝালেন, বিভীষণের জন্য যে কর্তব্যপথ তাঁরা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, সেটাতে আপাতদৃষ্টিতে যে কলঙ্ক-চেতনা জাগে, আসলে তা বিভীষণকে স্পর্শ করতে পারে না। কারণ তাঁর প্রকৃতির মধ্যে নেই কোনো হীনতা, নির্মমতা বা স্বার্থের বীজ। রাজ্যগ্রহণ সম্পর্কে শিবের মন্তব্য হলো,—

এ কথাও উচিৎ না হয় শুনিবার।
যেহেতু রাজ্যের আশা নাহিক তোমার॥
যদি তুমি রাজ্য পাব বলিয়া যাইতে।
বরঞ্চ তোমারে সবে পারিত নিন্দিতে॥
তিনি যদি বলে রাজা করেন তোমারে।
ইথে কেন অপযশ গাইবে সংসারে॥ (ঐ, পৃঃ ২৭৯)

কিন্তু শিবের কথায় কর্ণপাত করতে সকলে বাধ্য নয়, তাই মাইকেল-মোহিতলালের মতো সাহিত্যস্রষ্টার শক্তিশালী কণ্ঠে ঐ 'অপযশে'র রকমারি জুগুপ্সার গান গাওয়া হয়েছে।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিধনে বিভীষণের কাতরতা লক্ষ্য করে শিব বুঝিয়েছেন,—

দেখ দেখি বধ করি প্রহ্লাদ পিতারে।
নৃসিংহ প্রহ্লাদে রাজা কৈল বলাৎকারে॥
ইথে তার বিগান করয়ে কোন্ জন।
বরঞ্চ করয়ে সবে যশঃ প্রশংসন॥
তেন বধ করি দশাননে শার্ঙ্গপাণি।
রাজ্য দিবে তোমা তাহে কি দোষ না জানি॥
মিতা যে কহিলা বধিবারে দশাননে।
তাহাতেও কিছু দোষ নাহি লয় মনে॥
শাস্ত ধর্মনিষ্ঠ যাবতীয় মুনিগণ।
তাঁহারাও দুষ্ট বধে করে আয়োজন॥ (ঐ, পৃঃ ২৭৯)

ফলশ্রুতি অনেকটা অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের মতো। বৃহত্তর আদর্শের জন্য বান্ধব-নিধন যদি কর্তব্য বা অপরিহার্য বলে স্থির হয়, তবে হৃদয়-দৌর্বল্য জয় করে কর্তব্যে কঠোর হওয়াই বিধেয়।

বিভীষণের 'আত্মীয়বাৎসল্য ছিলো না' (মোহিতলাল), মিথ্যা কথা। বিভীষণকে অর্জুনের মতোই হৃদয়-দৌর্বল্য চেপে রেখে সর্বধ্বংসী যুদ্ধের আয়োজনে নিজেকে জড়িত করতে হয়েছে। বিভীষণ 'মনুষ্যত্বহীন' (মোহিতলাল), ততোঽধিক মিথ্যা কথা। যে মাইকেলের চিত্র সামনে রেখে মোহিতলালের এমন বিভীষণ-ভাষ্য রচিত হয়েছে, ঠিক তারই মধ্যে এজাতীয় বিষোদগার-যোগ্য কোনো আচরণ বা উপাদানের সন্ধান পাওয়া যায় না। এতোখানি কবির মনের মধ্যেও ছিলো কি না সন্দেহ। স্বপ্নটি তিনি দেখিয়েছেন বহুলাংশে টেক্‌নিক-চাতুরী হিসাবে। তাই এই দু'জনের বিভীষণ-ভাবনা সম্পর্কে বলতে হয়, মোহিতলালই বিষোদ্‌গারে অগ্রগামী। সূত্রের চেয়ে ভাষ্য বুঝি চিরকালই খরতর। অথবা এ সবই মাইকেল-প্রশস্তির মহিমা। নচেৎ মাইকেল মুখে (অর্থাৎ চিঠিপত্রে) 'স্কাউন্‌ড্রেল' বললেও, চিত্রে ঠিক সেই বিদ্বেষ জাগাবার চেষ্টা করেন নি। বরং পরবর্তী শোকপ্রকাশে বিভীষণের হৃদয়ের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়ে অত্যুৎসাহী ভাষ্যকারের ঐ 'আত্মীয়বাৎসল্য-হীনতা'র অভিযোগটি অমূলক প্রমাণিত করেছেন। সুতরাং বাংলায় মাইকেল-প্রশস্তির নেশা অনেক আগে থেকেই যে কী ভাবে অনর্থের কারণ হয়ে আসছে, এখানে তারই একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত মিলবে। একে, বোধহয়, মোহিতলালী অত্যাচার বললে খুব অন্যায় হবে না।

মাইকেলের মস্ত দোষ পরিকল্পনায় সৌষ্ঠব-সামঞ্জস্যের অভাব। কথায় ও কাজে, মন্তব্যে ও সৃষ্টিতে সংগতির অভাব। এ অবস্থায় তাঁর কাব্যকে বিবিধ মূল্যবান আদর্শের আধাররূপে বা কবিকে কোনো বৃহৎ বা মহৎ ধ্যান-মননাধিকারী মহাপুরুষ রূপে দেখাতে গেলে বিড়ম্বনা তো ঘটবেই। বিভীষণের উদ্দেশে কবিমুখের ঐ বিষোদ্গার, তৎসহ মোহিতলাল প্রমুখ শক্তিশালী ভাষ্য-কারের ঐ মর্মে নানাবিধ মস্তিষ্কচালনার ফলে বাংলার চিন্তারাজ্যে বিভীষণ-চরিত্রটির জন্য যে কুৎসিত স্থান নির্দিষ্ট হতে দেখা যায়, রামায়ণের বিভীষণ তার থেকে নিতান্ত বিভিন্ন তো বটেই, মাইকেলেরই কাব্য-ধৃত মনন-ভাবনাতেও অতোখানি কুৎসিৎ বিভীষণকে পাওয়া যায় না। কবি নিজেই যে চরিত্রটির উপর ঐ কলঙ্কারোপের বিরোধিতা করেছেন তাঁর চিত্রাঙ্গদার মুখের প্রচণ্ড সত্যভাষণে, সেটা তাঁর খেয়াল নেই। সুতরাং যে-কবি অসংগতির জালে নিজেই আবদ্ধ, তাঁর চিত্র বা চরিত্র নিয়ে কোনো বড়ো 'থিওরি' রচনা করা চলে না।

বিভীষণের মতো জটিল চরিত্রে কলঙ্কের প্রশ্নই উঠতে পারে না, তা নয়। কলঙ্কের একটা খসড়া বাল্মীকিতেও আছে, আছে কৃত্তিবাসেও। কিন্তু তার উত্তরে বিভীষণের মুখের কথাও যেমন জোরালো, সমগ্র বিভীষণ-ভূমিকাও তেমনি সেখানে বিচিত্র মহিমায় মণ্ডিত, সুতরাং গভীর অনুধাবনযোগ্য। কৃত্তিবাসী বিভীষণের কিছু পরিচয় দেওয়া হয়েছে, এখন বাল্মীকি-চিত্রে একবার নজর দেওয়া যেতে পারে।

[৫] বাল্মীকির বিভীষণ : মাইকেলের হাতে বিভীষণ ও লক্ষ্মণের বিকৃতির ইঙ্গিত : রামায়ণ-ব্যাখ্যাতার নূতন দায়িত্ব।

বাল্মীকি-রামায়ণে জ্ঞাতিত্ব-ভ্রাতৃত্ব, স্বজন-পরজন সংক্রান্ত মেঘনাদের অভিযোগ-ভাষণ (যার অংশবিশেষ মাইকেল হুবহু তুলে দিয়েছেন মেঘনাদের মুখে, এবং তার পরেই তিরস্কৃত পিতৃব্যের মুখ চেপে ধরেছেন) যেই শেষ হলো, অমনি—

ইত্যুক্তো ভ্রাতৃপুত্রেণ প্রত্যুবাচ বিভীষণঃ।
অজানন্নিব মচ্ছীলং কিং রাক্ষস বিকথ্যসে॥

প্রত্যুত্তরের ভূমিকা ও তার বাঁধুনি লক্ষণীয়। এবং ব্যক্তিত্বের কী শক্ত ভিত্তিতে, কী দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ে, ধর্মাধর্ম-ন্যায়ান্যায়-বোধের প্রজ্ঞাধর্মী ঔৎকর্ষ্য-বিচারে কী অধিকার নিয়ে বিভীষণ গুরুজন-সুলভ বিশ্লেষণ-যোগে মেঘনাদের দাম্ভিক তিরস্কারের স্পর্ধার সমুচিত জবাব দিয়েছেন, তাও লক্ষণীয় :—

রাক্ষসেন্দ্র সুতাসাধো পারুষ্যং ত্যজ গৌরবাৎ।
কুলে যদ্যপ্যহং জাতো রক্ষসাং ক্রূরকর্মণাম্॥
গুণো যঃ প্রথমো নৃণাং তন্মে শীলমরাক্ষসম্।
ন রমে দারুণেনাহং ন চাধর্মেণ বৈ রমে।
ভ্রাতা বিষমশীলোঽপি কথং ভ্রাতা নিরস্যতে॥
ধর্মাৎপ্রচ্যুতশীলং হি পুরুষং পাপনিশ্চয়ং।
ত্যক্ত্বা সুখমবাপ্নোতি হস্তাদাশীবিষং যথা॥
পরস্বহরণে যুক্তং পরদারাভিমর্শকম্।
ত্যাজ্যমাহুর্দুরাত্মানং বেশ্ম প্রজ্বলিতং যথা॥

পরস্বানাং চ হরণং পরদারাভিমর্শনম্‌।
সুহৃদামতিশঙ্কা চ ত্রয়ো দোষাঃ ক্ষয়াবহাঃ॥
মহর্ষীণাং বধো ঘোরঃ সর্বদেবৈশ্চ বিগ্রহঃ।
অভিমানশ্চ রোষশ্চ বৈরত্বং প্রতিকূলতা॥
এতে দোষা মম ভ্রাতুর্জীবিতৈশ্বর্যনাশনাঃ।
গুণান্‌ প্রচ্ছাদয়ামাসুঃ পর্বতানিব তোয়দাঃ॥
দোষৈরেতৈঃ পরিত্যক্তো ময়া ভ্রাতা পিতা তব।
নেয়মস্তি পুরী লঙ্কা ন চ ত্বং ন চ তে পিতা॥
অতিমানশ্চ বালশ্চ দুর্বিনীতশ্চ রাক্ষস।
বদ্ধস্ত্বং কালপাশেন ব্রুহি মাং যদ্‌যদিচ্ছসি॥

(যুদ্ধ—৮৭।১৮-২৭)

এখানে লক্ষ্য ক'রবার বিষয়, মাইকেলের বিভীষণের মতো বাল্মীকির বিভীষণ চোরের মতো প্রবেশ করায় এবং ভ্রাতৃপুত্রের ন্যায্য কথার যথোচিত উত্তর দিতে না পারায় 'মলিন বদন লাজে' এক দুর্বল চরিত্র নয়; এ বিভীষণ ব্যক্তিত্ববান, আত্মসচেতন পুরুষ; পিতৃব্যের গুরুজনোচিত প্রাপ্য সম্মান বা গৌরব স্পর্ধায় উপেক্ষিত হওয়ার অপরাধে রুষ্ট, স্বভাবতই ভর্ৎসনাপ্রবণ। রাক্ষস-পক্ষ পরিত্যাগের বিস্তারিত যুক্তিপ্রদর্শনে বিভীষণ এখানে বিশেষভাবে প্রয়াসী; তা ছাড়া, ধর্মাত্মা মহাজ্ঞানী পিতৃব্যকে নীতিশিক্ষা দিতে যাওয়ার ধৃষ্টতা, পরুষ-বাক্যে অপমানিত করার ঔদ্ধত্য প্রভৃতি মেঘনাদের দোষগুলিও এখানে রেহাই পায় নি। প্রথমেই, তাই, বিভীষণের কটাক্ষ, 'অজানন্নিব মচ্ছীলং কিং রাক্ষস বিকথ্যসে?'—ইন্দ্রজিৎ কি জানে না, পিতৃব্য তার কী প্রকৃতির অধিকারী? সে কি জানে না যে, ক্রূরকর্মা রাক্ষস-বংশে জন্মিয়েও বিভীষণ স্বভাবত সত্ত্বগুণান্বিত পুরুষ? তার কি উচিত ছিলো না—পিতৃব্যের এই বৈশিষ্ট্য ও গুরুজনপ্রাপ্য গৌরব সম্পর্কে সচেতন থেকে পারুষ্য বর্জন করা? তা যখন সে করে নি, তখন সে রাক্ষসেন্দ্রসুত হতে পারে, কিন্তু অসাধু, সে অতি-গর্বিত। বালক হয়েও দুর্বিনীত। নিশ্চিত মৃত্যুর কবলে পড়েছে, তাই সে পিতৃব্যকে যা ইচ্ছা তাই বলে যেতে পারে। বিভীষণ সংক্ষেপে অথচ অকাট্য যুক্তিতে বুঝিয়ে দিতে ছাড়েন নি, কেন তাঁর কাছে সহোদর ভ্রাতা হয়েছে পরিত্যাজ্য 'হস্তাদাশীবিষং যথা', অথবা 'বেশ্ম প্রজ্বলিতং যথা'। চোখের উপর তুলে ধরেছেন বিভিন্ন গুচ্ছে রাবণের দোষাবলী,—কখনও 'ত্রয়ো দোষা ক্ষয়াবহাঃ', কখনও 'এতে দোষা মম

ভ্রাতুর্জীবিতৈশ্বর্যনাশনাঃ' এই ভঙ্গিতে। ফলে ভ্রাতুষ্পুত্রের অভিযোগের সমুচিত উত্তর তো দেওয়া হলোই, অধিকন্তু সেই দুর্বিনীত বালকের পক্ষে গুরুজনকে যথেচ্ছ দুর্বাক্য বলার অপরাধটি প্রবল হয়ে উঠলো। 'আর, পিতৃব্যকে পরুষ বাক্য বলার ফলেই লাভ হলো এই যে, বিভীষণ বলবার সুযোগ পেলেন, ঐ কারণেই ইন্দ্রজিৎ আজ ব্যসনপ্রাপ্ত হতে বাধ্য—'অস্তেহ ব্যসনং প্রাপ্তং যস্মাং পরুষমুক্তবান'।

মাইকেল তাঁর মেঘনাদের অগ্ন্যুদ্গারী অভিযোগের উত্তরে বিভীষণের মুখে যে ক'টি কথা বসিয়েছেন, তা নিতান্তই ঐ চরিত্রকে মসীলিপ্ত করে দেওয়ার জন্যই পরিকল্পিত। একটিবার মাত্র—"নিজকর্মদোষে, হায়, মজাইলা এ কনকলঙ্কা, রাজা, মজিলা আপনি"—এই আসল কথাটি ছাড়া,—"রাঘবদাস আমি, কি প্রকারে তাঁহার বিপক্ষকাজ করিব, রক্ষিতে অনুরোধ", "রাঘবের পদাশ্রয়ে রক্ষার্থে আশ্রয়ী তেঁই আমি। পরদোষে কে চাহে মজিতে?"—ইত্যাদি হীনতা-সংকীর্ণতাব্যঞ্জক উক্তিতেই বিভীষণের ভূমিকার স্বরূপ বোঝাতে চেয়েছেন। রামায়ণে এই বিভীষণের নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে ঠিক মেঘনাদের মুখোমুখি ছাড়াও আরো যে বিচিত্র পরিচয় আছে, এখানে তার কোনো ইঙ্গিতই পাঠককে দেওয়া হলো না। কিন্তু সন্ধানী পাঠকের কাছে ধরা পড়বে, মাইকেল বিভীষণ চরিত্রটিকে যতো সহজ করে নিয়েছেন, আসলে সেটি অত সহজ নয়। আংশিক বিচারে তার এক রূপ, সামগ্রিক বিচারে আর এক রূপ, এবং সে রূপটি জটিল ব্যঞ্জনা-মহিমায় মণ্ডিত।

মূল রামায়ণের গ্রহণ-বর্জনে চরম খেয়ালের বশবর্তী হওয়ায় মাইকেলের হাতে চরিত্র ও চিত্রের কতো যে বিকৃতি ঘটেছে তার আর ইয়ত্তা নেই। বাল্মীকির অনুসরণে লক্ষ্মণ কর্তৃক ইন্দ্রজিতকে রণে আহ্বানের ঘটা আছে মাইকেলে, কিন্তু নিজস্ব খেয়ালী কল্পনায় বধ-চিত্রখানি ও তার আঙ্গিক রচনা করতে গিয়ে মাইকেল উদ্ভট অসঙ্গতি আমদানি করে বসে আছেন:—

'দেহ রণ মোরে অবিলম্বে'—

অথবা

'দেবাদেশে রণে আমি আহ্বানি রে তোরে'—

এই আহ্বানের মধ্যে পাওয়া গেল বাল্মীকির অনুবাদ—

তমুবাচ মহাতেজাঃ পৌলস্ত্যমপরাজিতম্।
সমাহ্বয়ে ত্বাং সমরে সম্যগ্‌যুদ্ধং প্রযচ্ছ মে॥ (যুদ্ধ—৮৭।৯)

কিন্তু বাল্মীকিতে বা কৃত্তিবাসে রীতিমত সম্মুখযুদ্ধের যে বিশাল বৃত্তান্ত আছে, মাইকেল তা লোপাট করে দিয়ে—"তস্কর যেমতি পশিলি"—ইত্যাদি আস্ফালনের সুযোগ নিয়েছেন, আর, "মারি অরি পারি যে কৌশলে" এই বুলি লক্ষ্মণের মুখে বসিয়ে পূর্বোক্ত রণে আহ্বান জিনিষটাকে নিরর্থক করে নিজেরই শৈথিল্য দেখিয়েছেন। চোরের মতো আচরণের জন্য যে তিরস্কারের ভঙ্গী, সেটি হুবহু নিয়েছেন মহর্ষির রচনা থেকে, কিন্তু সেটিকে কাজে লাগানো হয়েছে যেভাবে, তাকে বলতে হয় inversion বা twisting বা 'উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে'-র মতো ব্যাপার :—

অন্তর্ধানগতে নাজৌ যত্ত্বয়া চরিতস্তদা।

তস্করাচরিতো মার্গো নৈষ বীরনিষেবিতঃ।

(যুদ্ধ ৮৮।১৫)

লক্ষ্মণ বলতে চেয়েছেন, ইন্দ্রজিতের আচরণ তস্করসদৃশ, বীরাচারসম্মত নয়। আর, ঠিক এই কথাটিই চালিয়ে দেওয়া হয়েছে ইন্দ্রজিতের মুখে লক্ষ্মণকে উদ্ভট খেয়ালে চোর সাজিয়ে। আর, ঐ একই খেয়ালে ইন্দ্রজিতকে নিরস্ত্র করে, লক্ষ্মণের বিরুদ্ধে আনা হয়েছে রথিকুলপ্রথা বা বীরাচার লঙ্ঘনের মারাত্মক অভিযোগ। কবি-প্রদর্শিত ঘটনা-সংস্থানের এই কায়দাটিতে রামায়ণ-বৃত্তান্তের যে ভয়ংকর বিকৃতি ঘটলো, যে এক বিরাট মিথ্যা নবযুগের কাব্যাধারে প্রতিষ্ঠা পেলো, তার কি কোনো প্রয়োজন ছিলো ? এ তো খালি লক্ষ্মণ-চরিত্রের অবমাননা নয়, আদি-কবির মহান সৃষ্টির কাঠামোকে তছনচ ক'রে জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য রামায়ণের পরিকল্পনা-মহিমার প্রতি আস্থায় ভাঙন ধরানো।

ইন্দ্রজিৎ-চরিত্রের মহত্ত্বের জন্য এতো ঘটনা-বিকৃতির বা সংশ্লিষ্ট অপরাপর চরিত্রের উপর এতো কলঙ্কারোপের কোনোই প্রয়োজন ছিলো না। মোহিত লাল জোর করে চালাতে চেয়েছেন—মেঘনাদবধে মেঘনাদের মহিমা-জ্ঞাপনের জন্য লক্ষ্মণ-চরিত্রে কলঙ্কারোপের প্রয়োজন ছিলো। এমন আজগুবি সিদ্ধান্ত শুধু অন্ধস্তাবকতারই পরিচয় দেয়। মেঘনাদ চরিত্র আর্যরামায়ণে বা কৃত্তিবাসী রামায়ণেই যথেষ্ট মহৎ, যথেষ্ট উজ্জ্বল। বস্তুত মাইকেল যে তাকে উজ্জ্বলতর করতে পেরেছেন, একথা স্বীকার্য নয়। তাঁর মেঘনাদ-চরিত্রের সেরা অংশ যেটি সেটি, আগেই দেখানো হয়েছে, মহর্ষির আলেখ্য থেকেই হুবহু ছাপ-তোলা কৃত্তিবাসের কাব্যেও সরল ভাষায় আছে তার ছাঁচ। বাদবাকী যে বাগ্‌বিস্তা

বা নূতন ছন্দের নূতন ভাষায় মণ্ডন-কলাবিস্তার, তার কাব্যগত আকর্ষণ চমৎকার, কিন্তু ঐ কলাবিন্যাসের অবসর-রচনার জন্য কবি যে উদ্ভট খসড়া তৈরী করেছেন, তার কোনো মহত্ব তো নেইই, বরং সেখানে কবির খেয়ালের অত্যাচারের প্রশ্নটি উপেক্ষণীয় হতে পারে না।

চিত্র ও চরিত্র রচনায় যে অসঙ্গতি-অসামঞ্জস্য মেঘনাদবধ কাব্যের একটা মস্ত ত্রুটি, লক্ষ্মণের মতো বিভীষণেও তার পরিচয় যথেষ্ট লক্ষিত হয়। মাইকেল তাঁর বিভীষণকে প্রথম দিকে জড়ের মতো অঙ্কিত করে, পরে বধান্তে তাকে দিয়ে এক নাতিহ্রস্ব বিলাপ করিয়েছেন যাত্রার প্যাটার্নে। মহর্ষির বিভীষণ এর চেয়ে অনেক বেশি স্বাভাবিক ও জীবন্ত। ইন্দ্রজিৎ-বধের সমস্ত আয়োজন যখন সম্পূর্ণ, যুদ্ধকাণ্ডের যুদ্ধ যখন তুমুল চলেছে, তখন বিভীষণের পিতৃব্য-সত্তার স্নেহসিক্ত জাগরণের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় ফুটেছে আর্যরামায়ণে, তার আবেদন মাইকেলের ঐ বাগ্‌বিন্যাসভরা বিলাপের চেয়ে অনেক গভীর অর্থবহ, অনেক বেশি মর্মস্পর্শী।

> অযুক্তং নিধনং কর্তুং পুত্রস্য জনিতুর্মম।
> ঘৃণামপাস্য রামার্থে নিহন্তাং ভ্রাতুরাত্মজম্‌॥
> হন্তুকামস্য মে বাষ্পং চক্ষুশ্চৈব নিরুধ্যতি।
> তমেবৈষ মহাবাহুর্লক্ষ্মণঃ শময়িষ্যতি॥ (৮৯।১৭-১৮)

> 'আমি পিতা, পিতা হয়ে পুত্রের হত্যাসাধন একান্তই অনুচিত। ভ্রাতুষ্পুত্র ইন্দ্রজিৎ আমার পুত্রতুল্য। অথচ রামের জন্য দয়া, দুর্বলতা ত্যাগ করে তাকে বধ করতে হবে। (আমার অবস্থা কাকে বোঝাই?) আমি তার হত্যা কামনা করি, কিন্তু অশ্রুজলে আমার দৃষ্টি নিরুদ্ধ হচ্ছে। তাই মহাবাহু লক্ষ্মণই তাকে বধ করবেন।'

এই যে একটা নিগূঢ় অন্তর্দ্বন্দ্বের ইংগিত, একদিকে বাৎসল্যের গভীর আবেদন, অপরদিকে কর্তব্যবোধে চরম কঠোরতা, দুই পরস্পর-বিরোধী গভীর আবেগের সংঘর্ষে মথিত, পুত্রতুল্য ভ্রাতুষ্পুত্রের নিহন্তা হওয়ার শোকাকুলতায় বাষ্পাচ্ছন্নচক্ষু এই যে বিভীষণ, এর পাশে মাইকেলের

> সুপট্ট-শয়নশায়ী তুমি, ভীমবাহু,
> সদা, কি বিরাগে এবে পড়ি হে ভূতলে?

ইত্যাদি বাকসজ্জাবহুল শোকাড়ম্বরে প্রমত্ত বিভীষণ কতোই না কৃত্রিম, আড়ষ্টমূর্তি!

লক্ষ্মণ-চরিত্রের চরম বিকৃতি ঘটিয়ে মাইকেল যেমন ধৃষ্টতার পরিচয় দিয়েছেন, তেমনি বিভীষণ-চরিত্রটিকে গাঢ় মসীলিপ্ত করে এবং নিতান্তই অনার্য ভাবণ ভঙ্গিতে বিভীষণের গায়ে 'Scoundrel'ছাপ মেরে দিয়ে আর একদফা অপরাধে অপরাধী হয়েছেন। জগতের মাত্র চারখানি মহাকাব্যের (Epic) অন্যতম, ভারতের চিরগর্ব, ভারতবাসীর জীবনবেদস্বরূপ রামায়ণের উপর এমন খেয়ালী হস্তাবলেপ ঘটিয়ে মাইকেল জাতির বা যুগের কী মহোপকার করেছেন জানি না, তবে তিনি রামায়ণের ব্যাখ্যাকার বা ভাষ্যকারদের একটা কাজ বাড়িয়েছেন যে, মাইকেলী অত্যাচারের হাত থেকে রামায়ণকে বাঁচাবার নূতন দায়িত্ব তাঁদের বহন করতে হবে। এদেশের সনাতন নির্বাচনে যে সাতজনকে চিরজীবীর অর্থাৎ অমরত্বের স্বর্ণপীঠে বসানো হয়েছে, তার মধ্যে মহর্ষি বাল্মীকির মহৎ সৃষ্টি বিভীষণের নামটা যাতে মাইকেলী বিচারে, এবং মোহিতলালী ভাষ্যের চটকে খারিজ হয়ে না যায়, তার জন্যে অনেক আয়াস স্বীকার করতে হবে। "অশ্বত্থামা বলির্ব্যাসো" শ্লোকটির সশ্রদ্ধ আবৃত্তি যুগ যুগ ধরে চলে এসে এখন যদি মাইকেলের ইঙ্গিতে আবর্জনা বলে পরিত্যজ্য হয়, তবে সে বড়ো দুঃখের কথা।

নবম অধ্যায়

বাংলায় রামায়ণ বিপক্ষ

[১] প্রস্তাবনা

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে যে নানা প্রসঙ্গের অবতারণা হয়েছে, তাদেরই কতিপয়ের ভিত্তিতে বিশেষভাবে এই প্রস্তাবটি রূপায়িত হতে চায়। রামায়ণ ভারতের মহাকাব্য। এ সেই জাতীয় কাব্য, যা 'বৃহৎ বনস্পতির মত দেশের ভূতল-জঠর হইতে উদ্ভূত হইয়া সেই দেশকেই আশ্রয়চ্ছায়া দান করিয়াছে। **আধুনিক কোনো কাব্যের মধ্যেই এমন ব্যাপকতা দেখা যায় না। মিলটনের প্যারাডাইস্ লষ্টের ভাষায় গাম্ভীর্য, ছন্দের মাহাত্ম্য, রসের গভীরতা যতই থাক না কেন তথাপি তাহা দেশের ধন নহে,—তাহা লাইব্রেরীর আদরের সামগ্রী। **রামায়ণ মহাভারত ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহাস। **ভারতবর্ষের যাহা সাধনা, যাহা আরাধনা, যাহা সঙ্কল্প তাহারই ইতিহাস এই দুই বিপুল কাব্যহর্ম্যের মধ্যে চিরকালের সিংহাসনে বিরাজমান। *দেবতার অবতারলীলা লইয়াই যে এ কাব্য রচিত তাহা নহে। **রামায়ণে দেবতা নিজেকে খর্ব করিয়া মানুষ করেন নাই, মানুষই নিজগুণে দেবতা হইয়া উঠিয়াছেন। **রামায়ণের প্রধান বিশেষত্ব এই যে তাহা ঘরের কথাকেই অত্যন্ত বৃহৎ করিয়া দেখাইয়াছে। **রামায়ণের মহিমা রামরাবণের যুদ্ধকে আশ্রয় করিয়া নাই—সে যুদ্ধঘটনা রাম ও সীতার দাম্পত্য-প্রীতিকেই উজ্জ্বল করিয়া দেখাইবার উপলক্ষ্য মাত্র। পিতার প্রতি পুত্রের বশ্যতা, ভ্রাতার জন্য ভ্রাতার আত্মত্যাগ, পতি-পত্নীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি নিষ্ঠা ও প্রজার প্রতি রাজার কর্তব্য কতদূর পর্যন্ত যাইতে পারে রামায়ণ তাহাই দেখাইয়াছে। এইরূপ ব্যক্তিবিশেষের প্রধানত ঘরের সম্পর্কগুলি কোনো দেশের মহাকাব্যে এমনভাবে বর্ণনীয় বিষয় বলিয়া গণ্য হয় নাই। **বাহুবল নহে, জিগীষা নহে, রাষ্ট্রগৌরব নহে, শান্তরসাস্পদ গৃহধর্মকেই রামায়ণ করুণার অশ্রুজলে অভিষিক্ত করিয়া তাহাকে সুমহৎ বীর্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। রামায়ণ সেই গৃহাশ্রমের কাব্য। গৃহাশ্রম-ধর্মকেই রামায়ণ বিসদৃশ অবস্থার মধ্যে ফেলিয়া বনবাসদুঃখের মধ্যে বিশেষ গৌরব দান করিয়াছে। এই রামায়ণ-কথা হইতে ভারতবর্ষের

আবালবৃদ্ধবনিতা আপামরসাধারণ কেবল যে শিক্ষা পাইয়াছে তাহা নহে,—আনন্দ পাইয়াছে, কেবল যে ইহাকে শিরোধার্য করিয়াছে তাহা নহে—ইহাকে হৃদয়ের মধ্যে রাখিয়াছে, ইহা যে কেবল ধর্মশাস্ত্র তাহা নহে—ইহা আমাদের কাব্য। **রামায়ণে ভারতবর্ষ যাহা চায় তাহা পাইয়াছে। **বাল্মীকির রামচরিত-কথাকে পাঠকগণ কেবলমাত্র কবির কাব্য বলিয়া দেখিবেন না, তাহাকে ভারতবর্ষের রামায়ণ বলিয়া জানিবেন। তাহা হইলে রামায়ণের দ্বারা ভারতবর্ষকে ও ভারতবর্ষের দ্বারা রামায়ণকে যথার্থভাবে বুঝিতে পারিবেন।" (রবীন্দ্রনাথ—প্রাচীন সাহিত্য—'রামায়ণ')

এই 'ভারতবর্ষের রামায়ণ'কে—'ভারতের মহাকাব্য'কে—মাইকেলের 'মেঘনাদবধ' ভুলিয়ে দিতে চায়। কবি নিজে যে তাই চেয়েছিলেন, তা বক্তব্য নয়। তিনি চেয়েছিলেন বাংলায় নূতন কাব্য সৃষ্টি করতে,—নূতন রামায়ণ লিখতে নয়, মেঘনাদবধকে রামায়ণের স্থলাভিষিক্ত করতে নয়। নূতন ছন্দে, নূতন ভাষায় তিনি চেয়েছিলেন—'গাঁথিব নূতন মালা', চেয়েছিলেন—'গাইব মা বীররসে ভাসি মহাগীত', চেয়েছিলেন—'to engraft the exquisite graces of the Greek mythology on our own', 'to write, rather try to write, as a Greek would have done', 'to write a few epiclings and thus acquire a pucca fist' যা দিয়ে তিনি মনের মতো করে বীররসের মহাকাব্য লিখবেন—যদিও সে আর লেখাই হয় নি। এইসব চাওয়ার সম্মিলিত ফল মেঘনাদবধ কাব্য। এটি একখানা 'regular Iliad' হলেই তিনি যেন পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করতেন, কিন্তু তা হয় নি বলে যেন একটু আক্ষেপের সুর শোনা যায় তাঁর মন্তব্যে। তবে কবির তৃপ্তি এইখানে যে ছান্দসিক বিধি-বিধানের দিক দিয়ে তাঁর কাব্যকে নির্দোষ বলে জাহির করতে পেরেছেন—'I think I have constructed the Poem on the most rigid principles and even a French critic would not find fault with me'.

সুতরাং কবির লক্ষ্য যে মূলত ভাষায় ছন্দে ও বৈদেশিক (গ্রীক) ছাঁচের প্রয়োগে এক 'নূতন' সৃষ্টির (the Poem) দিকে, এটা অত্যন্ত স্পষ্ট। কিন্তু তাঁর স্বভাবসুলভ খেয়ালীপনার প্রচণ্ডতায় জীবনে যেমন ঘটিয়েছেন চারিদিকে মহা অনর্থ, কাব্যের এই সব চেয়ে বড়ো আসরটাতেও তেমনি অনর্থ ঘটে গেছে নানাবিধ। আতিশয্যের ঠেলায় যে ট্রাজেডি ঘটে, সেই ট্রাজেডি মাইকেলের

জীবনে এবং এই মেঘনাদবধ কাব্যে। নূতন-এর নেশায় আগুন এইখানে এসে 'মটকা ধরেছে'। "My motto is 'Fire away,"—এই সৃষ্টির আগুনের উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণের অভাবে অপসৃষ্টির অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। Greek writer সাজতে গিয়ে মধুসূদন না পেরেছেন খাঁটি গ্রীক হতে, না পেরেছেন খাঁটি ভারতীয়তায় ভেজাল দেওয়ার অপরাধ এড়াতে। কতোই না মহার্ঘতায় মণ্ডিত এক কাব্য তাঁর হাতে রচিত হয়েছে, এবং হয়েছে বাংলা ভাষা ও বাংলা কাব্য-সাহিত্যের এমন এক মুহূর্তে, যখন প্রাচীন যুগের অবসানে নূতনের আসর দখলের ঘণ্টা বেজে গেলেও কোনো মহনীয় নূতনের মহিমা নিয়ে বিরাট প্রতিভার সাড়া পাওয়া যায় নি। সেই প্রতিভা ও সেই শক্তির পরিচয় দিয়ে মেঘনাদবধ আসরে এসে দাঁড়াতেই আমরা তাকে দু'হাত মেলে স্বাগত জানিয়েছি। ছন্দে, ভাষায়, ভঙ্গিমায়, শক্তির জোয়ার এসে লাগলো বাংলা কাব্যে। আনুষঙ্গিকভাবে যুক্ত হলো কবির অন্যান্য সৃষ্টির ছাঁচ ও আঙ্গিকের বরণীয় অভিনবত্ব। তাই মাইকেলের মেঘনাদবধকে সকলের হয়ে অভিনন্দিত করেন স্বামী বিবেকানন্দ 'বাংলা ভাষার মুকুটমণি' বলে।

তখনো সূক্ষ্ম বিচারের সময় আসে নি। তখন খালি চলেছে নূতনের বরণ। যারা পিছিয়ে থেকেছে প্রগতিবিরোধী মন নিয়ে, তাদের সম্যক জাগানোর পালা চলেছে। বলা বাহুল্য, এ সবই কাব্যের ঢঙ নিয়ে—ঐ blank verse ও তার ভাষা নিয়ে, নূতন সংগীতের আবৃত্তি নিয়ে। বিষয়ের মধ্যে দৃষ্টি দেওয়ার ব্যাপক সাড়া তখনও জাগে নি। কেবল উপরতলার কতিপয় ব্যক্তি তা নিয়ে যৎকিঞ্চিৎ চিন্তা করেছেন।

তখনো বাংলা ছিলো ভারতের অন্যান্য অংশের মতো রামায়ণ-মহাভারতের দেশ। এখানকার সমাজ-জীবনে ছিলো অন্যান্য প্রদেশের মতোই রামায়ণের অনুধ্যান। সুতরাং মেঘনাদবধ ছিলো প্যারাডাইস লষ্টের মতোই 'লাইব্রেরীর আদরের সামগ্রী'। কালক্রমে অনুরাগ-বিরাগের আবর্তে দেখা দিচ্ছে এমন একটা পরিস্থিতি, যাতে মেঘনাদবধের পসার বেড়ে চলেছে সীমাহীন, কবিরও আশা-কল্পনাকে বহুদূর অতিক্রম ক'রে—বুঝি বা তাঁর নিজেরই অবাঞ্ছিতরূপে। শিক্ষার বিস্তার এনেছে পাঠ্যপুস্তকের প্রতি অনুরাগ, জীবনদৃষ্টির পরিবর্তনে ও গার্হস্থ্যজীবনের ছাঁচের আধুনিকতায় স্বভাবতই এসেছে পুরাণ-ধর্মগ্রন্থাদির প্রতি বিরাগ। পাঠ্যপুস্তক হিসাবে মেঘনাদবধ ও তার কবি মাইকেল মধুসূদনের খবর রাখতে হচ্ছে অনেককেই, পক্ষান্তরে রামায়ণ-চর্চার বহর দ্রুত

ক্ষীয়মাণ। মাইকেল-চর্চার আরো বিস্তার ঘটুক, মেঘনাদবধ ঘরে ঘরে পঠিত হোক, সেইটাই তো জ্ঞানবিস্তারের লক্ষণ; কিন্তু তার ফলে যদি রামায়ণ অবহেলিত উপেক্ষিত হয়, অথবা মেঘনাদবধই হয় রামায়ণের স্থলাভিষিক্ত, তবে উল্লসিত হওয়া চলে না। বর্তমান বাংলার সমাজে নেই আর সেই ঘরে ঘরে কৃত্তিবাসী রামায়ণের আবৃত্তি, নেই রামায়ণের গল্প শুনিয়ে শিশু-মনোরঞ্জনের অভ্যাস। সুতরাং মূল রামায়ণের যে একটা basic knowledge আগে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অতি সহজেই এদেশের ছেলে-মেয়েদের আয়ত্ত হয়ে যেতো, এখন আর তা হয় না। শুধু তাই নয়, এখন বোধহয় সন্ধান করলে দেখা যাবে, অনেক প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষিত লোকেরও বাল্মীকি বা কৃত্তিবাসী রামায়ণের মূল কাহিনী ও তার আবেদন সম্পর্কে কোনো সঠিক ধারণা নেই। অথচ নিজের পঠদ্দশায় কিম্বা অপরের আলোচনা-সূত্রে মেঘনাদবধ-কাব্যের কথা কিছু না কিছু সংগৃহীত হয়ে থাকে। এর উপর আছে এই কাব্যের প্রশস্তি-রচনায়, নব নব মাহাত্ম্যের আরোপে ভাষ্যকারদের ক্রমবর্ধমান উৎসাহ। ফলে এরই মধ্যে রামায়ণের যতটুকু স্থান পেয়েছে, সেইটাই হয়েছে বাংলার শিক্ষার্থিমহলের একটা মোটা অংশের রামায়ণ-জ্ঞানের পুঁজি।

মাইকেল কিন্তু এতোটা চান নি। তিনি চেয়েছিলেন সকলেই রামায়ণ ভালোবাসুক। 'I love the grand mythylogy of our ancestors' —এরই মধ্যে অনুসন্ধেয় কবির ইংগিত। আর চেয়েছিলেন, রামায়ণ পড়ুক, সম্ভব হলে, ইলিয়াডও পড়ুক, তার পর দেখুক আমার সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য, আমার মাতৃভাষা-সেবার কৃতিত্ব। কিন্তু কবির এই honest intention, যাকে, বোধহয়, innocent এবং noble বলাও চলে, কার্যত আজ বিকৃত, এবং অনর্থের হেতু বলে গণ্য হতে পারে। কারণ, অতিরিক্ত ফলাও-করা বিচিত্র প্রশস্তির আরোপে মেঘনাদবধের স্বরূপ-মহিমাকে বর্তমানে এতোই ফাঁপিয়ে তোলা হয়েছে এবং হচ্ছে, যে বাংলায়, বিশেষত বাঙালী শিক্ষার্থীর কাছে, আর্য-রামায়ণের প্রতি অবজ্ঞার মনোভাব গড়ে উঠছে সহজেই। তার ফলে রামায়ণের আসল চেহারাটার নির্ভুল পরিচয় নেওয়ার স্পৃহা থাকছে না সাধারণ পাঠকের,—বিদগ্ধ সমাজের কথা স্বতন্ত্র। বরং অনেকেরই মনে হতে পারে, মাইকেলের হাতে যা পাওয়া গেছে, এইটাই রামায়ণের মার্জিত উন্নত যুগোপযোগী সংস্করণ, অতএব পুরাতন পচা মালের খবর নেওয়ার দরকার নেই।

[২] মেঘনাদবধে রামায়ণের বিকৃতি : রাম-লক্ষ্মণ বিপন্ন

এখন, যদি এমন হতো, সত্যই মাইকেল নিয়েছেন সেই 'ভারতের মহাকাব্য রামায়ণে'র কাহিনী-সার বা ভাব-সার নূতন ভাষায় নূতন ছন্দে নূতন শক্তিতে পরিবেশনের ভার, তবে মেঘনাদবধ হাতে পেয়ে রামায়ণ ভুলে থাকায় তেমন আপত্তির কিছু থাকতো না। কিন্তু regular Iliad-এর নেশা-ধরা কবি-কল্পনায় এবং বাল্মীকিকে যথাসম্ভব এড়িয়ে সৃষ্টির স্বাতন্ত্র্য ঘোষণার ('to borrow as little as I can from Valmiki') দুর্দান্ত খেয়ালের ফলে মেঘনাদবধ কাব্যে স্থান পেয়েছে রামায়ণের যে মারাত্মক বিকৃতি, তাতে তো রামায়ণ আর রামায়ণ থাকছে না। মেঘনাদ-'বধ' মূল ঘটনাটি রামায়ণে আদৌ এইভাবে ঘটে নি; মর্মান্তিক বিকৃতির বশবর্তী করা হয়েছে গোটা পরিবেশকে; রামায়ণের লক্ষ্মণকে এখানে খুঁজেই পাওয়া যায় না; মেঘনাদ-বধের কবি বাল্মীকিকে এড়িয়ে নূতন কিছু করার সীমাহীন মত্ততায় বাল্মীকির আদর্শ-চরিত্র লক্ষ্মণকে করেছেন নরাধম, কাপুরুষ, 'তস্কর'-বৃত্তিধারী, 'নির্লজ্জ', 'পামর', 'বর্বর'! করেছেন মিথ্যার ভিত্তিতে, স্বকপোল-কল্পিত উদ্ভট পরিকল্পনায়। রামায়ণে অকথিত হিন্দু-পুরাণে অবিদিত মায়াদেবী আমদানী করে মাইকেল দৌরাত্ম্য চালিয়েছেন বাল্মীকি-রামায়ণের রাজ্যে। এই দেবীটির প্রাদুর্ভাবে লক্ষ্মণের বীরত্বকে হাস্যকর প্রহসনে পরিণত করেছেন। অপরপক্ষ লক্ষ্মণকে অতিথিরূপে বরণ করে 'আতিথেয় সেবা' নিবেদন করতে চাইলো, কিন্তু মাইকেলের লক্ষ্মণ আতিথ্য বোঝে না! শত্রুকেও অতিথি জ্ঞানে সেবা করার আদর্শ তুলে ধরা হলো, কিন্তু মাইকেলের লক্ষ্মণ ঐ ঔদার্য বোঝে না! নিরস্ত্র অরিকে আঘাত করতে নেই, এই ক্ষত্রবীর-প্রথা স্মরণ করিয়ে দিলেও মাইকেলের লক্ষ্মণের কাছে কোনো সাড়া পাওয়ার উপায় নেই! সে ঐ আতিথ্য-ঔদার্য-ক্ষত্রপ্রথার সম্মিলিত আবেদনের উত্তরে বর্বরের মতো হুংকার ছাড়ে, ব্যাধের মত খাঁচায়-পোরা বাঘ পেয়ে সে খুঁচিয়েই মারতে চায়—'মারি অরি পারি যে কৌশলে'!

কোথায় পেলেন মাইকেল এই লক্ষ্মণকে? যে রামায়ণ থেকে গৃহীত এই চরিত্রটি, সেখানে যে রাক্ষসেরাও দুর্বলের সঙ্গে যুদ্ধ করে না। রাবণ-পক্ষীয় অতিকায়ের মুখের কথা—"রথে স্থিতোঽহং শরচাপপাণির্ন-প্রাকৃতং কঞ্চন যোধয়ামি।" বানরেও চায় না অন্যায় যুদ্ধে কাজ হাঁসিল করতে। অন্যের সঙ্গে যুদ্ধে রত রাবণকে আঘাত হানবার সুযোগ

পেয়েও হনূমানকে বলতে শোনা যায়—"অন্যেন যুধ্যমানস্য ন যুক্তমভি-ধাবনম্"।

আর, রাম-লক্ষ্মণ ? তাঁরা শ্রান্ত মোহগ্রস্ত শত্রুকে বারে বারে ফিরিয়ে দিয়েছেন রণক্ষেত্র থেকে, অথবা বিশ্রাম নিতে বলেছেন। নিরস্ত্র শত্রুকে বলেছেন, উপযুক্ত রণসাজে সজ্জিত হয়ে আসতে। রামের সঙ্গে যুদ্ধের এক তুমুল পর্যায়ে রাবণ মোহগ্রস্ত হলেন, তাঁর হাত থেকে ধনু পড়ে গেল। তাই দেখে রাম বললেন, 'তুমি ভীমপরাক্রমে ভীষণ যুদ্ধ করেছো, কিন্তু তুমি পরিশ্রান্ত এই বিবেচনা ক'রে আমি তোমাকে শরাঘাতে বধ করলাম না"—

"তস্মাৎ পরিশ্রান্ত ইতি ব্যবস্য
ন ত্বাং শরৈর্মৃত্যুবশং নয়ামি।"

(যুদ্ধ—৫৯।১৪০)।

'নিশাচররাজ, তুমি এখন প্রস্থান কর। আমি জানি তুমি রণক্লান্ত। লঙ্কায় গিয়ে বিশ্রাম কর। পরে ধনুর্ধরদের সঙ্গে রথারোহণে ফিরে এসে আমার রণবল পরীক্ষা ক'রো :—

প্রযাহি জানামি রণার্দিতস্ত্বং
প্রবিশ্য রাত্রিঞ্চর রাজ লঙ্কাম্।
আশ্বস্য নির্যাহি রথী সধন্বী
তদা বলং প্রেক্ষ্যসি মে রথস্থঃ॥ (ঐ। ১৪১)

রামায়ণে লক্ষ্মণই ইন্দ্রজিতকে ভর্ৎসনার স্বরে বলেছেন 'তস্করাচরিতো মার্গো নৈষ বীরনিষেবিতঃ'। নিজেরা বীর-প্রথা-পালনে অভ্যস্ত ও উদার ক্ষাত্রগুণে মণ্ডিত বলেই না রাম-লক্ষ্মণের এরূপ আচরণ ? নিয়তির পরিহাসে মহর্ষি বাল্মীকির মহৎ সৃষ্টি এই নূতন যুগের বাংলার কবির হাতে হলো কলঙ্ক-মসীলিপ্ত, এবং তাও আবার প্রতিপক্ষের চরিত্রে ঠিক সেইসব মহৎ গুণের আরোপে, যেগুলি ধার করা হয়েছে বাল্মীকির রাম-লক্ষ্মণ-চিত্র থেকে। শত্রুর প্রতি মানবিকতার প্রকাশে দরদ বা ঔদার্য, নিরস্ত্র অরিকে আঘাত না-করার ক্ষত্র-বীরোচিত মনোভাব, তস্করাচরণের প্রতি ধিক্কার, সবই মাইকেল পেয়েছেন বাল্মীকির কল্পভাণ্ডারে এবং বিশেষত রাম-লক্ষ্মণের চরিত্র-চিত্রে ; আর তাই দিয়েই তিনি মেঘনাদকে সাজিয়ে, লক্ষ্মণকে করেছেন ঐ সব বৈশিষ্ট্য-বর্জিত এক ঘৃণ্য অনার্য চরিত্র। এ ছাড়াও আছে লক্ষ্মণের মুখে

মেঘনাদকে বারে বারে রণে আহ্বানের শূন্যগর্ভ আড়ম্বর। আড়ম্বরটি মাইকেল পেয়েছেন বাল্মীকির অনুকরণে—

—সমাহ্বয়ে ত্বাং সমরে সম্যগ্‌যুদ্ধং প্রযচ্ছ মে—

কিন্তু সেখানে তার মধ্যে শূন্যগর্ভতার প্রশ্ন নেই; যেমন বীরোচিত সম্মুখ-সমরে আহ্বান, তেমনি রণসাজে যথোচিতভাবে সজ্জিত শত্রুর সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ। আর মাইকেলে? 'দেহ রণ মোরে', 'দেবাদেশে রণে আমি আহ্বানি রে তোরে' বলে আহ্বানের ঘটা আছে; কিন্তু 'সাজি বীর সাজে আমি'—এই শিষ্ট আবেদনে কর্ণপাতও করা হলো না, উন্মুক্ত কৃপাণহস্তে লক্ষ্মণকে দেখা গেলো খাঁচার বাঘের নিধনে উদ্যত কিরাতের মূর্তিতে। এই যে রণে সাড়ম্বর আহ্বান ও বিনারণেই নিরস্ত্র অসহায়কে হত্যার উদ্যম—কবির এই অবনমনের পরিকল্পনা সম্পর্কে বলতে হয়,—"নাহি শিশু বাংলাদেশে, শুনি না হাসিবে এ কথা!"

আরো বিপদের কথা, মাইকেলের এই লক্ষ্মণেরই সমর্থনে ছুটে এসেছেন প্রতাপশালী সমালোচক মোহিতলাল "উপপ্লবায় লোকানাং ধূমকেতোরিবোত্থিতঃ"—এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রসঙ্গ হাতে নিয়ে। তার ফলে যে ঐ কলঙ্কিত অবনমিত লক্ষ্মণ-চিত্রই হলো সমর্থিত, তাতে সমালোচকের স্বস্তি বৈ অস্বস্তি দেখা যায় না।

বাংলায়, তাই, রামায়ণ সত্যই বিপন্ন। শক্তিশালী কবির হাতে রামায়ণের এক বিকৃত-চিত্র হয়েছে রূপায়িত, শক্তিশালী ভাষ্যকারের মনন-সমৃদ্ধ সাহিত্যপ্রয়াসে ঐ বিকৃতিই লাভ করতে চলেছে বিপুল প্রতিষ্ঠা। লক্ষ্মণের তো ঐ অবস্থা। রামচরিত্রেও অশ্রদ্ধা সঞ্চারিত হওয়ার উপকরণ যথেষ্ট। চিত্রগত উপাদানে অবজ্ঞা হয়তো তেমন শাণিত নয়, কিন্তু সে অভাব পূরণ করা হয়েছে কবির নিজস্ব মন্তব্যে—'I hate Ram and his rabble' (যতোই সুকুমার সেন 'and' এর ব্যাখ্যায় 'because of' বলে কবিকে বাঁচাতে চেষ্টা করুন)। লক্ষ্মণকে তবু রঙ্গমঞ্চে দাঁড়িয়ে মুখে চুণকালি মাখতে হলেও পর্দার আড়ালে কবির পিঠ-চাপড়ানি পেতে দেখা যায় (৪ম সর্গের বনের মধ্যেকার কল্পিত কাহিনীতে), রামের ভাগ্যে তাও জোটে নি। লক্ষ্মণ সর্বসমক্ষে উল্কার আগুনে দগ্ধবদন, রামের জন্য বরাদ্দ হয়েছে তুষের আগুন। সভায় দাঁড় করিয়ে লক্ষ্মণের মুখের উপর একের পর এক বর্ষিত হয়েছে তীক্ষ্ণ অগ্নিঝলক—'ক্ষত্রকুলগ্লানি,' 'নির্লজ্জ,'

'তস্কর', 'পামর', 'ভণ্ড', 'নরাধম', 'বর্বর'—যেন উল্কা-প্রকৃতি কবি-কল্পনা পর্যাপ্ত আগুন ছুটিয়ে রামায়ণের লক্ষ্মণের প্রতি পাঠকের বিরূপতার ভিত্তি পাকাপোক্ত না করে কিছুতেই থামতে পারে না।

এ হলো একরকম। রামের জন্য ভিন্ন ব্যবস্থা। তাঁর প্রতি বিদ্বেষটা (I hate Ram) কবি কোথাও বিশেষ ফলাও করে প্রকাশ করেন নি। কাব্যের উপসংহার-মুখে একটিবার রাবণের সমান সমান রূপে মুহূর্তের জন্য কল্পনায় স্থান দেওয়াও হয়েছে ('যথা রক্ষোদলপতি নৈকষেয় বলী; নর-দলপতি তুমি রাঘব!' ৯ম, ১০৮—৯); কিন্তু এই চরিত্রে যে কথায় কথায় ফুটেছে নারীসুলভ দুর্বলতায় ভেঙে-পড়া, তাতেই চরিত্রটির প্রতি শ্রদ্ধা হয়েছে পদে পদে ক্ষতবিক্ষত। রামায়ণের রামে অন্যান্য বিচিত্র গুণের সঙ্গে কোমল-কঠোরের যে অপূর্ব সমন্বয়, এখানে সেই রাম-চরিত্রের এক মর্মান্তিক ছাঁটাছোঁটা রূপ। সমন্বয়ের পরিবর্তে কেবলই কোমলতার নামে দুর্বলতা যা কোনো ক্ষত্রবীরেরই সাজে না—মহাপুরুষের তো দূরের কথা।

'বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি'—

ভবভূতির এই বিখ্যাত রামচন্দ্র-পরিচিতিকে যেন ব্যঙ্গ করে চলেছে মাইকেলের রাম-চিত্র। এ চিত্র ভুলিয়ে দিতে চায় বাল্মীকির রামকে, যাঁর চরিত্র-পরিকল্পনায় যুগপৎ আলোড়িত দেবর্ষি ও মহর্ষির কল্পলোক। মহর্ষি খোঁজেন :

> কোন্বস্মিন্ সাম্প্রতং লোকে গুণবান কশ্চ বীর্যবান।
> ধর্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ সত্যবাক্যো দৃঢ়ব্রতঃ॥
>
> (বাল—১।২)
>
> আত্মবান কো জিতক্রোধো দ্যুতিমান কোঽনসূয়কঃ।
> কস্য বিভ্যতি দেবাশ্চ জাতরোষস্য সংযুগে॥
>
> (ঐ—১।৪)

'মানুষের মধ্যে কে এমন আছেন যিনি যেমন গুণবান তেমনই বীর্যবান, যিনি ধর্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, সত্যরক্ষায় অবিচল এবং সংকল্পে সুদৃঢ়?' 'যাঁর ধৈর্য কখনও বিচলিত হয় না এরূপ অপ্রকম্প্য ধৈর্যবান পুরুষ কে? কে এমন আছেন যাঁর ক্রোধ সর্বদা সংযত, কেবল দণ্ডার্হ পাত্রেই যাঁর ক্রোধের উদয় হয়,—'ক্রোধমাহারয়ত্তীব্রং'—? গুণেতে দোষদর্শনরূপ অসূয়া যাঁকে স্পর্শ করে

না এমন কে আছেন? কোন্ পুরুষকে যুদ্ধে ক্রোধান্বিত দেখলে দেবাদিও ভয়-ভীত হন?' —(টীকা—'রামায়ণ সার')

'কহ মোরে, বীর্য কার ক্ষমারে করে না অতিক্রম,
কাহার চরিত্র ঘেরি সুকঠিন ধর্মের নিয়ম
ধরেছে সুন্দর কান্তি মাণিক্যের অঙ্গদের মতো,
মহৈশ্বর্যে আছে নম্র, মহাদৈন্যে কে হয় নি নত,
সম্পদে কে থাকে ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নির্ভীক...'

—(রবীন্দ্রনাথ)

দেবর্ষি জানান:

দেবেষ্বপি ন পশ্যামি কশ্চিদেভিগুর্ণৈর্যুতং।
শ্রূয়তাং তু গুণৈরেভির্যো যুক্তো নরচন্দ্রমাঃ॥

মেঘনাদবধে রামায়ণের এই 'নরচন্দ্রমা'-কে ভুলিয়ে দেওয়ারই প্রয়াস। যুদ্ধ-ক্ষেত্রে তাঁকে কবি এঁকেছেন, 'হায় রে বিষণ্ণ এবে জানকী-বিহনে, কৌমুদী-বিহনে যথা কুমুদরঞ্জন শশাঙ্ক!' (১ম অং); চিত্ররথের কাছে তিনি 'ভিখারী রাঘব হায়', 'অজ্ঞ নর আমি, হায়, কেমনে দেখাব কৃতজ্ঞতা' (২য় অং)। লক্ষ্মণের ব্যবহারের জন্য প্রেরিত ধনুক দেখে তাঁর তাক লেগে যায়—'বৈদেহীর স্বয়ম্বরে ভাঙিনু পিনাকে বাহু-বলে; এ ধনুকে নারি গুণ দিতে! কেমনে লক্ষ্মণ ভাই নোয়াইবে এরে?' (৩।২৮৫-৮৭)। প্রমীলার নারী-বাহিনীর প্রভাবের প্রতিক্রিয়ায় মাইকেলের রামচন্দ্রের মধ্যে ফোটানো হয়েছে নারীরও অধম দুর্বলতা। দূতীর কাছেও তিনি 'ভিখারী রাঘব', তাঁর লজ্জাকর প্রার্থনা—'বিনা রণে পরিহার মাগি তাঁর কাছে' (৩।৩৪৩-৪৫)। 'দূতীর আকৃতি দেখি ডরিনু হৃদয়ে, রক্ষোবর! যুদ্ধ-সাধ ত্যজিনু তখনি!' (৩।৩৫৯-৬০)—মাইকেলের রামের মুখের এই জঘন্য দুর্বলতাব্যঞ্জক উক্তিটিকে পাঠক যে কৌতুকমাত্র বলে মনে করবে, সে পথে অন্তরায় ক্ষণকাল-পরবর্তী ঐ রামেরই চিন্তিত ভাষণ: 'চঞ্চল হইনু এ প্রপঞ্চ দেখি, সখে, বঞ্চো না আমারে ** কহ, বুধ, কার এ ছলনা?' (৩।৪০৭-১২)। প্রমীলা এসে মেঘনাদের সঙ্গে মিলিত হওয়ায় যার নিজের সৈন্যদলকে মনে হয় মৃগপালের মতো অসহায়—'সিংহ সহ সিংহী আসি মিলিল বিপিনে, কে রাখে এ মৃগপালে?' (৩।৪৩৯-৪০) —তার বীরত্বের কী মহিমা যে কবি ফোটাতে চান, তা অবশ্যই অনুমেয়! লক্ষ্মণের জন্য স্নেহকাতরতা সুন্দর বটে, কিন্তু তার সীমাহীন আতিশয্য

মাইকেলের রামকে করেছে স্নেহদৌর্বল্যে এমনই হতচেতন যে, লক্ষ্মণ ও বিভীষণ উভয়কেই নানা প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে হয় তাঁকে খাড়া রাখতে। প্রায় তিরস্কারের সুরে লক্ষ্মণকে বলতে হয়: 'কেন অবহেল দেব-আজ্ঞা? ধর্মপথে সদা গতি তব, এ অধর্ম কার্য, আর্য কেন কর আজি? কে কোথা মঙ্গলঘট ভাঙে পদাঘাতে?' (৬।৮০-৮৩)। বিভীষণের কথাও সরাসরি রামের মূঢ়তাই প্রমাণ করে: 'উচিত কি তব, কহ, হে বৈদেহীপতি সংশয়িতে দেববাক্য, দেবকুলপ্রিয় তুমি? দেবাদেশ, বলি, কেন অবহেল?' (৬।১৬০-৬২)। অর্থাৎ কেবলই কোমলতা-দুর্বলতায় ভেঙে-পড়া রাম, কেবলই দ্বিধা-সংকোচে সংকুচিত নিয়ত-আতঙ্ক-পোয়ানো পৌরুষ-বর্জিত রামই মাইকেলের তুলিকায় চিত্রিত হয়েছে। অথচ রামায়ণের নিবিড়-পাঠক কবি মাইকেল দেখেছেন, মহর্ষির রাম-চিত্রে কিভাবে তুলিকা চালনা করা হয়েছে।

'নরচন্দ্রমা'র গুণকীর্তনের উদ্বোধনেই বলা হয়েছে, 'নিয়তাত্মা **মহাবীর্যো** দ্যুতিমান্ ধৃতিমান বলী' (১।১।৮); অমাত্যবর্গের কাছে তাঁর পরিচয়ের সুরুতেই শোনা যায়, 'স হি **বীর্যোপপন্নশ্চ** রূপবাননসূয়কঃ' (২।১।৯); অভিষেকপূর্ব রামচন্দ্রের বর্ণনায় মহর্ষি আমাদের শুনিয়েছেন রামচন্দ্রে সেই অপূর্ব সমন্বয়ের বার্তা, একদিকে পূর্ণচন্দ্রের সুশীতলতা, অপরদিকে মধ্যাহ্নরবির তেজোদ্দীপ্ততা,—'তং তপন্তমিবাদিত্যমুপপন্নং স্বতেজসা' (২।১৬।১১); রাবণের প্রতি মারীচের উক্তিতে রামের বর্ণনা,—'**অপ্রমেয়ং** হি **তত্তেজো** যস্য সা জনকাত্মজা' (৩।৩৭।১৮), আবার, রাবণের মুখে রামের বর্ণনা,—'**শত্রোঃ প্রখ্যাতবীর্যস্য রঞ্জনীয়স্য** বিক্রমৈঃ' (৬।১০৪।৬) (অর্থাৎ রামচন্দ্রের বীরত্ব প্রখ্যাত, তিনি বিক্রমে রঞ্জনীয়);

রাবণকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে হনুমানের মুখে রামের অতুলনীয় মহা বীরত্বগুণের বর্ণনা,—

ব্রহ্মা স্বয়ম্ভূশ্চতুরাননো বা
রুদ্রস্ত্রিনেত্রস্ত্রিপুরান্তকো বা।
ইন্দ্রো মহেন্দ্রঃ সুরনায়কো বা
ত্রাতুং ন শক্তা যুধি রামবধ্যম্॥
(৫।৫১।৪৫)

['অভিপ্রায়, ব্রহ্মা স্বয়ংজাত হইলেও, তাঁহার চতুর্মুখে যুগপৎ বেদোচ্চারণে সমর্থ হইলেও, রুদ্র কালবিশেষে সংহারক হইলেও, মহাবল ত্রিপুরাসুরের

সংহারক হইলেও, ইন্দ্র সমগ্র দেবাধিপতি হইলেও, এবং তেত্রিশ কোটী দেবগণ যুদ্ধে তাঁহার সহায় হইলেও, তাঁহারা কেহই যুদ্ধে রামের যে বধ্য শত্রু, তাহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ নহেন।' —টীকা—'রামায়ণ-সার'] ;
—কিন্তু মেঘনাদবধে এই মহাবীর্যোপপন্ন তেজোবিক্রমোদ্দীপ্ত আদর্শ পুরুষ রামচন্দ্রকে খুঁজে পাওয়ার সকল পথই বন্ধ করা হয়েছে। আর এই কাব্যের জয়ধ্বজাকে যতোই গগন-বিস্তারী করে তুলে ধরা হচ্ছে, কবির মনন-মাহাত্ম্যের জয়গানে যতোই দিগদিগন্ত হয়ে চলেছে প্রকম্পিত, ততোই রামায়ণের রাম-চরিত্রের বিকার-বিকৃতি কায়েমীভাবে মুদ্রিত হচ্ছে নূতন যুগের পাঠকের অন্তরে,বাল্মীকি-কালিদাস-ভবভূতির রাম হারিয়ে যাচ্ছে মাইকেল-স্তুতির আড়ালে। যে পথে কবি প্রাণ খুলে গেয়েছেন—"রামায়ণ ভারতের মহাকাব্য, * * রামায়ণে মানুষই নিজ গুণে দেবতা হইয়া উঠিয়াছেন,"—সে-পথে কাঁটা দেওয়ার আয়োজন চলেছে জোর কদমে আধুনিক বাংলা সমালোচনার আসরে। বাংলায়, আজ, রামায়ণ সত্যই বিপন্ন।

ভারতের আর কোনো ভাষায় রামায়ণের এই বিকৃতি এমনভাবে অভিনন্দিত হয় নি। উত্তর-ভারতের হিন্দী বা দক্ষিণ-ভারতের, তামিল-তেলেগু-মালয়ালম্, সব ভাষাতেই রামায়ণ মহাকাব্য বা রাম-চরিত-কথার নৈষ্ঠিক অনুশীলন চলে আসছে; কবি-দৃষ্টির স্বাতন্ত্র্যে বা কবি-ভাবনার স্বকীয়তায় অথবা আঞ্চলিকতার প্রভাবে সেখানে অবশ্যই কিছু কিছু নূতনত্বের অবতারণা ঘটেছে, কিন্তু এমন নিদারুণ বিকৃতিসূত্রে সেখানে রামায়ণ অ-রামায়ণ হয়ে যায় নি। যদি কোথাও বিজাতীয় সুরের আলাপ সুরু হয়ে থাকে তবে তার মূলে এই মেঘনাদবধ ও তার টীকা-ভাষ্যের প্রভাবই যে অনুসন্ধেয়, এমন মনে করার সঙ্গত কারণ আছে। আমরা সে কথায় পরে আসছি।

বাংলায় মাইকেলের হাতের এক কাব্যের প্রশস্তি-রচনায় অতিমুগ্ধতার ফলেই এখানে রামায়ণের এমন দুর্দশা। তা ছাড়া, রামায়ণেরই দুর্ভাগ্যবশতঃ আধুনিক যুগের সাহিত্যিক প্রতিভার ফলনের ক্ষেত্রে বাংলাই সর্বাপেক্ষা সুফলা এবং মেঘনাদবধ-সৃষ্টির প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সুরু হয় ঐ ফলনের জোয়ার। শক্তিশালী প্রতিভামাত্রেই ঐ সৃষ্টিটাকে নিয়ে একটু নাড়া-চাড়া না করে ছাড়েন নি। তার পর সাম্প্রতিক কালে দেখা দিয়েছে ঐ বহু হাতের নাড়া-চাড়ায় বহু আরোপিত মহিমা-সম্বলিত কাব্যখানিকে নিয়ে ভয়ংকর নূতন কিছু সৃষ্টির একপ্রকার মাদকতা। এও বুঝি বাংলায় রামায়ণেরই দুর্ভাগ্যের ফল।

[৩] রবীন্দ্র ভাষ্যের সমীক্ষা : রামায়ণ অ-রামায়ণ : 'সাহিত্যসৃষ্টি'র রাবণ ও 'রক্তকরবী'র রাবণ

যে-রবীন্দ্রনাথ রামায়ণকে 'ভারতের মহাকাব্য', 'ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহাস', ভারতের সাধনা, আরাধনা বা আদর্শের আধার ও প্রতীক এবং ভারতের শাশ্বত পরিচিতিরূপে দেখাবার পবিত্র সুগম্ভীর পূজার আয়োজনে ভক্তের মতো পুণ্য ঘণ্টাধ্বনিতে দীনেশচন্দ্রের মূল পূজার প্রতি সাহিত্যজগতের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং কার্যত পূজক অপেক্ষা ঘণ্টাবাদকের মহিমাতেই সকলকে অধিকতর মুগ্ধ করেছেন, তাঁকেই আবার দেখা যায়, মেঘনাদবধে রামায়ণের 'বিপরীত প্রকৃতি'(১) লক্ষ্য করেও কবি-প্রশস্তিতে বিপুল উদ্যমে ভাষ্য-রচনায় প্রবৃত্ত হতে। ভারতের শাশ্বত পরিচিতির 'বৈপরীত্যে' কোনোরূপ অস্বস্তির বশবর্তী হওয়া দূরের কথা, বরং দেখা যায়, ঐ বৈপরীত্য-সূত্রে একটা নূতন সৃষ্টির সন্ধান পেয়ে তারই আবাহন-মন্ত্র-রচনায় কবি ধ্যানস্থ হয়ে রইলেন। সেই ধ্যান মুহূর্তে সমগ্র মেঘনাদবধ-কাব্যের ভাব-নির্যাস ঘনীভূত হয়ে কবির অন্তরে যে একটা বিগ্রহরূপ প্রাপ্ত হয়েছে, তা হলো 'অটল শক্তি'—যা 'ভয়ঙ্কর সর্বনাশের মাঝখানে বসিয়াও কোনোমতেই হার মানিতে চাহিতেছে না',যা 'স্পর্ধাভরে কিছুই মানিতে চায় না,' যার মাইকেল-কৃত স্তবগান, রবীন্দ্রনাথের এই মুহূর্তের বিশ্লেষণে, 'য়ুরোপের শক্তির স্তবগানে' মুখর যে যুগের হাওয়া, তারই প্রভাবসঞ্জাত। ধ্যানস্থ কবির আরো উপলব্ধি,—'আধুনিক কালে রামায়ণকথার এই নূতন সুর, এ কোনো ব্যক্তিবিশেষের খেয়ালে হয় নাই, * * তাই রামায়ণের গান করিতে গিয়াও ইহার সুর আমরা ঠেকাইতে পারি নাই।'

প্রশ্ন অনেক জাগে রবীন্দ্রনাথের এই মাইকেল-প্রশস্তি নিয়ে। বিস্তৃত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। সংক্ষেপে কয়েকটি কথা। মাত্র চার বছর আগে রামায়ণকে কবি যে দৃষ্টিতে দেখেছেন(২), এখানে সে দৃষ্টি পরিত্যক্ত। 'ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহাস,' 'ভারতবর্ষের যাহা সাধনা, যাহা আরাধনা যাহা সংকল্প তাহারই ইতিহাস রামায়ণের মধ্যে চিরকালের সিংহাসনে বিরাজমান'—এই রামায়ণ-পরিচিতি এখানে অসম্মানিত, প্রতিবাদ-খণ্ডিত।

(১) 'সাহিত্যসৃষ্টি' ১৩১৪।

(২) প্রাচীন সাহিত্য, রামায়ণ, ১৩১০।

যদি যুগের পরিবর্তনে নূতন সুরে বিপরীত সুরে রামায়ণ গাওয়া চলে, তবে আর রামায়ণের আবেদনের সেই চিরত্ব স্বীকার্য হয় কিসে? 'সুমহৎ বীর্যের উপর প্রতিষ্ঠিত শান্তরসাস্পদ গৃহধর্মের' তবে কি ভারতবর্ষের জীবনে আর কোনো স্থান নেই? গৃহাশ্রমাদর্শের প্রয়োজন তবে কি ফুরিয়েছে? 'রামায়ণের দ্বারা ভারতবর্ষকে ও ভারতবর্ষের দ্বারা রামায়ণকে যথার্থভাবে বুঝিতে পারিবেন'—কবির এই ঋষি-বচন কি তবে আমাদের সংশোধিত করে নিতে হবে যে, আর রামায়ণের দ্বারা নয়, মেঘনাদবধের দ্বারাই বুঝতে হবে ভারতবর্ষকে? 'ব্যক্তিবিশেষের খেয়ালে' হয় নি যদি, তবে তো সারা দেশের, গোটা যুগের দাবীতে হয়েছে বলেই বুঝতে হয়। অর্থাৎ মাইকেলের হাতে রচিত হয়েছে যে নূতন রামায়ণ, তার মধ্যে নূতন কালের ভারতবর্ষের নূতন অভীপ্সা হয়েছে অভিব্যক্ত, এই বুঝতে হবে। এবং এও বুঝতে হবে যে, এতোকাল যাই থাকুক, এখন আর ভারত তার সেই সনাতন জীবনাদর্শ, গৃহাদর্শ, চরিত্রাদর্শ বজায় রাখতে চায় না। রামায়ণে তার আর প্রাণ ভরে না, তাই মেঘনাদবধের মধ্যে সে নূতন করে তার প্রাণের গান গেয়ে উঠেছে। এই নূতনত্বের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য প্রতিবাদকে স্তব্ধ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে কবি জানিয়েছেন য়ুরোপ থেকে আগত নূতন ভাবের সংঘাতে আমাদের সাহিত্যের নব-রূপলাভের অপরিহার্যতার কথা, আর লিখেছেন, 'ঠিক সেই সাবেক জিনিসের পুনরাবৃত্তি আর কোনোমতেই হইতে পারে না—যদি হয়, তবেই এ সাহিত্যকে মিথ্যা ও কৃত্রিম বলিব।'

এখানে আমাদের মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধের মূল বিষয়ের ('সাহিত্য সৃষ্টি') প্রতিপাদন-ধারায় মাইকেলের মেঘনাদবধকে একটি দৃষ্টান্তরূপে দেখাতে গিয়ে সমস্যার সৃষ্টি করে ফেলেছেন। প্রাচীন সাহিত্যের কতো বিষয়ই না তিনি নিজে নূতন যুগের সাহিত্যসৃষ্টির কাজে লাগিয়েছেন। নূতন আস্বাদনও সেখানে যুগিয়েছেন ভুরি ভুরি। 'ঠিক সেই সাবেক জিনিসের পুনরাবৃত্তি' অবশ্যই হয় নি; কিন্তু তাঁর 'শকুন্তলা'ও অ-শকুন্তলা হয়ে যায় নি, 'মেঘদূতে'রও গদ্যে পদ্যে বিচিত্র নব-রসায়ন সত্ত্বেও তার মধ্যে অ-মেঘদূতীয় আবেদন চিন্তা করার প্রয়োজন হয় না। উপেক্ষিতাদের ফুটিয়ে তুলে তিনি সাহিত্যসৃষ্টির নূতনত্বের অপূর্ব পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু তার ফলে নব নব আলোকরশ্মিপাতে মূলের আকর্ষণ বৃদ্ধিই পেয়েছে, তাদের মৌল প্রকৃতির 'বিপরীত' কিছু করা হয় নি। তাঁর 'দুর্যোধন' যতোই নব-দুর্যোধন হোক,

'গান্ধারী' হোক নব-গান্ধারী, 'কর্ণ-কুন্তী-সংবাদে' যতোই নূতন সংবাদ থাকুক, ঐ নবত্বের আস্বাদনের জন্য তাদের মহাভারতীয় মূল কাঠামোকে নস্যাৎ করে দিতে হয় না। কিন্তু মেঘনাদবধের ভাষ্যরচনায় রবীন্দ্রনাথ যা বোঝাতে চেয়েছেন, যেভাবে এই কাব্যকে নূতন যুগের রামায়ণ-কথা বলে চালাতে চেয়েছেন, তাতে রামায়ণ অ-রামায়ণ হয়ে পড়েছে, অথবা বুঝি নিজেরই অজ্ঞাতে তিনি বাংলায় রামায়ণকে বিপন্ন করে ফেলেছেন! যুগের হাওয়া যতোই পালটাক, যতোই পশ্চিমের আকাশ থেকে নূতন ভাবের দমকা হাওয়া এসে আমাদের ভাব-ভাবনায় সংঘাতের সৃষ্টি করুক, প্রাচীন ঐতিহ্যের শাশ্বত মূল্যের সৃষ্টিগুলির বিকার-বিকৃতি কোনোমতেই সমর্থনযোগ্য হতে পারে না। পশ্চিমের প্রভাবে আমাদের বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ্-গীতা-পুরাণের চরিত্র যদি অপরিবর্তিত থাকতে পেরে থাকে, কালিদাস-ভবভূতির সৃষ্টি যদি স্ব-মহিমায় অম্লান থাকায় সাহিত্যসৃষ্টিতে কোনো অনটন না পড়ে থাকে, তবে রামায়ণকেই বা কেন অ-রামায়ণ হতে হবে, তা আমরা ঠিক বুঝি না। অসংশয়ে বলা যায় যে, স্বয়ং মাইকেল এ সব কিছুই চান নি। নূতন যুগের রামায়ণ-রচনার অভীপ্সা তাঁর ছিল না। তবে তাঁর হাতে যা ঘটেছে তাতে রামায়ণের বিকৃতি যথেষ্ট।

'অরাম অরাবণ বা হবে ভব আজি'—এই সংকল্পের শেষ পরিণাম দেখাবার আগেই যদিও তাঁর কাব্যে যবনিকা নেমে এসেছে, তবু এর প্রথমাংশ কবি নিজে হাতে পূরণ করেছেন, রাবণের অপেক্ষায় থাকেন নি। মেঘনাদ-বধে রামায়ণের রাম অ-রাম হয়েছে, লক্ষ্মণ হয়েছে ততোধিক অ-লক্ষ্মণ। আর সেই কাব্যকে যে মহিমা দেওয়া হয়েছে **রবীন্দ্র-ভাষ্যে,** তাতে **রামায়ণ অ-রামায়ণ হয়ে দাঁড়াতে বাধ্য।** ভাষ্যকার তা জানেন, কিন্তু তবু তারই অনুকূলে যুক্তি দেখিয়েছেন,—সাহিত্যসৃষ্টির যুক্তি,—'সম্মিলিত মানবের বৃহৎ মন, মনের নিগূঢ় এবং অমোঘ নিয়মেই আপনাকে কেবলই প্রকাশ করিয়া অপরূপ মানসসৃষ্টি সমস্ত পৃথিবীতে বিস্তার করিতেছে।' অর্থাৎ যে সাহিত্য-সূক্ত খাঁটি এপিকের পক্ষে প্রযোজ্য, সেই মানদণ্ডকেই যাদুদণ্ডের মতো ছুঁইয়ে রবীন্দ্রনাথ মেঘনাদবধকে তাঁর প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত এবং প্রামাণ্যের দৃষ্টান্তস্থল করে নিয়েছেন। অতো ভেবে দেখেন নি যে, মেঘনাদ-বধ কাব্য সে-শ্রেণীর কাব্যই নয়—'জগতের যে সকল কাব্যের লেখক কে, তাহার যেন ঠিকানা নাই—যে সকল কাব্য আপনাকেই যেন আপনি সৃষ্টি

করিয়া চলিয়াছে’;—কবি মাইকেলও সেই জাতের কবি ন’ন, যাঁদের লেখাকে ঠিক তাঁদেরই লেখা বলে মনে করলে ভুল করে ধরে নেওয়া হয় ‘গঙ্গোত্রীই যেন গঙ্গাকে সৃষ্টি করিতেছে’ (সাহিত্যসৃষ্টি, পৃঃ ১০৫)। আসলে রবীন্দ্রনাথের ভুলটা হয়েছে দৃষ্টান্ত-নির্বাচনে। নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি আর থামতে পারেন না। কবি-সুলভ মনন-কল্পনার আবেগে বক্তব্যকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছেন সেই মন্দাকিনী স্রোতে যেখানে ব্যাস-বাল্মীকি-হোমারের মতো আদি-কবিদের প্রসঙ্গেরই প্রশস্ত স্থান, বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের মতো যাঁরা, তাঁদেরও অভিষেক হতে পারে ঐ পুণ্যধারায়।

রবীন্দ্রনাথের ভুল দেখাবার স্পর্ধায় যাঁরা বিচলিত, তাঁদের কাছে বলি, সে দৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকেই পাওয়া, এবং এই প্রবন্ধেই ছড়ানো রয়েছে কবির ঐ দৃষ্টিদানের দাক্ষিণ্য। ‘সাহিত্যসৃষ্টি’ প্রবন্ধে কবি দেশী-বিদেশী নানা সাহিত্যের প্রসঙ্গ এনেছেন। সাহিত্যের শ্রেণীভেদও করেছেন সতর্ক ভঙ্গিতে। অবশেষে ‘যথার্থ মহাকাব্যে’র প্রসঙ্গে আসবার গোড়াতেই চিহ্নিত করে দিলেন ঠিক সেই চারখানিকে—গ্রীসে হোমারের দু’খানি এবং ভারতবর্ষে রামায়ণ-মহাভারত। অতঃপর রামায়ণ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার একটি মূল্যবান প্রস্তাবনা রচিত হতে দেখা যায় বিদ্যাপতির পদাবলী-প্রসঙ্গ দিয়ে। যোগসূত্র বা সঙ্গতিসূত্র খুবই চমৎকার। ঐ যথার্থ মহাকাব্যগুলির যা সৃষ্টিরহস্য, বিদ্যাপতির পদাবলীরও তাই। বহুকাল যাবৎ সর্বসাধারণের পরিচিত সমাদৃত বহু ভাবের বহু সুরের সমন্বয়, কালে কালে অনেক জোড়া-তাড়ার মধ্যেও একটা **‘মূল কাঠামো’র** সুদৃঢ় ভিত্তি। নূতন নূতন জোড়াগুলি **‘ঐক্যের গণ্ডী’** থেকে ভ্রষ্ট হতে পায় নি। একটা **‘মূলসুর’** মাঝখানে থেকে সমস্ত পরিবর্তনকে আপনার করে নিয়েছে। নানা দিক থেকে নানা কালের হাত পড়েছে। কিন্তু ঐ কাব্য দেশের সকল দিক থেকে আপনার পুষ্টি আপনি টেনে নিয়েছে। এমনি করেই ক্রমশ তা সমস্ত দেশের জিনিষ হয়ে উঠেছে। তার মধ্যে সমস্ত দেশের অন্তঃকরণের ইতিহাস, তত্ত্বজ্ঞান, ধর্মবোধ, কর্মনীতি আপনি এসে মিলিত হয়েছে। নানা যুগের নানা প্রভাব যতোই পড়ুক, **‘মূল ঘটনাটার মাহাত্ম্যে’** সে সমস্তই অভিভূত হয়ে থাকে।’(১)

(১) ‘সাহিত্যসৃষ্টি,’ পৃঃ ৯৪—৯৫।

বৃহৎ সৃষ্টির এই স্বরচিত সূক্ত-ভাষ্যের পটভূমিকায় কবি সুরু করেন ভারতীয় এপিকের চরিতকথা—"আমাদের রামায়ণ-মহাভারত, বিশেষভাবে মহাভারত, ইহার দৃষ্টান্তস্থল"—এই সঙ্গত বাচনভাঙ্গতে। স্পষ্ট করে জানিয়ে দেন এই শ্রেণীর সাহিত্যের সংজ্ঞা 'যথার্থ মহাকাব্য', ব্যাখ্যায় অনুপম ভঙ্গিতে বুঝিয়ে দেন, "ইহারা এক-একটি প্রাচীন সভ্যতার স্তন্যদায়িনী ধাত্রীর মত" (পৃঃ ৯৬)। সুনিশ্চিত করে বলেন, "তেমনি মহাকাব্যও আমাদের জানা সাহিত্যের মধ্যে কেবল চারিটি-মাত্র আছে। ইলিয়ড্, অডেসি, রামায়ণ ও মহাভারত" (পৃঃ ঐ)। কিন্তু রামাযণের বিস্তারিত ব্যাখ্যা শেষ হতেই যেই মেঘনাদবধ-কেও গ্রথিত করেন ঐ একই ধারার সৃষ্টির দৃষ্টান্তরূপে, তখন কি হাজার প্রশ্ন একসঙ্গে মাথা তুলতে চায় না? 'আধুনিক কালের রামায়ণকথা'-ই যদি এটা, এবং মূল রামায়ণেব 'বিপরীত প্রকৃতি'-ই যদি এখানে ধরা পড়ে থাকে, তবে এই আধুনিক সৃষ্টি 'প্রাচীন সভ্যতার স্তন্যদায়িনী ধাত্রী'-র গোষ্ঠীভুক্ত হয় কি করে? পূর্বোক্ত 'মূল কাঠামো', 'মূল সুর' বা 'মূল ঘটনার মাহাত্ম্য'-ও যে বজায় নেই, 'ঐক্যের গণ্ডী' থেকে সৃষ্টি হয়েছে ভ্রষ্ট,—এও তো সমালোচকের নিজেরই স্বীকৃত? অর্থাৎ 'যথার্থ মহাকাব্য' যেটা নয়, তাকেই সেই শ্রেণীর সৃষ্টির আওতায় আনা হয়েছে। ভুলটা এইখানেই। কৃত্তিবাসে যে নূতন সুরের কথা বলা হয়েছে, মূল রামায়ণে যে তার একান্তই অভাব ছিলো, তা নয়; তা ছাড়া, ঐ ভাবের প্রাবল্য সত্ত্বেও কাব্যের মূল সুর বা মূল আবেদন অবশ্যই অক্ষুণ্ণ থেকেছে। সমালোচকও নিপুণ ভঙ্গিতে জানিয়েছেন, কৃত্তিবাসের কাব্য 'ভারতবর্ষে রামায়ণকথার ধারাকে গঙ্গার শাখা ভাগীরথীর ন্যায়, আর একটা বিশেষ পথে লইয়া গেছে' (পৃঃ ১০২)। গঙ্গা-ভাগীরথীতে যে কোন 'বিপরীত প্রকৃতি' লক্ষণীয় নয়, তা বক্তা ভালোই জানেন। জানেন বলেই মেঘনাদবধ-কে ঐ বৈপরীত্য-সূত্রে বিশিষ্ট করে নিলেন, অথচ তাকেই দিলেন মূলের মর্যাদা।

এর ফলে তিনি যে নিজেই নিজের প্রতিবাদ করছেন এটা কবির মনে হয় নি। চার বছর আগেকার 'রামায়ণ'-এ ছাড়াও আরো কতো নিবন্ধেই না তাঁর আসল নিজস্ব রামায়ণ-চিন্তা প্রকাশ পেয়েছে অপূর্ব হৃদয়জয়ী ভাষায় ও প্রত্যয়দৃপ্ত বিশ্লেষণ-ভঙ্গিতে। 'প্রাচীন সাহিত্যে'র 'রামায়ণে'র আগেই 'লোকসাহিত্যে' কবি যে রামায়ণ-চিন্তার পরিচয় তুলে ধরেছেন, তা একবার স্মরণ করা যেতে পারে।

হরগৌরী-কথা, রাধাকৃষ্ণ-কথা ও রামায়ণ-কথার তুলনামূলক আলোচনায় কবি স্পষ্টই জানিয়েছেন, একমাত্র শেষেরটিতেই পাওয়া যায় **"সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের খাদ্য"**, অপর দুটির একটিতে নিছক হৃদয়বৃত্তির ও অপরটিতে নিছক সৌন্দর্যবৃত্তির চর্চা হয়েছে। রামায়ণের মতো ঐ দুটিতে……

> "…বীরত্ব, মহত্ত্ব, অবিচলিত ভক্তি ও কঠোর ত্যাগস্বীকারের আদর্শ নাই। রাম-সীতার দাম্পত্য আমাদের দেশ-প্রচলিত হরগৌরীর দাম্পত্য অপেক্ষা বহুতরগুণে শ্রেষ্ঠ, উন্নত এবং বিশুদ্ধ; তাহা যেমন কঠোর গম্ভীর, তেমনি স্নিগ্ধ-কোমল। রামায়ণ-কথায় এক দিকে কর্তব্যের দুরূহ কাঠিন্য, অপরদিকে ভাবের অপরিসীম মাধুর্য, একত্র সম্মিলিত তাহাতে দাম্পত্য, সৌভ্রাত্র, পিতৃভক্তি, প্রভুভক্তি, প্রজাবাৎসল্য প্রভৃতি মনুষ্যের যত প্রকার উচ্চ অঙ্গের হৃদয়-বন্ধন আছে তাহার শ্রেষ্ঠ আদর্শ পরিস্ফুট হইয়াছে। তাহাতে সর্বপ্রকার হৃদয়-বৃত্তিকে মহৎ ধর্মনিয়মের দ্বারা পদে পদে সংযত করিবার কঠোর শাসন প্রচারিত। **সর্বতোভাবে মানুষকে মানুষ করিবার উপযোগী এমন শিক্ষা আর কোনো দেশে কোনো সাহিত্যে নাই।** বাংলাদেশের মাটিতে সেই রামায়ণ-কথা হরগৌরী ও রাধাকৃষ্ণের কথার উপরে যে মাথা তুলিয়া উঠিতে পারে নাই তাহা আমাদের দেশের **দুর্ভাগ্য**। রামকে যাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে ও কর্মক্ষেত্রে নরদেবতার আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের পৌরুষ, কর্তব্যনিষ্ঠা ও ধর্মপরতার আদর্শ আমাদের অপেক্ষা উচ্চতর।"

লক্ষ্য করলেই ধরা পড়বে, কবি অনেকটা বর্তমান নিবন্ধের মূল প্রস্তাবেরই প্রতিধ্বনি করেছেন—'বাংলায় রামায়ণ বিপন্ন'। Context বিভিন্ন, text অভিন্ন। রামায়ণ-বিচারের এই হলো কবির নিজস্ব দৃষ্টি, এই হলো তাঁর স্বাধীন সুস্থ চিরন্তন রামায়ণ-ভাবনা। যে 'দুর্ভাগ্যে'র জন্য এখানে উদ্বেগ প্রকাশ পেয়েছে, মেঘনাদবধ-এর সমালোচনায় (১৩১৪) সেই দুর্ভাগ্যকেই যে প্রকারান্তরে স্বাগত জানানো হলো, এইটাই আমাদের বক্তব্য। তবে কি ভারতবাসীর 'সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের খাদ্যে'র অথবা 'সর্বতোভাবে মানুষকে মানুষ করিবার উপযোগী শিক্ষা'র আর প্রয়োজন নেই বলে বুঝতে হবে?

আসলে এ সবই কবির নিজস্ব উদ্দেশ্যসিদ্ধির অনুকূলে একটা সৃষ্টির আবেগাতিশয্যের ফল। উদ্দেশ্য, 'সাহিত্যসৃষ্টি' নিয়ে প্রবন্ধ-রচনা। দৃষ্টান্ত-

ধারায় সকলের শেষে নিলেন মেঘনাদবধ, এবং নিলেন তাকে সরাসরি রাবণ-কাহিনী রূপে, আর তাকেই নূতন যুগের রামায়ণ বলে ঘোষণা ক'রে সাজালেন তারই উপযোগী বরণ-ডালা। কিন্তু কৈ, তাঁর নিজের হাতে যখন আরও নূতন কালের রামায়ণ-কাহিনী বেরুলো, তখন তো তাঁর রাবণকে ঠিক ঐ সাজানো ডালায় বরণ পেতে দেখা গেল না? বরং দেখা গেলো সেই বাল্মীকির রাবণেরই চমৎকার এক যুগোপযোগী সংস্করণ। আধুনিক যুগে কোনো শক্তিমান রাজার দশ-মুণ্ড কুড়ি-হাত মানায় না বলে কবি ঐ বাহুল্য ছেটে ফেলেছেন, পরিবর্তে দেখিয়েছেন, বৈজ্ঞানিক শক্তিতে মানুষের হাত পা মুণ্ড অদৃশ্যভাবে বেড়ে যেতে পারে। সেই রামায়ণের রাক্ষসরাজের মতোই হতে পারে বহুসংগ্রহী বহুগ্রাসী। সেই সুশিক্ষিত হয়েও পাপমতি, হরণ-শোষণ-দ্বেষ হিংসায় মত্ত। কেবল তাই নয়, কবি স্পষ্টই বুঝিয়ে দিলেন, বাল্মীকি-রামায়ণের সেই রাবণ এযুগেও অমর হয়ে আছে। অথবা তাঁর সেই দশানন-কর্তৃক সীতাহরণের কাহিনী সর্বকালের কাহিনী। 'নবদূর্বাদলশ্যাম রামচন্দ্রের বক্ষসংলগ্ন সীতাকে স্বর্ণপুরীর অধীশ্বর দশানন হরণ করে নিয়েছিল, সেটা কি সেকালের কথা না এ কালের? সেটা কি ত্রেতাযুগের ঋষির কথা না আমার মতো কলিযুগের কবির কথা?' খালি সেকালের লংকাপুরী হয়েছে একালের 'যক্ষপুরী',—যাকে খুঁজে পেতে হবে সেই বিখ্যাত নাটকে, যার প্রথম নাম ছিলো 'যক্ষপুরী', দ্বিতীয় নাম 'নন্দিনী', তৃতীয় ও শেষ নাম 'রক্তকরবী'।

মেঘনাদবধের রচনাকাল ১৮৬১, আর 'রক্তকরবী'র ১৯২৩; মধ্যবর্তী দীর্ঘ ৬২ বৎসর যাবৎ আধুনিককাল তার বিচিত্র আধুনিক অভীপ্সা নিয়ে আরো কতোই না হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে। কিন্তু ৬২ বৎসর পূর্বেকার রাবণের মধ্যে যে যুগাত্মার অনিবার্য প্রকাশ ও তার মহনীয়তা লক্ষ্য ক'রে রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়েছিলেন, কোথায় তাঁর নিজের হাতের রাবণচিত্রে ঐ মহত্ত্বেরই আরো মণিমাণিক্যবিজড়িত রাজ-রাজেন্দ্ররূপ বিকশিত হবে, তা না হয়ে এ আমরা কী দেখলাম? এতো সেই আদি-কবির রাবণ। শুধু রাবণ নয়, গোটা রামায়ণের গল্পটাই এসে হাজির রক্তকরবীর সাংকেতিক ছদ্মবেশে। যন্ত্রযুগের কলরোলের মধ্যে লোকের বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে দেখে কবিকে একটু ইশারায় জানিয়ে দিতে হয়েছে, এর কোথায় রাবণ, কোথায় বিভীষণ, কোথায় সীতা আর কোথায় রাম। নচেৎ বস্তুর স্বরূপে এ এতোই অভিন্ন যে নাট্যকারকে বলতে হয়েছে, "রামায়ণের গল্পের ধারার সংগে এর যে একটা মিল দেখছি তার

কারণ এ নয় যে, রামায়ণ থেকে গল্পটি আহরণ করা। আসল কারণ, কবিগুরুই আমার গল্পটিকে ধ্যানযোগে আগে থাকতে হরণ করেছেন।" অর্থাৎ বাল্মীকি যা রচনা করে গেছেন, তা সর্বকালের সর্বযুগের কাহিনী। রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী-পরিচিতি-তে রামায়ণের রাবণ-কাহিনী ভারতের গণ্ডী ছাড়িয়ে সমগ্র য়ুরোপীয় সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত ভূমণ্ডলে তার প্রযোজ্যতার অধিকার লাভ করেছে।

অথচ মেঘনাদবধের ভাষ্যরচনার বেলা এই রাবণকেই এই 'য়ুরোপীয় শক্তি'র প্রতিভূ রূপে যুগদেবতার পাদপীঠে স্থাপন করে উচ্ছ্বসিত বন্দনা গাওয়া হয়েছে। মাঝখানে মাত্র ষোল বৎসরের ব্যবধান(১)। এ অসামঞ্জস্যের হাত থেকে কবিকে বাঁচাতে হলে বোধহয় ৮২ বছর আগের ও পরের য়ুরোপীয় শক্তির প্রকৃতির পরিবর্তন ভাবতে হবে, এবং সেই প্রথম দিকে কেবল ভারতের উপর য়ুরোপের কল্যাণী প্রভাবের কথাটুকুই চিন্তা করতে হবে। কিন্তু এ সবই নিতান্তই মনন-লীলা-সাপেক্ষ। ষোল বৎসর পূর্বে কবির মনন-রঙ্গমঞ্চে যে রাবণের আবির্ভাব সে য়ুরোপীয় শক্তির যা ভালো তারই প্রতীক, আর সেই একই রঙ্গমঞ্চ ষোল বৎসর পরে যে রাবণ অধিকার করলো, তার পরিচয়ে কবি জানান—'It is an organised passion of greed that is stalking abroad in the name of European Civilisation'.(২); এবং এই চরিত্র-ব্যাখ্যাতেই তিনি তাকে বাল্মীকি-চিত্রের সগোত্র বলে দাবী করেন। স্পষ্টই প্রমাণিত হয়, স্বাভাবিক সত্য যা, তা রক্তকরবীতেই প্রকাশ পেয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধ-ধৃত ঐ ভাষ্যটি কবির নিতান্তই একটি সাময়িক উচ্ছ্বাস, যাকে উদ্দেশ্যমূলক বলে চিহ্নিত করতে হয়। যা কবির সুচিন্তিত রামায়ণ-ভাষ্য, তার স্বরূপ অন্যান্য ক্ষেত্রে মোটামুটি একই আছে,—আছে চার বছর আগেকার প্রবন্ধ প্রাচীন সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত 'রামায়ণ'-এ, তারও আগেকার লেখা 'লোকসাহিত্যে', আছে এই প্রবন্ধেরই (সাহিত্যসৃষ্টি) মহাকাব্য-ব্যাখ্যার গোড়ার দিকে, এবং আছে ঐ ষোল বছর পরে লেখা 'রক্তকরবী'র 'নাট্যপরিচয়'-এ। তথাপি আধুনিক বাংলা সমালোচনায় ঐ 'অটল-শক্তি'-তত্ত্বমূলক ভাষ্যটির প্রভাব যেহেতু অপরিমেয়, সেইহেতু আনুষঙ্গিক রূপে মেঘনাদবধ কাব্যের 'নূতন যুগের রামায়ণ'-পরিচিতিও প্রতিষ্ঠা পেতে চায়। সুতরাং, বাংলায় রামায়ণ বিপন্ন—প্রস্তাবটি, মনে হয়, উপেক্ষণীয় নয়।

[৪] 'অটল শক্তি'

কিন্তু যে 'অটল শক্তির' ভিত্তিতে কবির এমন অভিনব নির্মিতি, তা কিছু মাইকেলের নিজস্ব আবিষ্কার নয়—বাল্মীকি ও কালিদাসেই ঐ 'অটল শক্তি' প্রতিষ্ঠা পেয়েছে (৭ম অধ্যায়, রাবণ-প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য)। মেঘনাদবধে তার এমন মহামহিম রূপের প্রকাশ, অর্থাৎ য়ুরোপী সংঘাতজনিত উনিশ শতকীয় ভাব-রূপের প্রকাশ লক্ষ্য করা—নিতান্তই রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব কবি-দৃষ্টি, নিজস্ব কল্পনা-ভাবনার ফল, অথবা 'সাহিত্যসৃষ্টি'র দৃষ্টান্তের জবরদস্তি অন্বেষণের ফল। এই ভাষ্যে মেঘনাদবধের সমস্ত বৈশিষ্ট্যই হয়েছে রাবণ-কেন্দ্রিক। যেন মাইকেলের হাতে রামায়ণ-প্রসঙ্গে এক **'রাবণায়ণ'** রচিত হতে দেখে রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়েছেন এবং উল্লাসভরে নূতন যুগের ভারতবর্ষের মহাকাব্যোপম সাহিত্যসৃষ্টির নমুনারূপে তাকে স্বাগত জানিয়েছেন। এখন যদি কেউ উৎসাহভরে মেঘনাদবধের ফলশ্রুতিরচনায় ঘোষণা করেন, 'রাবণাদিবৎ প্রবর্তিতব্যম্ ন তু রামাদিবৎ' [দ্রষ্টব্য—ডাঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্যের 'মধুসূদনের কাব্যালংকার ও কবিমানস' পৃঃ ৭০, যদিও সেখানকার সমগ্র রাবণ-ভাষ্যের মধ্যে 'অটল শক্তির' কোনো প্রসঙ্গ নেই, বরং আছে সম্পূর্ণ ভিন্ন রাবণ-চিত্রের প্রাধান্য এবং স্ব-বিরোধী মন্তব্যেই (পৃঃ ১৫৮) উপসংহারে ফলশ্রুতির বাণীরূপ রচিত হয়েছে]—তবে তাঁকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। সুতরাং বাংলায় যে রামায়ণ বিপন্ন এ প্রস্তাবটি ভেবে দেখবার মতো।

আমাদের মনে হয়, মেঘনাদবধে যে একটা 'অটল শক্তি'-র আধিপত্য অনুভূত হয়, এটা ঠিকই। তবে এ শুধু রাবণের নয়, কবি-কল্পনার কসরতের শক্তি। শক্তিমাত্রই পাওয়া গেছে। সৃষ্টি-সুষমা নয়। শক্তির দৌড় বিস্ময়কর। তার জয়গান অবশ্য কর্তব্য। সেই পুরানো কথা, potential প্রতিভা। সমগ্র মেঘনাদবধে সেই দুর্দান্ত শক্তির ছাপ অতি প্রবল। কিন্তু শক্তিটা অসংযত অনিয়ন্ত্রিত। তাই তার এমন খেয়ালীপনার পরিচয়। খেয়ালের বশে সে বলে, 'I shall borrow as little as I can from Valmiki', কিন্তু নির্বিচারে গ্রহণ করে সেই বাল্মীকির ভাণ্ডার থেকে দু'হাত ভ'রে। খেয়ালের বশে বাল্মীকি-বন্দনায় জানায় 'তব অনুগামী দাস' ব'লে ভক্তি-কাতরতা, খেয়ালের বশে উড়িয়ে দেয় সেই বাল্মীকিরই পরিকল্পনার ছাঁচ—সেখানে আমদানী করে বিকার-বিকৃতি নির্বিকার উপেক্ষায় সৃষ্টিছাড়া ঔদাসীন্যে। খেয়ালের ঝোঁকে জাগে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যে জোড়কলম বাঁধবার

প্রয়াস, কিন্তু সমন্বয়ের সুষমা সে কোথায় পাবে যার নিজের জীবনে নেই সমন্বয়ের বালাই? তাই কেবল হিন্দুর দেব-দেবীগুলোই গ্রীক-ছাঁচের উৎকট চাপে কিম্ভূতকিমাকার হয় নি, অন্যত্রও, যথা—(১) চরিত্র, (২) ঘটনা-সংস্থান ও (৩) ভাব-সংস্থানে বিষম যোজনার ফলে অদ্ভুতত্ব হয়েছে বড়োই প্রকট।

লক্ষ্মণ, প্রমীলা, নৃ মুণ্ডমালিনী, ত্রিজটা প্রভৃতি প্রথমের নিদর্শন।

দ্বিতীয়ের নিদর্শন,—অকারণ সখি-সমাবৃতা প্রমীলার সাড়ম্বর সমরাভিযানের কৌতুকাবহ অভিনয়, ইন্দিরা ও মায়ার বারংবার উৎকট অতি-দীর্ঘ স্বর্গ-মর্ত ছুটোছুটি, 'মহী'র মাধবসমীপে দরবারের জন্য বৈকুণ্ঠ-অভিযান, মায়ার আঁচল-ধরা রামচন্দ্রের অতি-দীর্ঘ নরক ভ্রমণ (সূর্যোদয়ের পূর্বে ঔষধ-সংগ্রহের সম্ভাবনা বিলুপ্ত), এবং নবম সর্গের সামরিক কায়দায় শব-শোভাযাত্রা-চালনা।

তৃতীয়ের নিদর্শন,—অদ্ভুত রস-বিপর্যয়—বীরে-করুণে (ব্যাপক), বীরে-শৃঙ্গারে (৩য়), করুণে-শৃঙ্গারে (৯ম), বীভৎসে-শৃঙ্গারে (৮ম) উদ্ভট রসায়ন; লক্ষ্মণের প্রতি শ্রদ্ধা (৫ম) ও অবজ্ঞা (৬ষ্ঠ); সংক্রিয়ার শোক-বৈরাগ্যের মধ্যে সামরিক রাজসিকতা (মোহিতলালে যার ভূয়সী প্রশংসা—'কবি শ্রীমধুসূদন'—পৃঃ ১৩৫-৩৬); প্রমীলার চিতারোহণ, কিন্তু সশরীরে স্বর্গগমন,—তার দক্ষিণে মৃতপতিও বুঝি পুনর্জীবনপ্রাপ্ত (দিব্যমূর্তি!),—অথবা গোটা চিত্রটাই (৯/৪২৪-২৯) একটা hallucination!— ;'পূরিল বিশ্ব আনন্দ-নিনাদে' (৯/৪৩২) যদি, তবে আর 'সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে' কেন?

সর্বত্রই কবির খেয়ালের রাজত্ব। খেয়ালটা শক্তিমানের বটে। সে শক্তিও 'অটল শক্তি'। আমরা সমগ্রভাবে সেই শক্তিকেই জয়মাল্য পরিয়ে মেঘনাদবধের কবিকে বরণ করতে চাই। তার বেশি কিছু নয়। বেশি কিছুর প্রলোভন এড়াতে না পারাতেই আমাদের বাংলা সমালোচনায় যে অন্ধ স্তাবকতার ঢেউ উঠেছে, তাতে গোটা রামায়ণই প্রায় ভেসে যাওয়ার উপক্রম। অযথা মৌলিকতার পতাকা উড্ডীন করে সমালোচক সাধারণ পাঠককে ভুলিয়ে দিতে চান মূল রামায়ণের স্বরূপ, সুতরাং বিমুখ করতে চান বাল্মীকির প্রতি, 'ভারতের মহাকাব্য' রামায়ণের প্রতি। আবার এই বিমুখতাই স্তব্ধ করে কোনোরূপ যাচাইয়ের প্রয়াস, জাগিয়ে দেয় মাইকেলী সৃষ্টির সব কিছুর প্রতি সেই ধারণা, যার ফলে মেঘনাদবধে বর্ণিত কাহিনীকেই রামায়ণের উন্নত সংস্করণ বলে মনে

হওয়ার কথা। আসল রামায়ণের উপর স্বীকৃতি পায় বিকৃত রামায়ণ। কারণ সকলের উপরে আছে বিবিধ মন-গড়া মহাপুরুষোচিত উপাদান-সমাবেশে মাইকেল-বিগ্রহকে এমন এক মহিমার ঐশ্বর্যে মণ্ডিত করার সাম্প্রতিক প্রয়াস, যার তেজে দৃষ্টি প্রতিহত হওয়ায় সাধারণের পক্ষে সত্যকে যাচাই করার দৃষ্টি বজায় রাখা দুঃসাধ্য।

[৫] মাইকেলের হাতে সীতা-মাহাত্ম্য খর্বিত

একদিকে রাম-লক্ষ্মণের অবনমন, অপরদিকে রাবণকে নিয়ে—স্বয়ং কবি কিছু চমক-লাগানো যুগন্ধর সৃষ্টি করতে চান বা নাই চান—বাংলার বিদগ্ধমহলে অভিনব আলোড়ন ও তার ভাব-বিগ্রহ-রচনার পণ্ডিতী প্রয়াস,—এই দুইয়ের চাপে বলা যায়, **রামায়ণকে আমরা হারাতে বসেছি।** রাম-লক্ষ্মণকে হারানোয় হয়তো অনেকের দুঃখ নেই, কিন্তু বোধহয় অনেকেই বিচলিত হবেন যদি বলা যায় রামায়ণের সীতাকেও আমরা হারাতে চলেছি।

অতএব পাঠকের কৌতূহল অনুসরণে একবার সীতা-চিত্রের দিকেও নজর দেওয়া আবশ্যক। এখানে অবশ্য কিঞ্চিৎ ভিন্ন সুরের মন্তব্য। রাম-লক্ষ্মণের ক্ষেত্রে যে অবনমনের প্রশ্নটি উদ্বেগের সৃষ্টি করে, এখানে তার স্থান নেই। মাইকেলের কবিমানস সীতার প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা-মমতায় স্পন্দিত, তাঁর হাতের আলেখ্যটিও মনোরম। তবে প্রশস্তি-মাদকতার আওতায় যে একটা প্রস্তাব দানা বেঁধে উঠতে চায়—মাইকেলের হাতের সীতা-চিত্র বাল্মীকির চেয়েও উজ্জ্বলতর—, তার কোনো সমর্থনই থাকতে পারে না, ঠিক যেমন গ্রাহ্য হতে পারে না রামায়ণের চেয়ে মাইকেলের সরমা-চিত্রেব উজ্জ্বলতার দাবী। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এই গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ের ষষ্ঠ ও সপ্তম পরিচ্ছেদে। এখানে কেবল এইটুকু বক্তব্য যে, মাইকেলের সীতা-চরিত্রের প্রশস্তিতে আতিশয্যের ঢেউ তুলতে গিয়ে ঐ যে বাল্মীকির প্রতি উপেক্ষা জাগানো হয়, তারও ফলশ্রুতি মূলত গিয়ে দাঁড়ায় সেই একই, অর্থাৎ রামায়ণ-বিমুখতা। তা ছাড়া, সত্যই যখন উজ্জ্বলতর নয়, তখন অনুরূপ প্রচারে সাধারণ পাঠককে মূল সৃষ্টি-মহিমার স্বরূপ-পরিচিতির অমূল্য সঞ্চয় থেকে বঞ্চনার অভিযোগও এসে পড়ে।

বস্তুত মাইকেলের সীতা বাল্মীকির সীতার খণ্ড-চিত্র মাত্র। তারই একটি মাত্র অংশে অঙ্গুলি নিবদ্ধ রেখে সমগ্র চিত্রগত উৎকর্ষের তারতম্য নির্ণয়ের

প্রয়াস বিজ্ঞের কাজ নয়। লক্ষ্মণের প্রতি সীতার ভৎর্সনার সেই মাইকেলী নমুনাটি অবশ্যই প্রশংসনীয়; কিন্তু সমগ্র-চিত্রের বিচারে ঐ পালিশের কাজটুকুই কি হবে চরম নির্ণায়ক ? ঐ নিয়েই কি ভুলে থাকতে হবে রামায়ণের সীতার বিপুল চরিত্র-মাহাত্ম্য ? তা ছাড়া, মহর্ষির হাতের সীতা-চিত্রে উত্তরকালে ঐ সীতার মুখেই ঐ লক্ষ্মণের উদ্দেশে কথিত শ্লোকাষ্টকের (সুন্দর—৩৮/৫৪-৬১, ৩য় অধ্যায়, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত) মাধ্যমে এপিক চরিত্রের যে মাহাত্ম্যের বাঁধন রচিত হয়েছে, তা উপেক্ষা করে এবং আরো বিভিন্ন পরিস্থিতিতে লক্ষ্মণ-সীতার পারস্পরিক আচরণ ও মনোভাবকে উপেক্ষা করে বিচার নিষ্পন্ন করা চলে না।

আরো একটি কথা। আলোচ্য ক্ষেত্রে তিরস্কারের আদলটা মাইকেলের হাতে অপেক্ষাকৃত মার্জিত হয়েছে, ঠিকই ; কিন্তু তিরস্কার যে আদৌ লক্ষ্মণের প্রাপ্য নয়, এটা মাইকেলের সীতাকেও অবশ্যই পরে বুঝতে হয়েছে, এবং এও বুঝতে হয়েছে, লক্ষ্মণের কথা না শোনা এবং তাঁকে রূঢ় ভাষায় উত্তেজিত করার ফলেই তাঁকে ঐ নিদারুণ দুর্দশায় পড়তে হয়। সুতরাং সীতার পক্ষে একটা অনুতাপ-প্রকাশ ছিলো খুবই স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত। মেঘনাদবধে তার যে কোন অবসর ছিলো না, তাও নয়। সরমার সঙ্গে দীর্ঘ আলাপে হরণোত্তর কতো বিবৃতিই তো সীতার মুখে বসানো হয়েছে। একটিবার লক্ষ্মণের নামও শোনা যায় তাঁর মুখে ('দেবর লক্ষ্মণ মোর, ভুবন-বিজয়ী'—৪/৩৯৮), কিন্তু সেই বাঞ্ছিত অনুতাপের সুরটুকু আমাদের খুঁজে হতাশ হতে হয়—যেটা থাকলে সীতা-চরিত্রে থাকতো সামঞ্জস্য, সুতরাং অধিকতর সৌষম্য, মাধুর্য ও মহিমা। মাইকেলে সামঞ্জস্যের প্রতি কোথাও নজর নেই। এইটাই তাঁর কবিপ্রকৃতি। তাই তাঁর সীতা রাবণকে একটা মৃদু তিরস্কারও করতে পারেন না। খালি লজ্জায় মরে যান (৩৭১), আর কান্নায় ভেঙে পড়েন, আর তারই মধ্যে জানাতে বিশেষ যত্নবান—দশাননের প্রতি বৃথা গঞ্জনা উচিত নয় (৩৮৩)।

মহর্ষি বাল্মীকি যে বলেছেন,—

কাব্যং রামায়ণং কৃৎস্নং সীতায়াশ্চরিতং মহৎ (১/৪/৭)

সমগ্র রামায়ণখানি সীতার মহৎ চরিত্রেরই বিশ্লেষণে ব্যাপৃত—তার কতটুকু দিতে পেরেছেন মাইকেল প্রায় সাতশ' লাইনের সুদীর্ঘ আসরে ? সীতাদেবীর

পক্ষে অপহর্তা রাবণের প্রতি অব্যাখ্যেয় নিরুত্তাপ আচরণই শুধু নয়, অধিকতর ব্যাখ্যাতীত মুগ্ধতা,—মুগ্ধতা ঐ রাক্ষসরথী-বেশী লঙ্কাপতির ঐশ্বর্যের প্রতি, তার স্বর্ণরথ পুষ্পকের ও বাজী-রাজির গতিবেগের প্রতি, মুগ্ধতা রাবণের শিভালরি ও শিভালরি-প্রণোদিত চাটুবাদের প্রতি,—এর মধ্যে কি রামায়ণের সীতার,—ভারতের আদর্শ নারীচরিত্রের আদৌ কোনো মূল্যবান সংকেত থাকতে পারে?

যাঁদের ধারণা, অশোকবনে সীতার বিষাদমলিন করুণ চিত্র-রচনায় মাইকেলের শিল্প-কলা ও শিল্পী-দরদ মূল রামায়ণের চেয়েও অধিকতর চিত্তাকর্ষক, তাঁদের ভ্রান্তি পরিতাপজনক, এবং যে প্রশস্তিমোহান্ধ প্রচারের ফলে বাংলায় ঐ ধারণার উৎপত্তি হয়েছে, ভারতীয় মহাকাব্য রামায়ণের শিল্প-মাহাত্ম্য তথা কবি-মাহাত্ম্যকে বাঙালীর কাছে আচ্ছন্ন অবজ্ঞাত করে রাখার দায়ে তাকে অবশ্যই দায়ী হতে হবে। মাইকেলের সীতা -(১) 'একাকিনী শোকাকুলা, অশোক কাননে, কাঁদেন রাঘব-বাঞ্ছা আঁধার কুটীরে নীরবে', (২) 'মলিনবদনা দেবী, হায় রে, যেমতি খনির তিমির-গর্ভে (না পারে পশিতে সৌর-কর-রাশি যথা) সূর্যকান্ত মণি, কিংবা বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশি-তলে।' (৩) 'প্রভা আভাময়ী তমোময় ধামে যেন', (৪) স্বর্ণ দেউটি যার তলায় জ্বলছে, এমন 'তুলসী' বৃক্ষ, (৫) তাঁর মুখের বচন-ধারা যেন গোমুখী নিঃসৃত জাহ্নবী-ধারা, (৬) তাঁর ভাষণের মিষ্টতা—'উত্তরিলা প্রিয়ম্বদা (কাদম্বা যেমতি মধু-স্বরা)', (৭) রাম-সীতার জীবন-যাপন—'কপোত-কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষ-চূড়ে বাঁধি নীড়, থাকে সুখে', (৮) ক্বচিৎ কখনো উমা-মহেশ্বরের মতো সীতা-রামের তত্ত্বকথার আসর বসতো পর্বতের উপর, (৯) সব শেষে, অশোকবনে সীতা—'একটি কুসুমমাত্র অরণ্যে যেমতি'।

এই হলো ৪র্থ সর্গের সীতা-মূর্তির উল্লেখযোগ্য চিত্রগুলির গাঁথুনী। এর মধ্যে 'বিম্বাধরা রমা', এবং 'কপোত-কপোতী যথা'—সীতার মতো নারীচরিত্রের পক্ষে তুচ্ছ পরিচিতি, অবাঞ্ছিতও বটে। উপমা চিত্ররূপে কেবল ২, ৩, ৪ ও ৯ এই চারটিই পাওয়া গেল সীতার বর্ণনায়, আর, এ কাব্যের একেবারে গোড়াতেই, বাল্মীকির প্রতিধ্বনি করে বলা হয়েছে 'পাবকশিখারূপিণী'। কিন্তু মহর্ষি-অঙ্কিত সীতা-চিত্রের তুলনায় মাইকেলের চিত্র যে কতো সামান্য, কতো দুর্বল, তা সম্যক বোঝানো এই সীমিত পরিসরে সম্ভব নয়।

এই অশোকবনে সীতার বর্ণনায় মহর্ষি শ্লোকের পর শ্লোক মালা গেঁথে

চলেছেন সর্গের পর সর্গে। পাঠকের কৌতূহল নিবারণার্থ এখানে সুন্দর কাণ্ড থেকে কয়েকটি মাত্র উদ্ধৃতি যোগে ঐ সীতা-চিত্রের ইঙ্গিত দেওয়া যেতে পারে, যার সাহায্যে, আশা করি উভয় চিত্রের পার্থক্য এক নজরেই স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

১। 'পিনদ্ধাং ধূমজালেন শিখামিব বিভাবসোঃ' (১৫।২০) অথবা, 'শোকজালেন মহতা বিততেন ন রাজতীম্। সংসক্তা ধূমজালেন শিখামিব বিভাবসোঃ ॥' (১৫।৩২),—এই হলো মাইকেলের 'পাবকশিখারূপিণী'-র আদি উৎস। [তিলকের টীকায় ঐ 'শিখামিব বিভাবসোঃ' হলো 'পাতিব্রত্যতেজসাজ্বলন্তীম্'।]

২। পীড়িতাং দুঃখসন্তপ্তাং পরিক্ষীণাং তপস্বিনীম্।
গ্রহেণাঙ্গারকেণেব পীড়িতামিব রোহিণীম্ ॥ (১৫।২২)

অশোকবনে দুঃখবিবশা কৃশকায়া সীতা যেন তপস্বিনীর মতো ; দুঃখ-পীড়নের অগ্নি-তপস্যায় পরিক্ষীণা। আবার, তাঁকে দেখে মনে হয় যেন রাহু-গ্রস্ত চন্দ্র।

৩। ভূমৌ সুতনুমাসীনাং নিয়তামিব তাপসীম্।
নিঃশ্বাসবহুলাং ভীরুং ভুজগেন্দ্রবধূমিব ॥ (১৫।৩১)

এখানে একই সঙ্গে চরিত্রটির কতোগুলি বৈশিষ্ট্য আলোচিত হয়েছে। তপস্বিনী-সুলভ সংযম, স্বাভাবিক ভীরুতা, ভিতরে হাহুতাশজনিত দীর্ঘশ্বাস-প্রবণতা, আবার, প্রচণ্ড চারিত্রিক তেজস্বিতা। ভুজগেন্দ্রবধূর রূপকটি তেজস্বী প্রতিবাদের ব্যঞ্জনা বহন করে। [তিলকটীকাঃ 'ভুজগেন্দ্রবধূসাদৃশ্যং দুষ্প্রধৃষ্যত্বেন রক্ষঃকুলনাশকত্বেন চ'।]

৪। তাং স্মৃতিমিব সন্দিগ্ধামৃদ্ধিং নিপতিতামিব।
বিহতামিব চ শ্রদ্ধামাশাং প্রতিহতামিব ॥
সোপসর্গাং যথা সিদ্ধিং বুদ্ধিং সকলুষামিব।
অভূতেনাপবাদেন কীর্তিং নিপতিতামিব ॥ (১৫।৩৩-৩৪)

সীতা যেন সন্দেহাকুল স্মৃতি, নিপতিত সমৃদ্ধি, বিহত শ্রদ্ধা, প্রতিহত আশা, কণ্টকিত সিদ্ধি, বিড়ম্বিত বুদ্ধি, ও অপবাদগ্রস্ত কীর্তি। রূপকালংকারে এই যে সীতা-বর্ণন, এর জুড়ি মাইকেলে কোথাও খুঁজতে যাওয়া বৃথা।

৫। আম্নায়াণামযোগেন বিদ্যাং প্রশিথিলামিব। (১৫।৩৮)

ঐ একই দৃষ্টিতে চলেছে মহর্ষির সীতাবর্ণন। ক্লিষ্টা বিবশা সীতা যেন শিথিলা বিদ্যা ; শিথিলতার কারণ অভ্যাস-যোগের অভাব (আম্নায়ঃ — অভ্যাসঃ)।

৬। সংস্কারেণ যথা হীনাং বাচমর্থান্তরংগতাম্। (১৫।৩৯)

যেমন শব্দব্যুৎপত্ত্যাদি সংস্কারহীন শব্দ ভিন্নার্থ প্রাপ্ত হয়ে থাকে, তেমনি স্নানা-হ্নলেপনাদি সংস্কারহীনা সীতাকে এমনই দেখতে হয়েছে যে, তাঁকে প্রায় চেনাই যায় না।

৭। শোকভারৈরিব ন্যস্তাং ভারৈর্নাবমিবাম্ভসি। (১৭।৩)

দুর্বহ দ্রব্যভারে সাগরে নিমজ্জমান তরণীর মতো সীতার বর্তমানে শোকভারে নিমজ্জমান দশা।

৮। ক্ষীণপুণ্যাং চ্যুতাং ভূমৌ তারাং নিপতিতামিব।
চারিত্রব্যপদেশাঢ্যাং ভর্তৃদর্শনদুর্গতাম্॥ (১৭।২০)

বর্তমান দুর্দশায় সীতা যেন পুণ্য ক্ষীণ হওয়ায় ভূপতিত তারা। পতিদর্শন বিরহিতা হওয়ায় তাঁর দুর্দশা, তবে তিনি যে বিশেষ ধনে ধনী তা হলো তাঁর পাতিব্রত্যধর্মাচরণ-খ্যাতি।

৯। বিযূথাং সিংহসংরুদ্ধাং বদ্ধাং গজবধূমিব।
চন্দ্ররেখাং পয়োদান্তে শারদাভ্রৈরিবাবৃতাম্॥ (১৭।২২)

সীতা যেন যূথপতি থেকে বিচ্ছিন্ন গজবধূ, যে এখন সিংহদলের মধ্যে বন্দী ও বন্ধনদশাগ্রস্ত। তাঁকে দেখাচ্ছে যেন শরৎকালীন মেঘে আচ্ছন্ন চন্দ্রকলার মতো।

১০। ক্লিষ্টরূপামসংস্পর্শাদযুক্তামিব বল্লকীম্। (১৭।২৩)

সীতা যেন নীরব বীণা, যার স্বরূপ এখন পরাভূত, নীরব, কেননা বাদকহীন।
[বল্লকী=বীণা, অযুক্তা — বাদকহীনা।]

১১। অশোকবনিকামধ্যে শোকসাগরমাপ্লুতাম।
তাভিঃ পরিবৃতাং তত্র সগ্রহামিব রোহিণীম্॥

* * *

তাং দেবীং দীনবদনামদীনাং ভর্তৃতেজসা।
রক্ষিতাং স্বেন শীলেন সীতামসিতলোচনাম্॥ (২৪।২৭)

স্থানটি অশোকবন, কিন্তু সেখানেই সীতা রয়েছেন শোকের সাগরে নিমগ্ন। চেড়ী-পরিবৃতা সীতা যেন রাহুগ্রস্তা রোহিণী।

ভিন্নদৃষ্টিতে, ঐ দীনবদনা দেবীকেই শোভা পেতে দেখা যায় উজ্জ্বলবদনা রূপে। ভর্তৃতেজেই, অর্থাৎ রামের তেজোবীর্য নিত্যস্মরণের ফলেই তাঁর এই উজ্জ্বলতা। আপাতদৃষ্টিতে তিনি অরক্ষিত, কিন্তু আসলে অসিতলোচনা সীতা আপন পবিত্র স্বভাবের দ্বারা সুরক্ষিত। (শীলেন = ভর্তৃবিষয়কসমাধিনা)।

১২। মলমণ্ডনদিগ্ধাঙ্গীং মণ্ডনার্হামমণ্ডনাম্।
মৃণালী পঙ্কদিগ্ধেব বিভাতি ন বিভাতি চ॥ (১৯।৬)

সীতার যে দিব্যদেহ অমূল্য আভরণে ভূষিত হওয়ার যোগ্য, সেই দেহ আজ নিরলংকার, মার্জনার অভাবে ধূলিমলিন। তার শোভা আজ পঙ্কমলিন পদ্মের ন্যায়, প্রকাশ পেয়েও সম্যক প্রকাশ পায় না, অথবা বিড়ম্বিত প্রকাশেই তার শোভা আরো সুন্দর। (তিলক-টীকার অনুসরণে:—বর্তমানে সীতার সন্ন্যাসিনী-জীবন, তাই, মলই তাঁর মণ্ডন, ধূলিমালিন্য তিনি তাঁর ভূষণ বলে মনে করেন · ···ইত্যাদি।)

১৩। সমীপং রাজসিংহস্য রামস্য বিদিতাত্মনঃ।
সংকল্প-হয়-সংযুক্তৈর্যান্তীমিব মনোরথৈঃ॥ (১৯।৭)

সীতাকে আটক করে রাখে, কার সাধ্য? মনে মনে তিনি নিয়তই চলেছেন সিদ্ধস্বরূপ রাজসিংহ রামচন্দ্রের সমীপে। চলেছেন মনোরথে, আর, সে রথ সংকল্পরূপ অশ্বের দ্বারা বাহিত। (টীকা:—সংকল্প := রামানুধ্যানম্, যান্তীমিব = গুষ্যন্তীমিব।)

১৪। চেষ্টমানামথাবিষ্টাং পন্নগেন্দ্রবধূমিব।
ধূপ্যমানাং গ্রহেণেব রোহিণীং ধূমকেতুনা॥ (১৯।৯)

সীতা যেন মন্ত্রৌষধিতে নির্জীত ভুজগেন্দ্রবধূ, যে ঐ আচ্ছন্ন অবস্থা ঝেড়ে ফেলে স্বীয় তেজস্বী স্বরূপ প্রকাশের জন্য ভিতরে কঠিন চেষ্টা করে চলেছে। তাঁর অন্তর্দাহ দেখে মনে হয়, তিনি যেন কেতুগ্রহের আক্রমণে রোহিণীর ন্যায় নিয়ত অন্তর্জ্বালায় জ্বলছেন।

এমন আরো কতোই না চিত্র মহর্ষি এঁকেছেন এই অশোকবনের সীতাকে নিয়ে। মাইকেলের সীতাকে উজ্জ্বলতর বলে ঘোষণায় রামায়ণের এই সীতাকে

যে আচ্ছন্ন রাখা হয় এবং একটা সাহিত্যিক মিথ্যাকেই প্রশ্রয় দেওয়া হয়—সেইটাই আমাদের বক্তব্য। সীতার প্রতি মাইকেলের শ্রদ্ধা যতোই থাকুক, তাঁর দৃষ্টি প্রধানত বহির্মুখী, কাহিনীমুখী। সীতা-চরিত্রের অভ্যন্তরে বেশিক্ষণ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখার মনোগঠন তাঁর নেই। বস্তুত বাল্মীকি যে গভীর অন্তঃসন্ধানী কবিদৃষ্টির বশে বলেন—

আয়তীমিব বিধ্বস্তামাজ্ঞাং প্রতিহতামিব।
দীপ্তামিব দিশং কালে পূজামপহতামিব॥ (১৯।১১)

সীতা যেন সৌভাগ্য বিধ্বস্ত, আজ্ঞা অবহেলিত, দিগ্‌দিগন্ত উৎপাতকালে জ্বলন্ত, পূজা উপদ্রুত,—সে-দৃষ্টি মাইকেলের কাছে আশা করাই বৃথা। বহির্বর্ণনেও এ যুগের কবির চাঞ্চল্যজনিত তরলতা কী ভাবে প্রকটিত, একটি দৃষ্টান্তে দেখানো যেতে পারে। মহর্ষি এঁকেছেন,—

একয়া দীর্ঘয়া বেণ্যা শোভমানামযত্নতঃ।
নীলযা নীরদাপায়ে বনরাজ্যা মহীমিব। (১৯।১৯)

সীতা দীর্ঘ একবেণী-ধরা, দেহ তাঁর অযত্নরক্ষিত। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁর শোভা হয়েছে নীলবনরাজিযুক্ত ধরিত্রীর মতো।

মাইকেলও এক স্থানে সীতাকে উপমিত করেছেন 'বসুধা'র সঙ্গে। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গির ও মনন-ধারার পার্থক্যে, বিশেষত চিত্রগত আবেদনের ঈপ্সিত তরলতায় সেখানকার ব্যঞ্জনা হয়েছে একেবারেই ভিন্ন।

ভেটিবে রাঘবে তুমি, বসুধা কামিনী—
সরস বসন্তে যথা ভেটেন মধুরে। (৪।৬৫৫ ৫৮)

মহর্ষির 'বনরাজ্যা মহীমিব'-চিত্রে সীতা-চরিত্রের যে শুচিশুভ্র বিশালতা, তার পাশে এখানকার মধুকে 'ভেটিতে' ব্যাকুল 'বসুধা কামিনী'-চিত্রে বিধৃত সীতা চরিত্রের ব্যঞ্জনাটি কেমন হয়েছে সহজেই অনুমেয়।

তা ছাড়া, রামায়ণের সীতা-চরিত্র আরো যে সব মহত্ত্ব ও মাহাত্ম্যের ব্যঞ্জনায় মণ্ডিত, মাইকেলের সীতার প্রচলিত স্তুতি-মত্ততায় সেগুলিও উপেক্ষিত হয়ে চলেছে। মাইকেল তার এই নারী-প্রতিমার আরতির জন্য নবম সর্গে পুনরায় যে একটু সংক্ষিপ্ত আয়োজন করেছেন, সেটি অবশ্যই প্রশংসনীয়। "ভবতলে মূর্তিমতী দয়া সীতারূপে, পরদুঃখে কাতর সতত,"—এ পরিচয়ের

সঙ্গে রামায়ণের সীতা-পরিচিতির সুরসাম্য অবশ্যই লক্ষণীয়। কিন্তু যে-কবির বিচারে 'মূর্তিমতী দয়া' এর আগেই বরাদ্দ হয়ে গেছে সরমার জন্য (৪র্থ সর্গ), তাঁর এই মন্তব্য সীতা-চরিত্রে কোনো বিশিষ্ট রং ধরাতে পারে না; পক্ষান্তরে এই বৈশিষ্ট্যই বাল্মীকির সীতাকে কী অপরূপ মহিমামণ্ডিত করেছে, তার পরিচয় রামায়ণের নানাস্থানে, বিশেষত রাক্ষসী চেড়ীদের প্রতি সীতার আচরণে। মাইকেলের সীতা কেবলই কারুণ্যদীনা, কেবলই অশ্রুমুখী। সাধারণ নারীর সাধারণ কারুণ্য-দুর্বলতায় এবং সাধারণেরও অধম রোদন-বিকলতায় নিত্যচিহ্নিত এই চরিত্র। লক্ষ্মণের প্রতি তিরস্কারের ঐ দৃঢ়তা সমগ্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন কবি-কল্পনার একটা আকস্মিক উপদ্রবের মতো। যে অসামান্যতার বিদ্যুচ্চমক ওখানে ফুটেছে, তাকে ঐ চরিত্রেরই নিজস্ব উপাদান বলে মনে করার মতো কোনো ইঙ্গিত আর কোথাও খুঁজে পাওয়ার উপায় নেই। আর সর্বত্রই মাইকেলের সীতা অশ্রুদুর্বলতায় ভেঙে-পড়া এক সাধারণ নারী। সুতরাং চরিত্রায়ণ-শিল্পের বিচারে ঐ তিরস্কারের অভিনব শিহরণ গোটা শিল্প-গাত্রে একটা ভূমিকম্পের মতো। কবিও একটিবার ঐ চমক আমদানী করে ভুলেই গেছেন তার কথা, পরম স্বস্তিতে এঁকে চলেছেন সেই দুর্বল নারীর অশ্রুকাতরতার তরঙ্গের পর তরঙ্গ। রামায়ণের সীতা কারুণ্যপরবশ হলেও এমন সামান্যা নারী নন। সেখানে স্নেহকারুণ্যের দৌর্বল্যের সঙ্গে আছে কোথাও প্রজ্ঞার বাঁধন, কোথাও সংকল্পের, কোথাও বা আদর্শের দৃঢ়তা। সেখানে অনুনয়ও আছে, নিষেধও আছে, আত্মসমর্পণও আছে আত্মসংরক্ষণও আছে; বন্দনাও আছে, বিচারও আছে; মাতা-কন্যা-বধূ ছাড়াও আছে শক্তিরূপিণীর আবির্ভাব, সে শক্তি কল্যাণরূপিণী। কল্যাণের জন্যই তা সর্বংসহা, কল্যাণের জন্যই তা রুদ্রতেজা। পুরুষকারসহায়িনীরূপেও ঐ কল্যাণীশক্তির আত্মপ্রকাশ।

রাক্ষসী চেড়ীদের প্রতি সীতার করুণার অন্তরে কান পাতলে শোনা যাবে প্রজ্ঞার রাগিণী। হনুমান তাদের শাস্তি দিতে চাইলে সীতা বলেন, তারা দণ্ডার্হা নয়, কেন না, তারা রাজার আজ্ঞাধীন হয়েই কাজ করেছে। 'রাজসংশ্রয়বশ্যানাং কুর্বতীনাং পরাজ্ঞয়া। বিধেয়ানাং চ দাসীনাং কঃ কুপ্যেৎ বানরোত্তম।' (যুদ্ধ—১১৬।৩৬) ব্যাঘ্র-ব্যাধ-ঋক্ষের পৌরাণিক কাহিনী উদ্ধৃত করে বুঝিয়ে দেন, 'ন পরঃ পরমাদত্তে পরেষাং পাপকর্মণাম্। সময়ো রক্ষিতব্যস্তু সন্তশ্চারিত্রভূষণাঃ॥ পাপানাং বা শুভানাং বা বধার্হাণামথাপি

বা। কার্যং কারুণ্যমার্যেণ ন কশ্চিন্নাপরাধ্যতি॥' (ঐ। ৪২-৪৩)। পরের জন্য যারা পাপ করে, প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা তাদের ঐ পাপকর্মকে অপরাধ বলে গণ্য করেন না। ন্যায়সম্মত আচার-বিধি রক্ষা করতে হয়, চরিত্রই সাধুদের ভূষণ। তা ছাড়া, অপরাধ করে না, এমন কে আছে? সুতরাং অপরাধী বা নিরপরাধ, বা বধার্হ সকলের প্রতিই করুণার পরিচয় দেওয়া উচিত।

রাবণের মতো দুর্দান্ত পুরুষের অত্যাচারের ভয়ে সীতা বেপথুমানা, কিন্তু তিনিই ঐ রাবণের মুখের উপর গর্জে ওঠেন,—

অসন্দেশাত্তু রামস্য তপসশ্চানুপালনাৎ।
ন ত্বাং কুর্মি দশগ্রীব ভস্ম ভস্মার্হতেজসা॥

(সুন্দর—২২।২০)

'রে নীচ! আমি এখনই আমার তেজে তোমাকে ভস্মীভূত করতে পারতাম, কিন্তু আমার প্রতি শ্রীরামচন্দ্রের তেমন আদেশ না থাকায় আমি পারছি না।' স্বাতন্ত্র্য ও পারতন্ত্র্যের, তেজ ও নম্রতার, বীর্য ও মাধুর্যের এই পুণ্য সঙ্গম, এই অপূর্ব সমন্বয় রামায়ণের সীতা-চরিত্রকে করেছে অনন্য। ঠিক এই সীতাকে দেখবার দৃষ্টি মাইকেলের ছিলো না। তাই তিনি রাবণ-সীতা-চিত্রে সীতাকে কেবলই রোদনবিবশা দেখিয়েছেন। 'অনন্যা রাঘবেণাহং ভাস্করেণ প্রভা যথা' (সুন্দর—২১।১৫) মহর্ষি-দত্ত সীতামুখনিঃসৃত রাবণ-ভর্ৎসনার এমন কালোপযোগী সুডৌল রূপটি তাই মাইকেলের মনে ধরে নি।

রামায়ণের যে সীতা পাতিব্রত্যের জীবন্ত বিগ্রহ, সেই সীতাই রাবণ-বধান্তে পুনর্মিলনের শুভ মুহূর্তে তাঁর জীবন-সর্বস্বের মুখে যেই শুনলেন হৃদয়-বিদারক অন্যায় অভিযোগ, অমনি অখণ্ড আত্মসমর্পণের মধ্যেও আত্মরক্ষায় কঠোর হয়ে, ঐকান্তিক বন্দনার মধ্যেও বিচারের অনুব্রতী হয়ে রামচন্দ্রের মতো আদর্শ পুরুষের অমন অভিমত পোষণের ধীর-নম্র-বিজ্ঞ বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হলেন। একদিকে বক্ষোপ্লাবী অশ্রুধারা, আর একদিকে অকাট্য যুক্তিধারা। সঙ্গে সঙ্গে কর্তব্য নির্ণীত হলো নিদারুণ।

চিতাং মে কুরু সৌমিত্রে ব্যসনস্যাস্য ভেষজম্।
মিথ্যাপবাদোপহতা নাহং জীবিতুমুৎসহে॥
অপ্রীতেন গুণৈর্ভর্ত্রা ত্যক্তায়া জনসংসদি।
যা ক্ষমা মে গতির্গন্তুং প্রবেক্ষ্যে হব্যবাহনম্॥

(যুদ্ধ—১১৬।১৮-১৯)

'লক্ষ্মণ, তুমি আমার চিতা প্রস্তুত কর। তোমাদের এই বিপদের এই পথেই শান্তি। স্বামী অপ্রীত হয়ে সর্বসমক্ষে যাকে ত্যাগ করেন, সেই নারীর যে গতি হওয়া উচিত, আমারও তাই হোক, আমি অগ্নিপ্রবেশে প্রাণ বিসর্জন দেবো।'

অবশেষে যখন সীতা অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, তখন রামচন্দ্রের উক্তিও স্মরণীয়। মধ্যে, বহু দেবতার অনুযোগের উত্তরে তিনি জানিয়েছিলেন, "আমি তো দেবতা নই, আমি আমাকে মানুষ বলেই জানি—'আত্মানং মানুষং মন্যে রামং দশরথাত্মজং" ;—তাই এখন বলছেন,—

ইমামপি বিশালাক্ষীং রক্ষিতাং স্বেন তেজসা।
রাবণো নাতিবর্তেত বেলামিব মহোদধিঃ॥
ন চ শক্তঃ স দুষ্টাত্মা মনসাপি হি মৈথিলীম্।
প্রধর্ষয়িতুমপ্রাপ্যাং দীপ্তামগ্নিশিখামিব॥
নেয়মর্হতি বৈক্লব্যং রাবণান্তঃপুরে সতী।
অনন্যা হি ময়া সীতা ভাস্করস্য প্রভা যথা॥
বিশুদ্ধা ত্রিষু লোকেষু মৈথিলী জনকাত্মজা।
ন বিহাতুং ময়া শক্যা কীর্তিরাত্মবতা যথা॥

(যুদ্ধ—১১৮।১৬-১৯)

সীতা নিজের তেজেই সুরক্ষিতা। সমুদ্র যেমন কিছুতেই বেলাভূমি অতিক্রম করতে পারে না, তেমনি গৃহগতা সীতাকে রাবণ মনে মনেও ধর্ষণ করতে পারে না, সীতা তার কাছে দীপ্ত অগ্নিশিখার মতো অপ্রাপনীয়া। সূর্যের প্রভা যেমন সূর্যেরই, তেমনি সীতা আমাতে অনন্যা। এ হেন সাধ্বীর রাবণের অন্তঃপুরে অবস্থানকালে বৈক্লব্য-স্পর্শ অভাবনীয়। চারিত্রিক পবিত্রতায় ত্রিলোকখ্যাতা এই জানকীকে আমি নিজের কীর্তির ন্যায় পরিত্যাগ করতে অক্ষম।

রামায়ণের এই সীতাকে দেখবার দৃষ্টিও যেমন মাইকেলের নেই, দেখাবার আয়োজনও মেঘনাদবধে নেই। রামায়ণের সীতা অশোকবনে বন্দীদশার জন্য কেবলই সরমার গলা জড়িয়ে কেঁদেই ভাসান না ('কাঁদিলা রূপসী, সরমার গলা ধরি কাঁদিলা সরমা।' মেঘ—৪।৬৩৯-৪০), সহজ উদ্ধারের পথ পেয়েও উদ্ধার চান না, কারণ, যা সহজ, তা প্রায়ই মহৎ নয়। মহাবীর হনুমান প্রমাণ দিয়েছিলেন যে, সমস্ত লঙ্কাপুরী সমেত সীতাকে পৃষ্ঠে বহন করে নিয়ে

যাওয়ার শক্তি তাঁর আছে। জানিয়েছিলেন তাঁর কামনা—'ইন্দ্র যেমন অগ্নিকে হব্য প্রদান করেন সেইরূপ আমি রামের হস্তে তোমাকে সমর্পণ করবো।' সীতা শুনে হৃষ্ট ও বিস্মিত হলেন বটে, কিন্তু উত্তরে নানা কথার মধ্যে বললেন, সমস্ত রাক্ষসদের বধ করে যদি তুমি জয়ী হও, তাতে রামের যশোহানি হবে। রামের সঙ্গে তুমি এখানে এসো, তাতেই মহৎ ফল হবে। আমি রাম ভিন্ন অন্য পুরুষকে স্পর্শ করতে চাই না, সে কারণ তোমার সঙ্গে যেতে পারি না। রাবণ আমাকে স্পর্শ করেছিলো বটে, কিন্তু কি করবো, তখন আমি অনাথা বিবশা ছিলাম।

যদি রামো দশগ্রীবমিহ হত্বা সরাক্ষসম্।
মামিতো গৃহ্য গচ্ছেত তত্তস্য সদৃশং ভবেৎ॥

(সুন্দর—৩৭।৬৪)

যদি রাম এখানে এসে দশাননন ও অন্য রাক্ষসদের বধ করে আমাকে এখান থেকে নিয়ে যান, তবেই তার যোগ্য কাজ হবে।

বারে বারেই বলেছেন, 'তত্তস্য সদৃশং ভবেৎ': 'বলৈঃ সমগ্রৈর্যুধি মাং রাবণং জিত্বা সংযুগে। বিজয়ী স্বপুরং যায়াত্তত্তস্য সদৃশং ভবেৎ॥ বলৈস্তু সংকুলাং কৃত্বা লঙ্কাং পরবলার্দন। মাং নয়েৎ যদি কাকুৎস্থস্তত্তস্য সদৃশং ভবেৎ॥" এই সীতা কেবল নিজেকে নিয়ে বিব্রত ন'ন, তিনি রামচন্দ্রেরও পুরুষকার-সহায়িনী।

অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় বনবাসে নির্বাসনের দারুণ আঘাত যখন সীতাকে বুঝতে হলো তখন তিনি হয়তো সেই ঘোরতর মিথ্যা কলঙ্ক ও মনোবেদনার অবসান ঘটাতে পারতেন জাহ্নবীজলে আত্মবিসর্জনে, কিন্তু লক্ষ্মণকে তিনি বললেন—

ন খল্বদ্যৈব সৌমিত্রে জীবিতং জাহ্নবীজলে।
ত্যজেয়ং রাজবংশস্তু ভর্তুর্মে পরিহাস্যতে॥

(উত্তর—৪৮।৮)

আজই আমার পক্ষে জাহ্নবীজলে জীবন ত্যাগ করা উচিত হবে না, কারণ আমার গর্ভে রয়েছে শ্রীরামের বংশধর।

শেষাংশটি মর্মজ্ঞ পণ্ডিতসমাজে বিবিধ ভাষ্যযোগ্য হতে দেখা যায়। ভর্তার রাজবংশ-রক্ষা, রাজবংশকে পরিহাসের (বিদ্রূপে অর্থাৎ কলঙ্কের) হাত থেকে রক্ষা, রামচন্দ্রকে পত্নীহত্যার দায় থেকে রক্ষা, প্রভৃতি নানা ভাষ্য রচিত

হয়েছে। সর্বোপরি, সকল সংকটের মধ্যে ভর্তা শ্রীরামচন্দ্রের মনোভিপ্রায়ের অনুসরণ তো আছেই। অর্থাৎ একই সঙ্গে অনন্যপারতন্ত্র্য ও নিজেকে বহুর কল্যাণে বিনিয়োগ, এই হলো এই সীতা-চরিত্রের মর্ম-ভাষ্য।

এই বিশ্লেষণে, আশা করি, এটা অবশ্যই স্পষ্ট হবে, মাইকেল সীতা-চরিত্রটিকে যতো সহজ করে নিয়েছেন, রামায়ণের সীতা ততো সহজ নয়। সে চরিত্র বিরাট, বিচিত্র ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ। বহু আদর্শের সমন্বয়ে তার ধাতু গঠিত। তার সম্পূর্ণ রূপটির সম্যক অবধারণের কোনো প্রয়াস মাইকেলে নেই। অথচ বিস্ময়ের বিষয়, মাইকেলের সীতা-চিত্রের অভিনবত্বের প্রশংসায় অনেকেই পঞ্চমুখ। 'গাঁথিব নূতন মালা'র মধ্যে নূতন সীতা, উন্নততর সীতা-আলেখ্যের নিশ্চিত সন্ধান পেয়ে বাল্মীকির সীতার উপরে এই সীতার স্থান নির্দেশ করেছেন। আমাদের বিচারে মাইকেল সীতা-চরিত্র নিয়ে নূতন যদি কিছু করে থাকেন, তো, অসামান্যকে সামান্য করেছেন, জটিলকে সহজ করেছেন, বিরাটকে ক্ষুদ্র করেছেন, এপিককে লিরিক করেছেন—মেঘনাদবধের (৪র্থ সর্গের) মধ্যে বীরাঙ্গনার একটা আসর-রচনার মহড়া সেরে নিয়েছেন। মাইকেলের সীতা-কাহিনী আমাদের ভালো লাগে ঠিকই, তবে এ ভালো-লাগা ঐ বীরাঙ্গনা-ভালো-লাগার সামিল। এ ভালো-লাগায় রামায়ণের সীতা-কাহিনীর আকর্ষণ খর্বিত হওয়ার প্রস্তাব শুধু নিরর্থক বা প্রমাদ-দুষ্ট নয়, অকল্যাণকর; কারণ তাতেই বাংলায় রামায়ণ বিপন্ন হয়ে পড়ে। তার চেয়ে বরং আমাদের মাইকেল-সমীক্ষার মোড় ঘুরিয়ে মধুসূদনকে epic-এর কবি বলে শ্রেষ্ঠত্বের বরণ দেওয়ার পরিবর্তে, কেবল-কবি—বীরাঙ্গনার কবি, চতুর্দশপদীর কবি, লিরিকের কবিরূপেই যুগশ্রেষ্ঠের মুকুটে ভূষিত করাই সংগত।

বস্তুত মাইকেলের সৃষ্টির সর্বত্রই অনুভূত হয় প্রবল লিরিকের টান, এবং লিরিকের টানে এপিক সৃষ্টির রূপান্তর-ভাবান্তর ঘটতে বাধ্য। কেবল সীতাই নয়, আরো কয়েকটি রামায়ণের চরিত্রকে আমরা ঐ কারণেই মাইকেলের কাব্যে ছোটো হয়ে যেতে দেখি। মন্দোদরী ও সরমা এরই দৃষ্টান্ত। তৃতীয় অধ্যায়ের ৭ম পরিচ্ছেদে এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। অথচ রামায়ণের বৃহৎ সৃষ্টি যেখানে ক্ষুদ্র হলো, তাকেই যদি উন্নত রামায়ণের মর্যাদা

দেওয়া হয়, তবে অবশ্যই প্রস্তাবটি উড়িয়ে দেওয়া চলে না যে, বাংলায় রামায়ণ বিপন্ন।

[৬] প্রমীলা-সমীক্ষা

'প্রমীলা'-র কবি মধুসূদনের কবি-কৃতির বিচারে অবশ্যই পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখতে হবে। সীতা ও প্রমীলা, মেঘনাদবধে এই দুটি নারী-চিত্র প্রশস্তভাবে অঙ্কিত। সীতাকে স্থান দেওয়া হয়েছে মূল কাহিনীর উপান্তে, প্রমীলার স্থান কাহিনীর অন্তরে। স্থূল দৃষ্টিতে দুজনের প্রত্যেকের জন্যই এক একটি সর্গ সংরক্ষিত। চতুর্থ সর্গ যেমন সীতার, তৃতীয় সর্গটি তেমনি প্রমীলার জন্য বরাদ্দ। কিন্তু আসলে এই কাব্য-রাজ্যে প্রমীলার দখল অনেক বেশি,—অনেক ব্যাপক, বিচিত্র শাখা-প্রশাখায় পরিব্যাপ্ত। নবম সর্গের মাথায় 'প্রমীলার চিতারোহণ' শিরোনাম বসিয়ে ওটিকেও বিশেষভাবে প্রমীলার বলে ভাবতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি। এ ছাড়া, প্রথম, পঞ্চম ও সপ্তমে আমরা কম-বেশি প্রমীলা-ভূমিকা দেখতে পাই। কবি-চিত্তে এদের সমষ্টিগত আবেদনের কথা ভাবলে স্বচ্ছন্দে বলা যায়, মাইকেলের কবিমানস এখানে যতোখানি প্রমীলা-প্রভাবিত, এতো আর কোনো নারী-চরিত্রে নয়। এখানে প্রমীলার রাজ্যে সীতা বন্দিনীমাত্র। কাব্যের নায়ক যদি হয় মেঘনাদ, তবে নায়িকার এই প্রাধান্য তো থাকতেই পারে। এ নিয়ে কোনো সমস্যার কথা উঠতে পারে না। সমস্যা শুধু তাঁদের, যাঁরা এই কাব্যের মধ্যে নূতন যুগের মহাকাব্যকে, নূতন যুগের নূতন রামায়ণকে খুঁজে পেতে চান। প্রমীলাকে নিয়ে উৎকৃষ্ট কাব্য হলেও হতে পারে, কিন্তু মহাকাব্য হতে পারে কি? রামায়ণের যথাসর্বস্ব যে সীতা, তাঁকে ধরে এক ফাঁকে কিছু লিরিক উচ্ছ্বাসের আবেগ মিটিয়ে নিয়ে, রামায়ণের কোথাও যে নেই, তাকেই নায়িকার সিংহাসনে বসিয়ে যদি কাব্যের ময়ূরপঙ্খী ছুটিয়ে দেওয়া হয, তবে সে কাব্য রামায়ণের যুগোপযোগী সংস্করণ, অথবা নূতন যুগের মহাকাব্য ঠিক হতে পারে কি না, একটু ভাববার দরকার বৈ কি। তা ছাড়া, সৃষ্টি হিসাবেও প্রমীলা-চরিত্র বা প্রমীলা-কাহিনীর সমীক্ষা আবশ্যক।

মাইকেলের প্রমীলা যেন একটি উপেক্ষিতার আবিষ্কার। আবিষ্কার ও উপস্থাপন উভয়ই কৃতিত্বপূর্ণ। এক প্রমীলা-কাহিনী মেঘনাদবধ-কাব্যে যতোটা অভিনবত্বের স্বাদ যুগিয়েছে, এতো আর কিছু নয়। কিন্তু সৃষ্টির চরিত্র-বিচারে এও পুরোপুরি লিরিক। আবেদনের বৈচিত্র্য সত্ত্বেও লিরিক। এপিক

কাহিনীতে লিরিকের আরোপ। অথবা বুঝি কবির 'epicling' আসলে লিরিকের উপাদানেই রচিত হওয়ার design মেনে চলেছে। সুতরাং তাঁর খতিয়ানে কোনো বিষমের জোড়কলম ঘটাবার চেষ্টা হয় নি, উপাদানের চরিত্রসাম্য মোটামুটি বজায় আছে। আমরা প্রশস্তিমোহে লিরিকও নয়, epiclingও নয়, একেবারে epic বলেই সবটাকে নিয়ে মাথায় তুলে নৃত্য করতে চাই। যাঁরা ঐ মন নিয়ে প্রমীলা-চরিত্রে উপাদান-বৈচিত্র্যের সমাবেশে মুগ্ধ হয়ে একে 'তিলে তিলে তিলোত্তমা' বলে থাকেন, আমরা তাঁদের সংগে একমত নই। বহু পরস্পর-বিরোধী মনোবৃত্তির ও কর্মকৃতির সংযোজন এখানে; কিন্তু সংশ্লেষণের অভাবে চরিত্রটি যথেষ্ট সজীবতার অধিকারী হয় নি। শিল্পীর শিল্পকলার অনেক খেলা এখানে। রূপকথা, রোমান্স, নাটক, অতিনাটক, মায় অতিপ্রাকৃত পর্যন্ত একাধারে স্থান পেয়েছে। এর কবির হাতে যাদুকরের সম্মোহনী দণ্ড। সেই দণ্ড-শাসনে এখানে 'বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খাওয়ার' মতো প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভঙ্গি, পৌরাণিক চণ্ডী ও আধুনিক প্রণয়িনীর ভূমিকা একই নারীর আচরণে প্রকটিত! ঐ একই শাসনে প্রমীলা যুগপৎ যুযুৎসু ও কুলবধূ; বীরমদে-কামমদে উন্মাদ ভৈরবী; সে রাঘবের বীরপণাও পরীক্ষা করতে চায়, আবার 'যে-রূপ দেখি সূর্পণখা পিসী মাতিল মদন-মদে' সেই রূপটিও দেখতে চায়,—অধিকন্তু, রণোন্মাদনার মধ্যেই পিতৃষসার মদনোন্মাদ নিয়ে রঙ্গও করতে চায়! সে রক্তবীজনাশিনী চামুণ্ডা, কিন্তু মনমথে না পারে জিনিতে;—আবার ঐ চামুণ্ডারই প্রাণের কথা—'অবলা কুলের বালা আমরা সকলে'—বারে বারে উচ্চারিত! সে যে-কোনো প্রতিপক্ষকে এককভাবে শক্তির লড়াইয়ে আহ্বান জানায়—ধনুর্বাণ, অসি-চর্ম, গদা, এমন কি, মল্লযুদ্ধেও (৩।৩২০-২৫), কিন্তু এটাও ঠিক যে, সে তাদেরই দলের দলী, যারা 'অবলা কুলের বালা' (৩।২৪২)! 'অধর' এবং 'লোচন', এই দুটিতে সে এমন শক্তি ধরে, যা সেনাবাহিনীকে উত্তেজিত করার উপযোগী বলে সগর্বে ঘোষণার যোগ্য :—'অধরে ধরি লো মধু, গরল লোচনে আমরা' (৩।১৪৮)! ভুজবলে কটক জিনিবার সংকল্প; কিন্তু গদাযুদ্ধে অভ্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও কবির কঠিন শাসনে এতটুকু কাঠিন্য সেই ভুজদ্বয়কে স্পর্শ করার উপায় নেই—সে ঠিক 'মৃণাল-ভুজ' রূপে বাহুবল্লরী হয়ে নায়িকার শোভাবর্ধন করছে—'নাহি কি বল এ ভুজ-মৃণালে?' (৩।১৪৯)!—একমাত্র যাদুকরের সম্মোহনীতেই এ সব হতে পারে সম্ভবপর, চরিত্রায়ণ-শিল্পের বিধানসম্মত কাব্যসৃষ্টিতে নয়।

তবু যে প্রমীলাকে আমাদের ভালো লাগে, সে এই চরিত্রের সমগ্রতার আবেদনে নয়, আংশিকতার মাধুর্যে। সেই সেই অংশ, যা সমগোত্রীয়। সেই মিষ্টি-মধুর বঙ্গবধূর পতিপ্রাণতা, এবং তার ট্রাজেডির মাধুর্য। একেই কেন্দ্র করে যে একটি সুর বেজে চলেছে চরিত্রটির পরিমণ্ডলে, সেইটুকুর ভালো-লাগাই প্রমীলাকে ভালো-লাগা। নচেৎ তার বিচিত্র কথায়, বিচিত্র আচরণে বা ভূমিকার বিচিত্র শাখা-প্রশাখায়, ততোঽধিক বিচিত্র আঙ্গিক-পরিবেশে কবি তাকে যেভাবে দেখিয়েছেন, তাতে সৃষ্টিটা হয়েছে যে হ-য-ব-র-ল, এটা প্রশস্তি-মোহমুক্ত নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে ধরা পড়বেই। রামায়ণে এই চরিত্রের কোনো নমুনা না থাকায় কবি-কল্পনা এখানে খুসীমতো উদ্দাম হওয়ার সুযোগ পেয়েছে, আর তাতেই সৌষ্ঠব হয়েছে বিপর্যস্ত, আবেদনের মধ্যে জেগেছে বারোয়ারি ভাব। কবি যদি কেবল উপেক্ষিতার উদ্ধারে ব্রতী হতেন, অথবা মূলের সঙ্গে সুরসঙ্গতি বজায় রেখে নূতন রাগিণীতে প্রমীলা-গাথা গাইতেন—যেমন তিনি গেয়েছেন 'বীরাঙ্গনা'র নারীদের নিয়ে, অথবা মেঘনাদবধের 'চিত্রাংগদা' নিয়ে—তাহ'লে, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস 'মেঘনাদের প্রতি প্রমীলা'-য় আমরা পেতাম এক অপূর্ব প্রাণস্পর্শী চরিত্র ও চিত্র, কাব্যও হতো এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। কবি মাইকেলের শ্রেষ্ঠ পরিচয় সেইখানে, যেখানে তাঁর সৃজনধর্মী লিরিক উৎসার সৃষ্টি-সৌষম্যের স্বাভাবিক তাগিদে সংযম-সংহতির শৈল্পিক তটরেখায় ধরা দিয়ে সুমিত খাতে প্রবাহিত হয়েছে। মেঘনাদবধে এর শ্রেষ্ঠ পরিচয় চিত্রাংগদা-চিত্রে। এই উপাখ্যানটি যেন 'বীরাঙ্গনা'রই একটি আসর কবির হাতে আগেই রচিত হয়েছে এখানে,—খালি 'রাবণের প্রতি চিত্রাংগদা' শিরোনামটি বসালেই হয়। এমন নিখুঁত নিটোল সৃষ্টি সমগ্র মেঘনাদবধে আর দ্বিতীয় নেই। বস্তুত চিত্রাংগদা-বৃত্তান্তের স্থান ঠিক 'নীলধ্বজের প্রতি জনা'র পাশে। মেঘনাদবধ কাব্যে চিত্রাংগদাই একমাত্র দৃষ্টান্ত যেখানে নূতন যুগের কবির হাতে রামায়ণের চরিত্র হয়েছে সুন্দরতর উজ্জ্বলতর, সামান্য হয়েছে অসামান্য, উপেক্ষিত হয়েছে অপূর্ব।

কিন্তু তবু যে বাংলা সমালোচনার আসরে চিত্রাংগদার কবির চেয়ে প্রমীলার কবিরই গৌরব বেশি, তার কারণ, সম্ভবত, সৃষ্টি হিসাবে প্রমীলা বৃহত্তর, এবং বুঝি, আরো বেশি মৌলিক। দুইয়ের মধ্যেই সম্ভবত আধুনিক সমালোচক রেণেসাঁসের নারী-জাগৃতির অকাট্য প্রমাণ পেয়েছেন! তবে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য ভাবধারার তরঙ্গ-ভঙ্গ প্রমীলায়, বুঝি, আরো প্রত্যক্ষ, আরো ভাস্বর,

আরো বিপুল! সুতরাং এযুগের মাইকেল-প্রশস্তির অন্যতম শক্ত বাঁধন এই প্রমীলার দ্বারা মাইকেলের কবি-মানস বা কবিদৃষ্টির গঠন ও তাঁর সৃষ্টির চরিত্র-বিচার প্রভূত পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত বলেই ধরতে হবে।

কিন্তু সৃষ্টি হিসাবে প্রমীলা যে কোন্ স্তরের, আগেই তার সংকেত দেওয়া হয়েছে। নারী জাগৃতির প্রশ্নে বলতে হয়, রামায়ণের নারী চরিত্রে মহর্ষি-দত্ত যে জাগৃতির মহনীয় লক্ষণ ছিল প্রোজ্জ্বল, বিশেষত, সীতা, মন্দোদরী ও সরমায়, তা মাইকেলের হাতে এমন স্তিমিত হয়ে গেল কেন? ব্যক্তিত্বের বিশালতায়, শুভাশুভ-বিচারে, ভূমিকা-নিরূপণের স্বাধীনতায় এবং প্রজ্ঞাদৃষ্টির পরিচয়ের মধ্যে এইসব চরিত্রে যে জাগৃতির স্বাক্ষর ছিলো জ্বলন্ত, তাকে অবগুণ্ঠিত করে এই নারীচরিত্রগুলিকে যে সেই জাগৃতি-বঞ্চিত যুগের 'অবলা কুলের বালা' কুলবধূ বা অন্তঃপুরবাসিনী গৃহিণীরূপেই দেখানো হয়েছে, এর মূলে কবির কী মানস ইঙ্গিত লক্ষণীয়? প্রমীলার অন্তরের কথাও তো আড়ম্বরের চাপে হাঁপিয়ে ওঠে, সব ঝেড়ে ফেলে বারে বারেই বেরিয়ে আসতে চায়—'অবলা কুলের বালা আমরা সকলে'! তবে প্রগতির অকাট্য প্রমাণ অবশ্য কবচাবৃত উচ্চ-কুচ-যুগশোভিতা সুসজ্জিতা সালংকারা রস্তোরু প্রমীলার ঘোড়ায় চড়া মূর্তি! আর প্রাচ্য-প্রতীচ্যের ভাবধারার তরঙ্গ-ভঙ্গ যতো হোক না হোক, প্রমীলাকে নিয়ে কবিচিত্তের একটা তরঙ্গ-হিল্লোল আমরা প্রবলভাবে অনুভব করি—যেখানে তিনি উমা-বিজয়া-সংলাপে উমার চোখে নিজেই দু'চোখ ভরে উপভোগ করেন সেই ঘোড়ার দুলকি চালে চলার ফলে পিঠের উপর গৌরবর্ণ তরুণী-দেহের ওঠা-নামা—ঢেউয়ের দোলায় সোনার কমলের মতো:

> তুরঙ্গম-আস্কন্দিতে উঠিছে পড়িছে
> গৌরাঙ্গী, হায়রে মরি, তরঙ্গ-হিল্লোলে
> কনক-কমল যেন মানস-সরসে! (৩।৫৮৬-৮৮)

কিন্তু প্রমীলাকে নিয়ে সমালোচনা যেমনই হোক, এ চিত্র যে শক্তিশালী শিল্পীর হাতে রচিত তাতে সন্দেহ নেই। সে শিল্পের আস্বাদন চলুক যেমন খুসী রসিক সমাজে। তবে ঐ দিয়েই যদি নূতন যুগের মহাকাব্যের কোনো নূতন মহিমা নির্ণয়ের চেষ্টা হয়, তবে তাতে রামায়ণকে বিপন্নই করা হবে—যেটা হবে না মাইকেলের চিত্রাংগদার মহিমা-কীর্তনে। প্রমীলা অরামায়ণীয়; তাকে অত্যুজ্জ্বল (?) করে, যা রামায়ণের প্রাণ-সম্পদ—সেই সীতা-সরমা-

মন্দোদরী প্রভৃতিকে যদি ম্লান অথবা বিকৃত করা হয়, আর সেই কবি-কর্মই সাদরে সম্বর্ধিত হয় নূতন যুগের উন্নততর মহাকাব্যরূপে, তবে বাংলায় রামায়ণকে বিপন্ন করা হয় না কি ?

[৭] হিন্দী-তামিল তেলেগু-মালয়ালম রামায়ণ-প্রসঙ্গ : তুলসীদাস : 'প্রমীলা' ও 'সুলোচনা' (তুলসীদাস) : আধুনিক হিন্দীতে মাইকেলের প্রভাব : কৃত্তিবাস ও তুলসীদাস

প্রমীলার আবিষ্কার মূল্যবান। কিন্তু আবিষ্কার বা নূতন সংযোজন কৃত্তিবাসে কি কিছু কম ? যে বীরবাহুর প্রসঙ্গ নিয়ে মাইকেলের কাব্যের যাত্রা সুরু, যাকে অবলম্বন করেই মেঘনাদবধে বীর-করুণ যুগ্মধারায় কাব্যরসের গঙ্গাযমুনা বইতে সুরু করেছে, কৃত্তিবাসের সেই বীরবাহু ও তজ্জননী চিত্রাংগদার উপাখ্যান মূল রামায়ণ থেকে পাওয়া নয়। এ ছাড়া তো আরো কতোই আছে। গ্রহণ-বর্জন-সংযোজন, প্রতিভার বিকাশ সবকিছুতেই ঘটতে পারে। রামায়ণের মতো মহাকাব্য যুগে যুগে ভারতের কবিদের নব নব সৃষ্টির প্রেরণা যোগাবে, এইটাই স্বাভাবিক, এইটাই চলে এসেছে ভারতের বিভিন্ন বড়ো বড়ো ভাষায়। উত্তর-ভারতের হিন্দীতে বা দক্ষিণ-ভারতের তামিল-তেলেগু-মালয়ালমে রামায়ণ-কাহিনীর অভাব নেই। এদের মধ্যে হিন্দী ও তামিলের শ্রেষ্ঠ রামায়ণকার তুলসীদাস ও কম্বনের রামায়ণে কতোই না নূতনের সমাবেশ আছে, কিন্তু মূল রামায়ণকে কোথাও কুণ্ঠিত হতে দেখা যায় না। সর্বত্রই রামায়ণ 'ভারতের মহাকাব্য' হয়েই আছে। কী 'রামচরিতমানস' (হিন্দী—তুলসীদাস), কী 'রামাবতারম্' (তামিল—কম্বন), অথবা 'রঙ্গনাথ রামায়ণ' (তেলেগু—কোনা বুদ্ধরাজ), কিম্বা Kaṇṇaśśa Ramayan (মালয়ালম্—রাম পাণিক্কর), কোথাও রামাযণ অরামায়ণ হয়ে যায় নি, অথচ প্রত্যেকটিতেই আছে কবির স্বকীয়তা, প্রতিভার অমর স্বাক্ষর। বিভিন্ন অঞ্চলের কবি আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের সংযোগে বাল্মীকি-রামায়ণকেই করেছেন আস্বাদ্যতর, যদিও অভিনবত্বের অভাব নেই। মাইকেল যদি হয়ে থাকেন Milton of Bengal, রাম পাণিক্কর হয়েছেন Chaucer of Malayalam (১)। কিন্তু সমগ্র রাম-কাহিনী দক্ষিণ-ভারতের বুঝি এই কাব্যেই অখণ্ড রূপ প্রাপ্ত হয়েছে। তামিল রামায়ণের

(১) A History of South India—K. A. N. Sastri

শ্রেষ্ঠ কবি কম্বন যদিও নিজে বলেছেন, তিনি বাল্মীকির পদচিহ্ন অনুসরণ করেই রামায়ণ রচনা করেছেন, তবু তাঁর কাব্য অনুবাদমাত্র নয়। কৃত্তিবাসী রামায়ণের মতো, তাঁর কাব্যও দেশ-কালের রং-ধরানো বলেই তামিলভাষীর কাছে রামায়ণকে করেছে জনপ্রিয়। কোশল-রাজ্য সেখানে হয়েছে চোল-দেশের আদর্শায়িত সংস্করণ। কম্বনের রামচন্দ্র সংস্কৃতের মতো তামিল বাগ্‌ধারা (idiom)-প্রয়োগেও সুপণ্ডিত। রোমান্টিকতার নূতন হাওয়া বহিয়েছেন কম্বন মূল-বহির্ভূত রাম-সীতার পূর্বরাগের দৃশ্য আমদানী ক'রে—রামের মিথিলা-প্রবেশের পরেই দৈবাৎ সীতা-দর্শনের প্রসঙ্গ জুড়ে দিয়ে। এ ছাড়া, রামের অঙ্গুরীয়-প্রাপ্তিতে অশোকবনে বন্দিনী সীতার প্রতিক্রিয়ার মহর্ষিদত্ত ইঙ্গিতটুকু থেকেই তামিল-কবি কম্বন পরম উপভোগ্য মণ্ডন-কলা-সমৃদ্ধ রোমান্টিক আবেগ-কম্পনের বিপুল পসরা সৃষ্টি করেছেন (১)। কিন্তু রামায়ণের মূল সুরে কোথাও বেসুর বাজে নি।

স্বনামধন্য কবি তুলসীদাস বিহার-উত্তরপ্রদেশকে নানাভাবে জীবন্ত করেছেন তাঁর 'রামচরিতমানসে'। বালকাণ্ডে বিশ্বসৃষ্টির রহস্য-ব্যাখ্যায় যেখানে তুলসীদাস ব্রহ্মার সৃষ্টিতে ভালো-মন্দ ধর্ম-অধর্ম দুইয়েরই মিশ্রণের কথা বোঝাতে চেয়েছেন, সেখানে বেদ-পুরাণে কথিত বলে জানিয়েছেন :—

কাসী মগ সুরসরি ক্রমনাসা।
মরু মারব মহিদেব গবাসা॥

[এখানে যেমন আছে কাশী (বারাণসী)-র মতো পুণ্য স্থান, তেমনি আছে মগধ বা উত্তর-বিহার (যা কবির মতে অভিশপ্ত); যেমন আছে পবিত্র গঙ্গা, তেমনি আছে কর্মনাশা (বিহারের নদী, কিম্বদন্তী অনুযায়ী উৎপত্তি যার পাপ থেকে এবং সেখানে স্নানের ফলে পুণ্য হয় বিনষ্ট); যেমন আছে মারবারের (পশ্চিম-রাজপুতানা ও সিন্ধু) মরুভূমি, তেমনি স্বর্ণপ্রসূ মালবদেশ; যেমন আছে দেবতুল্য মানুষ, তেমনি গো-খাদক বর্বর সমাজ।]

রাম-চরিত-বর্ণনের মূল ছাঁচটাই তুলসীদাসের নিজস্ব। মহাভারতের মতো বক্তা-শ্রোতার ছাঁচ এখানে। পার্বতীর কৌতূহল নিবারণার্থ শংকর রাম-চরিত বিবৃত করে চলেছেন। মধ্যে ভক্তকবি তুলসীদাস আপন মনের আবেগ

(১) A History of South India—ঐ

প্রকাশের অবসর করে নিয়েছেন অজস্র। এপিকে-লিরিকে এখানে অপূর্ব সমন্বয়। বিষয়ের চরিত্র বিশুদ্ধ এপিক-ই আছে। সুরারোপ ও উপস্থাপন-ভঙ্গিমায় লিরিক আবেদন হয়েছে মর্মস্পর্শী ও মহিমান্বিত। তামিল-রামায়ণের মতো এখানেও বিবাহের পূর্বে রাম-সীতার আকস্মিক সাক্ষাৎকার ও উভয়ের মধ্যে পূর্বরাগের সূচনার কথা বর্ণিত হয়েছে, যার কোনো উল্লেখ বাল্মীকি-রামায়ণে নেই।

এ ছাড়াও আছে তুলসীদাসী রামায়ণে কবির মৌলিকতার কতোই না পরিচয়। কিন্তু রামায়ণের মূল সুরে কোনো বেসুর-ভাবনার প্রশ্নই এখানে আসে না। বরং মূলের আবেদন-মাহাত্ম্য নূতন যুগের নূতন সুরে নবীভূত হয়ে উঠেছে—

সীতারামগুণগ্রামপুণ্যারণ্যবিহারিণৌ।
বন্দে বিশুদ্ধবিজ্ঞানৌ কবীশ্বরকপীশ্বরৌ ॥

[কবীশ্বর শ্রীবাল্মীকি ও কপীশ্বর শ্রীহনুমানজী উভয়েই বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার অধিকারী ; রাম-সীতার পূত চরিত্রাশ্রিত স্বর্গীয় গুণাবলীর পুণ্যারণ্যে উভয়েই মনের আনন্দে বিহার করেছেন ; আমি উভয়কেই বন্দনা করি।]

এই বন্দনার মধ্যে তুলসীদাসের নূতন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। ভক্তি ও সেবার যুগ্ম-সাধনার কাব্য হিসাবেই সম্ভবত মহাত্মা গান্ধী এই তুলসীদাসের রামায়ণকেই এমন শ্রেষ্ঠত্বের পতাকায় চিহ্নিত করেছিলেন ; এবং বৈদেশিক বিদগ্ধ সমাজ একে "the perfect example of the perfect book" বলে অভিনন্দিত করেছেন।

যে-প্রমীলার আবিষ্কার প্রসঙ্গে আমরা ভারতের অপরাপর ভাষার রামায়ণের কথায় এসে পড়েছি, এই তুলসীদাসী রামায়ণেরই এক বিশেষ সংস্করণে সেই 'প্রমীলা'র ভূমিকায় অর্থাৎ মেঘনাদের সহধর্মিণীর ভূমিকায় 'সুলোচনা' নামে একটি নারী-চরিত্র পাওয়া যায়(১)। যদিও 'ক্ষেপক' রূপেই সুলোচনা-কাহিনীর অন্তর্ভুক্তি, তবু সেখানেও আছে সহমরণ-বৃত্তান্ত। আনুষঙ্গিক বিবরণে পার্থক্য যথেষ্ট ; কিন্তু তবু একটা ছায়া-ছায়া মিল চোখে পড়ে। প্রমীলার রামসমীপে গমনের মতো ঐ তুলসীদাসী রামায়ণে সুলোচনার রামসমীপে গমন কাহিনী

স্থান পেয়েছে। সুলোচনার সঙ্গেও ছিলো এমন রক্ষীবাহিনী যার সংযোগে সেই অভিযানের মধ্যে প্রমীলার সামরিক অভিযানের একটা ক্ষীণ সাদৃশ্য কল্পিত হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে সুলোচনা আদৌ কোনো সামরিক ভূমিকাই নেয় নি। তাকে কবি দেখিয়েছেন একেবারে মেঘনাদের মৃত্যুর পরে। তার 'সতী' হওয়ার কাহিনীই প্রধানভাবে উদ্দিষ্ট। "অথ ক্ষেপক। সুলোচনাকে সতী হোনেকী কথা।" —এই শিরোনামে বিবৃত হয়েছে সুলোচনা-বৃত্তান্ত। মনে পড়ে আমাদের 'প্রমীলার চিতারোহণ' শিরোনামে মেঘনাদবধের নবম সর্গের অংশবিশেষের পরিচিতি। কিন্তু হিন্দী রামায়ণের বৃত্তান্ত সম্পূর্ণ পৃথক। অলৌকিক উপায়ে সুলোচনা জানতে পারে স্বামীর যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুর কথা। সে এখানে নাগসুতা। সহচরী-সংখ্যা তারও যথেষ্ট। ঐ শোকাবহ পরিস্থিতিতে সখী-আলাপের মধ্যে জানা যায়, সুলোচনা তার স্বামীর অসামান্যতার পরিচয় হিসাবে জানে যে, যে-বীরের হাতে মেঘনাদের মৃত্যু হবে সেও হবে অসামান্য।

নীন্দ নারী ভোজন পরিহরই।
বারহ বর্ষ তাসু কর মরই॥

[তারই হাতে মৃত্যু হবে, যে বারো বৎসর নিদ্রা, নারীসঙ্গ ও আহার পরিত্যাগ করে কাটাতে সক্ষম হবে।]

সম্ভবত এখানে ষোড়শ শতকীয় তুলসীদাসের উপর পঞ্চদশ শতকীয় কৃত্তিবাসের প্রভাব পড়েছিলো; তাই লক্ষ্মণের চরিত্র-পরিচয়ে ঠিক একই সুরের গাঁথুনি দেখা যায়। তবে কৃত্তিবাসে মেঘনাদের বহুপত্নীত্বের কথা থাকলেও সেখানে প্রমীলাও নেই, সুলোচনাও নেই। কোনো এককের বিশেষ উল্লেখ নেই।

সুলোচনাও বহুগুণান্বিতা। তেজস্বিনী সেও কম নয়। তুলসীদাসের মন্দোদরী পুত্রশোকে মুহ্যমান, সুলোচনার প্রতি সমবেদনায় বিহ্বল। শোকার্ত হলেও রাবণের দম্ভ ঘোচে না। সদ্যোবিধবা পুত্রবধূ সুলোচনা যেভাবে রাবণকে সমুচিত কথায় জর্জরিত করে, তার মধ্যে মাইকেলের চিত্রাংগদার আভাস পাওয়া যায়। সুলোচনা সিদ্ধান্ত নিলো, রামচন্দ্রের কাছে পতির মৃতদেহ ভিক্ষা চাইবে এবং সহমরণ বরণ করবে। লংকাপুরীর অন্তঃপুরে সুরু হলো এই নিদারুণ শোকাবহ অভিযানের প্রস্তুতি। সংকল্প ও অশ্রুবেগ উভয়ই দুর্বার। চারিদিকে বিরহ-বিচ্ছেদের বেদনা। কতো পাখী, কতো মৃগ, কতো

তোতা-ময়না পুষেছিলো সুলোচনা। কবি তোতা-ময়নার মুখে বসিয়েছেন বিচ্ছেদ-কাতর বুলি,—'কাঁহা যাতী হো?' শকুন্তলার চেয়েও করুণ এই বিদায় দৃশ্য!

সুলোচনা রাম-শিবিরে যেতে পারতো কালো ঘোড়ায় চড়ে, কালো 'ব্যাজ' পরে, তার সঙ্গিনীরাও অনুরূপ শোক-প্রকাশের পাশ্চাত্য মডেল দেখাতে পারতো। কিন্তু হিন্দী কবি ঐ বিকারের পথ ধরেন নি। শিবিকাযোগেই সুলোচনা চলেছে। তথাপি দেখা যায় রামশিবিরের নিম্নমহলে ক্ষণেকের জন্য একটা সন্দেহ ও আশংকার দমকা হাওয়া,—যার সংগে ক্ষীণ সাদৃশ্য মেঘনাদবধের তৃতীয় সর্গের অনুরূপ প্রতিক্রিয়ায়। তবে হিন্দী কবি যেখানে ঐ সন্দেহ বা ভয়কে অমূলক বলে দেখাতে কালাবিলম্ব করেন নি, বাংলার শক্তিশালী কবি সেখানে সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছেন ঐ আবহাওয়াকে শাণিয়ে তুলতে এবং কেবল নিম্নমহল নয়, উচ্চতম যিনি, অর্থাৎ শিবিরাধিপতি স্বয়ং রামচন্দ্রকেও নারী-বাহিনীর ভয়ে পঙ্গু করে দেখাতে। সুলোচনার স্বামীর চিতায় আত্মাহুতির মধ্যে কোনো আলৌকিকের লীলা নেই, কৈলাস থেকে প্রেরিত কোনো অগ্নির অথবা কোনো আগ্নেয় রথের নাটকীয় আবির্ভাব নেই, অনুমরণের পরিবর্তে সশরীরে স্বর্গগমনের চমকপ্রদ বৃত্তান্ত নেই। বীর-পতির বীরোচিত মৃত্যুতে রামচন্দ্রের আশীর্বাদসহ সগৌরবে সতী-ব্রত-পালনের অমর মাহাত্ম্যে সুলোচনা এক আদর্শ ভারতীয় নারীরূপেই চিত্রিত হয়েছে।

'ক্ষেপকে'র অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় আলোচ্য সংস্করণের সুলোচনা-উপাখ্যানটিকে তুলসীদাসী রামায়ণে পরবর্তীকালীন সংযোজন বলেই অনেকে মনে করেন। এই সংযোজন মাইকেলের পূর্ববর্তী বা পরবর্তী, এটা সন্ধান-সাপেক্ষ। কিন্তু সে যেমনই হোক, প্রমীলা-স্থলে সুলোচনা এইটাই প্রমাণ করে যে, অভারতীয় ভঙ্গি-রঙ্গির ভেজাল এড়িয়ে মেঘনাদ-পত্নীর শূন্যস্থান পূরণ করা ও সেই সূত্রে রামায়ণকাহিনীতে নূতনত্বের স্বাদ যোগানো, রাক্ষস-পক্ষীয়দের জীবনের প্রতি পাঠকের মমতা-জাগানো অথচ রামায়ণের মৌল আবেদনকে অক্ষুন্ন রাখা কিছুই অসাধ্য নয়। তার জন্য রামায়ণকে অ-রামায়ণ হয়ে যেতে হয় না। মেঘনাদবধের কবি নিজে কী চেয়েছিলেন জানি না, তবে বাংলার মাইকেল-ভাষ্যে যেটা প্রবল হয়ে ফুটতে চায়, তা হলো, **মেঘনাদবধে রাবণায়ণের মূল সুরেরই একটি নিপুণ রাগিণী-আলাপ এর প্রমীলা-কাহিনী।** এইখানেই আসে বাংলায় রামায়ণ বিপন্ন হওয়ার কথা।

শক্তিধর কবি মধুসূদনের শক্তিদীপ্ত অমর কাব্য মেঘনাদবধ স্বভাবতই বাংলার ভগ্নীস্থানীয়া হিন্দীকে প্রভাবিত করেছে। অনুবাদও হয়েছে গোটা কাব্যের। আধুনিক হিন্দী কবিদের অনেকের মনে মাইকেলী রং ধরেছে বেশ। সেখানে 'রাবণায়ণে'র নূতন ঢং দেখা দিয়েছে। রচিত হয়েছে শক্তিশালী কবির হাতে শক্তিশালী লিরিক, যার কেন্দ্রে বিরাজমান রাবণ এক চমক-লাগানো রোমান্টিক নায়ক-ভূমিকায়! (১) যতদূর জানা যায়, রামায়ণের মতো সিদ্ধরসের মহাকাব্য নিয়ে, বিশেষত তার কোনো বড়ো চরিত্রকে নিয়ে এমন খেয়ালী কাব্য-বিহার হিন্দী বিদগ্ধ সমাজে তথা সাধারণ হিন্দীভাষী সমাজে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে (২)। তবে আমাদের কথা হলো, এ ধরণের কাব্য-বিলাস যুগ-রুচির ফল। আর এমন কিছু কিছু লিরিক উচ্ছ্বাসের জন্য হিন্দীর মতো বিশাল সাহিত্যের হয়তো কিছুই এসে যায় না, সেখানে রামায়ণ বিপন্ন হওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। বাংলার মতো সেখানকার লোকায়ত সমাজে হর-গৌরী-কথা বা রাধাকৃষ্ণ-কথার চাপে রামায়ণ-কথা কোণ-ঠাসা হয়ে যায়নি। লোকসাহিত্যের আলোচনায় তাই, রবীন্দ্রনাথকে দেখা যায় বাংলার ও উত্তর-ভারতের জনরুচির সমীক্ষায় উত্তর-ভারতের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এবং বাংলার রুচি-দৌর্বল্যে উদ্বেগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে (বর্তমান অধ্যায়েই পূর্বে আলোচিত)। তা ছাড়া, যেখানে তুলসীদাসের মতো কবির চতুঃশতাব্দীর অক্ষুণ্ণ প্রতিষ্ঠা, সেখানে রামায়ণের গায়ে আঁচড়-ধরানো সহজ নয়। বাংলায় কৃত্তিবাসের প্রতিষ্ঠা অবশ্য আরো দীর্ঘ কালের, কিন্তু কৃত্তিবাসের কবিত্ব-শক্তি তুলসীদাসের তুলনায় ক্ষীণ-প্রকাশ। পাণ্ডিত্যের কথা স্বতন্ত্র। দীনেশ সেন জানিয়েছেন, কৃত্তিবাস সংস্কৃত শাস্ত্রে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু সংস্কৃতের অমূল্য সম্পদকে বাংলা ভাষায় বাঙালী সমাজের উপযোগী করে বাঙালীর ঘরে ঘরে উপভোগ্যরূপে পরিবেশনের জন্য কৃত্তিবাস পাণ্ডিত্যের পথে না গিয়ে সহজ প্রাণস্পর্শী প্রকাশের পথ ধরেছিলেন। এতৎসত্ত্বেও কৃত্তিবাসের রচনায় যে কবিত্বের স্ফুরণ ঘটেছে তা সামান্য নয় কিন্তু আধুনিক বাংলার বিদগ্ধ-সমাজ বুঝি কৃত্তিবাসী রামায়ণকে নিতান্তই পল্লীর অবসরক্লিষ্টা গৃহিণী-পাঠ্য বা মুদী-পাঠ্য করেই রাখতে চান। রচনা হিসাবে

তুলসীদাসী রামায়ণ সত্যই কাব্যমূল্যে অনেক বেশি সমৃদ্ধ, তাই হিন্দীতে অ-রামায়ণী সুর আমল পাবে না। কিন্তু একে কৃত্তিবাসের কবিত্ব সরল সহজ খাতে প্রবাহিত, তার উপর রচনার অন্তর্নিহিত আবেদন-সন্ধানে এতোকাল যে শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা ছিলো, আজ তা অবসিতপ্রায়। এর উপরেও আছে বাংলার পণ্ডিতী বিচারে কৃত্তিবাসের তুচ্ছতার প্রতি কটাক্ষ। বাংলার 'কবিশেখর'ই যদি বলেন, 'কৃত্তিবাসের রামায়ণ প্রকৃতপক্ষে শিশুরঞ্জন রামায়ণ—ইহাতে উচ্চতর আদর্শের কথা কিছু নাই,'—তবে অ-কবির কাছে আর কী প্রত্যাশা! এ অবস্থায় যদি মেঘনাদবধ অবলম্বনে এদেশে প্রবলভাবে রামায়ণ-বিরোধী আদর্শের প্রচার হতে থাকে, তবে 'বাংলায় রামায়ণ বিপন্ন' প্রস্তাবটিকে বোধ হয় একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

উপসংহার

[নূতন কথা : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মাইকেলের স্থায্য স্থাননির্ণয়ে নূতন দৃষ্টিকোণের কথা : ২য় খণ্ডের ইঙ্গিত]

'উপসংহার' সমাপ্তিবাচক। 'সংহরণে'র ধারণাও এর মধ্যে। কিন্তু নূতনের ধারণা তো বহন করে না। অথচ এই উপসংহার নূতন কথা বলার উদ্দেশ্যেই রচিত। নূতন সুরের কথা।

অনেকটা নেতি-বাচক কথাতেই এ গ্রন্থের অধিকাংশ স্থান ভরে গেছে। মাইকেলের স্থান কোথায় নয়, কোন্ কোন্ প্রশস্তি তাঁর প্রাপ্য নয়, কোথায় তাঁর ত্রুটি-দুর্বলতা-অপূর্ণতা, বাল্মীকি-কালিদাস-কৃত্তিবাসের কাছে তাঁর ঋণের বহরটা কতোখানি, এই তিন মহাকবির সৃষ্টি-মহিমা কিভাবে মাইকেল-প্রশস্তি-মোহে উপেক্ষিত, কিভাবে প্রতিভার অপচয় ঘটেছে, চরম খেয়ালীপনায় কবি কোথায় কতো অপরাধে অপরাধী হয়েছেন, ঘটিয়েছেন কতো অন্যায়-অসংগতি, কী ধরণের কবি-প্রবণতা হয়ে চলেছে উপেক্ষিত—সর্বোপরি, মাইকেল-সমালোচনার ধারাটাই যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিভ্রান্ত,—যার ফলে বলতে হয়, বাংলায় রামায়ণ আজ বিপন্ন,—প্রধানত এই সব বৃত্তান্ত ও তাদের প্রমাণ-প্রয়োগ নিয়েই পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলি ব্যাপৃত। প্রসঙ্গত কবি-সৃষ্টির স্বরূপের উপর আলোকপাতের চেষ্টা হয়েছে বটে, কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কোথায় ঠিক মাইকেলের ন্যায্য স্থান, সেই অকুণ্ঠ প্রশস্তিযোগ্য অবদানের কী সৃষ্টি-মহিমা, তার কিছু কিছু ইঙ্গিত হয়তো স্থান পেয়েছে, উপযুক্ত আলোচনার অবসর হয় নি।

উপসংহারে এসে ঐ প্রসঙ্গ উত্থাপন লেখকের পক্ষে বড়োই কুণ্ঠার বিষয়। কারণ 'উপসংহার'-এর সীমিত পরিধিতে ঐ পরম বাঞ্ছিত আলোচনা সম্ভব নয়। শুধু তার ইঙ্গিতটুকু দেওয়াই এই উপসংহার-রচনার উদ্দেশ্য। তাই সহৃদয় পাঠক-সমাজের কাছে গ্রন্থকারের বিনীত প্রার্থনা, যেন এই 'উপসংহার'কে অনুগ্রহ করে তাঁরা 'মাইকেল-সমীক্ষা'র উপসংহার বলে না ধ'রে কেবল বর্তমান খণ্ডের সমাপ্তি এবং ভাবী খণ্ডের উপক্রমণিকা, বলে মনে করেন। কী সেখানকার প্রতিপাদ্য, তার ইঙ্গিত দেওয়ার আগে দুটি কথা নিবেদন করি।

'প্রকৃত সমালোচনা পূজা' — গ্রন্থারম্ভে এই রবীন্দ্র-বচনের প্রয়োগ-ভঙ্গিতে একটা কটাক্ষপাতের স্পর্ধা ধরা পড়তে পারে। কিন্তু উদ্দিষ্ট কটাক্ষ (?) বচন-নির্মাতার প্রতি নয়, তদনুসরণে যান্ত্রিকতার প্রতি। নচেৎ এই গ্রন্থকারেরও বিশ্বাস, প্রকৃত সমালোচনা পূজা, অর্থাৎ পূজ্যের পূজা, বা পূজ্যাংশের পূজা। তবে পূজার তো বিধি আছে? আছে মন্ত্র, তন্ত্র, পদ্ধতি;—আছে পূজার সাজ, উপচার, আঙ্গিক। বিশেষ দেবতার বিশেষ মন্ত্র, বিশেষ তন্ত্র, পদ্ধতি বা উপচার। এর ব্যতিক্রমে পূজা অবৈধ, অসিদ্ধ। তাই কোথাও তুলসী, কোথাও বিল্বপত্র; কোথাও ধুতুরা, কোথাও রক্তজবা; কোথাও সগর্ভদূর্বা, কোথাও বা অগর্ভ। বিধিবিহিত পূজায় ভক্তি-শ্রদ্ধার অবশ্যই প্রয়োজন, কিন্তু সঠিক পদ্ধতির সঠিক প্রয়োগও চাই বৈ কি, আর চাই সঠিক উপচার ও সাজ-আঙ্গিক। নচেৎ এই মাইকেলের মতোই লক্ষ্মী-পূজা-শিব-পূজার আয়োজনে নিকুম্ভিলা যজ্ঞ করা হবে! গঙ্গাজলেই হবে হোমের আহুতির ব্যবস্থা! আদিরসের প্রদীপে হবে বীরাঙ্গনা-প্রতিমার আরতি!

দেবতা-বিশেষে মন্ত্রও যে পৃথক হওয়া উচিত, এটা মনে রাখা হয় না বলেই মাইকেল-পূজায় আনা হয় কখনও রবীন্দ্রপূজার মন্ত্র, কখনও বৈষ্ণব-ভক্ত-মহাজনের, কখনও জাতীয়-জাগৃতি-ঋষির, আবার কখনও বা চৈতন্যাবতারের! এই অবৈধ পূজার মত্ততা আমরা চাই না। এতোটা আপত্তিকর না হলেও, বাল্মীকি বা কালিদাস, কারও সঙ্গে একই আসরে মাইকেলের পূজার আয়োজন আমাদের বিচারে অসমীচীন। নির্বিচার পূজা-বিহ্বলতা আমাদের এমনই পেয়ে বসেছে যে, স্বভাবত স্পর্ধাধর্মী হয়েও স্বয়ং কবি বললেন মিলটনের সমকক্ষ তিনি ন'ন, কারণ Milton is divine, কিন্তু তবু আমরা তাঁকে পুরো মিলটন না করে ছাড়ি না, হয়তো আরো উপরে তুলতে চাই। মাইকেল অভ্রান্ত যে, তিনি নিজেকে মিলটন মনে করার স্পর্ধা দেখান নি, কিন্তু তিনি ভ্রান্ত যে, 'it licks Kalidas' এই চাটুবাদকেই সত্য মনে করে এমন অভিমত জারি করেছেন, যাতে তাঁর পূজারীরা এদিকে কালিদাসের, ওদিকে দান্তে-ভার্জিল-ট্যাসোর উপরের তলার আয়োজনে তাঁর পূজার সাজ সাজিয়েছেন। উপলক্ষ অনুযায়ী আসর সাজাতে হয়, নচেৎ যেমন নিজেদের, তেমনি অপরের বিভ্রান্তির কারণ হয়ে পড়ে। গোটা ব্যাপারটাই হয় লক্ষ্যভ্রষ্টের আয়োজনের মতো, কেবলই সমারোহের মত্ততা। দোল-দোল-দুর্গোৎসবের সব ক'টাই একসঙ্গে এক আসরে করা চলে কি? কোথায় হবে 'অষ্টপ্রহর', কোথায় 'কালী-

কীর্তন,' কোথায় 'বিরাট-পাঠ', কোথায় 'ভাগবত-পাঠ',—উৎসব-কর্তাকে এটা একটু বিচার করতে হয় বৈ কি। সারস্বত সভায় যাঁর আসল স্থান, তাঁরই জন্য বিরাট ধর্ম-সভা ডেকে বসলে চলবে কেন? কবি বা সাহিত্য-শিল্পী যাঁর পরিচয়, তাঁকে মাল্যচন্দনে ভূষিত করবার জন্য মহাপুরুষের সভায় নিয়ে গিয়ে তুললে অনর্থক হট্টগোল করা হবে। কবি-বিগ্রহের অবস্থাটি হবে 'হংসমধ্যে বকো যথা', তাঁর গুণ-কীর্তনেও ফাঁক থেকে যাবে।

অতএব সমালোচনায় পূজা যদি সম্পন্ন করতে হয়, তবে সমারোহ-মত্ততা বর্জন করে প্রকৃত গুণ-কীর্তনে ব্রতী হওয়া আবশ্যক। এবং আসরও রচিত হওয়া দরকার তদনুযায়ী আঙ্গিকে। কেবল এদেশে-সেদেশের বড়ো বড়ো কবির পাশে মাইকেলের নামটা সাজিয়ে প্রচুর ধূপ-ধূনায় দিঙ্‌মণ্ডল আচ্ছন্ন করে তোলার মধ্যে ভাবাবেশ-বিহ্বলতায় একজাতীয় পূজা হতে পারে, সার্থক সমালোচনার নৈষ্ঠিক ব্রত উদ্‌যাপন হয় না। সেখানে চাই বিশেষের উপর বিশেষ আলোকপাত। শিল্পীর সেই সেই গুণ বা কৃতিত্বের উপর যথাযোগ্য আলোকপাত বাঞ্ছনীয়, যেগুলি বিশেষভাবে তাঁর নিজস্ব, এবং যে গুলির উত্তর-সাধনায় বাংলা সাহিত্য হয়েছে প্রকৃতই সুসমৃদ্ধ।

এই ভূমিকাযোগে সেইটাই নিবেদন করা উদ্দেশ্য যা এই গ্রন্থের সপ্তবিধ বিশেষ লক্ষ্যের সপ্তম বলে 'নিবেদন'-এ জানানো হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মাইকেলের স্থান-নির্ণয়ে দৃষ্টিকোণের পরিবর্তন হওয়া আবশ্যক,—বর্তমান গ্রন্থরচনার প্রেরণামূলে এই ধারণার প্রভাবও সামান্য নয়। বিচিত্র অভিনবত্বের প্রবর্তকরূপে মাইকেলের যে স্থান-নির্ণয়, তা অভ্রান্ত ঠিকই। বিভিন্ন কাব্যের সঙ্গে নাট্য-কীর্তিগুলিকেও—বিশেষত 'কৃষ্ণকুমারী'—ঐ স্থান-নির্ণয়ে যে প্রতিভার পরিমাপকরূপে দেখানো হয়, তাও অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু এই যে তাঁর অবদানের শ্রেষ্ঠত্ব-নিরূপণের বেলা সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হয়ে থাকে মেঘনাদবধ কাব্যে, এইখানেই বক্তব্যের অবসর। কবি মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ দান মেঘনাদবধ নয়। সেখানে শুধু তাঁর শক্তির পরিচয়ে আমরা মুগ্ধ হই, সৃষ্টির মহিমায় নয়, সুষমায় তো নয়ই। এই মহিমা-সুষমায় অদ্বিতীয় তাঁর 'বীরাঙ্গনা'। তিলোত্তমায় ও মেঘনাদবধে খুব একটা আকাশ-পাতাল প্রভেদ নেই। তিলোত্তমায় কবির এমন বহু মূল্যবান প্রয়োগভঙ্গি, কল্পনাভঙ্গি ও উপমাদি প্রকাশরীতি দেখানো যেতে পারে,

মেঘনাদবধে যাদের শুধু পুনরাবৃত্তিই লক্ষণীয়। এমনও দেখা যায়, মেঘনাদবধে যেগুলির প্রয়োগ দূষিত, তিলোত্তমায় তাদের নির্দোষ প্রয়োগ। মেঘনাদবধে যা আড়ষ্ট বা কৃত্রিম, তিলোত্তমায় সেইটাই সাবলীল ও প্রাণবন্ত। যেমন, 'কল্পনা'র ভূমিকা-নির্ণয়ে মেঘনাদবধের কবি ভ্রান্ত, কিন্তু তিলোত্তমার কবি সজাগ সচেতন। মেঘনাদবধের বাণী-বন্দনার চেয়ে তিলোত্তমার বন্দনা সুন্দরতর, অধিকতর সৌষ্ঠবমণ্ডিত। তা ছাড়া,—সেই 'আশুগতি যথা আশুগতি' (মেঘনাদবধের 'আশুগতিগতি' নিকৃষ্টতর), সেই 'বিধির নির্বন্ধ কিন্তু কে পারে খণ্ডাতে', 'পূবাশার হৈম দ্বার', 'মাধবের বুকে কৌস্তুভ রতন', 'বাড়বাগ্নিসদৃশ কোপানল', 'প্রভা আভাময়ী', 'কৃত্তিকাকুল-বল্লভ', 'যথা ব্যাধ বধয়ে শার্দূল, 'আনায়-মাঝারে তারে আনিয়া কৌশলে', 'গ্রাসে রাহু যথা সুধাংশুমণ্ডলী', 'মদকল করী নলবনে, নলদলে দলি পদতলে';—সেই 'ত্বিষাম্পতি', 'বীতিহোত্ররূপী', 'সুনাসীর', 'তারাকারা', 'সাগরের তীরে বালিবৃন্দ';—সেই 'নরকবর্ণনা'; সেই 'বিলাসী'-যোগে শব্দরচনা; মুরারি-গোপিনীর উপমার অজস্রতা; এমনকি, সেই 'যথা ধর্ম জয় তথা' পর্যন্ত সবই তিলোত্তমায় পাওয়া যায়। এটুকু খালি ঐ দুই কাব্যের সম্ভাব্য বিস্তারিত তুলনামূলক আলোচনার ইঙ্গিত মাত্র। অবশ্য এ কথাও বক্তব্য নয় যে মেঘনাদবধে কাব্য হিসাবে উন্নত সংস্করণের কোনো লক্ষণ নেই। পরবর্তী খণ্ডের প্রশস্ত পরিধিতেই বিষয়টির সম্যক আলোচনা হবে সম্ভবপর। সেখানেই পরিব্যক্ত হবে এই কাব্য-কেন্দ্রিক অপরাপর অসৌষ্ঠবের কথা যাদের ভিত্তিতে বলা হয়েছে মেঘনাদবধ মাইকেলের শ্রেষ্ঠ অবদান নয়।

'বীরাঙ্গনা'-ই কবির নিটোল সৃষ্টি। মাইকেলের নূতন ছন্দের নূতন ভাষার রমণীয়তম কাব্য, সুর যার বিশুদ্ধ রাগ-রাগিণীসম্মত। মেঘনাদবধে যার বিক্ষিপ্ত খেয়ালী অনুশীলন, বীরাঙ্গনায় তারই নিপুণ পরিশীলন। মেঘনাদবধে ব্যায়াম, বীরাঙ্গনায় স্বাস্থ্য। ওখানে ডন-বৈঠকের চমকলাগানো কসরৎ, এখানে গঠিত দেহ-মনের কান্তি। ওখানে অর্জনের উত্তাপ আবেগ উগ্রতা, এখানে অর্জিতের শান্তি সুষমা কমনীয়তা। ওখানে দাবী মহাকাব্যের, কিন্তু সে দাবী বিতর্কিত, এখানে অপূর্ব নাট্যরসাঢ্য গীতিকাব্যের সুষমা অবিসংবাদিত। মেঘনাদবধে acquiring a pucca fist-এর মহড়া। পাকা হাতের মহাকাব্য আর হলো না, কিন্তু হাত যে পেকেছে, তাতে সন্দেহ নেই। বীরাঙ্গনা সেই পাকা-হাতের কাব্য। শিল্পী মধুসূদন যে কঠিন শিল্প-সাধনায় ব্রতী হন,

তিলোত্তমা-মেঘনাদবধের দুটি উত্তরণের ধাপ বেয়ে বীরাঙ্গনাতেই তার সিদ্ধি। কবি যদি মহাকাব্যেই তাঁর স্বভাবসিদ্ধ লিরিক-প্রতিভার চর্চা করে থাকেন, তবে সেটা শিল্পীর খেয়াল মাত্র। আমরা সেই খেয়ালের মধ্যে কবির মৌল প্রকৃতি হারিয়ে ফেলবো কেন? বরং নিশ্চিন্ত হবো দেখে, যে, পাকা-হাতের মহাকাব্য হলো না বটে (হলো না, কারণ, হওয়ার কথাই নয়), কিন্তু যা পাওয়া গেল মেঘনাদবধের কবির হাতে, তা পাকা-হাতেরই কাব্য। 'বীরাঙ্গনা' নিঃসন্দেহে কবির পরিণত শিল্প-সাধনার ফল।

মেঘনাদবধের কাব্য-বিচারে সমালোচককে অগ্রসর হতে হয় মৌলিকতা-প্রশ্নের সঙিন-উঁচানো কণ্টকিত পথ বেয়ে। সঙিনের খোঁচায় পদে পদেই তার প্রাণান্ত। পক্ষান্তরে বীরাঙ্গনা অখণ্ড মৌলিকতার মহিমায় সমুজ্জ্বল। মেঘনাদবধের কবি দেশ-বিদেশের ঋণ-ভারে প্রপীড়িত। বীরাঙ্গনায় কবি-ঋণ যেটুকু আছে, তার গোত্র যেমন পৃথক, ফসলের মহিমার স্বকীয়তায় সে ঋণও তেমনি অকুণ্ঠ অভিনন্দনযোগ্য।

কিন্তু তবু মেঘনাদবধ মহাকাব্য, আর বীরাঙ্গনা গীতিকাব্য। তাই হয়তো এভাবে শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে এ দুটিকে পাশাপাশি তুলে ধরার যুক্তি হবে অগ্রাহ্য—ক্ষুদ্র-বৃহতের জাতিগত পার্থক্যে। মহাকাব্যে-গীতিকাব্যে আবার তুলনা কিসের? বিজাতীয়ের মধ্যে তুলনার অবতারণা সংকীর্ণ দৃষ্টির পরিচায়ক বলে গণ্য হতেই পারে। কিন্তু তবু যে এর প্রয়োজন আছে পরবর্তী খণ্ডে সেইটাই বুঝিয়ে বলার পরিকল্পনা।

বীরাঙ্গনার মধুসূদন একাধারে কবি, নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক। একাধারে ক্লাসিক ও রোম্যান্টিক, সনাতনী ও আধুনিক। বাংলা সাহিত্যে ভাবী আধুনিকতার পূর্বাভাস এখানে। শুধু তাই নয়, মাইকেলের নূতন ছন্দে বিচিত্র রস-পরিবেশনের যে শ্রেষ্ঠ নমুনা এখানে ফুটেছে, মাইকেলোত্তর বাংলা কাব্যে তার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অনুশীলন যথেষ্ট দেখা যায়। ভাষার দিক দিয়ে, এ হলো সেই কবি-ভাষা যার অনুপ্রেরণায় পরবর্তী যুগের বাংলাকাব্য উৎসাহিত। মেঘনাদবধের ভাষার যে কোনো সার্থক অনুশীলনে কেউই উৎসাহিত হয় নি, এতেই প্রমাণিত হয়ে গেছে সে ভাষার প্রকৃতিগত অদ্ভুতত্ব ও অবদান হিসাবে জড়ত্ব। এ ভাষার স্থান আমাদের ভাষার museum-এর একটা উঁচু গ্যালারীতে। সাধারণ পাঠককে গাইডের সাহায্যে যার পরিচয় নিয়ে দুদণ্ড চোখ বুলিয়ে আসতে হয়। বীরাঙ্গনার ভাষা ও সুর বেঁচে আছে পরবর্তী

কালের অমিত্রচ্ছন্দের কাব্যের মধ্যে প্রচ্ছন্নরূপে তাদের অদূরবর্তী পূর্বসূরীর আছে। সুতরাং বাংলা ভাষার প্রকৃত সেবা বলতে যা বোঝায়, তার অকৃত্রিম তজস্বী রূপ মেঘনাদবধে নয়, এই বীরাঙ্গনায় ও চতুর্দশপদীতে, যারা অনুশীলন-সূত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে আমাদের সাহিত্যদেহে, যারা যুগিয়েছে নব নব সৃষ্টির প্রেরণা আমাদের সাহিত্যের অন্তরে। তাই যাদেরই জীবন্ত প্রভাব সঞ্চারিত পরবর্তী কালের সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যে, সাহিত্যের ইতিহাসে মাইকেলের স্থান-নির্ণয়ের বেলা কবির সেই সেই সৃষ্টিকেই প্রাধান্য দেওয়া উচিত। এর জন্য বীরাঙ্গনা ও চতুর্দশপদীর নূতন দৃষ্টিতে মূল্যায়ন আবশ্যক। এ বিষয়ে মৎ-সম্পাদিত চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হয়েছে। বর্তমান গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে গ্রন্থকারের অন্যতম লক্ষ্য হবে এইটাই যুক্তি-তথ্যাদিযোগে প্রমাণ করা যে, মহাকাব্যের কবি হিসাবে মাইকেলকে মহাকবি করে দেখানোর নেশায় ঐ যে মেঘনাদবধকেই দেখানো হয়ে থাকে তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি বলে, সুতরাং তাঁর সৃষ্টির সারাংশ বলে, এবং এই দিয়েই যে বাংলা সাহিত্যে ও বাঙালী মানসে মাইকেলের স্থান নির্ণয় করা হয়ে থাকে, এ দৃষ্টি ভ্রান্ত। এর ফলে কবির যা সত্যই সেরা অবদান, পরবর্তী কালের সাহিত্যে যাদের সঞ্জীবনী ও সৃজনী প্রভাব সুদূরসঞ্চারী, যাদের অবলম্বনে কবি লাভ করেছেন প্রকৃত সাহিত্যিক অমরতা—ঐতিহাসিকের ঢক্কা নিনাদে নয়, অর্থ-পুস্তকের মন্তব্যে বা অধ্যাপকের চীৎকারেও নয়—সাহিত্যের অণু-পরমাণুতে উপলব্ধিযোগ্য যে অমরতা—, সেই অবদানকে উপেক্ষা করে, কেবল একটা আড়ম্বরের দিকে আকর্ষণের দৃষ্টিবিভ্রম ঘটানো হয়েছে। কবির প্রতিও সুবিচার করা হয় নি, কারণ যে কাব্য কবির অজস্র ত্রুটি-বিচ্যুতিতে ভরা, যা কবির রকমারি দুর্বলতার বা অন্যায়-অবিবেচনার দৃষ্টান্তস্থল, তাই দিয়েই তাঁর চরম বিচার নিষ্পন্ন হওয়ায় সারস্বত সমাজে তাঁর স্থান হয়েছে বিতর্কিত। সম্প্রদায়-বিশেষের মধ্যে বদ্ধমূল হয়েছে মাইকেলের প্রতি অনুরাগের পরিবর্তে বীতরাগ, বাধ্যতা ব্যতীত মাইকেল-পাঠে মনোনিবেশ দেখা যায় না। আর, সমাজ-মানসেও মাইকেলের প্রতি বিরূপ প্রতিক্রিয়ার মূল এই মেঘনাদবধে প্রতিফলিত আজগুবি কবি-মানসের প্রচার। মহাকাব্যের কবির পরিবর্তে কেবল কবি হিসাবে মাইকেল যে সর্বহৃদয়-জয়ী, এবং তিনি, যেমন বাংলার ও বাঙালীর, তেমনি কাব্যরসিকমাত্রেরই মনের মতো কবি, এই সত্যের প্রতিষ্ঠায়, আশা করি, মাইকেল-সমীক্ষা হবে সার্থকতর।

এই সঙ্গে যুক্ত হবে মাইকেলের দু'খানি উপেক্ষিত প্রহসনের কথা, যেখানে প্রকাশ পেয়েছে মাইকেলের সেই বিরল পরিচয়, সমাজ-কল্যাণ-চেতনা বা সংস্কার-চেতনা। এইখানেই কিছু খাঁটি মহৎ ও বৃহৎ চিন্তার পরিচয় কবি মধুসূদনের, যা নিয়ে জাতির কাছে তিনি প্রসন্নচিত্তে দাঁড়াতে পারেন মনীষা-দীপ্ত ব্যক্তিত্বের মূল্যায়নের প্রত্যাশায়। এদের সাহিত্যমূল্যও অসামান্য।

আশা করি, উপসংহারে কথিত এই সমীক্ষাধারায় বাংলা সাহিত্যে মাইকেলের স্থান-নির্ণয় সম্পর্কে যে নূতন ইঙ্গিত রইলো, পরবর্তী কালের ইতিহাস-রচয়িতা তার প্রতি মনোযোগী হবেন। এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনাই হবে পরবর্তী খণ্ডের প্রধান উপজীব্য।

তবে গোড়াতেই এই গ্রন্থকে 'প্রথম খণ্ড' বলে চিহ্নিত করতে সাহস পাই নি, কি জানি, যদি অজানা প্রতিকূলতায় অথবা বর্তমান খণ্ডের প্রতি বিরূপতার হুমকিতে দ্বিতীয় খণ্ড আদৌ প্রকাশের পথ খুঁজে না পায়! বিধাতা জানেন তার ভাগ্যে কি আছে।

সমাপ্ত

॥ 'বেদশাস্ত্রবিবাদেন কালো গচ্ছতি ধীমতাম্' ॥

॥ 'পরস্পরবিরোধিন্যোরেকসংশ্রয়দুর্লভম্' ॥

॥ 'সরস্বতী শ্রুত-মহতাং মহীয়তাম্' ॥

— × —

আলোচনান্তর্গত গ্রন্থ-প্রবন্ধাদির সংকেত

রচয়িতা	রচনা
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (ডাঃ)	বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ১ম, ১৯৫৯।
ঐ	আধুনিক বাঃ সাঃ সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত, ৩য়, ১৩৭০।
আশুতোষ ভট্টাচার্য্য (ডাঃ)	'বাংলার লোকজীবনে রামায়ণ'—বেতারজগৎ (শারদীয়া সংখ্যা), ১৯৭১।
কম্বন	তামিল রামায়ণ 'রামাবতারম্'—A History of South India (by—K. A. Nilkanta Sastri, M. A., Professor of Indology, Mysore University) থেকে তথ্য সংগৃহীত।
কালিদাস	'রঘুবংশম্'।
ঐ	'কুমারসম্ভবম্'।
ঐ	'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'
কালিদাস রায় (কবিশেখর)	বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়, ১ম খণ্ড, ৩য় সং।
কৃত্তিবাস	কৃত্তিবাসী রামায়ণ—দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত (১৯১৬), চতুর্দশ মুদ্রণ, আগষ্ট ১৯৫৫, প্রকাশনা—ভট্টাচার্য্য এ্যাণ্ড্ সন্স লিঃ।
জনার্দন চক্রবর্ত্তী	'পিতৄন্ নমস্তে'—বেতারজগৎ (শারদীয়া সংখ্যা), ১৯৭১।
জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস	বাঙ্গালা ভাষার অভিধান, ২য় সং।
ট্যাসো (Tasso)	The Jerusalem Delivered, Translated by J. H. Wiffen.
তুলসীদাস	রামচরিতমানস (হিন্দী রামায়ণ)—সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত কর্তৃক সংকলিত ও (বাংলায়) অনূদিত, খাদি প্রতিষ্ঠান, ১৯৩৪।

রচয়িতা	রচনা
তুলসীদাস	ঐ—গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর থেকে ইংরাজী অনুবাদসহ প্রকাশিত, ১৯৬৮।
ঐ	বিদ্যাবারিধি পণ্ডিত জ্বালাপ্রসাদজী-মিশ্রকৃতসঞ্জীবনী-টীকাসহিত শ্রীগোস্বামি-তুলসীদাসজীকৃত রামায়ণম্—বেঙ্কটেশ্বর প্রেস, বোম্বাই, ১৯৬০।
দীননাথ সান্যাল	‘মেঘনাদবধ কাব্যে সীতা ও সরমা’—সমালোচনা-সংগ্রহ, ৫ম সং, কলিঃ বি. বি. ১৯৫৮।
নগেন্দ্রনাথ সোম	মধুস্মৃতি।
নবীনচন্দ্র সেন	রৈবতক।
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	রবীন্দ্র-জীবনী, ১ম।
প্রমথ চৌধুরী	সবুজ পত্রের মুখপত্র, বৈশাখ, ১৩২১।
ঐ	বীরবলের হালখাতা।
প্রমথনাথ বিশি	মাইকেল মধুসূদন, ২য় সং।
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	বঙ্কিম-রচনাবলী, ২য় খণ্ড, ‘সাহিত্য সংসদ’ প্রকাশিত।
ঐ	Calcutta Review No. 104, 1871.
ঐ	ঐ অনুবাদ (‘বাঙ্গালা সাহিত্য’), মন্মথনাথ ঘোষ, প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড্ সন্স্, ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ।
বাল্মীকি	‘রামায়ণম্’: তিলক-শিরোমণি-গোবিন্দ-রাজীয়ে (ভূষণে)-তি-টীকা-ত্রয়-সমলংকৃতম্ :—বোম্বাই এলফিনষ্টোন কলেজের সংস্কৃত-অধ্যাপক কট্টী-শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মুধোলকর কর্তৃক সম্পাদিত, বোম্বাই গুজরাটী প্রিন্টিং প্রেসে মুদ্রিত, ১৯২০।

রচয়িতা	রচনা
বাণী রায়	মধু-জীবনীর নূতন ব্যাখ্যা।
বিবেকানন্দ স্বামী	প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য।
ঐ	স্বামি-শিষ্য-সংবাদ।
ভবভূতি	'উত্তররামচরিতম্'
ভার্জিল (Virgil)	The Æneid, Translated by Michael Oakley.
মাইকেল মধুসূদন দত্ত	গ্রন্থাবলী,—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ সংস্করণ।
ঐ	'মেঘনাদবধ কাব্য'—রাজকিশোর দে কর্তৃক ১৮৭৪ সালে প্রকাশিত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের টীকা ও ভূমিকা-সম্বলিত এবং কুসুমকলিকা-প্রণেতা প্রসন্নকুমার ঘোষ লিখিত কবির 'জীবন-বৃত্তান্ত'-যুক্ত প্রাচীন সংস্করণ।
ঐ	'মেঘনাদবধ কাব্য',—গ্রন্থকার-সম্পাদিত, মডার্ণ বুক এজেন্সী-প্রকাশিত।
ঐ	'চতুর্দশপদী কবিতাবলী',—ঐ।
মিলটন (Milton)	Paradise Lost
ঐ	Samson Agonistes.
মোহিতলাল মজুমদার	কবি শ্রীমধুসূদন, ১ম সং, বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫৪।
যতীন্দ্র রামানুজদাস	রামায়ণ-সার, শ্রীবলরাম ধর্মসোপান।
যোগীন্দ্রনাথ বসু	মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত, ১৩৩২ সালের আশ্বিনে প্রকাশিত পঞ্চম সংস্করণ।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	'সাহিত্যসৃষ্টি'—সাহিত্য, ১৩১৪।
ঐ	'ভারতী'-প্রবন্ধ, ১২৮৪।
ঐ	ঐ ১২৮৯।
ঐ	জীবনস্মৃতি।